বিমল কর-এর

বাছাই গল্প

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

আশ্বিন ১৩৭১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ
ও
মডার্ন প্রসেস

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং কোঃ প্রাঃ লিমিটেড

আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস

আলোকচিত্র
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

সাগরদা-কে

সূচীপত্র

'বাছাই গল্প' সম্পর্কে

'বাছাই গল্প' সাদামাটা নাম। নির্বাচিত গল্পেরই নামান্তর। বেশ কয়েক বছর আগে নির্বাচিত গল্পের একটি সংকলনও প্রকাশ পেয়েছিল আমার। এখন আর সেই বই পাওয়া যায় না। পূর্ব গ্রন্থটির সঙ্গে এই 'বাছাই গল্পে'র কোনো সম্পর্ক নেই। এটি অন্য-এক সংকলন।

'বাছাই গল্প' নামকরণ করেছেন শ্রীসুনীল মণ্ডল। তিনি এই গ্রন্থের প্রকাশক। সুনীল আমার স্নেহভাজন, অনুজতুল্য। তাঁর প্রবল উৎসাহ এবং তৎপরতা না থাকলে আজকের দিনে দু তিন মাসের মধ্যে এমন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর তৎপরতার সঙ্গে পাললা দেবার সাধ্য আমার ছিল না। যে-সব ত্রুটি পাঠকের চোখে পড়তে পারে তার দায় আমার, সুনীলের নয়।

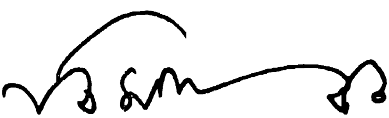
সুনীলের বড় ইচ্ছে ছিল, এই গ্রন্থটির জন্যে আমি একটি ভূমিকা লিখে দি। আমি রাজী হই নি। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটলে নিজের লেখা সম্পর্কে কিছু লেখা লেখকদের উচিত নয়। ওটা যে শুধু শিষ্টাচার তা নয়, সঙ্গত। লেখকের সমস্ত লেখাই পাঠকের কাছে নিবেদনের মতন। পাঠক তা গ্রহণ করতে পারেন, নাও পারেন। নিজের রুচি, পছন্দ, ভাল মন্দ লাগার মন নিয়ে পাঠক লেখার বিচার করেন। লেখকের সেখানে বলার কি থাকতে পারে?

প্রাসঙ্গিক অন্য কয়েকটি কথা বলা দরকার। এই গল্প সংকলনটিতে আমি লেখাগুলিকে কালানুক্রমে সাজাবার চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে তা আর কখনো করতে পারি নি। কাজটি করতে গিয়ে কিছু ভুল চুক ঘটে গিয়েছে। যেমন 'পলাশ' গল্পটি আনন্দবাজার দোল সংখ্যায় প্রকাশিত, ভুল করে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বলে ছাপা হয়েছে। 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পটিরও প্রকাশ কালের তারিখ ছাপার ভুলে ১৯৫১ সাল হয়েছে। ওটি ১৯৫২ সাল হবে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই সব ভুল-ভ্রান্তি, কালানুক্রমের কোনো মূল্য থাকার কথা নয়। তবে কোনো পাঠক যদি লেখকের লেখার ধারাবাহিকতার খোঁজ করতে চান তাঁর কাজে লাগতে পারে এই মাত্র।

মোটামুটি ভাবে আমি গল্প লিখছি আজ প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ বছর। সময়টা নিশ্চয় দীর্ঘ। দীর্ঘকাল লিখছি বলেই লেখক হিসেবে আমার যোগ্যতা আছে— তেমন দাবি অবশ্যই আমি করি না। অনেক কাল ধরে লেখার ফলে গল্পের সংখ্যা কম হয় নি। 'বাছাই গল্প' গ্রন্থটির গল্প সাজাতে গিয়ে দেখি গত কয়েক বছরের গল্প আর দেওয়া যাচ্ছে না। দিতে গেলে বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যায়। এই ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি।

অনেক দিন ধরে গল্প লিখতে লিখতে গল্প লেখা সম্পর্কে আমার নিজের একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। সেটি অভ্রান্ত এমন দাবি আমার নেই। কোনো কালেই ছিল না। আমার সমস্ত গল্প আমার ধারণা মতন লেখা, তা ভালই হোক অথবা মন্দ।

আজকের দিনে একটি বই প্রকাশ করা যে কত ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সাধারণে হয়ত বোঝেন না। সুনীল যে এই দুর্দিনে শেষ পর্যন্ত 'বাছাই গল্প' প্রকাশ করতে পেরেছে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। পাঠক যদি প্রসন্নচিত্তে গ্রন্থটি গ্রহণ করতে পারেন আমি খুশী হব॥



ইঁদুর

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে যতীন।

আর-একটু হলেই ডান হাতের আঙুল ক'টা ওর ইঁদুর-মারা কলে থেঁতলে যেত। র‍্যাশন-আনা ক্যাম্বিসের থলেটা বার করতে হাত বাড়িয়েছিল বেঞ্চির তলায়। কে জানত, ওরই তলায় ওত পেতে বসে আছে সর্বনেশে কলটা। লোহার ধারালো দাঁত আঙুলে ফুটতেই চট করে হাত সরিয়ে নিয়েছে, তাই না রক্ষে।

সাবধানে কলটাকে বাইরে টেনে আনে যতীন। তীক্ষ্ণদন্ত ইস্পাতের যন্ত্রটা হাঁ করে রয়েছে; সদ্য-ধার-দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকার দুটি করাতের ফলা শিকার ধরার সম্ভাবনায় তখনও অপেক্ষমান।

'কই শুনছ, শীঘ্রি একবার এস তো এখানে।' রুক্ষ গলায় হাঁক পাড়ে যতীন।

সামনে দাওয়ায় বসে বাসী রুটিগুলো দালদায় ভেজে নিচ্ছে মলিনা। বসে বসেই উত্তর দেয়, 'আমার হাত জোড়া। কি বলছ বলো?'

'এখান থেকে বললেই যদি হবে তবে তোমায় সোহাগ করে ডাকছি কেন? ঘরে এসে স্বচক্ষে তোমার কাণ্ডটা একবার দেখে যাও।'

যতীনের তাগিদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না মলিনা। পরিপাটি করে স্বামীর জল-খাবারের থালা গুছোয়। দালদায় লালচে করে ভাজা খান চারেক বাসী রুটি, দু টুকরো বেগুন ভাজা, একটু গুড়।

স্বামীর দিকে জলখাবারের থালাটা এগিয়ে দিয়ে মলিনা বলে, 'অমন করে হাঁক পাড়ছ কেন, হয়েছে কী?'

'হয় নি, তবে আর-একটু হলেই মোক্ষম একটা কিছু হত—!' মুখ চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে যতীন কলটার দিকে ইঙ্গিত করে।

মেঝের দিকে তাকিয়ে মলিনা একটু অবাকই হলো হয়ত।

'ওটা আবার টেনে বের করতে গেলে কেন?'

'না' বাব করব কেন, ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দি—তারপর আমার আঙুল ক'টা উড়ে যাক, না হয় তোমার পায়ের গোড়ালি—!' রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে যতীন ভুরু কুঁচকোয়।

'আহা, কি আমার বাক্যি রে—' মলিনা স্বামীর প্রতি ভ্রূভঙ্গি হেনে মেঝেতে উবু হয়ে বসতে বসতে বলে, 'ধান ভানব মরণকালে, দাঁড়িয়ে থাকি ঢেঁকিশালে। কবে তোমার হাত কাটবে, পা কাটবে, তাই ভেবে কলটাকে সিন্দুকের মধ্যে পুরে রাখি!'

আহার-পর্ব শুরু হয়েছে। তবু চটেমটেই উত্তর দেয় যতীন, 'মেয়েলি শ্লোক

মরণকাল পর্যন্ত তোমায় আর ঢেঁকিশালে অপেক্ষা করতে হত না !'

ইঁদুরকলে হাত দিয়েছিল মলিনা ; স্বামীর কথাটা কানে যেতেই হাত সরিয়ে নিল। তাকাল যতীনের মুখের দিকে।

'বেঞ্চির তলায় হাত ঢুকিয়েছিলে কেন ?'

'থলে বের করতে।'

'একটু আর তর সইছিল না, যত রাজ্যের জিনিসপত্র হাঠকাতে লাগলে !' উষ্ণস্বরে বলে মলিনা ; ইঁদুরকলটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে রাখে।

বেঁকা চোখে যতীন স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করছিল। কলটা সম্পর্কে এতটা তাচ্ছিল্য তার মনঃপূত নয়।

'আবার, আবার সেই—কথাটা গ্রাহ্যি হল না ?'

'না, হল না।' মলিনা উঠে দাঁড়ায়। কথা দিয়েই ও যেন ধমক দেয় যতীনকে, 'অযথা তুমি সর্দারি ক'রো না তো ! আমার সংসার, আমি যা ভাল বুঝব করব !'

'কোথায় ইঁদুর তার ঠিক নেই কল পেতে বসে আছে !' যতীন বিড়বিড় করে।

'কোথায় ইঁদুর তুমি তার কি জান ? আমি বুঝি, তাই কল পেতে বসে থাকি। তুমি মাথা ঘামাও কেন ?' পালটা জবাব দেয় মলিনা। কথার শেষে ঘর ছেড়ে চলে যায়। স্ত্রীর অহেতুক একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে যতীন।

চায়ের কাপ হাতে করে একটু পরেই মলিনা আবার ঘরে ঢোকে।

'টাকা নেবে না ?' স্বামীকে লক্ষ করতে থাকে মলিনা।

'নেব না তো টাকা পাব কোথায় ? মুফতিতে র‍্যাশন দেবে, অফিসটা আমার শ্বশুরবাড়ি কিনা !' এঁটো থালাটা মেঝেতে রাখতে রাখতে মেজাজী গলায় বলল যতীন। চায়ের কাপটাও উঠিয়ে নিল।

'আবার সেই কথা ? কতদিন না বলেছি আমার বাপ-মা নিয়ে যা মুখে আসে বলবে না !' চট করে চটে ওঠে মলিনা।

'আমার বয়েই গেছে তোমার বাপ-মা নিয়ে কথা বলতে !'

'ও ! শুনি তবে শ্বশুরটা তোমার কে ?'

মলিনার কথার কোনো জবাবই দেয় না যতীন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চায়ের কাপটা শেষ করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ও যেন বাঁচে।

মলিনা নিরুত্তরে র‍্যাশনের থলে গুছোয় ; বাক্স খুলে টাকা বের করে তক্তপোশের ওপর রাখে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে যতীনের। পায়ের মোজাটা ঠিকঠাক করে হাঁটুর নিচে দড়ি বাঁধে। তাক থেকে পেন্সিল আর নোট-খাতাটা উঠিয়ে নিয়ে বুকপকেটে গোঁজে। তারপর একটা বিড়ি ধরায়।

'টাকার গাছ আছে নাকি আমার—যা ছিল দিলুম। দুটো টাকা আর বাজারের আছে। ভালো কথা, বাজার করে দিয়ে যেও!' মলিনার গলায় বেশ ঝাঁঝ।

একটু বুঝি হতভম্ব হয়ে পড়ে যতীন, চট করে জবাব খুঁজে পায় না। সামলে নিয়ে বলে, 'পনেরো দিনের র‍্যাশন পাঁচ টাকায় হয় নাকি? ফি বার দিচ্ছ।'

'এবার নেই তো দেব কোত্থেকে? চুরি বাটপাড়ি করব?' ফিরতি প্রশ্ন মলিনার।

এক মুহূর্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যতীন বলে, 'বেশ! পাঁচ টাকায় যা হয় নিয়ে আসব।' কথার শেষে নোটটা খাকি হাফ-প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

যতীন বেরিয়ে যাচ্ছিল মলিনা বলল আবার, 'বাজার করে দিয়ে যাও।'

'সময় নেই। আটটায় ডিউটি, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।'

'ভালোই তো, আমার আর কি, ডালভাত রেঁধে রেখে দেব। আমার মুখে সব রোচে।'

'আমারও।' যতীনের জবাব।

'কিন্তু তোমার বন্ধুটির? তাঁর ত আজ সকালেই ফিরে আসার কথা। সন্ন্যাসী মানুষ, তায় আবার প্রাণের ইয়ার পণ্ডাতেলী। ফল চাই, মূল চাই, কলা চাই। কোনো ত্রুটিটিক্ হবার জো নেই। হলে তোমার মাথা কাটা যাব আর আমার বাপ ঠাকুরদাকে সগ্গ থেকে টেনে এনে হেলাফেলা করা হয়—।' তাকের ওপর অযথা খুটিনাটি কি একটা গুছোতে গুছোতে ভাবী গলায় বলল মলিনা।

'বাসু আজই কল্যাণেশ্বরী থেকে ফিরছে নাকি? যতীন ঘুরে দাঁড়ায়।

'কি জানি, বলে তো গেছে—'

'হু।' যতীন মাথা নাড়তে নাড়তে টানা একটা শব্দ করে মুখ বুজেই তারপর মুখ খোলে, 'আমার আর সময় নেই। যা হয় ক'রো।'

দালানে নেমে যতীন তার ঝড়ঝড়ে সাইকেলটার চাকা পরখ করছে, দেখছে পাম্প আছে কি না—শুনল ঘর থেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মলিনা বলছে, 'করব আবার কি? আমি কিচ্ছু করব না, রোজ রোজ পরকে পায়ে ধরে সেধে বাজার আনাব? আমি আর কাউকে সাধাসাধি করতে পারব না—যা আছে ঘরে তাই ফুটিয়ে রেখে দেব। এতে কার পেট ভরল না, মন উঠল না, অত আমার দেখার দরকার নেই।'

যতীন চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে দেখল মলিনা—সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে সেই একইভাবে স্বামী তার প্রস্থান করল। ওর চলে যাবার ভঙ্গিটাই এমন—যা থেকে মনে করা যায় সকালবেলার দাম্পত্যকলহের জের সবটুকুই স্ত্রীর কাছে জিম্মা দিয়ে ও নিজে খালাস পেল; চলে গেল।

চারপাশটা লক্ষ করল একবার। পরক্ষণেই তাকে দেখা গেল এঁটো বাসন আর কাপ দুটো নিয়ে দালানে রেখে এসেছে। আবার একবার বিছানা ঝাড়ল; ঘর ঝাঁট দিল। জলের ন্যাতা দিয়ে মুছতে লাগল ঘরের মেঝে।

বসে বসে উবু হয়েই ঘর মুছছিল মলিনা। বেঞ্চির কাছে আসতেই ইঁদুরমারা কলটা আবার তার চোখে পড়ে। ঠিক আগের মতোই মুখব্যাদান করে বসে আছে যন্ত্রটা। হাতের কাজ থামিয়ে মলিনা একমনে তাই দেখে।

এই নিয়েই তো যত গণ্ডগোল, মলিনা ভাবছিল: অফিস যাবার আগে অযথা কথা কাটাকাটি। যতীন হয়ত রাগ মনেই পুষে রাখল। অফিসে একটা কেলেংকারীও বাধাতে পারে—চাই-কি দুপুরে হয়ত খেতেই আসবে না বাড়িতে। এমন ঘটনা মাঝে মাঝে হয়েছে বইকি। বাড়িতে কিছু বলে নি যতীন, ওর মুখ দেখে বোঝবারও উপায় ছিল না, রাগের আঁচে তেতে আছে তার মন, মলিনা বসে আছে তো বসেই আছে—দুপুর গেল, বিকেল গেল—সেই সন্ধ্যের গোড়ায় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ফিরল যতীন। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, চোখ বসে গেছে। কোথায় ছিলে, কেন দুপুরে খেতে আস নি, কি খেয়েছ? জানো, তোমার জন্যে আজ একটু ইলিশ মাছ আনিয়ে ঝাল রেঁধেছি, বড়ি ভেজেছি, টক করেছি লাউয়ের। আর হ্যাঁ মশাই, আমিও দাঁতে কাটি দিয়ে পড়ে আছি সারাদিন। থাক থাক, সোহাগ দেখাতে হবে না। কতই তো বউয়ের ওপর টান। তাই তো—! মলিনা অভিমানে কেঁদে ফেলেছে। তখন যতীন ওর কান্না থামিয়েছে—চোখের জল দিয়েছে মুছে। বলেছে, আর কখনও এমন গর্হিত কর্ম করব না, লক্ষ্মীটি; সত্যি বলছি, মাইরি, তোমার দিব্যি।...আবার ওরা জোড় বেঁধে থালা সাজিয়ে খেতে বসেছে, গল্প করেছে হিজিবিজি, হাসিতে হাসিতে ছোট্ট ঘরখানাও যেন হেসে উঠেছে।

আনন্দে, খুশীতে, পরিচ্ছন্নতায়, নিবিড় সাহচর্যে এই ছোট্ট ঘরখানা হেসে উঠুক, খুশীতে টইটম্বুর হয়ে থাক ওরা দু-জন, দুটি মন—মলিনা তো তাই চেয়েছে। তাইতো এত! কিন্তু এটা বাড়ি নয়, বস্তি। তবু বাড়িই বল। এমন বাড়িতেই তাদের মত গৃহস্থরা থাকে। খোলার চালের ঘর একখানা আর একফালি দালান। সামনে একটু মাটির উঠোন। ভাড়া কুড়ি টাকা। তাও অনেক ধরা-কওয়া করে; নয়ত এই বাড়িরই নাকি ভাড়া ছিল চব্বিশ।

অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে মলিনা এ বাড়িতে পা দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনই ঘরে ঢুকে সমস্ত উৎসাহ যেন হঠাৎ উবে গেল। কেমন যেন ফ্যাকাশে, ভয়-পাওয়া মুখে প্রশ্ন করল, 'কুড়ি টাকায় এই বাড়ি?'

বিছানা খুলছিল যতীন। লণ্ঠনের আলোয় মলিনার মুখভাব তেমন ভালো করে দেখতে পেল না

কুড়ি টাকা একরকম তো সস্তাই। সে আসানসোলে আর আছে নাকি! যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেল। আর বাড়ি—তা যেমনই হোক, মানুষকে বাঁচতে হলে চালচুলো রাখতেই হবে। খড়ের ছাউনি, খোলার চাল, টিনের চালা—চোখের পলকে এক-একটা রাজত্ব বনে গেল। এই শালার ঘর তিন বছর আগে তিন টাকাতেও ভাড়া হত না। আর এখন—। বিছানা খোলা শেষ করে যতীন হাঁফ ছাড়ল।

লণ্ঠন নিয়ে মলিনা তখন ঘরের ইতি-উতি দেখছে। ইস, মাগো, ঘরের মেঝের কী ছিরি! সিমেণ্টের একটা পাতলা প্রলেপ না থাকলে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপরই তাবা দাঁড়িয়ে থাকত। সিমেণ্টেও কি আছে নাকি—ফেটে ফুটে একাকার। ঘরের এখানে ওখানে বড় বড় গর্ত—দেওয়ালে চিড় ধরেছে। আর ঘরের মাথা! কোন্ যুগের ছেঁড়া চট দিয়ে সিলিং করা এখনও তাই টিঁকে আছে। তবু রক্ষে যেমন-তেমন করেও ঘরে সদ্য একবার কলি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বাড়িঅলা। এখনও চুনের গন্ধ ভাসছে। নয়তো দুর্গন্ধেই প্রাণ যেত।

'ও, মাগো—' হঠাৎ বিশ্রী রকম কঁকিয়ে উঠল মলিনা। ধড়মড় করে চৌকির ওপর লাফিয়ে উঠতে গেল। লণ্ঠনটা চৌকিতে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। দপ দপ করে লণ্ঠনের কাঁপা, অসম, এলানো শিষটা কাচের মধ্যে কিলবিল করল, ধোঁয়া, জমল খানিকটা আর তারপরই সব অন্ধকার। নিকষ কাল রঙে সবকিছু ডুবে গেল, মুছে গেল।

'কি হলো? এ্যাঁ—?' যতীন উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'ইঁদুর!' মলিনার গলার স্বর দ্রুত, হ্রস্ব, আতঙ্কভরা।

'ইঁদুর!' যতীন প্রথমে বোবা, আরপর তাচ্ছিল্যমাখা তরল সুরে প্রত্যুত্তর দিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে, 'বাব্বা! যেমন করলে তুমি, আমি চমকে উঠেছিলুম। ভাবলাম না জানি সাপ-খোপ হবে।'

লণ্ঠন জ্বালাল যতীন। মলিনাকে দেখল। ওর মুখচোখে তখনও ভয় লেপ্টে রয়েছে।

'আরে, অমন মুখ করে বসে আছ কেন? মনে হচ্ছে যেন—'

যতীনের কথায় বাধা দিয়ে মলিনা বলল, 'কই, দেখি, তোমার হাত দেখি। দেখ আমার বুকটা এখনও ধকধক করছে।' যতীন হাত দিয়ে অনুভব করল; সত্যিই মলিনার হৃদপিণ্ড দ্রুততালে বেজে চলেছে।

'আশ্চর্য, এত ভয় তোমার ইঁদুরে!'

'তা বাপু ভয়ই বলো আর ঘেন্নাই বলো, ও বিদিকিচ্ছি জন্তুগুলো দেখলে আমার গা গুলিয়ে আসে।' আস্তে আস্তে জবাব দিল মলিনা বিকৃত মুখভঙ্গি করে, স্বামীর চোখে চোখ রেখে। একটু থেমে বলল আবার, 'এ বাড়ির চৌকাঠে পা

দিয়েই আমার জন্মশত্তুরগুলো চোখে পড়ল। তখন থেকেই গা বিড়োচ্ছে। তার ওপর পড়বি তো পড়, হতভাগা একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল গা।'

'আজব কাণ্ড তোমার!' যতীন বললে, 'ইঁদুর কোথায় না থাকে?'

'থাক্, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে থাক; আমার ঘরে থাকা চলবে না। দু চোখের বিষ আমার। পাজি, নোংরা, কুচ্ছিত—' মলিনার ঠোঁট, চোখ, নাক, মুখ ঘৃণায় কুঁচকে কুশ্রী হয়ে উঠল।

মুখে যা বলেছিল মলিনা—সেইদিন সেই প্রথম এ বাড়িতে পা দিয়ে, অক্ষরে অক্ষরে তা ফলিয়ে ছেড়েছে। প্রথম দিন থেকেই, মলিনার সে কী অসাধ্য-সাধন। মেঝেতে কোথায় গর্ত, দেওয়ালে কোন্ কোণে ফাটল, দালানে জঞ্জাল জড় করা কেন—এ সবের মধ্যেই তো ইঁদুরের রাজত্ব। ইঁটের গুঁড়ো, কাঁকর, বালি, পাথর-কুচি যা পায় ঠেসে ঠেসে গোজে, ভরাট করে গর্তের ফাঁক, তারপর মাটি দিয়ে লেপে দেয়। যতীনদের ডিপোতে শেডের কাজ হচ্ছে, অফিস-ফেরতা যতীন ভোলাবাবুর কাছ থেকে সিমেণ্ট চেয়ে রুমালে বেঁধে আনে। একটা কর্নিক কিনে আনল একদিন। সারা দুপুর বোমরে কাপড় জড়িয়ে মিস্ত্রিগিরি করে মলিনা।

একটু হয়ত বাড়াবাড়িই হবে এই ইঁদুর-ভীতি। তবু কে অস্বীকার করবে ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে মলিনা ঘরের শ্রী পাল্টে দেয় নি? আসলে তাই। কুড়ি টাকার খোলার ঘর মলিনার হাতে পড়ে শ্রী পেল। শৌখিন না হোক শোভন হলো। যতীন মনে মনে ভাগ্যবান মানল নিজেকে। লক্ষ্মীমন্ত বউ তার; দেখতে না দেখতে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিল।

ঝকঝকে, তকতকে করে ঘর সাজাল মলিনা। কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশ, একটা বেঞ্চি, দুটো জলচৌকি, কেরোসিন কাঠের তেথাকা—এমনি সব টুকিটাকি জিনিস। প্রথম ক'টা মাস খুবই টানাটানি চলে সংসারে। মাইনের একশোটা টাকা থেকে বাঁচিয়ে এটা-ওটা কেনা কি সহজ।

যতীন একদিন ঠাট্টা করেই বলেছিল, 'ভাগ্যিস ভগবান আমায় রাজা করে নি গো। বেঁচে গেছি!'

'কেন?' জানতে চেয়েছে মলিনা অবাক হয়ে।

যতীন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে, 'তা হলে তো তুমি প্রাসাদ বানাতেই ব্যস্ত থাকতে। এ অধম তোমার প্রসাদ পেত না!'

যতীনের কথায় হেসে ফেলেছে মলিনা; স্বামীর গলা জড়িয়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছে কানে, আধো-আধো স্বরে বলেছে, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক, তোমার অত কাব্যি কি বুঝি—! তুমি যদি রাজা হতে আমি কি আর রানী হতাম!'

'রানী হতে না—? তবে হতেটা কি! চোখ বড় বড় করে রহস্য করেছে যতীন।

'দাসী!' ছোট করে উত্তর দিয়েছে মলিনা।

'বল কি, এত থাকতে দাসী ?'

'হুঁ দাসী-ই। যা ময়লা রং আমার, বাপ-মা দেখে শুনেই নাম দিয়েছে মলিনা. রানী কি ময়লা হয়!' মলিনার গলার স্বরে আশ্চর্য জড়তা এসেছে কথাগুলো বলতে গিয়ে।

যতীন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠেছে, 'বয়েই গেছে; হোক না গায়ের রং ময়লা—মন তো আর ময়লা নয়।'

তাই, মলিনার মন ময়লা নয়। অন্তত মলিনা যেন সেই কথাটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে বলে মনে হয়। ময়লার উপর তাই কি ওর অত বিজাতীয় ঘৃণা? নোংরা যা কিছু, কুৎসিতদর্শন যেখানে যা আছে, বিকৃত, বীভৎস যা—চোখকে যা পীড়া দেয়, মনকে অসুস্থ করে, মলিনার কাছে তা অসহ্য। সেখানে তার এতটুকু দয়া নেই, ক্ষমা নেই।

ইঁদুরকে ঠিক এইজন্যেই বুঝি এত ঘেন্না মলিনার। দেখতে যেমন, থাকেও তেমনি অন্ধকার নোংরা আবর্জনার স্তূপে। একটু ভালো করবে তোমার—বয়েই গেছে, বরং ক্ষতির বহরটা একবার হিসেব করে দেখ। চাল, ডাল, তরিতরকারি, কাপড়, বই—সর্বত্র ওর সমান গতি। আর নষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই।

তালপুকুরের ঘরে অত যে ইঁদুরের উৎপাত, সে উৎপাতও বন্ধ করল মলিনা। এল ইঁদুর-মারা কল, তারপর এল বেড়াল, শেষ পর্যন্ত ইঁদুর মারা বিষ।

মলিনার সংসার থেকে একদিন দূর হল এই নোংরা জীবগুলো। একেবারেই। চিরকালের মতই।

তারপর? তারপর তো বেশ ছিল মলিনা। হঠাৎ আজ ক'দিন থেকে কেমন করে যেন একটা ইঁদুর আবার এসে পড়েছে। শব্দ শুনছে মলিনা, বুঝতে পারছে। কিন্তু কই দেখতে তো পায় না? কিছুতেই ধরতেও পারে না।

কে! মলিনা চমকে উঠল। কে যেন ডাকল।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল মলিনা। হাতে তার ইঁদুরকল। দরজার কাছে সরে আসতেই উঠোনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল মলিনার। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক বাস, দীর্ঘদেহ এক মূর্তি। সর্বাঙ্গে রোদ আর তপ্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

'ফিরলাম কল্যাণেশ্বরী থেকে, উঠোন থেকে স্বর ভেসে আসে: 'সব যে বড় চুপ-চাপ। যতীন কই? অফিস বেরিয়ে গেছে?'

বাসুদেব উঠোন থেকে দালানে উঠে আসে।

মলিনার হাত থেকে কলটা পড়ে যায়। একেবারে পায়ের কাছেই। শব্দ কানে যেতে ও সম্বিত ফিরে পায়। পায়ের দিকে নজর পড়তেই দেখে মাটিতে কলটা

ড়ে রয়েছে—করাতের ফলার মত মুখ দুটো বন্ধ। তাড়াতাড়ি মাথায় া মলিনা বলে, 'আসুন। আপনার বন্ধু তো অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে

দুপুর বেলায় খেতে এল যতীন ; রোজ যেমন আসে।

ঘরে পা দিতেই বাসুদেবের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'করেছিস কি রে—এ্যাঁ—! মাথা কামিয়ে এলি কল্যাণেশ্বরী থেকে ?'

নিজের মাথায় নিজেই হাত বুলিয়ে বাসুদেব হাসল, 'খারাপ দেখাচ্ছে ?'

'না, খারাপ কেন হবে ? একেবারে মঠের মহারাজের মত দিব্যি দেখাচ্ছে, ঠাট্টা করে যতীন।

'দীক্ষা নিলুম কি না—তাই !'

গায়ের জামাটা আলনায় টাঙিয়ে যতীন ঘুরে দাঁড়ায়, 'দীক্ষা—!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বাসুদেব। চুপ করে থাকে, হাসে মুচকি মুচকি। বন্ধুব হাসির অর্থভেদ করতে না পেরে যতীন বলে, 'দাঁড়া, মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে নি—তারপর তোর দীক্ষা নেওয়ার কথা শুনছি।'

স্নান সেরে খেতে বসল যতীন ; পাশে বাসুদেব। মলিনা বাসুদেবের সামনে থালা সাজিয়ে দিয়ে গেল পবিপাটি কবে। তারপর স্বামীব। আর-এক দফা অবাক হবার পালা যতীনের।

'ব্যাপার কি ? আমি ভাত, তুই রুটি ?' যতীন বাসুদেবের পাতের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রশ্ন করল।

'আমি নিরামিষ আর তুই আমিষ ! আমাব পাতে দুধ কলা, তোর পাতে কিন্তু ভাই কাঁচকলা।' বাসুদেব উচ্চগ্রামে হাসে।

ততক্ষণে মলিনা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

খেতে খেতে বাসুদেব বলে, 'আজ পূর্ণিমা ; ভাত খাওয়া নিষেধ।'

'কার নিষেধ, তোর গুরুদেবের ?' যতীন চোখ তুলে তাকায়।

'না। নিজে থেকেই খাই না।' বাসুদেব আড়চোখে মলিনার দিকে তাকাল।

খেতে বসে গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে যতীন। বাসুদেবেরও মুখে ঘাড়ে ঘাম জমে উঠেছে। মলিনা চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। যতীনের খোলা গায়ে ঘামের প্রাবল্য একটু বোধহয় দৃষ্টিকটুই হবে। অথচ তারই পাশে বসে বাসুদেব। ধবধবে ফরসা গোলগাল মুখের ছাঁদ লোকটার। কপালটাও তেমন চওড়া নয়। ভরাট গলা। ঘাম জমেছে ফোঁটা ফোঁটা, সারা মুখ ভরে। ভিজে চন্দন দিয়ে মুখে তিলক আঁকলে বুঝি এমনই দেখায়।

'তোমার পাখা নেই ?' যতীন মলিনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।
কি যেন ভাবছিল মলিনা। স্বামীর কথা কানে যায় নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে।
'কি ? নেই পাখা ?' যতীন আবার জানতে চায়।
মলিনা ঘর থেকে পাখা নিয়ে আসে।
'জোরসে একটু বাতাস কর তো। খাব কি ঘেমেই মলুম। যা ভ্যাপসা গরম।' ভিজে গামছায় বুক মুছে যতীন বললে।
'কাল কল্যাণেশ্বরীতে বৃষ্টি হল !' বাসুদেবও কপালের ঘাম মোছে।
'পাহাড় জায়গা তো ; ওখানে তুই এত গরম পাবি না।'
'কই, দিনের বেলায় এমন আর কম কি ? রাত্তিরে অবশ্য ঠান্ডাই।'
'কোথায় ছিলি রাত্তিরে ?'
'মন্দিরে। বেশ লাগল। এক সাধুর সঙ্গে দেখা ; কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। বয়স হয়েছে তাঁর। আশ্রম আছে দেওঘরের দিকে। গৃহী অথচ সাধু। আশ্চর্য !' বাসুদেব কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে।
'ব্যাস, আর কি! সাধু মানুষ, বয়স হয়েছে, আশ্রম আছে, তুই একেবারে গলে গেলি !' যতীন জোরে হেসে উঠল, 'দীক্ষাটাও চট করে নিয়ে নিলি, কি বল ?'
বাসুদেব ওর স্বভাবমত মুচকি হাসি হেসে মাথা নাড়ল।
'ওঁর আশ্রমে আপনার একটা জায়গা হল না ?' মলিনা ঠোঁট কুঁচকে হাসল। মলিনার মুখের হাসি তার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা ঢাকতে পারল না। বাসুদেব আবার আড়চোখে তাকাল। তেমনি ভাবেই মাথা নাড়ল আবার, 'না। আমি তো জায়গা খুঁজি নি।'
'খুঁজলেই পারতেন। আশ্রম না হলে সন্ন্যাসীদের মানাবে কেন ?' হাতের পাখা জোর হয়ে ওঠে মলিনার।
আশ্চর্য, এত জোরে বাতাস করছে মলিনা তবু যতীন ঘামছে। বাসুদেবের মুখের ঘাম কিন্তু শুকিয়ে গেছে।
'আমি তো সন্ন্যাসী নই,' বাসুদেব আস্তে আস্তে বলল।
'সন্ন্যাসী নন তো গেরুয়া পরেন কেন ?' মলিনার রুক্ষ দৃষ্টি বাসুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে যায়।
'এমনি। ভাল লাগে তাই। সুবিধেও কম নয়। বিনি টিকিটে ট্রেনে চড়ি—কারুর বাড়িতে গেলে দু'বেলা অন্নও জুটে যায়। এ ও প্রণাম করে—দু'চার পয়সা দেয়। মন্দ কি ! দিন তো চলে যাচ্ছে !' বাসুদেব যেন কৌতুক করছে—এমনি ভাবে কথাগুলো বলে। পরিহাসের তরলতা তার গলায়! পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বাসুদেব এবার যতীনকে বলে, 'কি রে, ঠিক বললুম না ?'

'উঁহুঁ। নেহাতই বাজে কথা!' যতীন উত্তর দেয়।

'কি রকম?'

'ওর আর কোনও রকম নেই! ঘরে মা নেই, থাকলে তোর বিয়ে দিত। তখন বউয়ের ভেঁড়ুয়া হতিস। বউ নেই তাই গেরুয়া ধরেছিস।' যতীন বললে মুরুব্বি চালে। তাকাল মলিনার দিকে।

ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে যে ভারী আবহাওয়া জমে উঠেছিল যতীনের কথা আর হাসিতে তা অনেকটা ফিকে হয়ে এল। সশব্দে হেসে উঠল বাসুদেবও।

মলিনাও হাসল। তবে তার হাসি শব্দবহুল নয়—এমন কি কৌতুক-স্নিগ্ধ সহজ সাদা হাসি যে—তাও নয়। বরং মলিনার ঠোঁটের কোণে যে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল তার জের টেনে ও কথা বলল বাঁকা সুরেই, 'বেরাগী লোকের বউতে কি যায় আসে? কথায় আছে না তাই—থাকলে সর, না থাকলে পর।'

বেফাঁস কথাটা মলিনার মুখ থেকে কেমন করে যে বেরিয়ে গেল সে বুঝতেও পারল না। জিভকে রাশ বেঁধে সব সময় কি রাখা যায়—কখনো-সখনো আলগা হয়ে যায় বই কি'

কথাটা কারও কান এড়ায় নি। যতীন ভাতের থালা থেকে হাত উঠিয়ে তাকাল মলিনার দিকে। সোজাসুজি চোখে তাকাল বাসুদেবও।

ক'টা মুহূর্ত। নিঃশব্দে তিনটি প্রাণী মনের ফেনা মাখল নিজেদের মনেই; বিমূঢ়, বিব্রত হয়ে। শেষ পর্যন্ত মনের ফেনায় মলিনার চোখের কোণে কেমন করে যে জল এসে পড়ল, করকরিয়ে উঠল দুই চোখ, কে বলবে, কে জানে!

পাখা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল মলিনা। দালান থেকে ঘরে এসে ঢুকল। বুকটা অযথাই ধড়ফড় করছে! ব্যথার মোচড়ে বুকের হাড় ক'টাও কনকনিয়ে ওঠে।

বিকেল হতে না হতেই মলিনা ঘর-দোর পরিষ্কার করে উনুন ধরিয়ে দিলে। আনাজের ঝুড়ি নিয়ে কুটনো কুটতে বসল দালানে। দমকে দমকে ধোঁয়া আসছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল মলিনা। ভিতরে বিছানায় বসে বাসুদেব 'সদ্‌গুরু-সঙ্গ' পড়ছে।

দালান ভরে কটু ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল—আর সেই ধোঁয়ার মাঝে বসে থাকল মলিনা অনেক—অনেকক্ষণ। ধোঁয়া যখন সরে গেল, বাতাসে চোখ মেলে মলিনা দেখে উনুনে তার ধরে উঠেছে দাউ দাউ করে। চোখের জলে মনটাও থিতিয়ে গেছে। মলিনা মরমে মরে যাচ্ছে এখন।

তাড়াতাড়ি চা তৈরী করল মলিনা। ধবধবে কাচের গ্লাসে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল; 'কই, নিন, চা নিন!' হাত বাড়িয়ে চা দিল মলিনা।

বই থেকে মুখ তুলে বাসুদেব আনমনা-চোখে তাকাল। 'সদ্‌গুরুসঙ্গে'র সঙ্গী

মন যে নিঃসঙ্গ নয়—এ কথা মনে করতে বাসুদেবের খানিকটা সময় লাগে। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বাসুদেব প্রশ্ন করল, 'বিকেল হয়ে গেল নাকি?'

'ত কি আপনার আমার জন্যে বসে থাকবে?' মৃদু হাসল মলিনা। শাড়ির আঁচলে 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' ঢেকে নিয়ে বলল, 'চা খেয়ে আমার একটা কাজ করে দিন তো দেখি।'

'কি কাজ?' জানতে চায় বাসুদেব।

'একটু বাজার যেতে হবে।' মলিনার স্বরে লজ্জা।

'তা বেশ তো।'

নিজেকে আরও স্পষ্ট, ব্যক্ত করার আশায় মলিনা বলে, 'আপনার বন্ধু ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তক্ষণ অপেক্ষা করতে আমার আর যাওয়া হয় না—হাঁড়ি আগলেই বসে থাকতে হবে। রান্নাবান্না শেষ করে রাখি। উনি এলেই আমরা আজ আপনার সঙ্গে আশ্রমে বেড়াতে যাব।'

একটু হয়ত অবাকই হয়েছিল বাসুদেব। কিন্তু সবাক হল যখন, তখন তার গলার স্বরে সহজ একটা প্রশ্নই শোনা গেল। 'আশ্রমে যাও নি কখনো?'

'একটিবার শুধু। ঠাকুরের আরতি হয় শুনেছি—দেখি নি। আজ চলুন, দেখে আসি।' উৎসাহ জানাল মলিনা।

'বেশ তো চল।'

বেশ খুশীই হয়েছে মলিনা। ওর মুখ দেখে তাই অন্তত মনে হয়। তাকের ওপর 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' তুলে রেখে মলিনা এবার বলল, 'এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, যা ভয় হচ্ছিল।'

'কেন?'

'আমি ভাবলাম আপনি বুঝি খু-ব রেগে রয়েছেন—' মলিনা নতচোখে বলল হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে, 'তখনকার কথায় রাগ করেন নি তো?'

বাসুদেব তার অভ্যাস মতো নীরবে হাসে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মলিনার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে। ক্লান্ত কপালে ফিকে সিঁদুরের টিপ; আরও যেন কিছু—একটু মমতা, হয়ত বা করুণা। সব মিলে-মিশে মনমরা একটি মুখ।

'পাগল, রাগ করব কেন?'

সবেমাত্র গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে মলিনা ভব্য হচ্ছে, ওদিকে সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার দালান পেরিয়ে জুড়ে বসছে, ঘর, উঠোনে তুলসী গাছের চারার তলায় প্রদীপটা জ্বলছে তখনও কেঁপে কেঁপে, হঠাৎ দমকা ঝড় এল যেন।

হুড়মুড় করে সদর দরজা পেরিয়ে যতীন উঠোনে পা দিয়েই হাঁক দিল, 'কই গো, শীঘ্রি তোমার রান্না সারো।'

উঠোনে বেতের মোড়া টেনে বসেছিল বাসুদেব। মলিনা ঘরে প্রসাধন সারছে

তখনও।

'এই যে তুই বাড়িতেই আছিস ? ভালোই হল।' বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বলল যতীন, 'ভাগ্যিস তুই ছিলি, না হলে আচ্ছা এক বিপদে পড়া যেত।'

স্বামীর ডাক শুনে মলিনা দালানে এসে দাঁড়াল। স্ত্রীর দিকে এক লহমা তাকিয়ে যতীন বলল, 'চট করে তোমার রান্নাটা সেরে নাও তো। দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সারা রাত ট্রেনের ধকল সইতে হবে। ভাল কথা, আমার ধোয়ানো কাপড়-চোপড় বাক্সে আছে না কিছু ?'

মলিনা অবাক হয়ে স্বামীর পানে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হঠাৎ ধকল সওয়ার কারণ কি ঘটল। একটু ভয়ই হয়। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে নাকি।

'হঠাৎ ট্রেন ? যাবি কোথায় ?' প্রশ্ন করে বাসুদেব।

'কলকাতা।' দ্রুত, উত্তেজনা-ভরা গলায় বলতে থাকে যতীন, 'অফিসে চিঠি এসেছে আমাদের পাঁচ টাকা করে ডিয়ারনেস বেড়েছে এপ্রিল মাস থেকে। গত এপ্রিল থেকে এই এপ্রিল। পাক্কা এক বছর পাঁচটাকা করে পাব—মানে তোর ষাট টাকা। অনিলবাবুকে দিয়ে আজই বিল করিয়ে নিয়েছি। সাহেবও সই করে পাস করে দিয়েছে। কাল হেড অফিসে পৌঁছে বিলটা দেব; আমাদের টাকাটি নেব আর ব্যস রাত্রে ট্রেনে উঠব! ভাগ্যিস তুই ছিলি, নয়ত কি আর একা বউ ফেলে যাওয়া যেত!...কই গা একটু চা খাওয়াবে না ? আর হ্যাঁ, কথা বলছ না যে, কাপড়-চোপড় নেই ?'

'আছে।' মলিনা থমথমে গলায় বললে।

ফিরে গিয়ে নিবে আসা উনুনে চায়ের জল চড়াচ্ছে, শুনল—বাসুদেব বলছে 'দেখ্ তো কাণ্ড। আমি কোথায় ঠিক করে রাখলাম কাল সকালে যাব তো তুই সব ভেস্তে দিলি!'

'কাল সকালে তুই যাবি ? কোথায় যাবি ?'

'কোথায় তা কি ঠিক করে রেখেছি ? তবে কালই বেরিয়ে পড়ব ঠিক করে রেখে-ছিলাম। এখানে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল, প্রায় তিন হপ্তা।'

'আরে নে তোর তিন হপ্তা। যাবি, যাস না। আমি তোকে আটকাচ্ছি ? কালকের দিনটা থেকে যা। পরশুদিন সকালে আমি ফিরে আসছি, তারপর যাস।'

স্বামীর জন্যে চা ঢালতে ঢালতে মলিনা সব শুনল, প্রত্যেকটি কথা। মনটা তার হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠেছে আবার।

যতীনের হাতে চা তুলে দিয়ে মলিনা বলল, 'বাক্স থেকে কাপড়-জামা কি বেছে নেবে, নাও এসে।'

কাপড় জামা বেছে নেওয়ার কিছুই ছিল না। এ শুধু একটা অজুহাত। যতীন ঘরে এল। বাক্স খুলে হাঁটু গেড়ে বসল মলিনা। এক হাতে তুলে ধরল লণ্ঠন।

'বা, বেশ দেখাচ্ছে তো তোমায় আজ।' স্ত্রীর গম্ভীর অথচ সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন বলল।

'দেখাক্ তোমার কি! আমার মুখ দেখবার জন্যে তো আর তুমি বসে থাকবে না। নাও, তাড়াতাড়ি করো, আমার কাজ আছে।'

মলিনা যে চটে উঠেছে সে কথা বুঝতে যতীনের দেরি হয়নি। আমতা আমতা করে যতীন অফিসের সব কথা বুঝিয়ে বলল আবার। শেষে মলিনার গাল ধরে বলল, 'ছিঃ, অবুঝ হয়ো না। গরিব লোক আমরা। যে ক'টা টাকাই পাই না কেন হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ঘুম হবে না। কত লোকের কত দরকার, এই টাকাটা পেলে কাজে লাগবে সকলেরই।'

'তা যাও না কলকাতা, আমি কি বাদ সাধছি!' বলে মলিনা অভিমানভরে মুখ সরিয়ে নিলো।

'বাদ না সাধলেও বাধা দিচ্ছ।'

'মোটেই নয়।'

'বেশ, তবে বলো তোমার জন্যে কি আনব কলকাতা থেকে?'

'কি আর আনবে! বেশ মোটা দেখে দড়ি কিনে এনো খানিকটা।' থমথমে গলায়, চোখে জল ভরে বললে মলিনা, খুব আস্তে আস্তে!

কাজকর্ম সেরে মলিনা যখন ঘরে ঢুকল রাত তখন খুব বেশি নয়। তবু পাড়াটা নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে গেছে। রোজই যায়। রোজ তবু এ বাড়িটা অন্তত আরও খানিকক্ষণ সজাগ থাকে। কথায়, চিৎকারে, হাসিতে এতটুকু বাড়ি সরগরম করে রাখতে যতীনের জুড়ি নেই। খাওয়া সারতেই একঘণ্টা। মলিনার সঙ্গে যত রাজ্যের অফিসের গল্প করবে যতীন। তারপর বন্ধুদের কথা—কি হয়ত বাড়ির। শুতে এসে দুজনায় কত যে খুনসুটি করে তার কি শেষ আছে। বাতি নিবিয়ে বকবকমের শেষ হতে কি-বা এমন কম রাত হয়। আজ সব চুপ। অনেকক্ষণ হলো যতীন চলে গেছে। এতক্ষণে গাড়িই হয়ত স্টেশন ছেড়ে চলে গেল।

মুখে দু'চার কুচি সুপুরি পুরে মলিনা দরজা ভেজিয়ে দিল। একবার শুধু দেখে নিল বাসুদেব শুয়েছে কি না। না, বাসুদেব এখনো শোয় নি। উঠোনে দড়ির খাটিয়ার ওপর চুপ করে বসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে কি যেন গাইছে। কীর্তনের সুরের মতই কানে লাগে। চাঁদের আলোয় সারা উঠোন ভেজা। বাসুদেবের চোখ মুখ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। দরজা বন্ধ করে দেয় মলিনা। খিল আঁটে। হঠাৎ কি যেন খেয়াল হয় তার, আবার খিল খোলে। মেঝে থেকে লণ্ঠন তুলে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে থাকে। খিল আঁটে

হয়ত ভেঙেই যাবে। যা ফাঁক দরজায়—পেরেক কী পাতলা লোহার শিক গলিয়েই তো খিল খোলা যায়। মলিনার বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। দুর দুর করতে থাকে বুক। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দরজা ভেজিয়ে খিল এঁটে দেয় তাড়াতাড়ি।

এত ভয় কিসের তার—কে আসবে ঘরে, রাতদুপুরে? মলিনা ভাববার চেষ্টা করে। কে আসবে তা ভাবতে গেলে প্রথমেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে যে—সে ওই উঠোনে বসে। আর কারুর কথা তো মনের কোণেও উঁকি দেয় না। তবে? এ ভয় কি বাসুদেবের জন্যে? কিন্তু বাসুদেব—!

স্বামীর ওপর ভীষণ রাগ হয় মলিনার। এ কি? বন্ধু, তোমার বন্ধু—আমার কি! পা ফেলতে জায়গা নেই এমন এক ফালি ঘর—সেই ঘরে—দিনের পর দিন বন্ধুকে শুতে খেতে বসতে ঠাঁই দাও। কি অসুবিধেই যে হয়! আড়াল আবডাল বলে কিছুই নেই—বাইরের লোকের কাছে নিত্যি ওঠা, বসা, কথা বলা।

বাসুদেবও যেন কেমন। সেই এসেছে তো এসেইছে; যাবার নামটি করে না। হঠাৎ এল, যতীনের খোঁজখবর নিয়ে। একই গ্রামে নাকি ওদের বাড়ি, একই সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ। বাড়িতে বাড়িতে জানা-শোনা—দহরম-মহরম। বাসুদেবের মা মারা যাবার পর ঘরে তালা দিয়ে ছেলে বিবাগী হয়ে যায়। আর গ্রামে ফেরে নি। যতীনের বিয়ের কথা কার মুখে যেন শুনেছিল—ঠিকানা জেনে নিয়েছিল—তারপর হাজির হয়েছে উটকো ভাবেই।

স্বামীর কাছে কথায় কথায় মলিনা শুনেছে বাসুদেবের নাকি কোনো এক ডানা-কাটা পরীর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। সব ঠিকঠাক, হঠাৎ বাসুদেবের মা শুনলেন—মেয়েটি বালবিধবা। বাসুদেব জানত। বিয়ের ইচ্ছেটা তাই। তবু মা গোপন কথাটা জানতে পেরে আঁতকে উঠলেন। হ'লই বা সুন্দরী—সমাজ ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্দরী ঘরে আনতে হবে এমন কথা কেউ কি শুনেছ? না—তা হবে না। বাসুদেবের মার দৃঢ় আপত্তি। ওদিকে বাসুদেবেরও গোঁ। হ্যাঁ-না-এর টানা-পোড়েন চলছে, এমন সময় হঠাৎ বাসুদেবের মা মারা গেলেন; ছেলেও গৃহত্যাগ করলে।

কি যে ত্যাগ করেছে বাসুদেব—মলিনা তাই ভাবে। কে বলবে ও ঘর ছেড়েছে? এই কি ঘর ছাড়ার লক্ষণ? নিজের ঘর ছেড়েছে বটে কিন্তু জুড়ে বসেছে অপরের ঘর, অপরের ঘরণী।

কথাটা মনে হতেই মলিনার চোখদুটো কপাটের খিলে আটকে গেল। আবার দুরু দুরু করতে লাগল বুক। সত্যি, লোকটা যেন কেমন! প্রথম যে দিন এল, ওর চেহারা আর কাঁধ-পর্যন্ত চুলের বহর দেখেই মলিনার মন বিষিয়ে গিয়েছিল।

হাসা, আস্তে-আস্তে ওর নাম ধরে ডাকা—মলিনা, ও মলিনা।...আর এমন ভাবে লোকটা তাকাত যেন মলিনা ওর কত জন্মের চেনা, কতই না আপনজন।

প্রথম দর্শনেই যাকে দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল তার গেরুয়া-বসনের ঘটাপটায় ভেকভড়ং ছাড়া আর কিছু যে আছে মলিনা তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি। আজও পারে না। কেনই বা না হবে? সবল সুস্থ মানুষ, এ সংসারে তার কোনো কাজ নেই গা? বন্ধুর ঘাড়ে বসে খাবে আর তার বউয়ের দিকে চোরা-চোরা তাকাবে? তাও যদি বন্ধু বড়লোক হত। একে তো নিজেদেরই চলে না; আনতে, খেতে, পরতে শুধু নেই, তবু পরের জন্য ধার করো আর মরো।

রাগ শুধু নয়, যতীনের ওপরেও মলিনার মন বিষিয়ে ওঠে। এ কি! কোথাকার কে—তার জিম্মায় ঘর ছেড়ে, বউ ছেড়ে দিব্যি তুমি চলে গেলে! কিছু যদি একটা হয়!

মাঝরাতে মলিনা হয়ত কখন ঘুমিয়ে পড়বে—আর হঠাৎ যদি দরজা খুলে ওই—।

...ভয়ে মলিনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাম জমতে থাকে ঘাড়ে, কপালে।

হঠাৎ কি মনে হতে মলিনা ইঁদুর-মারা কলটা বেঞ্চির তলা থেকে বের করে নেয়। প্রাণপণে তার তীক্ষ্ণধার ফলা দুটি খোলে। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ইঁদুরকলটা দরজার চৌকাঠের ঠিক মাঝখানেই রেখে দেয়।

বাতির শিখা কম করে বিছানায় শুয়ে পড়ে মলিনা। চোখের দৃষ্টি মেলা থাকে দরজার ওপর—আলকাতরা-রাঙানো কালো কাঠ পুরু একটা যবনিকার মতন ভাসতে থাকে।

কখন যেন চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমেছিল—হয়ত শেষ রাতেই, কিসের একটা খুট্ করে শব্দ হতে ধড়মড় করে উঠে বসল মলিনা। কই, কিছু না তো? তবে? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মলিনা অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে উঠোনে চোখ মেলে তাকাল।

ভোর হয়ে আসছে। ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাসুদেব ঘুমিয়ে।

পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এল মলিনা। বাসুদেব ঘুমোচ্ছে। তার চোখের পাতায় ভোর বেলার প্রগাঢ় ঘুম, ঠোঁটের কোলে একটু মিষ্টি হাসি। হয়ত স্বপ্নই দেখছে। কার স্বপ্ন? মলিনা হঠাৎ চমকে ওঠে, শিরশিরিয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গ। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয়—কাল আশ্রমে বেড়াতে যাবার জন্যে মলিনা যা সাজগোজ করেছিল, এখন সে সবই তার দেহে। সেই শাড়ি, ব্লাউজ, সেই কুমকুমের টিপ, পায়ের আলতা। এখনো গায়ে সেন্টের ফিকে গন্ধ।

আশ্চর্য, রাতে শোবার আগে শাড়ি ব্লাউজটাও খুলে রাখে নি? কেন এমন ভুল? আঁচলটা আঙুলের পাকে জড়াতে জড়াতে মলিনার কেমন যেন মনটা ফাঁকা হয়ে

ফাঁকা মন নিয়েই মলিনার সারা দিন কেটে যায়। আনমনা উদাস। টুকটাক কাজ-কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়; পারে না। দুপুরে গরম পড়ে—অসহ্য গরম। মলিনার মনের জ্বালাও মন থেকে মনে ছড়িয়ে পড়ে। বার দুয়েক গা ধুয়ে নেয়। একটু যদি জুড়োয় শরীর।

দুপুরের একটু পর থেকেই মেঘ জমতে থাকে। বিকেলের গোড়ায় ঘোর হয়ে আসে আকাশ। ধুলো বালির ঘূর্ণি ওঠে, তারপর জল নামে অঝোর ধারায়। ক'দিন ধরে যা গরম পড়েছে তাতে বৃষ্টি হবে এ এমন কিছু অশ্চর্য নয়—কিন্তু এই বৃষ্টি দেখে মলিনার মুখ আরও কালো হয়ে ওঠে।

আবার রাত। নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে আসে তালপুকুরের পাড়া। সমানে বৃষ্টি পড়ছে। কখন ঝিমিয়ে আস, কখন জোর হয়ে ওঠে। ছেদ নেই। ছন্নছাড়া এলোমেলো বৃষ্টির ছাঁট আলুথালু করে মলিনাকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়; ভিজে জলে থই থই করতে থাকে দালান। উঠোনে জল দাঁড়িয়ে যায়।

এমন ভাবনায় আর কখনো পড়ে নি মলিনা—সমস্যাটা খুবই কঠিন। তবু সে সমস্যা তেমনি ভাবেই সমাধান করতে হয়—ঠিক যেমন ভাবে বাসুদেবের মা ছেলের বিয়ের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। জলে গলা পর্যন্ত ডুবে যাক বাসুদেব, দালানে দাঁড়িয়ে থাক—তবু এক ঘরে মলিনার সঙ্গে তার শোয়া চলে না।

মুখ ফুটে বলতে হয় নি মলিনাকে, বাসুদেব নিজেই দালানের একটু কোণ ঘেঁষে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল।

আজ যেন আরও ভয় করছে মলিনার। আকাশই শুধু কালো নয়, বৃষ্টির জলই শুধু জল নয়, মলিনার মন রাতের প্রতিটি প্রহরে প্রহরে যত রাজ্যের কালি শুষে শুষে কালো হতে লাগল; আর চোখের জলে সেই কালো গলে গলে ওর সর্বাঙ্গে কালি মাখাল।

কে? কিছু না, বাতাস!—কে যেন হাঁটছে দালানে; জলে পা পড়ার শব্দ, পা টানার আওয়াজ। কার চোখ বুঝি দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে! কি দেখছে ও? মলিনাকে? অষ্টাদশী মলিনা ভয়ে লজ্জায় আঁট হয়ে থাকে। ধুকধুক করে বুক, হাত-পা কাঁপে, অবশ হয়ে আসে।

কত রাত এখন? গভীর রাত নিশ্চয়। যতীন নেই। কলকাতায়। না, কলকাতায় নয়, গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে যতীন। পকেটে টাকা। মলিনা আরও ক'টা টাকা জমাবে এবার। বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে লুকিয়ে এ ক'মাসে প্রায় গোটা তিরিশেক টাকা জমিয়েছে। এবার যদি আর কিছু জমায়—ভারী দুটো কানবালা গড়াবে মলিনা। বড় শখ তার। কিম্বা একটা সেই শাড়ী কিনবে—পূর্ণিমার মতন। কিন্তু যতীন

যদি তাকে টাকা না দেয়—যদি পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দেয় তার বাবাকে, গলসীতে। না, কখনই তা হবে না। পাঠিয়ে দেখুক যতীন; যাচ্ছে-তাই ঝগড়া করবে মলিনা এবার। বিয়ে করেছ, কচি খোকাটি নও, তবু বউয়ের জন্যে দরদ নেই তোমার। শুধু দুবেলা দুটি ডাল-ভাত আর মিষ্টি কথা? একটা পয়সাও যদি হাতে তুলে দিয়ে থাকে কখনো; একটা কিছু কিনে থাকে নিজে শখ করে! কষ্টে-সৃষ্টে যা বাঁচাবার মলিনাকেই বাঁচাতে হয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। চুরি? কথাটা মনে হতেই মলিনার বুকটা ধক করে ওঠে। চুরি ছাড়া কি? চুরি-ই বলে একে। যতীন জানে না, মলিনা লুকিয়ে টাকা জমায়; লুকিয়ে এটা-ওটা কেনে। হোক না তা দু'চার আনা, কী দু'এক টাকা। কালও যাবার সময় যতীন চেয়েছে; চেয়েছে র‍্যাশন আনতে, চেয়েছে কলকাতা যাবার সময় দু-চার টাকা, ট্রেনে হাত খরচের জন্যে। মলিনা দেয় নি। বলেছে 'টাকা কই, কোথায় পাব?'

শেষ পর্যন্ত যতীন বাসুদেবের কাছ থেকে ক'টা টাকা নিয়ে গেছে। বাসুদেব! এই লোকটাকেও আজ তিন হপ্তা ধরে চর্ব্যচুষ্য খাওয়াতে হচ্ছে। কোথাকার কে, তার জন্যে গতর দাও, নিজেদের মুখের ভাত তুলে দাও। এক পো দুধ পেলে যতীনের হাড়ভাঙা খাটুনির খানিকটা যেন পূরণ হয়—কিন্তু তার কপালে এক ঝিনুকও দুধ জোটে না, অথচ বাসুদেবের বেলায় দুধ চাই। কেন? কে তার বাসুদেব?

যতীনই বা কে, যতীনের বাবা মা-ই বা কে মলিনার? মলিনা কি তার স্বামীকে দুধ খাওয়াতে পারে না? একটু ঘি বা একটু বেশি মাছ। কানবালার জমান টাকা, ব্লাউজের ছিট, পাড়াপড়শীর সঙ্গে মাঝদুপুরে সিনেমা যাওয়া। মাসে এই ক'টা টাকাও তো বাঁচিয়ে স্বামীর জন্যে ব্যয় করতে পারে মলিনা। শ্বশুর শাশুড়ীর ওপরেই বা এত রাগ কেন?

মলিনার মাথা গরম হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে। এমন ভাবে কোনোদিন সে ভাবে নি। এত ভয় হয় নি তার নিজের জন্যে। আজ যেন সব একে একে খুলে যাচ্ছে —মনের যত গ্লানি, জট। স্বামী তার, স্বামীর সংসার তার, কর্তৃত্ব তার। সব পেয়েছে মলিনা, কিন্তু পেয়েও মন কি তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে? না! স্বামী আর সে ছাড়া আর কিছুই তার সহ্য নয়। আর যা আছে সবই তার চিন্তার গণ্ডী থেকে দূরে।

কে ডাকল না! মলিনা ধড়মড় করে উঠে বসল। সম্বিত ফিরে পেয়েছে এতক্ষণে। কান পেতে শুনল—বাইরে আবার অঝোর ধারায় জল নেমেছে; আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। ঘরের বাতিও প্রায় নিবু-নিবু।

কে যেন দরজায় ঠেলা দিচ্ছে! একটু পরেই আধো-আলো অন্ধকারের একটা মুখ ভেসে উঠবে। ইঁদুর-কলটা পাতা আছে তো দরজার গোড়ায়? আছে।

বিবর্ণ মুখে বসে থাকে মলিনা দরজায় চোখ রেখে রুদ্ধ নিশ্বাসে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়—কই কেউ তো আসে না। কেউ না।

আজও এল না তা হলে!

জানলা দিয়ে আকাশ দেখল মলিনা। শ্লেট-রঙের আকাশ। ভোর হল এই, বৃষ্টি থেমেছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে দালানে পা দেয় মলিনা। জলে ভেসে যাচ্ছে দালান। এক কোণে সিক্তবাস সিক্তদেহ বাসুদেব গালে হাত রেখে চুপ করে বসে আছে। যেন সপাং করে একটা চাবুক কষিয়ে দিলে মলিনাকে। জ্বালা ধরে গেল সর্বাঙ্গে! হাত পা অসাড় হয়ে এল ক্ষণেকের জন্যে। কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে যে লোকটা পাথরের মতো বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মলিনার মনে হলো—বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে। নোংবা মন। ইঁদুর কি!

বাসুদেবের পাশে এসে মলিনা ডাকে, 'একি? এমনি ভাবেই বসে আছেন সারারাত?'

বাসুদেব চোখ তুলে তাকায়। চোখ দুটো তার জবা ফুলের মতো লাল। বাসুদেবের হাত ধরে মলিনা।

'ছি ছি। আপনি কি বলুন তো! সারা রাত এ ভাবে বসে থাকলেন? একবার তো ডাকতে হয়। আমিও মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছি।'

বাসুদেব তেমনি ভাবেই তাকায়। মলিনার চোখে মুখে কোথাও কি ঘুম লেগে আছে?

'গাটাও খুব গরম মনে হচ্ছে। উঠুন। আসুন আমার সঙ্গে।' মলিনা বাসুদেবের হাত ধরে টানে।

সেদিনই মাঝরাতে যতীনের পাশ থেকে উঠে মলিনা দরজার খিল খুলতে গেল নিঃশব্দে। কে জানত আজও দরজার গোড়ায় ইঁদুরকল পাতা আছে। মনেও পড়েনি ঘুণাক্ষরে মলিনার। ইঁদুর-কলে পা পড়ল ওর। করাতের দাঁত কামড়ে ধরেছে মলিনার পা। কঠিন কামড়। পায়ের পাতা যেন থেঁতলে গেল। কী তীব্র যন্ত্রণা! কঁকিয়ে উঠল মলিনা। যতীন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোন সাড়া শব্দ নেই।

কেমন করে যে মলিনা বাতি জেলেছে; অসহ্য যন্ত্রণা সম্বরণ করেছে দাঁতে দাঁত চেপে, কেউ তা জানতে পারল না।

পরের দিন একটু বেলায় গম্ভীর মুখে যতীন একটা রিকশা ডেকে আনল। গায়ের মোটা চাদরটা জড়িয়ে কাঁধের থলে কাঁধে ফেলে বাসুদেব বললে, আসি রে! বেশ কাটল ক'টা দিন। আবার আসবো কখনো।'

'খবরদার! এ বাড়িতে জীবনে আর পা দিবি নে, তোর গুরুর দিব্যি। আমি তোর কে?'

ব'ধ্ন,' ম্লান হেসে বলে বাসন্দেব।
থাক-থাক শালা, আর বাক-ফট্টাই করিস নে। অনেক ভড়ং দেখলাম।
।া ভর্তি জবর। বাড়ি ছেড়ে চললেন উনি। কেন রে? এতদিন কাটল, আর ক'টা দন তোর এখানে কাটত না?'
রাগ করিস কেন? আমার হয়ত বসন্ত হবে। তোদের বাড়িতে বিষ ছড়াব। তাই।
একটু থামল বাসন্দেব, তারপর বললে আবার, 'যাই দেওঘরের গাড়ি চলে গেলে ফবে আসতে হবে।'
দেওঘরে যাচ্ছ? যাও—।' ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে তাকাল যতীন, 'কোথায় উঠবে? সই আশ্রমে তো! যদি না উঠতে দেয়?'
পাগল, তিনি আমার গ্নর্ন। আচ্ছা আসি। মলিনা কই—ঘরে? থাক থাক, আসতে বে না। চললন্ম—আবার আসব।'
াসন্দেব গিয়ে রিকশায় উঠল। বড় রাস্তা পর্যন্ত বাসন্দেবকে এগিয়ে দিয়ে যতীন ফরে এল। উঠোনে, দালানে কোথাও মলিনা নেই।
বে ঢনুকে যতীন দেখে মলিনা জানলার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।
'ক গো, কি হল, দাঁড়িয়ে যে?'
বামীর গলার স্বরে মনুখ ফেরাল মলিনা। চোখ দনুটো তার লাল; ছল ছল রছে।
াবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যতীন বলে, 'কি ব্যাপার, কাঁদছ কি?'
লিনার খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি চোখ মনুছে বললো, 'পা'টায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।'
লিনার পায়ের দিকে যতীনের এই প্রথম নজর গেল। ছেঁড়া কাপড়ে মলিনার পা ড়ান। বেশ ফনুলেছে। কি হয়েছে জানতে চায় যতীন।
না বলে, 'ইঁদনুর কলে কেটে গেছে।'
মেষে যতীনের মেজাজ চড়ে যায়।
কাথায় সেই সর্বনেশে যন্তরটা? আজ আমি ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করব।'
টের তলায় ইঁদনুরকল খনুঁজতে বসে যতীন।
ামীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মলিনা ধীরে ধীরে বলে 'খাটের তলায় ই।'
কাথায় তবে?'
ফলে দিয়েছি জানলা দিয়ে।'
নক লাগে যতীনের। দাঁড়িয়ে উঠে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'সত্যি?'
াস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মলিনা। বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি?'
া হলে তোমার ইঁদনুর—?' স্ত্রীর অবোধ্য চোখে চোখ রেখে যতীন থতমত খেয়ে

বলে।

স্বামীর কথার জবাব দেয় না মলিনা। মনে মনে ভাবে : ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই—ঘরেই রয়েছে। কুরকুর করে কাটছে দিনরাত—কত যে ক্ষতি করেছে তার কি লেখা-জোখা আছে—না থাকবে কোনও দিন। আরও কত হয়ত করবে। কিন্তু যতীন একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, এই তার ভাগ্য।

বরফসাহেবের মেয়ে

'তাহলে একটা গল্প বলি, শোনো—' পাঁচুদা বললেন, গল্পটা যদিও সেই বয়সের যে-বয়সে আমাদেরও তোমার মতন মরাল রেস্‌পনসিবিলিটির ভূত ঘাড়ে চেপেছিল রাসু, কিন্তু আসলে সব মানুষেরই সব বয়সের গল্প সেটা।

আমরা ছিলাম তিন বন্ধু : বীরু, তিনু আর আমি। কতোই বা বয়স হবে তখন আমাদের, বড় জোর বছর বারো-তেরো। থাকতাম ধানবাদে ; ডোমপাড়ার রেল-কোয়ার্টার্সে। পড়তাম পুরোনো স্টেশনের 'অ্যাকাডেমি'তে।

ধানবাদ বাজার ছাড়িয়ে ডোমপাড়া। সে-পাড়ায় ঢুকতেই ডানহাতি যে ব্লকগুলো সারবন্দিভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারই একটাতে থাকতাম আমি, আর-একটাতে তিনু। আমার বাবা এবং তিনুর বাবা দু' জনাই ছিলেন রেলের চাকুরে। বীরুর বাবা কাজ করতেন ধানবাদ বাজারের সবচেয়ে চোখ-ধাঁধানো বিরাট এক সাহেবী দোকান 'গ্রেগারী ব্রাদার্স'। থাকতেন কাছাকাছি ভাড়াটে বাড়িতে। মোহিত কাকাবাবু কী কাজ করতেন তা জানি না, তবে বীরু প্রায়ই পকেট ভর্তি করে লজেন্স, টফি, বিস্কুট—এমনি কত কি নিয়ে আসত। আর আমরা সেই সব পকেটে করে হাজির হতাম বরফসাহেবের বাড়ি ; বরফ সাহেবের মেয়ে—জিনির কাছে।

বরফসাহেব ! নামটা শুনে কেমন যেন লাগছে তোমাদের, না ? সেই ছেলেবেলায় আমরাও যখন বরফসাহেবের কথা প্রথম শুনেছিলুম, কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিল। যখন ভাব হল, যাওয়া-আসা শুরু হল, বৃদ্ধি পেল অন্তরঙ্গতা, তখন কিন্তু আর অদ্ভুত লাগত না। আর কেই বা তাঁর নাম দিয়েছিল 'বরফসাহেব', তাও জানতে চাইনি, ইচ্ছেই করেনি। আজও জানি না, কী তাঁর আসল নাম।

আমাদের পাড়াতেই, জোড়াফটক যাবার পথে ডানদিকে বিরাট সাদা পাঁচিল-তোলা, ফটক লাগানো প্রকাণ্ড এক বাড়ি ছিল। বাড়িটা বরফকলের। ওই পাঁচিলের মধ্যে এক পাশে টালি আর খাপরা-ছাওয়া ছোট্ট একটা কটেজ, অনেকটা দিশি-বাঙলোর মতন। গির্জার চুড়োর মতো সে-বাড়ির মাথাতেও এক চুড়ো ছিল। লতানো গাছে শ্যাওলা-মাখা সে চুড়ো ঢাকা থাকতো অনেকটা। কতো.কমো ফুল দেখেছি তার গায়ে।

এই বাড়িতেই থাকতেন বরফসাহেব। ঝকঝকে-তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক কটেজে। সামনের ছোট্ট বাগানে ঋতু-বদলের সাথে সাথে নানান ফুল ফুটত। বারান্দায় থাকত ক্রোটনের টব। একটিমাত্র টব ছিল জিনিয়া ফুলের ! একেবারে

সাদা—বরফের মত ধবধবে ফুল দেখতাম সেই টবে—একটিই ফুল শুধু। বরফ-সাহেব নিজের হাতে কি সব করতেন যেন, আর সংবৎসর সেই টবে ফুটিয়ে রাখতেন নিঃসঙ্গ একটি জিনিয়া ফুল, একটি-দুটি কুঁড়িও। দুটি ফুল কখনো আমরা সে গাছে দেখি নি। শুনেছি, দুটি কুঁড়ি ফুটবো-ফুটবো হলেই একটি তিনি কেটে সরিয়ে ফেলতেন। কোথায় যে তা জানি না। বরফসাহেবের মেয়ে জিনিয়া—হ্যাঁ, বরফসাহেবের মেয়ের নাম ছিল জিনিয়া—আমরা অবশ্য বলতুম জিনি, লোকে বলত বরফসাহেবের মেয়ে—সেই জিনি বলত, একটি ফুল বরফ-সাহেব তার মাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। আমরা চোখ বড় বড় করে সে কথা শুনতাম, আর ভাবতাম, বরফসাহেব নিশ্চয় মন্ত্র-তন্ত্র জানেন।

বরফসাহেবের বাড়িতে কিসের যেন যাদু মাখানো ছিল। সে-বাড়ির বারান্দায় সকাল থেকেই ছায়া নামত, সবুজ রঙ্‌করা বেতের চেয়ার-টেবিলগুলো সারাদিন অসাড়ে ঘুমোত, হাওয়ায় হাওয়ায় পর্দা দুলত ঘরের, খাঁচার টিয়া পাখিটা থেকে থেকে ডেকে উঠত, দূরে থেকে ভেসে আসত ঘুঘুর ডাক। আর বরফকলের শব্দও নিরবচ্ছিন্ন বেজে চলত কানের কাছে।

আমরা—বীরু, তিনু আর আমি—আমরা নিত্যই যেতাম সেখানে। বরফসাহেব আমাদের খুব ভালোবাসতেন। বেঁটে-খাটো, গোলগাল, মাথায় পাকা চুল, কান জড়ানো চশমা চোখে! আমাদের সেই বরফসাহেবকে আজো স্পষ্ট মনে করতে পারি। আমরা যেন ছিলাম তাঁর বন্ধু, কি নাতির দল। আমাদের ডোমপাড়া গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলা থাকলে বরফসাহেব কল থেকে আধ চাঁই বরফ দিয়ে দেন দিয়ে দেন অমন দশ-বারো বোতল লেমনেড। একটা রুপোর কাপ কিনে দিয়ে ছিলেন তিনি আমাদের। সেই কাপ খেলা হত ফুটবল সিজিনে। বরফসাহেব ছিলেন তার কর্মকর্তা। ক্রিকেট খেলার মরসুমে তিনি আমাদের ব্যাট, উইকেট বল—সব কিনে দিতেন। তা ছাড়া, সর্বত্রই তো তিনি আমাদের। সরস্বতী পুজো করতাম; বরফসাহেব চাঁদা দিতেন দশ টাকা। নিজে এসে ঠাকুর সাজাতেন বিসর্জনের সময় সঙ্গে যেতেন সবার আগে, বরফসাহেবের মেয়ে জিনি এসে অঞ্জলি দিত।

আমরা তিন বন্ধু বরফসাহেবকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি তাঁর বাড়িতে। ফাঁক পেলেই তিনি আমাদের সঙ্গে লুডো, স্নেকল্যাডার, ক্যারাম, হর্সরেস—কত কি খেলতেন। আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন বরফকল ছাড়িয়ে ধানক্ষেত আর মাঠের মধ্যে, কবরখানার শেষে যে চাঁদমারি আছে, সেখানে। আমরা ছুটতাম—বীরু, তিনু, আমি আর জিনি। বরফসাহেব রুমাল উড়িয়ে স্টার্ট দিতেন। খেলতাম কানা মাছি। বেশির ভাগ সময় বরফসাহেব হতেন চোর। তাঁর চোখ বেঁধে দিতাম, আর তিনি ছড়ি দিয়ে দিয়ে বাতাসে আঁক কাটতেন—হ্যাই বীরু, কাঁহা গিয়া? তিনু

তোকে ধরবো এবার। জিনি—জিনি—শয়তান পাঁচুটা কোথায় রে ?

বরফসাহেবের বাড়ির আড্ডায় বরফসাহেবকে সব সময় অবশ্য পেতুম না, পেতুম জিনিকে। জিনি আমাদের জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকত। সমবয়সী সখি আমাদের। জিনিয়া ফুলের মতোই গায়ের রঙ, বরফসাহেব তাই বুঝি ওর নাম রেখেছিলেন জিনিয়া—জিনি। একরাশ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কাঁধ পর্যন্ত চুল জিনির। কী কোঁকড়ানো আর নরম। ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখ। টানা-টানা চোখ, মণি দুটো একটু কটা। জিনির গাল-ঠোঁট লাল হয়ে থাকত। লুডো খেলায় হেরে গিয়ে গলা বেঁকিয়ে জিনি যখন আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করত, কী অভিমান জানাত, আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতুম। ফ্রক পরত জিনি, কত রঙ-বেরঙের ফ্রক ছিল তার। আর সেই ফিকে গোলাপী সিল্কের মোজা, ওর নরম দুধ-রঙের পায়ে গা মিশিয়ে যে-মোজা আরও মধুর দুধ-আলতা রঙ ধরত।

জিনি ছিল আমাদের খেলার সাথী, সুখ-দুঃখের বন্ধু। আমরা গল্প করতাম, খেলতাম, খেতাম। কতদিন এমন হয়েছে, বীরু পকেট ভরতি করে চকলেট এনেছে, তিনু এনেছে ডাঁসা পেয়ারা, আর আমি স্রেফ তেঁতুলের আচার। জিনির কাছে তিনজনে লজেন্স, পেয়ারা আর তেঁতুলের আচার নামিয়ে রেখেছি। তারপর চারজনে মিলে বারান্দার তলায়, লতা-গাছের ছায়ায় বসে এক সাথে সেইসব সুখাদ্য এবং কুখাদ্য খেয়েছি। মাঝে মাঝে জিনি জিভ বের করে মুখ-চোখ কুঁচকে বলেছে, 'কি টক্!' বীরু বলেছে, 'খাসা'; তিনু বলেছে, 'বেড়ে'; আর আমি জিনির জিভ থেকে আমার জিভে মনে মনে সব টক টেনে নিয়ে বলেছি, 'গ্র্যান্ড'।

এই আমাদের জিনি। তিন বন্ধুর মনের বাগানে একটি ফোটা ফুল। তার রূপে, তার গন্ধে, তার খেলায় আমরা মুগ্ধ, আমরা খুশী, আমরা বিভোর। তার চেয়েও বড় কথা বুঝি, বরফসাহেবের মেয়ে জিনি আমাদের বন্ধু—এতে আমরা কৃতকৃতার্থ।

অথচ এই জিনি যে সত্যি সত্যি কে, তা আজও জানি না। নানান মুখে নানা কথা শুনেছি। ভাসাভাসাভাবে তার মানে বুঝলেও সে-কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসিনি। জিনির জন্মরহস্য যাই হোক্, বরফসাহেবের জিনিই ছিল সব, আর জিনির বরফসাহেবই সব। তিন কুলে ওদের আর কেউ আছে বলে জানতাম না, কোনোদিন আর কাউকে দেখলাম না। জিনির জাত কী, কী তার ধর্ম, কোনটা তার মাতৃভাষা, সে-কথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। বরফসাহেব নিজে বাঙলায় কথা বলতেন আমাদের সাথে, একটু তাতে উচ্চারণ-বিকৃত ছিল এই যা। আর জিনি, জিনি ইংরিজী পড়তে-লিখতে পারত যত না, তার বেশি ওর দখল ছিল বাঙলায়। জিনি সরস্বতী পুজোতে অঞ্জলি দিতে আসত সেকথা তো আগেই বলেছি তোমাদের, দুর্গা পুজো, কালী পুজোতে ঠাকুর দেখে বেড়ানোর উৎসাহও আমাদের চেয়ে তার কম ছিল না। ওদিকে আবার দেখেছি, জিনির গলায় সোনার সরু হারে

একটা ক্রস ঝোলানো।

বেশ ছিলাম ; বীরু, তিনু, আমি আর জিনি। আর—আর বরফসাহেব।

সুখেরও ঋতুবদল আছে। একথা ছেলেবেলায় প্রথম জানলাম, বরফসাহেব যেদিন মারা গেলেন। একেবারেই হঠাৎ ; মাত্র একদিনের জ্বরে। বরফকলের কাছেই ছিল গ্রেভ্ ইয়ার্ড—কয়েকটা ধানক্ষেতের ব্যবধানে। বরফসাহেবকে সেখানে কবর দেওয়া হল। সেদিন বরফসাহেবের বাড়িতে অনেক লোক দেখেছিলাম। সবই সাহেব-সুবো লোক। অবশ্য অন্ত্যজ কুলেরই বেশি। আমরা তিন বন্ধু বরফকলের গেটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম চৈত্র মাসের রোদ্দুরে। অত লোক আর সাহেব-সুবো দেখে ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় নি। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি, বিরাট সাদা উঁচু পাঁচিল ভেদ করে কিছু দেখতে পাই নি, কিছু শুনতে পাই নি, শুধু নিমগাছের ডালে সেদিনও ঘুঘুটা ডাকছিল, আর চৈত্র মাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে-আসা ধুলোয় আমাদের মাথা-মুখ-চোখ ভরে উঠেছিল।

বিকেল হয়-হয়—একটা কালো মতন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে বরফসাহেবের মৃতদেহ নিয়ে ওরা চলে গেল। আমরা শুধু গাড়ি দেখলুম, দেখলুম ফুল আর লোক আর কিছু না। জিনি কই ? জিনি ? চোখ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমরা—দেখতে পেলুম না জিনিকে।

তিন বন্ধু ছুটে গেলাম খোলা গেট দিয়ে। সেই বরফ সাহেবের বাড়ি। বারান্দা ফাঁকা, জিনিয়া ফুলের টব ফাঁকা। সব শূন্য, স্তব্ধ, নিঝুম। বীরু ভয়ে ভয়ে ডাকলো, জিনি—জিনি। তিনু ডাকলো, জিনি—জিনি। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। অধৈর্য হয়েই আমি চীৎকার করে ডাকলুম, জিনিয়া—জিনি।

বারান্দার নীচে লতাগাছের ঘন ছায়া থেকে কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমরা তিনজনে ছুটে গেলাম। ওই তো জিনি, আমাদের জিনি। গুমরে গুমরে জিনি কাঁদছে। ফোলা-ফোলা চোখ তুলে জিনি তাকাল, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠল আবার। তার কান্নায় আমাদের গলাও বুজে এল। এতক্ষণ যেন জোর করে আগলে রেখেছিলুম, আর পারলুম না, জিনির পাশে বসে আমরাও কাঁদতে লাগলুম।

কতক্ষণ কেঁদেছি, খেয়াল নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এসেছে, তারা উঠেছে আকাশে, তখন জিনির হাত ধরাধরি করে আমরা উঠলুম।

বীরু বললে, রাত্রে এসে সে শুতে পারে। তিনু বললে, সেও। আমিও মাথা নাড়লুম।

জিনি বললে, না, কাউকে আসতে হবে না, আয়া তো তার আছেই।

আমরা তিন বন্ধু ফিরে এলুম।

পরের দিন বিকেলে জিনিকে সঙ্গে করে গেলাম গ্রেভ্ ইয়ার্ডে, বরফসাহেবের কবর

দেখতে। জবা-গাছের তলায় বরফসাহেবের কবর হয়েছে। নতুন কবর। বড্ড ঠাণ্ডা যেন। কবরের চারপাশে বসে বীরু, তিনু, আমি আর জিনি অনেক কাঁদলুম। উঠে আসার সময় আমরা বুঝি সকলেই মনে মনে বললুম, বরফ সাহেবের না-থাকার দুঃখ জিনিকে আমরা পেতে দেব না। না—না—না।

দু-দশ দিন কেটে গেল। জিনির কাছে রোজই যাই আমরা। একদিন শুনলাম, জিনিকে বরফসাহেবের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেন কোথায় কি ব্যাপার—? জিনি কিছুই জানে না। বরফকলের মালিকের হুকুম। অন্য সাহেব আসবে সে বাড়িতে। মুখ শুকনো জিনির। বললে—কি হবে বীরু, তিনু, পাঁচু—আমি কোথায় যাব?

তাই তো, মহা দুশ্চিতায় পড়লাম আমরা। জিনি যাবে কোথায়, থাকবে কার কাছে, খাবে কী? জিনিকে সাহস দিয়ে বললাম, ভয় কি, আমরা আছি।

তারপর তিন বন্ধুতে চুপিচুপি ফাঁকায় বসে গালে হাত দিয়ে কত পরামর্শ, কত চিন্তা। রাত্রে আমাদের ঘুম বন্ধ। বীরু বললে, তার বাবা লোক ভাল, কিন্তু মা? মা খেস্টান মেয়ে বাড়িতে রাখতে রাজী নয়। তিনু বীরুর কথা শুনে বললে, তার মা বড় ভাল, কিন্তু ঠাকুমা? বুড়ি এক্কেবারে হাড়-জ্বালানো ছুঁচিবাই। জিনিকে ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে দেবে না। আমি বললুম, জিনি সরস্বতী পুজোতে অঞ্জলি দেয়, মা কালীকে প্রণাম করে ও খেস্টান নয়। তিনু বললে তা হোক, ও খেস্টানই। গলায় যীশু আছে।

গলায় যীশু-ঝোলানো মেয়েকে আমিই বা ঘরে এনে তুলি কি করে, বাবা-মা আমারও আছে; অতএব বীরু, তিনু যা পারে না, আমিও পারি না। অথচ এই না-পারাটা তখন আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কত ভেবেছি আমরা তিন বন্ধু আমবাগানের ছায়ায় বসে, রাগ করেছি গুরুজনদের ওপর, মন তিক্ত হয়েছে যীশুর ওপর —যেন ওই গলার ক্রসটাই সমস্ত বাধা। আর নিজেদের অসহায়তার কথা তুলে সান্ত্বনা দিয়েছি পরস্পরকে।

আশ্চর্য, ওই বয়সেও আমাদের লজ্জা পাবার মতো মন ছিল। জিনির জন্যে কিছুই করতে পারছি না তারই লজ্জা। পরম লজ্জাই বলা যায়। জিনির কাছে যাওয়া বন্ধ করতে হল। কাঁহাতক আর রোজ রোজ মিথ্যে কথা বলে তাকে ঠেকিয়ে রাখি। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতেও যেমন মুখ ফুটত না, জিনির কাছে মিথ্যে কথা বলতেও তেমনি কষ্ট হত।

জিনি-বিহনে আমাদের কিশোর-বৃন্দাবন অন্ধকার। মন খারাপ, মেজাজ খারাপ—এমন কি, বোধহয় শরীরটাও সকলের একটু খারাপ হয়ে গেল।

সেদিন শনিবার। স্কুল থেকে ফিরে এসে বীরু আর আমি ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা চড়াচ্ছি, এমন সময় লাফাতে লাফাতে তিনু ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,

'জিনি—জিনি ডাকছে তোদের ; শীঘ্র চ'— ।'

জিনি? কোথায় জিনি? মাঞ্জা মাথায় থাকল—ছুটলাম আমরা জিনি-সন্দর্শনে। পাড়ার শেষে মাঠের কাছে ল্যাংড়া ডাক্তারের বাড়িতে দেখা পেলাম জিনির ; কুল-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের অপেক্ষায়। দেখা হতে জিনি অভিমানভরে কাঁদল, বলল তার মনোব্যথা করুণ সুরে।

বরফসাহেবের বাড়িতে জিনির যে আয়াটা ছিল, সেই আয়াবুড়িই শেষ পর্যন্ত জিনিকে এখানে এনে ঠাঁই দিয়েছে। আমরা বললাম, তোমার ঘর কই ? জিনি জবাব দিলে, তার ঘর নেই। আয়া-বুড়ির সাথে এক সঙ্গে একটা কুঠুরিতে সে থাকে।

জিনি আরও কত কথা বললে, সমস্ত কথাই এ বাড়ির। এখানে তার কত যে কষ্ট, তারই কথা। আমরা চুপ করে শুনলাম শুধু। বলার কিছু ছিল না।

আসার সময় বীরু বললে, মন-টন খারাপ করো না, জিনি। আমাদের পাড়ার মধ্যে এসে গেছ, বেশ হয়েছে ; এক পাড়াতেই কাছাকাছি থাকব। রোজ আসব আমরা।

বীরুর সান্ত্বনাটা যে নেহাতই অসার একথা বুঝতে বেশ কিছুদিন লাগল। জিনিকে আমাদের পাড়ার মধ্যে পেয়ে প্রথমটায় অবশ্য পুলকিত হয়েছিলাম, দুর্ভাবনা দূর হয়েছিল জিনি আশ্রয় পেয়েছে জেনে ; কিন্তু প্রথমে যা ভাবিনি, দেখিনি, ক্রমেই তা চোখে পড়তে লাগল।

জিনি যে-বাড়িতে এসে উঠেছিল সেটা এক পার্শী বুড়োর-পাঁউরুটি-বিস্কুট-কেক তৈরির কারখানা। পার্শীটার নাম ছিল পেসরানজী, আমরা বলতুম পেস্তাবাদামজী। বাড়ির এক অংশে থাকত সেই পেস্তাবাদামজীর পরিবার—সাহেবী কায়দায় ; আলাদা করে ঘেরা সেই অংশ। বাকি বাড়িটা ছিল পাউরুটির কারখানা—যেমনি নোঙরা, তেমনি গন্ধ। ওখানেই রুটি-বিস্কুট-কেক তৈরি হয়, আর এদিক-ওদিক মাথা গুঁজে পড়ে থাকে কারিগররা—যত সব খানসামা, বাবুর্চি ক্লাসের ছোট-লোকের দল। ওরা বিড়ি ফোঁকে, ইতর ভাষায় কথা বলে, রগড় করে জিনিকে নিয়ে, আমরা গেলে আমাদের নিয়েও।

কাণ্ড-কারখানা যত দেখি, ততই চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। প্রথম-প্রথম দেখতাম, জিনির কোনো কাজ ছিল না। বাড়ির কোনো নির্জন কোণে এসে সে একা-একা বই পড়ছে, কি, তেঁতুল-বিচি নিয়ে খেলছে। বাড়িতে স্থান না জুটলে কুলতলায় ঠায় বসে থাকত জিনি একা-একা। চলে আসত আমাদের কাছে। ক্রমেই সেসব বন্ধ হল। দেখলাম, জিনি কাজকর্ম করে। কখনও দেখি, জিনি দু হাতে বড় বালতি ধরে টেনে-হিঁচড়ে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখন মাথায় তার পাঁউরুটির ঝুড়ি, কখন বা তোয়ালে-জড়ানো খাবার বয়ে দুপুর রোদে জিনি চলেছে পেস্তা-বাদামজীর দোকানে—সেই পোস্ট অফিসের কাছে।

চোখের সামনে দেখি, জিনি দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। তার ঠোঁটের হাসি মুছলো, মুছলো তার গালের লাল আভা। আটা-ময়দার গুঁড়োয় অমন চুল তার রুক্ষ লালচে হয়ে উঠেছে। জিনির গায়ে ছেঁড়া ফ্রক ; পায়ে রঙ-করা মুসলমানী মেয়েদের মতো খড়ম।

জিনিকে একদিন বললাম, 'তুমি এত কাজ করো কেন ?'

জিনি করুণ সুরে জবাব দিল, 'কাজ না করলে মারে, খেতে দেয় না।'

জিনির কথা শুনে বীরু লাফিয়ে উঠল, কে মারে তোমায়—নাম বলো। সে ব্যাটার আমি হাত ভাঙব।'

জিনি জবাব দিল, 'কার নাম বলবো, সকলেই। কাজ করতে না পারলে মারবে ছাড়া আর কি করবে !'

আমাদের সেই আয়াবুড়ির কাছে গেলাম। সে বুড়ি কেঁদেকেটে বললে, 'খোকাবাবুরা, আমার নসিব। আঁখ্ গেছে আমার—দেখতে পাই না এক চোখে, পার্শী সাহেবের বাড়িতে ফাই-ফরমাস খাটি। সাত টাকা তলব দেয়। জিনিমিসি কারখানায় খাটে—পাঁচ টাকা তলব। না খাটলে দানা পড়বে না পেটে। তবুভি জিনিমিসিকে আমি এক আঁখে রাখি। না রাখলে এরা ওকে কুত্তার মতো ছিঁড়ে খেতো। জিনি-মিসির উমর বাড়লো।'

সত্যিই, জিনির বয়স বেড়েছে ; বয়স বেড়েছে আমাদেরও। এখন অনেক জিনিস বুঝি, অনেক জিনিস দেখি। ময়লা, রঙীন শাড়ি পরে, কোমর পর্যন্ত রুক্ষ চুলের এক বেণী ঝুলিয়ে জিনি যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়, আমরা তখন তার বাড়ন্ত দেহটাকে আড় চোখে লক্ষ করে জিনির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠি।

আমরা কারখানায় জিনির কাছে গেলে ইদ্রিস, নুলো—সব ক'টা লোকই ইতর রসিকতা করে, হাসে কুৎসিতভাবে। সম্মানে আঘাত লাগে আমাদের। বীরু বলে, এ বাড়িতে জিনি থাকে থাকুক, আমাদের আসা চলবে না। তিনু মাথা নেড়ে সায় দিলে। আমিও মাথা নাড়লুম।

জিনির সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনটা আরও ক্ষীণ হল। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, বরফসাহেবের বাড়িতে যে-জিনি আমাদের স্বপ্ন ছিল, যাকে মনে মনে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলাম—সেই জিনি পেসতনজীর পাঁউরুটি কারখানায় ছোট-লোকদের ভিড়ে একসাথে থেকে, খেয়ে, চুল্লি ধরিয়ে, আটা মেখে অনেক নীচুতে নেমে গেছে। আমাদের সাথে ওর মেলামেশা প্রকাশ্যভাবে আর চলে না। সেটা দৃষ্টিকটু।

দিনে দিনে যাওয়া-আসা, দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হল। নেহাতই যদি কোনোদিন পথে

দেখা হত, কিংবা জিনি আসত গল্পের বই চাইতে তবেই কথা হত। তাও যৎ-সামান্য দু-চারটে কথা।

জিনিকে আমরা এড়িয়ে চলি প্রত্যক্ষভাবে, কিন্তু পরোক্ষভাবে তার নামে কথা উঠলেই কান খাড়া করে শুনি। হ্যাঁ—তখন ক্রমাগতই জিনির নামে কুৎসা শুনেছি, নানান মুখে।

একদিন তিনু এসে বললে, 'এ শালা জাতের দোষ।'

'কিসের?' প্রশ্ন করলুম অবাক হয়ে।

'জাতের; বুঝলি না, হাঁদারাম। যার জন্মের ঠিক নেই, দো-আঁশলা—সে ছুঁড়ির আর হবে কি? যাই বলো, ও ঠিক ওর মনের মতো জায়গায় জমে গেছে।'

'কার কথা বলছিস রে, জিনির কথা?' বীরু লাল ঘুঁটিটা পকেটে ফেলে ক্যারাম বোর্ডটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ—জিনি নয় তো কার! আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, মাইরি—ও কিছুতেই সাহেব-টাহেব নয়, এক্কেবারে লেড়িকুত্তার জাত। ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে বসেছিল। এখন সব পুচ্ছ খসে গেছে।'

তিনুর উত্তেজিত হবার কারণটা জানা গেল। কাল শেষ-বিকেলে নাকি কোন্ ধানক্ষেতের ধারে জিনি আর ইদ্রিসকে দেখা গেছে—বিজন বলেছে তাকে।

খবরটা জানিয়ে তিনু নানারকম খারাপ মন্তব্য করতে লাগল।

'যা মুখে আসে, তাই যে বলছিস, তিনু।' বললাম আমি অসন্তুষ্ট হয়ে।

'কি খারাপ বলেছে?' বীরু তিনুর হয়ে জবাব দিল।

'জিনি ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তোর আমার কি?' বললুম আমি।

'কেন নয়?' বীরু দপ করে জ্বলে উঠল যেন, 'জিনি কি ইদ্রিসের?'

'তো কি তোর নাকি?' আমার মুখ দিয়ে ফস করে কথাটা বেরিয়ে গেল।

'আলবাৎ। আমাদের নয় তো কোন্ শালার?'

আমি চুপ এবং আমরাও।

জিনি কি আমাদের? আমি ভাবলুম। শুধুই কি আমি ভেবেছি? না, না—বীরু, তিনু, আমি—আমরা সবাই হয়ত সেদিন ভেবেছি—জিনি কি আমাদের?

মাস, বছর কেটে গেল চোখের ওপর দিয়ে। আমরা তখন ম্যাট্রিক পাস করে বেকার বসে আছি। তিনজনেই চেষ্টায় আছি রেলের চাকরির। মাঝে মাঝে ইনটারভিউ দিয়ে আসি আসানসোল গিয়ে। ওই পর্যন্ত, চাকরি আর কপালে জোটে না।

বেকার যুবকদের কাজ কি কি হতে পারে—তোমরাই ভেবে নাও। স্রেফ হোটেল-ডি-পাপ্পার অন্ন ধ্বংস, ঘুম, আড্ডা, বিড়ি ফোঁকা। আমরাও তার জের টেনে চলেছি। তফাতটুকু শুধু এই যে, আমরা অধিকন্তু তিনটি কাজ করতাম। রেল

ইনস্টিটিউট থেকে রাতারাতি অখাদ্য উপন্যাস এনে রাতারাতি শেষ করা, খেলা থাকলে মাঠে ছোটা, আর—আর বুঝতেই তো পারছ, যেহেতু বয়সটা খারাপ এবং হাতে অনন্ত সময়, সেহেতু নিজেদের মধ্য পাড়া-বেপাড়ার মেয়ে নিয়ে একটু খোস গল্প।

ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে, গলার ওপর শার্টের কলার তুলে, বাঁ হাতে সাইকেল চালিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে বেশ মসৃণ গতিতে দিন কাটাচ্ছি, হঠাৎ জিনি সব সুখ ভেস্তে দিল।

পার্শী পেসবানজীর বেকারি উঠে গেছে, জিনি কাজ নিয়েছে ধানবাদ রেল ইন-স্টিটিউটের সিনেমাতে—লেডিস গেটের গেটকিপার। নীল শাড়ি পরে, বিনুনি দুলিয়ে, শিলপারে ধুলো ... নি আমাদের চোখের ওপর দিয়ে চাকরি করতে যায়। তখনও সে থাকে ... গাতেই—একটা ঘর ভাড়া করে।

সে কথা যাক, আসল ... এই বয়সে জিনিকে আবার যেন হঠাৎ একদিন নতুন চোখে দেখল ...

সিনেমা দেখতে ... আমরা—বীরু, তিনু আর আমি। টিকিট পেলাম না। কি একটা ... হচ্ছিল, বেজায় ভিড়। রাত্রের শোয়ের টিকিট কিনে সামনের চা ... স বসে গল্প করছি আর চা খাচ্ছি মৌজ করে, সেই সঙ্গে এদিক-ও ... খে সিগারেট ফুঁকছি। এমন সময় দেখি, ... তা থেকে নতুন ... লিয়াত সিনেমা অপারেটার সুখেন্দু ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকি ... রে হাসতে হাসতে স্টলে ঢুকছে—পাশে জিনি। আমাদের দেখে ... খেই কি একটা বলল যেন, তারপর ওরা দুজনেই পরদা-ফেলা ... মধ্যে গিয়ে বসল।

... লে আমার দিকে, আমি তিনুর দিকে। তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ... বাই একসঙ্গে তাকালুম পরদার দিকে। সব লক্ষ করলাম আমরা। চপ কেক গেল, টি-পটে করে চা গেল পরদার ভেতরে। সুখেন্দুর হাসির সাথে মাঝে জিনির হাসিও কানে এল। সিগারেটের গন্ধও ভেসে আসতে লাগল ... থেকে।

... যে মাথা-মুণ্ডু কি ছবি দেখেছি, জানি না। শোয়ের শেষে তিন বন্ধুই ... হয়ে অন্ধকারে পথ হেঁটেছি। পাড়ার কাছাকাছি এসে বীরু বললে, 'জিনি ... হলে বেশ ভালোই আছে!' তিনু বললে, 'বেকারিতে থাকার সময় শুঁটকি ... গিয়েছিল। দেখলে মনে হত, টি বি রুগী। এখন চেহারাটা বেশ ফিরেছে।' ... ম বললুম, 'সুখেন্দু লুটছে।' আমার কথা শুনে বীরু উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা ... ল, 'লুটোচ্ছি। ওসব কলকাতিয়াগিরি ধানবাদে চলবে না।'

... থ্যা কথা বলব না। সেইদিন থেকে কী যেন হয়ে গেল আমাদের। সে অবস্থা

বর্ণনা করা মুশকিল। এক কথায় বলতে পারি, বিশ্রী একটা ঈর্ষায় আমরা জ্বলতে লাগলুম মনে মনে। এ ঈর্ষা কেন, কার ওপর, তা কি খতিয়ে দেখেছি নাকি? উঁহু, সেসব দেখি নি। খালি ভেবেছি, এ আমাদের হার। একেবারে থিন টু নীলে। ক্যালকেশিয়ান সুখেন্দু আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।

পাড়ায় ঘাঁটি ফেললাম—ঘাঁটি ফেললাম সিনেমায়। জিনির যাওয়া-আসা চাল-চলন নজর রাখি। কখন যায়, কখন ফেরে, কি করে।

একদিন তিনু এসে বললে, সুখেন্দু আর জিনি অপারেটারের ঘরে গা জড়াজড়ি করে বসে থাকে। বীরু বললে, সুখেন্দু জিনিকে ওই ফুল-তোলা শাড়িটা কিনে দিয়েছে। আমি বলি, জিনি আজকাল রোজ বেশ রাত করে ফেরে।

অসহ্য—অসহ্য! এ আমাদের অসহ্য। মনে পড়ে বীরুর কথা—আলবাৎ জিনি আমাদের। আমাদের নয় তো কার? সেই জিনি বেলেল্লাপনা শুরু করেছে; আর আমরা শুধু দেখেই যাব!

বীরু সুখেন্দুকে একটা উড়ো চিঠি দিয়ে শাসালো। কোনো কাজ হল না। আড্ডায় তিনজনেই আমরা লোভনীয় তিনটি প্রত্যক্ষ দৃশ্য দেখেছি বলে বর্ণনা দিলুম। সত্যি বলতে কি, আমি কিছুই দেখি নি। কিন্তু বীরু, তিনু যদি দেখে থাকে, আমার না দেখাটা শোভা পায় না। বানিয়েই বললুম, সুখেন্দু আর জিনি রাত প্রায় বারোটার সময় কাল পাড়ায় এসেছে। সুখেন্দু জিনির ঘরেই ছিল। সারা রাত।

শুনে বীরু আমাদের টেনে নিয়ে সটান গিয়ে হাজির হল জিনির কাছে।

'কি?' জিনি প্রশ্ন করলে।

'এটা ভদ্রলোকের পাড়া, জিনি।'

'ওমা, তা কে না জানে?' জিনি হেসে ফেললো।

'জানো তো, এমন হয় কেন?' বীরু অনেক কষ্টে বললে।

'কী?' জিনি জানতে চাইল।

বীরু আমায় বলতে বললে 'কী'-টা। আমি কি বলব! আমি বলতে বললাম তিনুকে। তিনু বললে বীরুকে।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হল না। আমরা বোকার মতো তিনজনে ফিরলাম। জিনি খিলখিল করে হাসতে লাগল।

জিনির হাসি যেন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল। জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলুম তিন বন্ধু। এ অপমান বরদাস্ত করা যায় না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন হকি খেলে ফেরার পথে সুখেন্দুকে পেয়ে গেলুম ফাঁকায়। বীরু তাকে গিয়ে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

হকি-স্টিকের মার তো কম নয়। সুখেন্দু বেশ ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকল।

তারপর আবার যে কে সেই। সুখেন্দু আর জিনি। একটা শুধু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। জিনি আজকাল আমাদের দেখেও দেখে না। পথে দেখা হলে মুখ নীচু করে দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে যায়।

এও অসহ্য। বীরু বললে, 'ওর লভারকে ঠেঙিয়েছ, ও তোমাদের দিকে তাকাবে কেন? মনে মনে খাপ্পা হয়ে গেছে।'

তিনু বললে 'তাই বলে এ অপমান?'

তিন বন্ধু যুক্তি আঁটলাম নানারকম এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটা, সেটাই প্রয়োগ করলাম এবার। প্রতিশোধ নেবার এমন দুর্দমনীয় বাসনা মানুষের কেন হয়, কে জানে!

সিনেমা সেক্রেটারি মানিক অধিকারীকে এক চিঠি পাঠালাম। আমাদের রেল-পাড়ার কয়েকজন বাপের বয়সী ভদ্রলোকের নাম-সই জাল করে, ব্লক নম্বর দিয়ে। তাতে জিনির চরিত্র সম্পর্কে লোমহর্ষক কুৎসিত ইঙ্গিত নানা রকমের। ও মেয়েকে চাকরিতে রাখলে বাড়ির বউ-ঝিকে আর সিনেমা দেখতে পাঠানো যাবে না। যদি জিনির চাকরি এর পরও থাকে, তবে জেনারেল মিটিংএ এইসব নিয়ে কেলেঙ্কারি হবে কিন্তু।

মফস্সল শহরের রেল ইনস্টিটিউটের সিনেমা সেক্রেটারি—তাঁর অত ঝামেলায় কাজ কি! জিনির চাকরি গেল। এমন কি, কয়েকদিন বাদে সুখেন্দুরও।

আমরা খুব খুশী। যেন যুদ্ধ জয় করেছি। আনন্দের চোটে একদিন ভিজে বেড়ালের মতো জিনির বাড়িতে সহানুভূতি জানাতে গেলাম। জিনি সেদিন আমাদের পরম বিস্ময়-ভরা চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছিল, একটাও কথা বলে নি।

গল্পটা এখানে শেষ হতে পারত, যদি জিনি সুখেন্দুর সাথে ধানবাদ ছেড়ে চলে যেত। আমরা তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু জিনি আমাদের অনুমান মিথ্যে করল। সুখেন্দু ধানবাদ ছেড়ে চলে গেল, আর জিনি আমাদের পাড়া ছেড়ে বাজারের মধ্যে খোলার চালঅলা এক সরু নোংরা গলিতে গিয়ে ঘর বাঁধল। একা।

জিনি যেখানে ঘর বাঁধল, সে-গলিটা সম্পর্কে নানান জনে নানা কথা বলত। ওখানে বাজারের শাকসবজি, আলু-পটল-অলারা থাকে, থাকে মুটে-মজুর-ঝিয়ের দল এবং আরও এ-ও, যাদের দু'চার টাকায় মাথা গোঁজার জায়গা চাই, তারাই।

বাজারের মধ্যে দিয়ে ইনস্টিটিউট যাবার ওইটেই ছিল শর্ট-কাট পথ। আমরা সাইকেল নিয়েও ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতুম। জিনি যাওয়ার পর ওই পথে যাতায়াতটাও আমাদের বেড়ে গেল।

একদিন এক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলুম। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। ইনস্টিটিউট থেকে আমরা দুই বন্ধু—বীরু আর আমি ব্রিজ টুর্নামেণ্ট খেলে ফিরছি ভিজতে ভিজতে,

জিনিদের অন্ধকার গলির পথ দিয়ে। হঠাৎ চেপে বৃষ্টি এল। একটা ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের টিনের চালার তলায় দাঁড়ালুম আমরা।

এক সময় বীরু হঠাৎ বললে, 'এই দ্যাখ—দ্যাখ'।

বীরুর নির্দেশ অনুসরণ করে আমি তাকালুম। মিউনিসিপ্যালিটির মিটমিটে লাইট-পোস্টের কাছে একটা লোক ঘুরঘুর করছে। টলটল পা। দু-চার পা এদিক-ওদিকে যাওয়া-আসা করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের দরজায় বসে পড়ল।

'নন্দ না ?'

'হ্যাঁ, নন্দ বলেই মনে হচ্ছে।' আমি বললুম।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বীরু বেশ একটু কঠিন গলায় বললে, 'নন্দও আজকাল জিনির কাছে আসে।'

'জিনি ?' আমি অবাক, 'তুই জানলি কি করে ?'

'জানি। ও বাড়িটা জিনির।'

বৃষ্টি থেমে এল ; আমরাও পথে নামলাম।

পরের দিন জিনির প্রসঙ্গ উঠল। উঠবেই যে, সেটা স্বাভাবিক। তিনু সব শুনে টিপ্পনী কাটল, 'মাত্র এই—এ আমি আগেই জানতাম। কী না দেখেছি, আর না শুনেছি। রীতিমত একটা বেশ্যা হয়ে উঠেছে জিনি। বাজারের যত মদো-মাতাল আলুঅলা-বিড়িঅলা ওর কাছে যায়-আসে।'

তিনুর কথা শুনে বীরু দপ করে জ্বলে উঠল।

'যাওয়াচ্ছি সব শালাকে। দাঁড়া—'

'কী করবি তুই ?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'পেঁদিয়ে বাজার থেকে ওঠাবো। এ কি মুফতি মাল নাকি ? যে আসবে, সেই।' বীরু উত্তেজনার মাথায় বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে দিলো তিনুর গায়েই। তিনু ক্ষিপ্র হাতে জামা বাঁচিয়ে বিড়ির শেষ অংশটুকু ফুঁকতে লাগল চোখ ছোট করে।

'শেষ পর্যন্ত আলুঅলা নন্দ ! শেম্ !' বীরু কপালে হাত তুলল।

'কী অধঃপতন !' তিনু চোখ ছোট ছোট করেই যোগ করলে, 'বরফ সাহেবের মেয়ে আলুঅলা নন্দ?—

তিনুর বাকি কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললুম, 'আচ্ছা বীরু, আমাদের এত মাথাব্যথার দরকার কি ? যার ছাগল, সে যেখানে খুশি কাটুক।'

বীরু কটমট করে আমার দিকে তাকাল। এবং পরমুহূর্তেই অধৈর্য হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'পাঁঠাটা কি নন্দর ?'

'আমাদেরও না।' আমি বললুম।

'আলবাত আমাদের।' আমাদের নয় তো কোন্ ব্যাটার। আস্ক্ তিনু, এ একটা মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটির কোশ্চেন। হাজার হোক, জিনি আমাদের ছেলেবেলার

বন্ধু—বরফসাহেবের মেয়ে। একসঙ্গে, এক পাড়ায় আমরা থেকেছি। সেই মেয়েটা বাজারের বনে যাবে, দ্যাট্স্ ইম্পসিব্ল! উই ক্যান্ট এ্যালাও দ্যাট্।'

'ঠিক বলেছে বীরু', তিনু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই ভাব পাঁচু, ছেলেবেলার সেই জিনি আর আজকের জিনি। এ একেবারে তোর সেই হেভেন এ্যান্ড হেল্। বরফসাহেব কাণ্ডকারখানা দেখে স্বর্গ থেকে আমাদের মুণ্ডুপাত করছে।'

'শোনো!' বীরু আমার দিকে তর্জনী তুলে শাসালো, যেন আমিই জিনি। বললে, 'আমার বাবা প্লেন কথা। তুমি আমাদের বন্ধুলোক, গরীব হও, বড়লোক হও, যায় আসে না। বাট্ ইউ মাস্ট্ বি গুড্। ওসব বেলেল্লাগিরি চলবে না। জিনিকে শেষবারের মতো এই কথাটা জানিয়ে দেব।'

বীরু আর তিনু যা বললে, তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না, জিনিকে সৎপথে রাখাটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য অর্থাৎ মরাল রেস্পন্সিবিলিটি।

এর পর কয়েকদিন বীরু, তিনু আর আমি বাজারপাড়ার সেই গলির মধ্যে ঘুরঘুর করলাম একসঙ্গেই। বাড়ির বাজারটা আমরা স্বহস্তে করতাম। বেকার অবস্থায় ইনকামের ওই একটা পথ গার্জেনরা আমাদের দয়া করে দিয়ে থাকেন। আলুওলা নন্দর কাছে আলুটা আমরা কিনতাম বরাবরই। তার প্রধান কারণ, নন্দ আমাদের কাছে ধার রাখত। আর দ্বিতীয় কারণ, ভদ্রলোকের ছেলে সে; ইউ পি স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত আমাদের সাথে পড়েছিল, সেই সুবাদে বাল্যবন্ধু। অবশ্য বাল্যকালটা যেমন চিরন্তন নয়, তেমনি নন্দরও সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও সেই ফাইভ ক্লাসেই শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে নন্দ তার তরফ থেকে বন্ধুত্বটুকু রাখতে চেয়েছিল, আমরা পাত্তা দিই নি। ইদানীং ধার পা বলে হেসে-টেসে দু-চারটে কথা বলি। যাই হোক, বাজার করতে গিয়ে আ যা আভাসে নন্দকে ঠেস দিয়ে কথা বলেছি, পরখ করতে চেয়েছি তার মনো মোটা-মাথা, নাদুস-নুদুস নন্দ পানের ছোপ-ধরা দাঁত বের করে শুধু হে কিছুই বোঝে নি, কিছুই বলে নি।

বীরু বললে, ও বেটা পয়লা নম্বরের শয়তান। তিনু বললে, তা না হলে খলছি। ব্যবসা করে টু পাইস করে। আমি বললুম, ওর মাথা মোটা নয় মাইরি, দেখি চালাক দেখছি।

ইতিমধ্যে এক সুযোগ এলো আমাদের হাতে। একেবারেই আকস্মিকভাবে।

রাত তখন গোটা দশেক হবে বোধহয়। বর্ষার দিন। বৃষ্টি আসে হঠাৎ, থামে খানিকক্ষণ; তারপর আবার দেখো, সেই একঘেয়ে ইলশেগুঁড়ি। বীরু, তিনু আর আমি সেদিন একসঙ্গে রাত করেই ইনস্টিটিউট থেকে ফিরছি বাজারপাড়ার গলি দিয়ে। গলি ফাঁকা। মিউনিসিপ্যালিটির সেই বাতিটা টিম-টিম করে জ্বলছে। গলি প্রায় ফুরিয়ে আসে-আসে এমন সময় দেখি—নন্দ। অন্ধকারের কোনো

সঙ্গোপন কোণ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর পড়ে আর-কি।

আমরা একটু সরে গেলাম। নন্দও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল পা ফাঁক করে। তারপর দু হাত জোড় করে মদের ঝোঁকে সে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলে। বোধহয় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার জন্যে ক্ষমা চাইছিল।

বীরু তাকাল তিনুর দিকে, তিনু আমার দিকে। তিনু ইতর একটা উক্তি করলে নন্দকে উপলক্ষ করে। তিনজনে সেই উক্তির সূত্র ধরে আর-একবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমাদের চোখে যে কি ছিলো, জানি না। বীরু হঠাৎ দু পা এগিয়ে নন্দর মুখে দড়াম করে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলে। আচমকা ঘুঁষি খেয়ে মাতাল নন্দ টলতে টলতে রাস্তার ওপর প্রায় পড়-পড়—দেখি, তিনু ছুটে গিয়ে তার পেটে টেনে এক লাথি মারল। কেমন একটা আঁতকে ওঠার শব্দ করে নন্দ রাস্তার ওপর মুখ গুঁজে পড়ল।

'ঠিক হয়েছে। শালা, মাতাল।' দাঁতে দাঁত চেপে বললে তিনু, 'চল, পালাই।'

'চল্।' বীরু জামায় হাত ঘষতে ঘষতে পিছু ফিরলে।

'বীরু।' আমি ডাকলুম।

বীরু, তিনু ফিরে দাঁড়াল।

নীচু গলায় বললাম আমি, 'কেটে তো পড়ছি। কিন্তু নন্দটা কেমন করে গোঙাচ্ছে দেখ্। ব্যাটা যদি মরেই যায়।'

'মরে মরুক, চলে আয়।' তিনু জবাব দিলে।

'বীরু নন্দর ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী ভেবে তার পাশেই 'পে'. পড়ল। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে নীচু গলাতেই বললে, 'মারটা বড় জোর বীরু গেছে রে, পাঁচু। শালার নাক-মুখ দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। মাইরি। এভাবে ক্ষিপ্র হাত পড়ে থাকলে ব্যাটা মরুক না মরুক, নির্ঘাত নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।

'শেষ ৮ কথায় ভীত হলাম। বললাম, 'কি করবি ? ফেলে পালাবি ?'

'কী অধাঁতে ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ বললে, 'অল রাইট্। ধর আলুক্ক, চ্যাংদোলা করে তোল্।'

তিনুরা তাকালুম। অর্থাৎ প্রশ্ন করলুম, চ্যাংদোলা করে না হয় তুললাম নন্দকে, একিন্তু তারপর—তারপর কী ?

আমাদের মনোভাব বুঝে বীরু বললে, 'ঘাবড়াস না। সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি মাথায় এসেছে। নন্দকে জিনির জিম্মায় দিয়ে যাই। যার জিনিস সে বুঝুক। জিনিও জানুক, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পীবিত করা যায় না।'

বীরুর প্রস্তাব আমাদের মনঃপূত হল। ঠিক বলেছে বীরু।

নন্দর সেই বিশাল সিক্ত বপু আমরা কোনরকমে টানতে টানতে বয়ে চললাম।

উৎকট গন্ধ ভাসছে নন্দর গা থেকে। কি যেন বিড়বিড় করছে হারামজাদাটা তখনও।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে জবাব এলো, 'কে ?'

বীরু জবাব দিল। বললে, 'আমরা—বীরু, তিনু, পাঁচু। বিপদ হয়েছে। শিগগির খোলো।'

দরজা খুললো জিনি, হাতে তার লণ্ঠন। কোন ভূমিকা না করেই নন্দর বেহুঁশ দেহটাকে আমরা রোয়াকে নামিয়ে রাখলুম।

লণ্ঠনের আলো নন্দর মুখে ফেলে জিনি আঁতকে আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'এ কি ? একে এখানে নিয়ে এসেছো কেন ?'

বীরু নন্দর কাপড়ের খুঁট দিয়ে তার নাক-মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'মাতাল লোক, পথ চলতে পারে না, নালার ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভয় নেই, রক্ত বন্ধ হয়ে এসেছে—ঠিক হয়ে যাবে।'

'তা, তা তোমরা ওকে এখানে আনলে কেন ?' জিনি ভীত, বিস্মিত গলায় আবার বললে।

'কোথায় তবে নিয়ে যাব ?' বীরুর গলার স্বরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, 'ছেলেবেলার বন্ধু আমাদের নন্দ, আর তুমিও হলে ছেলেবেলার বান্ধবী। নন্দ নর্দমায় মুখ গুঁজে সারা রাত পড়ে থাকবে, তাই কি চোখে দেখতে পারি! পেঁাছে দিয়ে গেলাম তাই। আয় পাঁচু, তিনু—'

বীরুর ডাকের সাথে আমরা জিনির ঘরের দরজা টপকে রাস্তায় এসে নামলুম। দরজা হাট হয়েই খোলা থাকল।

গলি পেরিয়ে আমরা যখন বড় রাস্তায় পা দিয়েছি—তিনু বললে, 'আ—এ যা একটা হল না মাইরি, খাসা—সব অপমান স্রেফ জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।'

বীরু গম্ভীর স্বরেই জবাব দিলে, 'নোব্‌ল্‌ রিভেঞ্জ!'

এ ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। বীরুদের বাড়িতে বসে আমরা তাস খেলছি। তখন দুপুর। হঠাৎ দেখি—নন্দ। নন্দকে ক'দিনই আর আলুর দোকানে দেখি নি।

ঘরে ঢুকেই নন্দ আমাদের পাশে বসে পড়ে তিনবার তিনজনের হাত জড়িয়ে ধরল। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম আমরা। নন্দটাও যে কি বলবে, ঠিক করতে পারছে না। পানের ছোপ-ধরা দাঁতগুলো বের করে হাসিতে, আহ্লাদে, মিনতিতে ঠিক একটা কুকুরছানার মতো কেঁউ কেঁউ করতে লাগল।

'কি ব্যাপার।' বীরু জানতে চাইলো যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে।

নন্দ আরও একবার কেঁউ কেঁউ করে বীরুর হাত চেপে ধরল। 'ভাই, আজ আমি

তোমাদের কাছে এসেছি, একটা কথা আমার রাখতেই হবে।'

আমরা সন্ত্রস্ত হলুম। নন্দ নিশ্চয় ধারের পাওনা টাকা চাইতে এসেছে। তিনজনে চোখাচোখি হয়ে গেল।

'কী কথা ?' তিনু বললে।

যেন কেউ নন্দকে কাতুকুতু দিচ্ছে—মুখ, চোখ, গলার তেমনি একটা কিম্ভূত-কিমাকার আহ্লাদে মুখ করে নন্দ বললে, 'আমার বিয়ে ভাই আজ, তোমাদের যেতেই হবে। তোমরা না গেলে হবে না, কিছুতেই হবে না। তোমরা আমার বন্ধু, তোমাদের দয়াতেই তো পেয়ে গেলাম।'

নন্দর বিয়ে ! আমরা বোবা, বোকা বনে গেলুম।

'কোথায় বিয়ে ?' বীরু প্রশ্ন করলে।

'কোথায় আবার, এখানেই। বাজার-গলিতে। তোমাদের ভাই যাওয়া চাইই। আমার অনুরোধ।' নন্দ একটু থেমে বিগলিত হয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'আমার ভাবী বউয়েরও। সে তো বারবার করে বলে পাঠিয়েছে। তা ছাড়া, তোমরাই তো তাকে চেনো, আমার হাতে দিয়েছ, তোমরাই সাক্ষী হবে বিয়ের।'

'সাক্ষী হব আমরা ?' বীরু লাফিয়ে উঠল 'কী বলছিস নন্দ—ও সমস্ত তোর ইনিবিনি কথা রাখ—; সাফসোফ জবাব দে। কার সঙ্গে বিয়ে তোর, কিসের সাক্ষী ?'

'যাঃ !' নন্দ মেয়েমানুষের মতো মিনমিনে লাজুক গলায় বললে, 'কিছুই যেন জানো না তোমরা। জিনিয়া ভাই—তোমাদের সেই জিনিয়ার সঙ্গে বিয়ে। সই-করা বিয়ে কিনা, বোঝোই তো, তোমরা ছাড়া কে আমাদের সাক্ষী হবে !'

নন্দ উঠল। চট করে তার কোঁচার খুঁট গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করলে আবার। বললে, 'গলায় কাপড় দিয়ে বলে যাচ্ছি ভাই, নিশ্চয় যেও। না এলে বড় দুঃখ পাব। সন্ধ্যেবেলায় একটু সকাল-সকাল আসা চাই। অনেক কাজ এখন আমার। চলি ভাই।'

নন্দ যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মত চলে গেল। আমরা—বীরু, তিনু আর আমি—আমরা সেই ঝড়ের ধাক্কায় যেন সমূল বৃক্ষের মতো ছিটকে পড়েছি।

অনেকক্ষণ পরে বীরু বললে, 'কি রে কী বুঝছিস ?'

'ভেড়া বনে গেলুম মাইরি, বুঝবো আবার কি ?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দিলে তিনু।

'যাবি নাকি ?' প্রশ্ন করলুম আমি।

বীরু ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করলে, বিঁড়ির ধোঁয়ায় আরও ধোঁয়া করে তুলল আমাদের মন। অবশেষে কম্যান্ড করল। 'আলবত যাবো। বেশ একটু

আগেই যাব। জিনিকে গিয়ে বোঝাব, এখনো সময় আছে। আল্লা নন্দকে বিয়ে করা আর গলায় দড়ি দেওয়া সমান।

'বুঝিয়ে লাভ ?' আমি মিয়ানো গলায় বললুম।

'লাভ আবার কি! এটা আমাদের মর‍্যাল রেস্পন্সিবিলিটি। কর্তব্য। বরফসাহেবের মেয়ে জিনি, যার পায়ের নখের যুগ্যি নয় নন্দ, তাকে সে বিয়ে করবে ? কেন ? বিয়ে করার মতো আর ছেলে নেই নাকি ?' বীরু অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'কিন্তু—' তিনু আমতা আমতা করে বললে, 'জিনি যদি আমাদের কথা না শোনে ?'

'না শুনে যাবে কোথায় ? সাক্ষী—রেজেস্ট্রি ম্যারেজের সাক্ষী কারা ? আমরা তিনজনেই তো। তবে বাছাধন—হোয়ার টু গো ?' বীরু চোখ টিপে ভুরু নাচালো, 'আজ সন্ধ্যেয় গ্র্যান্ড একটা থিয়েটার হবে রে, পেঁচো। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—নন্দবেটা হাতে-পায়ে ধরছে আমাদের, জিনি হাউমাউ করে কাঁদছে'—বীরু সিনেমা-থিয়েটারের ভিলেন নায়কের মতই মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠল।

মরাল রেস্পন্সিবিলিটি পালন করার মহান দায়িত্ব নিয়ে এবং মজা দেখবার অসীম আগ্রহ সাথে করে আমরা তিন বন্ধু বেশ সেজেগুজেই সন্ধ্যের গোড়াতেই বেরিয়ে পড়লাম।

জিনির বাড়ির কাছে পেঁছে দেখি—দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে জোর একটা আলোর রোশনাই উঁকি দিচ্ছে। কড়া নাড়বার জন্যে হাত বাড়াতেই দরজাটা খুলে গেল। খোলাই ছিলো দরজা, ভেজানো ছিলো আর কি। মাথা বাড়িয়ে আমরা দেখলুম—উঠোন ফাঁকা, বারান্দাটুকুও। ঘরের ভেতরে বাতি জ্বলছে।

গলা পরিষ্কার করে বীরু ডাকল, 'নন্দ ?'

ডাকের সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো জিনি। দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'তোমরা এসে গেছ ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো—ঘরে চলো।'

বারান্দায় জুতো খুলে রেখে আমরা ঘরে গিয়ে বসলাম। একটা তক্তপোশের ওপর সতরঞ্চি আর নকশা-কাটা সুজনি বিছিয়ে বসবার জায়গা করেছে নন্দ। জাপানী কাঁচের প্লেটে একরাশ বেলফুল। পাশেই একটা পানের ডিবে, সিগারেটের প্যাকেট। ঘরের এক কোণে টুলের ওপর পেট্রোম্যাক্স বাতিটা জ্বলছে নীলচে আভা ছড়িয়ে। ঘরটা আমরা নজর করলুম চোরা চোখে চেয়ে চেয়ে। নিরাভরণ ঘর। টুকিটাকি ক'টা জিনিস। একটা শুধু ছবি দেখলাম দেওয়ালে। মনে হল—বরফসাহেবের ছবি।

ঘর ঢুকে জিনি বললে, 'তোমাদের জন্যে চায়ের জল চড়িয়ে এলুম। একটু চা খাও, কেমন ? সবে সন্ধ্যে।'

'নন্দ কই ?' বীরু প্রশ্ন করলে।

হীরাপুরে গেছে। এখুনি আসবে।' জিনি কেমনভাবে যেন হাসল। সলাজ হাসিই বোধহয়।

কথা যেন আর এগোচ্ছে না। চুপচাপ। অস্বস্তি বোধ করছি সকলেই। জিনি বোধহয় অবস্থা বুঝেই বললে, 'তোমরা বসো। চা-টা নিয়ে আসি।'

জিনি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি ফিসফিস করে বললুম, 'জিনিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, না ?'

তিনু বললে, 'খাসা দেখাচ্ছে।'

শুধু বীরু কিছু বললে না।

সত্যিই জিনিকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল। অমন ধবধবে রঙ যার, অমন যার মুখচোখ দেহের বাঁধুনি, তাকে টকটকে লাল শাড়ি-ব্লাউজে পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোয় যে ভাল লাগবে দেখতে, এ আর নতুন কথা কি। জিনি আজ খোঁপাও বেঁধেছে দেখলুম, খোঁপায় গুঁজেছে দুটি বেলের কুঁড়ি। এই প্রথম দেখলুম, বিনুনি ছেড়ে জিনি খোঁপা বাঁধলো।

মুগ্ধ গলায় বললাম আমি, 'নন্দর ভাগ্যটা ভালো।'

কথাটা বীরুর কানে গেল। বীরু তাকাল আমার দিকে উগ্র দৃষ্টিতে, ফিসফিস করেই বললে, 'দেখা যাক্ ভাগ্যটা'—একটু থেমে আবার—'জিনি চা নিয়ে এলে কথাটা আমি তুলবো, তোরা যোগান দিবি। হুঁশিয়ার। বাজে কথাটি কেউ বলবে না। গ্রেভ্ হতে হবে।'

জিনি আমাদের হাতে একে একে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

আমি, তিনু চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছি—এইবার বীরু শুরু করবে। বীরু আর শুরু করে না। চায়ের কাপ শেষ হল। আমরা আড়চোখে বীরুকে দেখছি। শেষ পর্যন্ত বীরু কি নার্ভাস হয়ে পড়লো !

জিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে, বীরু হঠাৎ কথা বললে, 'তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন বসো না ? এখানেই বসো।' বীরু সরে বসল। আমরাও সরে বসলুম।

জিনি বসল। বীরু একটা সিগারেট ধরাল। কড়িকাঠের দিকে তাকাল। চাইল আমাদের দিকে, জিনির দিকে। তারপর খুব আস্তে মোলায়েম সুরে বললে, 'এটা কি ঠিক হলো ?'

'আমায় বলছো ? জিনি নরম চোখ তুলে প্রশ্ন করল।

বীরু মাথা নাড়ল।

'কিসের কথা বলছো ?' জিনি জিজ্ঞাসা করলে।

'কিসের আর—এই ইয়ের, এই ব্যাপারটার—'বীরুর গলায় যেন কথা যোগাচ্ছে না। তিনু বীরুকে সাহায্য করলে।

'বীরু তোমাদের বিয়ের কথাটা বলছে।'

জিনি বীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'বিয়েটা কি হল ?'

'ঠিক হল না।' বললুম আমি, 'নন্দ তোমার ঠিক ম্যাচ নয়—মানে মানায় না।'

'কেন ?' জিনি তখনও ঠোঁট টিপে হাসছে।

'কেন কি, মানায় না, মানানসই নয় বলে। হাজার হোক, নন্দ একটা থার্ড ক্লাস লোক, আলুঅলা। কি তার স্ট্যাটাস ? ভদ্রসমাজে ওর জায়গা নেই। বীরু উত্তেজিত হয়েছে দেখলাম।

জিনি সব শুনল। উঠল তক্তপোশ থেকে। তাকাল আমাদের দিকে একে একে। ঠোঁটের কোণে তার হাসি নেই, আর তার বদলে আশ্চর্য একটা কাঠিন্য। খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে জিনি জবাব দিল, 'ভদ্রসমাজে জায়গা তো আমারও নেই।'

'কে বললে ?' বীরু আপত্তি জানাল, 'তুমি আমাদের বন্ধু—বরফসাহেবের মেয়ে, আলবত তোমার ভদ্রসমাজে জায়গা আছে।'

'নাকি ? তবে, তবে তোমরা অভদ্র, বাজারের আলুঅলা একটা মাতালকে রাত-দুপুরে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে গেলে কেন ?' জিনির গলার স্বর থরথর করে কাঁপছে।

আমরা চুপ। বিহ্বলবাক্। বীরু অনেক কষ্টে দোষ কাটাবার চেষ্টা করলে, 'অন্যায়টা কি করেছি ? আমরা শুনেছি, নন্দ—নন্দ তোমার কাছে আসত।'

'তোমরাও তো আসতে। তা বলে তোমরা—' জিনির বাঁকা হাসি ধারালো ছুরির মতো আমাদের অতি গোপন মনোবাসনাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য আলোয় উন্মুক্ত করে দিল।

তিন বন্ধু আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চোখ নীচু করলাম।

'বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, জিনি।' বীরু উঠতে উঠতে বলল, 'আর কারুর কথা জানি না, আমি কোনদিন তোমার ঘরে ঢুকি নি। দরজার বাইরেই থেকেছি। দেখতে আসতুম, তোমার লীলাখেলা কেমন চলছে।'

'অযথাই ?' জিনি এবার জোরেই হাসল শুধু।

'অযথা-ফযথা জানি না। তোমায় দেখা—মানে তুমি যাতে খারাপ হয়ে না যাও, তা দেখা আমার কর্তব্য—মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি বলে ভেবেছি।'

বীরুর কথা শেষ না হতেই তিনু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আমিও তাই। তোমার ঘরে ঢোকার জন্যে আসতাম না। অত ছোটলোক ভেব না আমায়।'

এবার আমার পালা। আমিও উঠতে উঠতে বললুম, 'সকলকে সমান ভেব না, জিনি। আমি নন্দ নই।'

'জানি। নন্দও তোমাদের মতন নয়। তোমরা অনেকবার এসেও দরজা খোলা পাও নি। সে একবার এসেই—।'

আমরা তিনজনে ততক্ষণে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি। ঠিক এই সময় দরজা দিয়ে চীৎকার করতে করতে নন্দ ঢুকল। সঙ্গে তার দুই ভদ্রলোক। একজন তাব মধ্যে উকিল। চিনি তাঁকে। এ পাড়াতেই থাকেন।

'তোমরা এসেছ ভাই, কি খুশীই যে হয়েছি! কতক্ষণ এলে? বাইরে কেন? চলো, চলো, ঘরের ভেতরে চলো—।' নন্দ আমাদের দু-হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

সমস্ত অবস্থাটা তখন এমনই হয়ে এসেছে যে, আমরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্বাক, বিমূঢ় হয়ে, আর দরদর করে ঘামছি।

শুনলাম, নন্দ বলছে, 'বসুন স্যার—বসুন; বসুন উকিলবাবু, তোমরাও বসো ভাই। স্যার, এরাই আমার বন্ধু, ওরও বন্ধু। এরাই সাক্ষী দেবে।'

'সবই রেডি। তবে আর শুভকাজে বিলম্ব কেন?' বললেন উকিলবাবু।

আমাদের চোখের সামনে পেট্রোম্যাক্সের নীলাভ আলোটা ধীরে ধীরে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে জিনির মুখ, ফুল-কাটা সুজনি, বেলফুলের প্লেট্। দেখছি সেই স্যারকে—ধানবাদ কোর্টের কোনো হাকিম বা মহকুমা অফিসারকে। কাগজপত্র বেরুল, দু-চারটি প্রশ্ন করলেন স্যার।

'নিন্, সই করুন আপনারা।' উকিলবাবু আমাদের দিকে তাঁর কলম এগিয়ে দিয়ে আহ্বান জানালেন।

আমরা তিনজনে তিনজনের দিকে তাকালাম। আমার বুকটা ধকধক করছে তখন। এই বুঝি হল। এখুনি ঘরের সমস্ত আলো দপ্ করে নিবে যাবে। ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরবে নন্দ; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে জিনি।

অপেক্ষা করছি শেষ পরিণতিটুকুর জন্যে—বিরুর দিকে তাকিয়ে।

বীরু আর একবার আমাদের দিকে তাকাল। তাকাল জিনির দিকে। তারপব হঠাৎ এক লাফে ঘবের বাইরে এসে সোজা রাস্তা ধরে ছুট্।

আমরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। নন্দ, উকিলবাবু এবং স্যারও। পর-মুহূর্তে ব্যাপারটা অনুধাবন করেই তিনু আর আমি বীরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম।

নন্দ যখন হেই হেই করছে, ততক্ষণে আমরা রাস্তায়—বীরু অনেকটা আগে, আমি আর তিনু একসাথে ছুটছি প্রায়।

গলি পেরিয়ে বাজারের বড় রাস্তা—সেই রাস্তার অনেকখানি ছুটতে ছুটতে এসে আমরা দাঁড়ালাম অন্ধকারে—শিবমন্দিরের পাঁচিলের গায়ে।

সকলেই চুপ। কেউ কোনো কথা বলছি না; বলতে পারছি না। হাঁপাচ্ছি আব

ঘাম মুছছি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশ্রী একটা অস্বস্তি জমে উঠতে লাগল আমাদের মধ্যে। সবাই হয়ত মনে মনে জিনির বিবাহবাসরের কথা ভাবছিলাম। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বীরু বললে, 'তোরা যা তিনু, আমি একবার স্টেশন যাব। বম্বে মেলের আর-এম-এসে একটা জরুরী চিঠি ফেলার আছে।' কথা শেষ করেই বীরু আবার বাজারের পথ ধরে হনহন করে এগিয়ে গেল।

বীরুর যাবার পথে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনু যেন কি ভাবলে। বললে, 'এখনও নিশ্চয় ন'টা বাজে নি—কি না রে, পাঁচু। যতীনবাবুর বাড়িটা একবার ঢু দিয়ে আসি—কি যে করছেন ভদ্রলোক চাকরির অ্যাপ্লিকেশনখানা নিয়ে।' কথার শেষে তিনুও অপেক্ষা না করে শিবমন্দিরের বাঁ দিকের পথ ধরল।

আমি একা। বীরু, তিনুর যাবার পথে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল আমার। পা-পা করে এগিয়ে চললাম। কোথায় যাব? কোথায়? সামনেই ম্যাক্ সাহেবের বাঙলোর মাঠ। তার টপকে সেই মাঠে গিয়ে বসলাম।

অন্ধকার। জলো বাতাস ভেসে আসছে হুহু করে। ভিজে ঘাসের ঠাণ্ডা লাগছে হাত-পায়ে। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। মেঘ জমছে।

সন্ধ্যেবেলার ঘটনাটাই চোখের ওপর ভাসছে তখনও। দেখছি—সেই ঘর, সেই আলো, জিনি, জিনির খোঁপা, খোঁপার ফুল। কি হল শেষ পর্যন্ত, কে জানে! ভেস্তেযাওয়া বিয়ের বর-কনে নন্দ আর জিনি পেট্রোম্যাক্স নিবিয়ে ধুলোয় বুঝি গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাঁদছে নন্দ, কাঁদছে জিনি—। নাকি অন্য কিছু!

অসম্ভব কৌতূহল হল আমার। জিনিদের বিয়ের বাসরের পরিণতিটুকু না দেখলে যেন সব—সব বৃথা হয়ে যাবে। দোষ কি? কেউ তো আমায় দেখছে না। একবার উঁকি মেরে দেখেই চলে আসব।

উঠে বসলাম। পিছনের পথ ধরে এগিয়ে চললাম জিনিদের গলির উদ্দেশে। গলিটায় পৌঁছানো গেল। অন্ধকার গলি। দু-একজন লোক যাওয়া-আসা করছে। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলুম জিনির বাড়ির কাছে। দরজার একটা পাট ভেজানো। আর একটা দিয়ে আলো আসছে তখনও—সেই নীলাভ আভা। তা হলে? তবে কি নন্দ—? পা টিপে টিপে যেই খোলা দরজার কাছে গিয়েছি, মাথা বাড়াবো—হঠাৎ কে যেন ডাকল নাম ধরে।

চমকে উঠে পালাতেই যাচ্ছিলাম—দেখি, পাশে বীরু।

'তুই?' আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

'তিনুও এসেছে, আস্তাবলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।'

তিনু এগিয়ে এলো। আমরা তিনজনেই দাঁড়ালাম জিনির দরজার সামনে।

'চল্—ফিরে চল্।' বললে বীরু।

'ওদের কি হল ?' প্রশ্ন করলুম আমি।
'যা হবার।' গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে বীরু, 'উকিল থাকতে আবার বিয়ের ভাবনা। ব্যাটা নন্দর ওপর যা রাগ হচ্ছে—যত সব বাজে লোক ধরে এনে বিয়ের সাক্ষী দেয়ালে শেষ পর্যন্ত। কি হয়েছিল একটু সবুর করতে। আমি তো একটু পরেই এলাম।'
'তুই বুঝি অনেকক্ষণ এসেছিস ?' আমি প্রশ্ন করলুম।
'এলাম কি করবো ? তোদের ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, কাজটা ঠিক হয় নি। আফ্‌টার অল্‌ নন্দ, জিনি দুজনেই আমাদের বন্ধু—একটা মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আছে তো ! সইটা করেই দি !' গম্ভীর সুরে বলল বীরু।
'যা বলেছিস, ভাই। আমারও তাই মনে হল। শেষ পর্যন্ত এলুম সই করতেই,' বললে তিনু।
'আমিও ওই কথাই ভেবেছি,' বীরুর দিকে তাকিয়ে বেমালুম বলে দিলাম, 'সইটা করেই কেটে পড়তাম।'
তিন বন্ধু ফিরে চললাম। আমরা এসে মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি পালন করার আগেই ইম্‌মরালের দল এসে সেটা পালন করে গেছে। জিনি আর নন্দ এতক্ষণ নীলাভ আলোর তলায় নক্‌শা-কাটা সুজনির ওপর বসে হয়ত হাসছে কিংবা—!

পাঁচুদা গল্প শেষ করে নীরবে হাসলেন শুধু।

[দেশ : নভেম্বর ১৯৫১]



শালবনীর মেলায় আবার দেখা।

ডাক শুনে মুখ ফেরাতেই কে যেন খপ্ করে হাত ধরে ফেলল কেষ্টর। কার্বাইডের মরা-জ্যোৎস্নায় সে-মুখের দিকে তাকিয়ে কেষ্ট অবাক। ঠিক ঠাওর হয় না। এ কে? কাঁচপোকার টিপ কপালে, চোখে কাজল, পরনে রঙীন শাড়ি! সাজনী নয় তো? সাজনীর কথা মনে হতেই গায়ে-কাঁটা কেষ্ট দাঁড়িয়ে থাকে, চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নেবার।

হাত ছাড়ে না টিপ্-কপালী। কাজল-চোখ আরও ডাগর করে, কথার সুরে টান দিয়ে বলে, 'ভালছিস কি? লারছিস ঠাওরাতে? আমি রে, আমি—কিষ্টো, গঙ্গা-মণি।'

নামের চেনায় নিমেষে মনে পড়ল গঙ্গামণিকে। কিন্তু ঠিক চেনা গেল না।

মেলার বাইরে এসে কার্বাইডের আলো-মোছা, কার্তিক-পূর্ণিমার কুয়াশা-ভেজা জ্যোৎস্নায় গঙ্গামণিকে নিষ্পলক নয়নে দেখতে থাকল কেষ্ট।

হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল গঙ্গামণির, কেষ্ট তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। খেয়াল হতেই সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাল গঙ্গামণি। বললে, 'রা কাড়ছিস না যে—? চিনতে লারলি?'

কেষ্ট তবু চুপ। একটু পরে বললে, 'তুই হেথায় ক্যানে?'

'বিটিছেলা আমি, জুয়া চালতে আসি নাই। মানসিক দিব যে, তাও লয়। পয়সা কুথায় রে কিষ্টো, ফুটা-কড়িও সাথে নাই।' একটু থামে গঙ্গামণি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি লেগেছে। শাড়ির আঁচলটা আরও ঘন করে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'সাধ তো কতো লয় মনে, পূজাথানে আজ মানসিক দিয়ে পের্থনা করি—রাত পোয়ালে ভাতে-পাতে হয় ঠাকুর গো, আর কিছু লয়।' গঙ্গামণি কথার শেষে হঠাৎ থামল। দীর্ঘ করুণ একটা টান দিয়ে দীর্ঘনিঃবাস ফেলল।

কেষ্ট তাকাল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গঙ্গামণির চোখের কাজল, কপালের টিপ বুঝি ধুয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। কৃশকরুণ কতকগুলো রেখা কুঞ্চিত, শীর্ণ, অস্থিসর্বস্ব একটি মুখকে ফুটিয়ে তুলছে—সেই আলোয়, সেই হাওয়ায়।

গঙ্গামণি গলার সুর আরও করুণ করে আবার বললে, 'বুঝে দ্যাখ্ ক্যানে রে—চাঁপার ঠেঙে সাজ নিলাম, শাড়ি নিলাম হাতে-পায়ে ধরে।' গঙ্গামণি আঁচলে বাঁধা শালপাতার মোড়ক খুলে ধরল, 'মাথা কুটে তার ঠেঙে পানও লিয়েছি দশ খিলি—দশ গণ্ডা পয়সা দিতে হবে কাল সূয্যি ওঠার মুখে-মুখেই,—কিন্তুক এক

খিলি পান লিলে না কোন হতভাগা।' গঙ্গামণির সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়ায়, না উত্তেজনায়, কে জানে। কথাটাও ও শেষ করল ঠিক মিনমিনে সুরে নয়, বরং তিক্ত কর্কশভাবেই।

শালপাতায় মোড়া পানের খিলির দিকে বোকার মতো চেয়ে থাকল কেষ্ট। একেবারেই বোবা হয়ে।

অনেকক্ষণ পরে কেষ্ট জানতে চাইল, 'থাকিস কুথায় আজকাল?'

'ভাগাড়ে। তিক্ত সুরেই জবাব দিল গঙ্গামণি, 'কপাল বটেক্ আমার, পাটরানী' কপাল রে কিষ্টো—আজ হেথায় কাল হোথায়, বেউ দিলেক শুতে তো ঢাকায় শুলোম, না দিলেক তো নালায়। শেয়াল-কুকুরের পারা দিন কাটাই।'

গঙ্গামণি থামল। তিক্ত সুর ওর মুখকে আরও বিকৃত, বীভৎস করে তুলেছে।

কেষ্ট চুপ। মনে মনে তার অনেক কথাই জমছে আস্তে আস্তে। গঙ্গামণির চেনা রূপটাও সেই সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার কাছে।

কেষ্টর শীত করছিল। পা পা করে সে মেলার দিকে আবার এগুতে লাগল। গঙ্গামণিও।

মেলার প্রায় কাছাকাছি এসে গঙ্গামণি প্রশ্ন করলে, 'এদিক পানে যাস কুথায়?'

'ঠাণ্ডা লাগে বড়। উই যে কোণে চায়ের দোকান দিয়েছে শেতল—দু খুরি গরম চা খেয়ে লি উর দোকানে।'

'মন্দ লয়!' গঙ্গামণিও চা খাবার লোভে আনমনা হয়ে উঠল। বললে, 'তুই ক্যানে চায়ের দোকান দিলি না, কিষ্টো? দু পয়সা তুর আসতো।'

সে কথার কোন জবাব দিল না কেষ্ট।

দোকানের বাইরে, একটু তফাতে চায়ের খুরিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে গঙ্গামণির লোভ বাড়লো আরও। বললে, 'বুঝলি নাকি রে, কিষ্টো—তুর ই চা-পানিতে পেটের জ্বলনটা আগুনে ধরাই দিলেক্।' একটু থেমে আবার, 'বুঝ্ ক্যানে, চারবেলা পেটে ভাত লাই। সে তুর কুন্ সকালে দুটা ফুলোরু খেলোম, সব্বোনেশে খিদায় পেট দুমড়ায়, তিতা জল কাটে মুখে।' কথার মাঝে থেমে গঙ্গামণি সটান হাত পাতলো। কাকুতি করে বললে, 'দে না ক্যানে গুটেক পয়সা। মুড়ি-চিঁড়া কিনে খাই।'

কথা বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না কেষ্ট। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে গঙ্গামণির হাতে দিল।

সিকি তো নয়, যেন সাত রাজার ধন এক মানিক—খুরির গরম চা-টুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে গঙ্গামণি সিকিটা মুঠির মধ্যে জোরে চেপে ধরল। শীতের কাঁপুনির মধ্যেও বেশ একটু গরম পেয়েছে সে। চায়ে, না সিকিতে, কে জানে!

মেলার এদিক-ওদিক তীক্ষ্ন চোখে নজর করে গঙ্গামণি দ্রুতনিশ্বাসে বলে, 'তু

দাঁড়া কিন্টো হেথায় । হুই একটা ময়রার দোকান দেখি খুলা আছে । চট্ করে এলাম আমি ।'

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখেই গঙ্গামণি হাওয়ার বেগে ছুট দিল । চোখের পলকে অদৃশ্য ।

সেদিকপানে তাকিয়ে গঙ্গামণিকে হঠাৎ চেন্না-দেওয়া জিনিসের মতোই চেনা গেল । স্পষ্ট, সহজভাবেই । কার্বাইডের ফ্যাকাশে আলো-ছড়ানো এই মেলার ভিড়েই । মনে পড়ল কেষ্টর সেই পুরনো গঙ্গামণিকে ; সেই চিল-চোখ, হাভাতে, হ্যাংলা, লোভী, দস্যি মেয়েটাকে । আর মনে পড়ল গত সনের কথাও । যে-সনে আকাল হল ; চাল গেল, চুলো গেল গঙ্গামণিদের ; জাত গেল, ধর্ম গেল ; প্রাণও । জলের মতোই মনে পড়ছে সে-সমস্ত কথা ।

চাঁচুরিয়াতেই প্রথম দেখা, গঙ্গামণি আর কেষ্টর । তখন ওদিকপানে আকাল লেগেছে । চালের আকাল । আকাল যদি চালের হয়, বাকি থাকে কি ? গোড়া শুকোলো তো গাছ মরল, ফুল-পাতা মুড়োল ।

তেমনি ! রাক্ষুসে একটা টান দিয়ে কেউ যেন ওদের পায়ের মাটি ধসিয়ে দিলে ; ছুঁড়ে ফেলে দিলে মাথার চালা । দলে দলে গঙ্গামণিরা বেরিয়ে পড়ল গ্রাম ছেড়ে, ভিটের-ভিটের পিত্তবগির থুথু ছিটিয়ে ।

দেড়বিত্তের শহর চাঁচুরিয়া । সেই শহরই দেখতে দেখতে ভরে গেল হাভাতেদের ভিড়ে । এ শহরেও তখন চাল বাড়ন্ত । ইট-টালির কারখানার স্টোর থেকে চুপি-চুপি চড়া দরে চাল এনে আরও চড়া দরে বাজারে বিক্রি করছে মহাজনের ছুটকো দালালরা । রেল-রেশনের গুদাম থেকেও আসছে চোরা পথে ; সে চাল তো চাল নয়, যেন সাদা হাড়-বাঁধানো পালিশ-দেওয়া খুরো গুঁড়ো ।

জনমানুষের কমতি নেই চাঁচুরিয়ায় । যারা আছে, তাদেরই ভাতের পাতে টান , তার ওপর এই নতুন উপসর্গ । ঘরের চৌকাঠে ওদের মাথা ঠুকতে দেখলেই গৃহস্থজন খেঁকিয়ে ওঠে, ওরে, ও হারামজাদার দল, বলি চাল কি এখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি হল ?

প্রথম-প্রথম ওরাও জবাব কাটতো । বলত, গাঁয়ে শুনলাম, হেথা রাজায় গোলা বাঁধলেক ধানের । ঠাকুর গো, দু মুঠা ভাতের লেগে এলাম হেথায় । ইস্‌টিশনের মালগুদামে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল, কারখানার ফটক-ঘরে বস্তা বস্তা চাল—আপন চোখে দেখলাম, ঠাকুর । হেথা আকাল হবেক ক্যানে কও ?

ঠিক । চাঁচুরিয়াতে রাজায় গোলাই বেঁধেছে বটে । তবে সে গোলাতেই যা না, হতভাগার দল । মরতে বাড়িতে, পথে-ঘাটে পেট চিতিয়ে পড়ে থাকিস কেন ?

পড়েই থাকে ওরা । পথে, ঘাটে, পাথর-বাঁধানো মালগুদামের রাস্তায়, স্টেশনের

ওভারব্রিজের তলায়। রোদ্দুরে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, কলেরা-বসন্তর মধ্যেই।
দিন যায়। দু-দশ জন সরে পড়ে, রেলের চাকার তলায় গলা দেয় ক'জন, একদল যায় কলেরায়, একদল বসন্তে, না খেয়ে-খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো কুৎসিত, নগ্ন ধড়টাকে রাস্তায় ফেলে রেখে কেউ কেউ আবার স্বর্গবাসী হয়।
তবু যদি ওরা একসাথে সব ক'টা গিয়ে দামোদরের জলে ডুবে মরে, কি অন্যত্র চলে যায়, যেখানে রাজায় ধানের গোলা বাঁধেনি! তা যাবে না।
এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, হাড়গিলে রুগ্ন গরুর মতো ধুঁকে ধুঁকে শ্বাস টানবে, কথা বলবে, কাঁদবে। ঠিক মনে হবে, কাঁচা পথ দিয়ে বলদটানা গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে—কাতরানো, কর্কশ, করুণ। ওরা কচ্ছপের মতো মুখ লুকিয়েছে বুকের তলায়। গায়ে চামড়া-পোড়া গন্ধ।
সারা শহরটা ওরা বিষিয়ে দিলে। আবর্জনায়, নোংরায়, মলমূত্র আর প্রকাশ্য ব্যভিচারে।
'টাউন রেস্টুরেন্টের' টেবিলে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট সবই দেখতো। আজ তিন বছর সে এখানে—এই চাঁচুরিয়ায় চায়ের দোকানে কাজ করছে। মালিক বদল হল দোকানের, কলি ফিরল, সাইনবোর্ড উঠল মাথায়, টেবিল-চেয়ারও এলো—কেষ্ট কিন্তু সেই কেষ্টই। তার আর কোথাও বদল নেই। সেই ময়লা নীল হাফপ্যান্ট আর আধহাতা গেঞ্জি। এই চায়ের দোকানে আগে খদ্দের ছিল না, এখন খদ্দেরের ভিড় কত। সকাল থেকে চা দিয়ে দিয়ে, মামলেট ভেজে কেষ্টর হাতটাও অবশ হয়ে আসে আজকাল। নতুন একজন কারিগর এসেছে দোকানে। এতদিন একলাই ছিল কেষ্ট। এখন দু'জন। নতুন কারিগর চপ-কাটলেট ভাজে, মাংস রাঁধে, ডিমের ঝোল।
কোথায় ছিল এতদিন এইসব খদ্দেররা? চপ কাটলেট আর ডিমের ঝোল যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়—সিগারেট ফোঁকে, চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলে? চোখের টোপ নিয়ে বসে আছে সর্বক্ষণ?
তাজ্জব লাগে কেষ্টর। সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছেলে—চায়ের লিকার দেখে দেখে আর কাপ ধুয়ে ধুয়ে যার মনটাই জলো-জলো হয়ে থাকল, সেই কেষ্ট ভেবেই পায় না, চালের আকালে দেশটাই যখন জল-ভিক্ষু চাতক পাখির মতো শূন্যে চোখে চেয়ে রয়েছে, তখন এই বাবুরা কেমন করে, কোথা থেকে আসে, চকমক করে, কাটলেট মুখে পুরে দিব্যি চিবোয়, মাংস খেয়ে হাড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পথে। ঘূর্ণি বয়ে যায় হাভাতেদের সেই হাড় কুড়োনোর পাল্লায়।
ভাবতে বসলে কেষ্টকে 'সুসমাচার' খুলে বসতে হয়। মথি, যোহনের সুসমাচার আজও আছে কেষ্টর কাছে। আছে একটা ছেঁড়া-ফাটা বাইবেল। কাজের শেষে রাতে, দোকান বন্ধ হলে রেস্টুরেন্টেরই একচিলতে পর্দা-ফেলে আড়াল-করা রান্নাঘর

থকে কেষ্ট তার বিছানাপাটি নামিয়ে নিয়ে বেঞ্চি জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ে। তখন কেরোসিনের কুপি। সেই কুপির আলোয় কেষ্ট তন্নতন্ন করে খোঁজে মথি, লূক, যোহনের সুসমাচারের কোথায় আছে এদের কথা। এরা—যারা চাঁচুরিয়ায় এসেছে ক্ষুধার তাড়নায়, আর ওরা—যারা ডিমের লালচে ঝোল চামচে ডুবিয়ে হুসহুস করে খায়।

কুপির আলো ধরে কেষ্ট যীশুর ছবিও দেখে। মিশনারি থেকে দিয়েছিল কবে, কোন্ যুগে, সেই ছেলেবেলায়—কেষ্ট যখন মিশনারির বাগানে ছিল, কাজ করত মালিদের সাথে। সে ছবি আজ কালিতে-ধুলোতে ময়লা, বিবর্ণ! কিন্তু তবু আছে—কেষ্টর কাছে, রেস্টুরেণ্টের খুপরিতে দেওয়ালে আঠা দিয়ে আঁটা।

মাথায় কাঁটার মুকুট, কপালে রক্ত-বিন্দু—করুণ নেত্র, যীশু চেয়ে আছেন ঊর্ধ্ব-পানে। খুপির শিস্-ওঠা লালচে আলোতে সে মুখ, সে চোখ, সে নগ্নগাত্র যীশু কেষ্টর কাছে আজকাল আরও রহস্যময় মনে হয়।

আঠারো বছরের কেষ্ট—ভাল করে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে অরফ্যানেজে মানুষ মিশনারি কুঠিতে গতর দিয়েছে, রুটি খেয়েছে, লাল টালি ছাওয়া গীর্জেয় অর্গ সুরে সুরে প্রেয়ার করেছে ঠোঁট নেড়ে—সেই কেষ্টপদ দাস অবশেষে বুঝি ,ই। সান্ত্বনা খুঁজে পেল। ঊর্ধ্বনেত্র যীশুর ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে কেষ্ট যেন পারল, এ অন্যায়ের বিচার স্বর্গে। অনাথ!

আর এই যে তছনছ অবস্থা, কদর্য ভিড়, খেয়োখেয়ি, ঘিনঘিনে নোংরামি, এখানে আর কিছু নয়—অপদূতে-পাওয়া অবস্থা। বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত শয়তান অট্টহাস্য হাসছে। তাদের দাপটে মেঘ হল না আকাশে, বৃষ্টি নেই, জল নেই। শয়তানদের নিশ্বাসে ধানের শীষ শুকিয়ে গেল, ফসল ফুরাল মাঠে-মাঠে।

এমনই হবে না? আকাশ থেকে আগুন আর গন্ধকের বৃষ্টি নেমে এসে প্লাবন হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে পাপ; তবেই মনুষ্য-পুত্র আত্মপ্রকাশ করবেন।

সেই আগুন আর গন্ধকের বৃষ্টিতেই না চাঁচুরিয়ায় প্লাবন ডেকেছে। তীব্র জ্বলনে, কটু গন্ধে এর আকাশ-বাতাস ভরা। সাত শয়তানের ছিটিয়ে দেওয়া আবর্জনায় মানুষের গায়ে নোংরা, মনে নোংরা।

ঠিক এমন সময়ই গঙ্গামণির সঙ্গে দেখা। চাঁচুরিয়া যখন আর চাঁচুরিয়া নয়; নরক। নরক।

ভোলাবাবুদের গদিতে চায়ের অর্ডার ছিল। বাবুদের চা খাইয়ে হাতের আঙুলে এঁটো চায়ের কাপ আর কেটলী ঝুলিয়ে কেষ্ট বাজারের রাস্তা দিয়ে আসছে। এমন সময় চোখে পড়ল দৃশ্যটা। কালীময়রার দোকান থেকে তার কর্মচারী নিতাই এঁটোকাঁটার আর ছেঁড়া-পাতার জঞ্জাল ফেলা টিনটা হাতে করে রাস্তায় নামতেই

চারপাশ থেকে ভিখিরী ছেলে-ছোকরাগুলো তাকে ঘিরে ধরল। রাস্তার ওপাশে নর্দমা। ওপারে গিয়ে জঞ্জালগুলো ফেলে দেবে নিতাই। কিন্তু কার সাধ্য এক পা এগোয়। ছিনে জোঁকের মতো তাকে আটকে ধরেছে।

গালাগাল দিতে দিতে নিতাই দু-এক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় কে বুঝি বেকায়দায় পথ আটকাতে গিয়ে নিতাইয়ের পায়ে পা জড়িয়ে ফেলল। টাল সামলাতে গিয়ে নিতাইয়ের হাতের টিন ছিটকে পড়ল রাস্তায়, ঠিক মাঝ রাস্তাতেই। মার-মুখো হয়ে নিতাই ঘুরে দাঁড়াতেই ভিখিরীর বাচ্চাগুলো দু পা হটে এলো। আবার এগুবে এগুবে করছে, এমন সময় ক'পা দূরেই মাল বোঝাই লরী। সরে গেল নিতাই, পথ ছেড়ে পালাল ভিখিরীর বাচ্চাগুলো। রাস্তা ফাঁকা। উচ্ছিষ্ট ছিটোনো, পাতা ছিটোনো টিনটা পড়ে আছে মাঝ রাস্তাতেই। হঠাৎ কোন এক অদৃশ্য কোণ থেকে একটা চিল ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই উচ্ছিষ্ট ভর্তি টিনটার ওপরেই।

চেঁচিয়ে উঠল পথ চলতি লোকজন। মালগুদোমের রাস্তা থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরে সবেমাত্র গিয়ার বদলেছিল লরীটা। পুরোদমে ব্রেক কষলো। চাকা ঘষড়ানো 'টাঙ্-', কর্কশ, আওয়াজ উঠল, বুক কাঁপানো আওয়াজ।

তিন ব

হল দো কিন্তু অবাক। উচ্ছিষ্ট-ভর্তি টিন সামনে ছড়ানো ; যা পেয়েছে, সপেট-

কিন্তু আঁচলে তুলে, হাতে পুরে চোখের নিমেষে লিকলিকে বেতের মতো মেয়েটা

আর ও। ঠিক যেন একটা চিল. চোখের পলকে ছোঁ মেরে আবার উড়ে গেল। আশ-

ভি পাশে কোথাও তার চিহ্ন নেই।

কেষ্টর বুক ধক ধক করে উঠেছিল। সে কাঁপন থামল দোকানে ফিরে জল খেয়ে।

পরের দিন আবার দেখা। ওভারব্রিজের তলায়, এক্কাগাড়ির স্ট্যাণ্ডে। দেখার সাথে সাথেই চিনতে পারল কেষ্ট। সেই কালো চিল।

স্টেশন থেকে ফিরছে কেষ্ট টিকিট বাবুদের চা-টোস্ট খাইয়ে, খবরের কাগজ আর পাউরুটি-বিস্কুটের হাত-ঝোলানো ঝুড়িটা নিয়ে।

কেষ্টর হাতের ঝুড়ির দিকেই তাকাচ্ছিল মেয়েটা সোজাসুজি। রোজই হয়তো তাকায়। কিন্তু আগে কোনদিন কেষ্ট এই সাধারণ ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে নি। আজ করল।

দাঁড়াল কেষ্ট। তাকাল একটু। তারপর কাছে ডাকল।

কালো চিল কাছে এলো। একেবারে গায়ের কাছেই।

'তুর নাম কি ?' কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

'গঙ্গামণি।' চট্‌পট্‌ জবাব গঙ্গামণির।

'নামটা তো তেমন টগবগে লয়। এলি কোন্‌ গাঁ থেকে ?'

'ধলগাঁ। নদী-পারে ছুণ্টিপুর, তার পাশেই বটে গ।'

'বটেক, ধলগাঁ ?' কেষ্ট এক মুহূর্তে নীরবে কি ভাবল যেন। গঙ্গামণিকে দেখল

নজর করে। কালো চিলকেই। কাঠি গা, তবু গড়নে, চোখে, চুলে ছিটে-ফোঁটা রূপ আছে।

'ধলগাঁ চিনি। দু'কোশ তফাতে গাঁ আমার কাঁকুড়গাছি।' কেষ্ট আবার একটু থেমে প্রশ্ন করলে, 'উদিক পানেও আকাল ?'

কুথায় লয় ?' গঙ্গামণি ধারালো দৃষ্টিতে কেষ্টকে যেন ব্যঙ্গ করে বললে, 'সগ্গ, মত্ত, পাতাল সরবত্তরই। তুর গাঁ আমার গাঁ সতন্তর লয়, পিরথিবী ভরেই আকাল।'

কেষ্ট চুপ। একটু সরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে রেস্টুরেন্টের পাঁউরুটি-বিস্কুটের ঝুড়ি থেকে দুটো মিষ্টি বিস্কুট ফেলে দিয়ে বললে, 'কাল তুই অমন করে গাড়ির সামনে ঝাঁপাই পড়লি যে—ভাগ্যি জোরে বেঁচে গেলি নয়ত কাটা যেতিস। তুর কি ভয় ডর নাই রে ?'

বিস্কুটে দাঁত বসিয়ে গঙ্গামণি ঠোঁট বেঁকালো। জবাব দিলে, 'কাটা পড়লে নিশ্চিন্ত হতুম গ। পেরান গেলে পেট থাকত লাই। পেটের জ্বালা সর্বনেশে জ্বলা; কেউটে সাপের কামড়। সে জ্বলনের কাছে মরণ ডরায়।' কথার শেষে গঙ্গামণি কুকুরের মতো অদ্ভুত এক শব্দ করে হাসল।

গঙ্গামণির সে হাসি কেষ্টর মরমে এসে বিঁধল। ঠাঁই পেল বরাবরের জন্যেই। অন্তরঙ্গ হল এই পরিচয় দিনে দিনে।

কেষ্টর তরফে বলার কথা সামান্য। কেষ্টপদ দাস অল্প বয়স থেকেই অনাথ। মিশনারীদের কাছে থেকেছে, খেয়েছে, পরেছে। তারপর হেথা-হোথা ঘুরে এখানে এলো, চাঁচুরিয়ায় তিন বছর আগে। সেই থেকে সে চায়ের দোকানে কাজ করে। ও কিন্তু কৃশ্চান।

কেষ্টর সঙ্গে ভাব হওয়ার পর গঙ্গামণির কষ্ট একটু তবু ঘুচলো। আগে নিত্য অনশন, এখন তবু টুকটাক জুটে যায় কেষ্টর কল্যাণে। রেস্টুরেন্টেরই আশে-পাশে চিল-চোখে সর্বক্ষণ সে টহল দিচ্ছে। ও এলাকাটা যেন ওর। সেখানে আর কাউকে হাত বাড়াতে দেখলেই চুলোচুলি শুরু করে। এদিকে মালিক আর কারিগরের চোখ বাঁচিয়ে কেষ্ট গঙ্গামণির আঁচলে এটা-ওটা ফেলে দেয়। ফাঁক পেলেই এই দয়া-দাক্ষিণ্য।

রোজকার ব্যবস্থাটা কিন্তু ছিল রাত্রেই, মালিক যখন চলে যায়, কারিগর বিদেয় নেয়, তখন। গলির পথ দিয়ে গঙ্গামণি রেস্টুরেন্টের পেছন দরজায় হাজির।

'কি-ই-ষ্টো, উ কিষ্টো।' আস্তে আস্তে নীচু গলায় ডাক দেয় গঙ্গামণি।

কেষ্ট মুখে কোন শব্দ করে না। নীরবে রেস্টুরেন্টের পড়তি বা বাড়তি মালের খানিকটা জালির ফুটো দিয়ে গঙ্গামণির ভাঙা টিনের থালায় ঢেলে দেয়।

খুশী গলায় গঙ্গামণি বলে, 'তুর মতো মনুষ্যি নাই রে ই জগতে।'

ক'দিনেই গঙ্গামণির লোভ আরও বেড়ে ওঠে, 'উ কিষ্টো, গুটেক মাস দে-না।

কাল তো শুধুই কাদা পারা ঘেঁটানো ঝোল দিলি। ভাত লাই একটুকুনও ?'
নিজের ভাত থেকেই কেষ্ট খানিকটা ভাত দিয়ে দেয়। না বললেও সে যে দেয় না, তা নয়। তবে রোজ হয়ে ওঠে না। মালিক মাপ করে চাল দিয়ে দেয় কেষ্টকে হপ্তাভোরের। আগেভাগে ফুরোলে কিনে খাও।
আশ্চর্য মেয়ে এই গঙ্গামণি। কেষ্ট দেখত আর ভাবত। আর ওর লোভ, পেটের জ্বালা—তা এতো উগ্র, তীব্র যার বুঝি তুলনা নেই। লোভের আভায় গঙ্গামণির চোখ দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলত।
গঙ্গামণিকে দেখে কেষ্টর মাঝে মাঝে মনে হত, মেয়েটা যেন গন্ধকেরই ঝড়। কটু, তীব্র, বিষাক্ত।
তবু গঙ্গামণিকে কেষ্ট ভালবাসত। কেন যে, কে জানে? প্রতিবেশী গ্রামের মেয়ে বলে কি ? না, আরও কিছু ?
এ রকম ভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন। বাধ সাধল গঙ্গামণি নিজেই। তার নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকির করে রেস্টুরেন্টের দরজা ঘেঁষে এসে দাঁড়ানো, আর প্রত্যহ এটা-ওটা চাওয়া সমস্ত ব্যাপারটাকেই ফাঁসিয়ে দিলে মালিকের কাছে। কারিগর ব্যাটা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল আগে থেকেই, ইতর রসিকতাও করত কেষ্টোর সঙ্গে তা নিয়ে। শেষাবধি মালিককে চুগলি। হাতে নাতে বামাল ধরা পড়ে নি কেষ্ট এই যা রক্ষে। শাসানি, ধমকানি খেয়ে কেষ্ট হাত টান করলে।
গঙ্গামণির জিবে তার জমে গেছে ততদিনে। সে ছটফটিয়ে ঘুরে মরতে লাগল রেস্টুরেন্টের এপাশ ওপাশ।

এমন সময় হঠাৎ ক'দিন গঙ্গামণি উধাও। পাত্তা নেই তার। দিন চারেক পরে ওভার-ব্রিজের তলাতেই দেখা।
'হঠাৎ করে গেলি কুথায় তুই ?' কেষ্ট প্রশ্ন করলে।
গঙ্গামণির গায়ে একটা নতুন কোরা শাড়ি। মাথার চুলগুলো তেল-চকচকে।
'চাকরী নিলাম রে, কিষ্টো। বাবুর বাসায়।' খুশীতে গঙ্গামণি ঢলে পড়ছে।
'কোন্ বাবু ?'
'লাম-টাম জানি নাই। উ-ই যে বাবু, তুর দোকানে ঝুড়িঝুড়ি খাবার খেতে আসেক রে। দুবলা গোছের, চোখে কাঁচ, সাদা পারা দেখতে।'
রোগা, চশমাপরা, ফর্সা বাবুটি যে কে, কেষ্ট বুঝতে পারল না প্রথমে! পরে বুঝল বাবু নতুন। একেবারেই নতুন এ শহরে।
'বাবুর বাড়ি কুথায় ?'
'হুই যে, রেলপারে, যেথায় সাঁকো আছে।'
কেষ্ট মনে মনে জায়গাটা ভেবে নিলে। বাবুটিকেও ভাল করে মনে করল

তারপর বললে, 'বাবুর বাসায় কোন্ কোন্ জন থাকে ?'
'কেউ লয়। ফাঁকা।' জবাব দিলে গঙ্গামণি, 'আর ও জাতটাতও মানে না রে, কিষ্টো। আমার হাতের ছোঁয়া খায়। তিনদিন পেটপুরে ভাত খেলাম।' গঙ্গামণি এমন একটা মুখভঙ্গী করলে যেন ওর মুখে এখনো সেই ভাতের গন্ধ।
কেষ্ট একটা বিড়ি ধরিয়ে গঙ্গামণিকে ভাল করে নজর করল আবার। গঙ্গামণির গা-গতরে একটু যেন ঢল নেমেছে আজকাল।
'দেখ, গঙ্গামণি।' কেষ্ট বললে ভেবে চিন্তে, 'এই আকালে শহরে অনেক হুটকো লোক এলো। অনেক ভদ্দরলোক বাবু। কিন্তুক মানুষগুলোকে মনে লয় না। মন্দ ঠেকে। বরং ই তোর পথঘাটই ভাল ছিল, রে।'
কেষ্টর কথায় গঙ্গামণি বাধা দিলে।
'আক্‌বকের কথা কাড়িস না, কিষ্টো। শাড়ি দিলেক, ভাত দিলেক, মানুষটা মন্দ হবে কিসের লেগে ? উ দেবতার বংশ।'
কেষ্ট চুপ করে গেল।
গঙ্গামণির সঙ্গে আর দেখা হল না। সপ্তাহ কাটল, মাস কাটল। সেই ফর্সা মতন চশমা চোখে বাবুটিও আর আসে না। একদিন কেষ্ট গেল গঙ্গামণির খোঁজ নিতে। সাঁকোর কাছে বাড়ি আছে বটে, তবে সেখানে গঙ্গামণি নেই, সেই বাবুটিও না। কেষ্ট ফিরে এলো। মনে পড়ছিল গঙ্গামণির কথা : শাড়ি দিলেক, ভাত দিলেক, মানুষটা মন্দ হবে কিসের লেগে ? উ দেবতার বংশ।
সেই শেষ। কেষ্টর মনে গঙ্গামণির রঙ দিনে দিনে ফিকে হয়ে আসছিল।
হঠাৎ আবার এই নতুন করে দেখা—শালবনীর মেলায়, কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে, কার্বাইডের আলোয়। সেই গঙ্গামণি।
হাত ধরতে কেষ্ট চমকে উঠল।
'পালালি কুথায়, তুই ? খুঁজে খুঁজে হেদায় গেলাম।' গঙ্গামণি আবার এসে কেষ্টর হাত ধরেছে।
পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে কেষ্ট কখন যেন মেলা ছেড়ে ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।
'খেলি তুই ?'
'হাঁ। ফুরাইছিলো সব। চারগণ্ডা পয়সা—কী যে ছাতা-মাথা দিলেক রে কেষ্ট, গলাতেই সেঁদাই গেল। দে বিড়ি দে একটা। শীত করে বড়।'
শীত করছিল কেষ্টরও। গঙ্গামণিকে বিড়ি দিয়ে কেষ্ট আশে পাশে একটু ঢাকা জায়গা খুঁজে নিল।
পাশাপাশি বসল দুজনে, কেষ্ট আর গঙ্গামণি। মন্দিরের ভেতরে তখন পক্ষকাল চাঁদের কলার হিসেব-মত-জ্বালা দেউটিকে ঘিরে শত শত মানসিক করা প্রদীপ

জবলে জবলে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

দুজনেই চুপ করে বসে থাকল। কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে, ফুটফুটে চাঁদের আলো এবার যেন শীতের দাপটে সাদা কাপড় জড়াল গায়। দামোদরের চর থেকে ভিজে গন্ধ ভেসে আসছে। সোঁদা, বুনো গন্ধ। গঙ্গামণির কাঁচপোকার টিপ খুলে পড়ে গেছে কোথায়।

'হঠাৎ করে তুই শহর ছেড়ে গেলি কুথায় রে, গঙ্গামণি ?' কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

চট করে এবার আর জবাব দিতে পারল না গঙ্গামণি। মুখ বুজে বসে থাকল অনেকক্ষণ। পরে, কথার জবাব দিতে বসে ওর দু-চোখ জলভরা হয়ে উঠল।

সমস্ত কথা খুলে বললে গঙ্গামণি কেষ্টর পাশে বসে। একে একে। সেই হারামজাদা শয়তান মিনসেটা ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাতের লোভ দেখিয়ে তাকে শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। হেথায় হোথায় করে কাটাল কিছুদিন। তারপর একদিন পালিয়ে গেল। গঙ্গামণি একা। বিদেশ বিভুঁয়ে, গ্রামে গ্রামে পথ ঘাট মাঠ করে ও ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে, ভাতের জন্য হাত পেতে পেতে। গাঁয়ে গাঁয়ে ধানের গোলা আজও শূন্য, আজও আকাল মেটে নি। পেটের তাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গঙ্গামণি এসে উঠল হাতামোড়ায়। সেইখানেই ছিল গঙ্গামণি আজ দু—দু মাস। চাঁপাদের কাছেই। ওদের কথায়, ওদের সাথেই এই মেলায় এলো, শ্যামবনীর মেলায়।

কথার শেষে গঙ্গামণি কেষ্টর হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিতে কেঁদে উঠল।

'আর লারি, কিষ্টো। ব্যাধি হলো শরীলে, বল নাই। এ জবলন সামলাতে লারি। তুই সাথে লিয়ে চল আমায়।'

হাত সরিয়ে দিলে না কেষ্ট গঙ্গামণির। কান পেতে শুনল সব কথা। প্রথম আলাপের সেই হাসি মরমে গাঁথা ছিল, এবার গাঁথা হল এই অনুনয়। নিরুত্তরে কেষ্ট শুধু তাকিয়ে থাকল মন্দিরের দিকে। শেষ রাতের দুধ-আলো চুড়ো-ভাঙা, শ্যাওলা-মাখা মন্দিরের গায়ে গা মিশিয়ে দিয়ে যেন নিঃসাড়ে সোহাগ জানাচ্ছে।

ভোর হল। সূর্য ওঠার মুখে মুখেই গঙ্গামণি চাঁপার শাড়ি, জামা চুপিসারে ফেলে রেখে একায় এসে উঠল। পাশে কেষ্ট। গঙ্গামণির দিকে তাকাল কেষ্ট। ভোরের আলোয় গঙ্গামণি ছেঁড়া-ফাটা, চিট-নোঙরা শাড়িতে গা গতর ঢেকে এসেছে কায়ক্লেশে। শীতের হাওয়ায় কাঁপছে ঠকঠকিয়ে।

সেদিক পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কেষ্ট প্রথমটায় কেমন যেন অবাক তারপর অদ্ভুত একটা বেদনায় মন ভার হয়ে বসে থাকল।

কেষ্টর চোখে গঙ্গামণির লুকোনো লজ্জাটা ধরা পড়ে গেছে। ছেঁড়া-ফাটা শাড়ির আঁটুনীতেও ঢাকা পড়ে নি সে কলঙ্ক চিহ্নটা।

একা ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে পলাশবনীর পথ ধরে। লাল ধুলো উড়ে পথের পাশে পলাশ আকন্দের পাতায় রঙ ধরাচ্ছে ধূসর। শূন্য প্রান্তরে একটানা ঘণ্টি বাজছে ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টিগুলোর। সামনে পিছনে আরও কত একা, কত মেলা ফিরতি মানুষ-জন।

একার ঝাঁকুনি খেতে খেতে সহসা কেষ্ট বুঝতে পারল সাজনীর সাজে সেজে এসেও গঙ্গামণি কাল রাত্তিরে পানের মোড়ক বাঁধা আঁচলের গিঁট খুলতে পারে নি কেন।

আবার সেই চাঁচুরিয়ায় ফিরে এলো গঙ্গামণি। এসে দেখে, অবস্থার হেরফের তেমন কিছু হয় নি। মরে, পালিয়ে বেঁচেবর্তে শেষ পর্যন্ত যারা টিকে গেছে তারা প্রায় সকলেই ঠাঁই নিয়েছে ওভারব্রীজের নীচে, একা স্ট্যাণ্ডের ছাউনির তলায়। ঘোড়ায়, কুকুরে, মানুষে মিলে-মিশে রাতটুকু নিশ্চিন্তে ওরা কাটিয়ে দেয়। ভোরের মুখ দেখার সাথে সাথেই যে যার মতো বেরিয়ে পড়ে পথে।

গঙ্গামণিও এসে মাথা গুঁজলো সেই ছাউনিতে।

আসার পথেই কেষ্ট সাবধান করে দিয়েছে গঙ্গামণিকে। খবরদার, দিনের বেলায় রেস্টুরেণ্টের আশে পাশে গঙ্গামণি যেন ঘুরঘুর না করে। রাত্রে সেই আগের মতোই গলিপথ দিয়ে লুকিয়ে গিয়ে পিছন দরজায় এসে ডাক দিলেই হবে। সজাগ থাকবে কেষ্ট।

এবার আর কেষ্টর কথা অমান্য করতে সাহস করল না গঙ্গামণি। সারা দিন পরে সিকিপেটা, আধপেটা যাই হোক, যেমন হোক খাবারটা জোটে কেষ্টর কাছেই। তা কি বন্ধ হতে দেওয়া যায়?

খুব সাবধান হয়েছে এবার গঙ্গামণি। যতক্ষণ দিনের আলো আছে, বাজার-পথে ওর ছায়া দেখবে না কেউ। সারা দিন লাইনধারে, স্টেশনে, প্যাসেঞ্জার গাড়ির কামরায় কামরায় ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়।

রাত হলে ওর পা আর বাধা মানতো না। বাজারে ঢুকতিপথে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকত রেস্টুরেণ্টের দিকে। কতক্ষণে ভিড় কমে, মালিক চলে যায়, দোকানের দরজা বন্ধ করে দেয় কেষ্ট। অগ্রহায়ণের হিমে গঙ্গামণির সর্বাঙ্গ কনকনিয়ে আসে—তবু পা নড়ে না, চোখ ফেরে না অন্য-দিকে। রেস্টুরেণ্টের বাতিটা নিভে যাবার অপেক্ষায় তার দু চোখ ঠায় জেগে থাকে।

রেস্টুরেণ্টের বাতি নিভে গেলে পা-পা করে গঙ্গামণি গলির পথ ধরে। ছাই, জঞ্জাল, ফণিমনসা ঢাকা এক-মানুষ-গা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গঙ্গামণি রেস্টুরেণ্টের পিছন দরজায় এসে থামে। জলের ফুকার দিয়ে উঁকি মারে। আস্তে আস্তে ডাকে—'কিষ্টো, উ কিষ্টো।'

কেষ্ট সজাগ। ডাক শুনে গঙ্গামণির জন্যে লুকিয়ে রাখা খাবার হাতে জালের

ফকিরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

কালিঝুলি মাখা জানালের ফকিরের গায়ে গঙ্গামণির জ্বলজ্বলে চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মতো জ্বলতে থাকে। হাপর-টানার মতো শব্দ ওঠে ওর নিশ্বাসের। আবছা একটা ছায়া জালের ওপাশে মুখ ঘষে।

লুকিয়ে রাখা পাত্রটা ঝটপট টেনে নেয় কেষ্ট। ফাঁক দিয়ে গঙ্গামণির থালায় উজাড় করে ঢেলে দেয় সঞ্চিত খাদ্যবস্তুগুলো।

কথা বলার অবসর নেই গঙ্গামণির। অন্ধকারেই একটা হাত তার থালা থেকে মুখে এসে উঠেছে।

চুপ-—সব চুপ। দূরে কুকুর ডাকছে। কেরোসিনের লালচে আলোয় রেস্টুরেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেষ্ট। বাইরে অন্ধকার। আবর্জনার গন্ধ ভাসছে। খেতে খেতে গঙ্গামণির গলা বন্ধ হয়ে আসে, বিষম লাগে। কাশির দমকে বুক ছিঁড়ে যাবার যোগাড়।

ধমক দেয় কেষ্ট। ধরা পড়ার ভয়ে ওর গা ছমছম করে। তাড়াতাড়ি জল দিয়ে বিদেয় করে দেয় গঙ্গামণিকে।

নিত্যই এই। কোন রকমফের নেই। রাত্রে নিদেনপক্ষে একটি দুটি কথা হয়। নয়তো সব কিছুই চুপি চুপি ; নিঃসাড়ে।

কথার পাট দিনের বেলায়। কাজের ফাঁকে কেষ্ট স্টেশনে এলে।

দেখতে দেখতে অগ্রহায়ণ শেষ হল। পৌষ এলো শীতের প্রচণ্ড দাপট নিয়ে। সে পৌষও শেষ। মাঘ মাসে গঙ্গামণি একা স্ট্যাণ্ডের ছাউনির তলায় শীতের রোদ্দুরে চুপচাপ বসে থাকে আর হাঁপায়। গায়ে বল পায় না। প্যাসেঞ্জার ট্রেন এলে কোন-রকমে শরীরটাকে টেনে-টুনে প্লাটফর্ম পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাও যেন পারে না রোজ। মাথা ঘোরে চরকিপাকে, দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁপ ওঠে। চড়চড়িয়ে টান পড়ে পেটে, পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। গা গুলোয়, মাথা গুলোয়।

শরীরটা যতই নিস্তেজ হয়ে আসে, ততই যেন গঙ্গামণির পেটের খিদে জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসে। কুকুরের মতো পাত চেটে বেড়ায় ও একা স্ট্যাণ্ডের এখানে ওখানে।

এদিকে রেস্টুরেন্টে জোর রেষারেষি বেধে গেছে কারিগর আর কেষ্টতে। ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করেছিল কারিগর। ধরা পড়ে দোষ চাপাল কেষ্টর ঘাড়ে। তা ছাড়া বেশ খানিকটা হাত টান ছিল কারিগর ছোকরার। ধরা পড়লেই কেষ্টকে কোণঠাসা করে দিত। বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'হবে না কেন মালে কমতি? সেই শালী তো আবার এসেছে—পিরীতের বোষ্টমী কেষ্টার। উর পাতেই তো যায়।'

গোলমেলে ব্যাপার দেখে কেষ্ট গঙ্গামণির আসা বন্ধ করে দিলে। বললে, 'ঝামেলা

বাঁধাইছে রে, গঙ্গামণি। উ শালা লটবরের শয়তানি সব। তুই আর আমার ঠেঙে রেতে যাস নে। থাক হেথায়। লুকাই চুরাই দিব ক্যানে কিছু।'

সেই থেকে গঙ্গামণির দুকূল যেতে বসল। দুর্বল শরীর নিয়ে বসে থেকে পাত চাটলে পেট ভরে না ; কেষ্টর প্রত্যাশায় পথ চেয়ে চেয়ে হন্দ হয়ে গেলেও তেমন কিছু জোটে না আজকাল। রোজ তো নয়ই। বাধ্য হয়েই গঙ্গামণিকে এবার স্টেশন বাজার সর্বত্রই কঁকিয়ে, কেঁদে, হাতে-পায়ে ধরে পেটের জ্বালা মেটাবার চেষ্টায় বেরোতে হল।

আরও কিছুদিন কাটল এইভাবেই। গঙ্গামণি আর পারে না। শরীরে কুলোয় না একেই, তায় আবার যা জোটে এঁটোকাঁটা তাতে ওর অরুচি।

কেষ্টর সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলেই গঙ্গামণি ওর পথ আটকে ধরে।

'আর তো লারি রে, কিষ্টো। ভাল, তুই—ভাল। দয়ামায়া কুথায় গেল রে তুর ; ই শরীলে আমার থাকল কি ক ?'

কেষ্ট চুপটি করে সব শোনে। কথা বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না। কিই বা আছে বলার !

আর একদিন দেখা। প্লেট-ঢাকা খাবার নিয়ে কেষ্ট যাচ্ছিল স্টেশনে, বুকিং অফিসে।

'যাস কুথায় রে, কিষ্টো ?' গঙ্গামণি পথ আড়াল করে দাঁড়াল, 'কি আছে রে উতে ?'

'চপ্।' জবাব দিলে কেষ্ট, 'টিকিটবাবুর চেনা-জানা লোক এলো। অর্ডার দিলেক।'

চপের প্লেটের দিকে লোভার্ত দৃষ্টিতে গঙ্গামণি তাকিয়ে থাকল, 'মাসের চপ্, না কি রে ?' জিভে জল এসে পড়েছে ওর।

'হাঁ ; মাসের।' কেষ্ট পা বাড়াল।

'শুন, শুন কিষ্টো ;—টিকিটবাবুরা সবটাই কি খাবেক আর ? টুকচা ফেলাছাড়া থাকলে দিস ক্যানে আমায়। আমি হেথায় আছি।' গঙ্গামণি চপের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যেন অবশ হয়ে এলো।

চলে গেল কেষ্ট চপের প্লেট হাতে নিয়ে।

কিন্তু ছাড়া পেলে না। সেই থেকে গঙ্গামণির সাথে দেখা হলেই ও নাছোড়বান্দা।

'উ কিষ্টো। খাওয়া ক্যানে একটা চপ রে ? কতোই তো হয় তুদের রোজ। বড্ড সাধ লাগে—। ই জিবে আর সোয়াদ নাই রে। পায়ে পড়ি কিষ্টো তুর, একটা মাসের চপ্ খাওয়া আমায়।'

কেষ্ট কত বোঝায়। বলে, 'বড় কড়াকড়ি রে, গঙ্গামণি। মালিক নিজের হাতে সব গুণে রাখে, হিসেব নেয়। চপ্ তোকে খাওয়াই কি করে ? একটু সবুর কর, ফাঁক পেলেই খাওয়াবো।'

গঙ্গামণির কপাল ভাল। অল্প ক'দিনের মধ্যেই হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। মাঘের শেষ তখন। বাজারে আলুর আড়ৎ যার সেই নন্দীবাবুদের মেয়ের বিয়ে। দু হাতে পয়সা ঢেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নন্দীবাবু। বোষ্টম লোক। বাড়িতে মাছ মাংস একেবারেই অচল। অথচ বরযাত্রীদের জন্যে খাবার ব্যবস্থাটা মাংসের পর্যায়ে না তুললেই নয়। মদনবাবুর রেস্টুরেণ্টে ঢালাও অর্ডার হল মাংস আর চপের।

মাঘের প্রচণ্ড শীত। বিয়ের লগ্ন মাঝ-রাতে। সেই দুরন্ত শীতে নিমন্ত্রিতদের পাতে গরম চপ আর মাংস তুলে দেওয়ার পাট চুকোতে-চুকোতে বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেল। ক্লান্ত মদনবাবু বিদায় নিলে। চলে গেল কারিগর গামছার একটা মোটা রকমের পুঁটুলি বেঁধে। রেস্টুরেণ্টের ধোয়ামোছা শেষ করে কেষ্ট উনুনটায় কয়লা ঢেলে দিলে। রাত তো প্রায় শেষ হতে চলল। ভোর না হতেই গরম জল দরকার চায়ের।

হাতমুখ ধুয়ে অল্প একটু বিশ্রাম নিল কেষ্ট। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীতে সমস্ত শরীরটা অবসন্ন হয়ে এসেছে। পর পর দুটো বিড়ি খেয়ে হাই তুলল। ঘুম পাচ্ছে ওর ; ভীষণ ঘুম। রাতের গোড়ায় জোর খিদে পেয়েছিল : এখন আর দাঁতে কুটো কাটতেও ইচ্ছে করে না।

বেঞ্চি জোড়া দিয়ে কেষ্ট তার বিছানাটা বিছিয়ে নিল রেস্টুরেণ্ট ঘরে। একটা কালো ময়লা পর্দা ঝুলত রেস্টুরেণ্টের রান্না ঘর আর এই চেয়ার টেবিল সাজানো ঘরের মধ্যে। পর্দাটা গুটিয়ে দিলে কেষ্ট। উনুনে আঁচ উঠে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতে ওই আঁচের তাপটা বেশ লাগে।

চায়ের জল-গরমের টিনটা উনুনেচাপিয়ে জল ভর্তি করে দিল। ফট্‌ক এখন। ঠিক এমন সময়ই জালের ফুকোর দিয়ে ডাক শোনা গেল, 'কিষ্টো—উ কিষ্টো।'

এই ডাকেরই অপেক্ষা করছিল কেষ্ট। গঙ্গামণিকে আজ সে আসতে বলেছে। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে না হলে আর সুযোগ জুটত না। কতদিন মেয়েটা একটা চপের জন্যে বায়না ধরেছে, মাথা খুঁড়ছে কেষ্টর পায়। আজকের এই রাশি রাশি খাবারের মধ্যে ও যদি দুটো খায় কেউ জানতে পারবে না, ধরতে পারবে না। বেচারী গঙ্গামণি ! কতকাল পেট ভরে খায় নি, কতদিন ওর মুখে এঁটোকাঁটা আর নোংরা ছাড়া কিছু ওঠে নি। কেষ্টর ভরসা করেই গঙ্গামণি এখানে এসেছিল এবার, এই চাঁচুরিয়ায়—কিন্তু কেষ্টও পারল না। পারল না গঙ্গামণিকে নিত্য একবেলা এক মুঠিও হাতে তুলে দিতে।

জালের ফুকোরর পাশে পিছন-দরজা। সেই দরজাটার খিল খুলে কেষ্ট ডাকল, 'আয়—ভেতরে আয়।'

গঙ্গামণিকে দ্বিতীয়বার বলতে হল না। অন্ধকারের গুহা থেকে লোভার্ত একটা

ভীরু পশু যেন ঘরে এসে ঢুকল। শীতের দাপটে কাঁপছে হি হি করে।
কেরোসিনের খুপির আলোয় সেই ফোলা ফোলা বীভৎস মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেষ্ট আবার দরজার খিল এঁটে দিল।
'রাতটো শেষ করেই এলাম রে।' গঙ্গামণি এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তীক্ষ্ন চোখে নজর করছে।
'ভালোই করলি।' কেষ্ট কি যেন ভাবল একটু। তার নিজের পাত্রটা টেনে নিলে দেওয়াল-তক্তা থেকে। গঙ্গামণির জন্যে লুকিয়ে রেখেছিল দুটো চপ, ক' হাতা মাংস।
খাবারের পাত্রটা এগিয়ে দেবার আগে কেষ্ট বললে, 'শীতে তুই বড় কাঁপছিস গঙ্গামণি, একটু আগুন পুইয়ে নে। না হলে খাবি কি, কেঁপেই মরবি।'
'আগ্ সেঁকে কাজ নাই। তু দেখ ক্যানে—আমি হদ হদ করে খেয়ে লিব। সারা রাত ঠায় চোখ ফাবড়ে বসে আছি তো বসেই আছি। ই বাবা, এত কি যজ্ঞি রে কিষ্টো, মানুষগুলা খায় তো রাত ভোর করেই খায় সব।
গঙ্গামণি অধৈর্য হয়ে আঁচল পাতল।
'লিতে হবে না। বোস তুই, উখানেই বোস। বোসে বোসে খা।'
কেষ্টর কথায় গঙ্গামণি বোধহয় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু অতশত ভাববার সময় নেই তার। পেট থেকে জল টানছে জিবে। মাটিতে বসে পড়ল গঙ্গামণি।
হাতের পাত্রটা কেষ্ট এগিয়ে দিল। সেদিক পানে তাকিয়ে গঙ্গামণির চোখের পাতা আর পড়তে চায় না। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে থাকে, হাঁ হয়ে থাকে মুখ। জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ঘি-ভাতের ওপর।
বিয়ে বাড়িতে পরিবেশন শেষ করে আসার পথে কারিগর নটবর ওদের ভাগ নিয়ে এসেছিল—লুচি, মাছ, ঘিভাত কত কিছু। কেষ্টকেও দিয়ে গেছে খানিক খানিক। সবই তোলা ছিল। কেষ্ট থালাটাই এগিয়ে দিয়েছে গঙ্গামণিকে। এর ওপর মাংস আর চপ।
জীবনে কোনদিন এত খাবার দেখে নি গঙ্গামণি। জিভে স্বাদ জানে না অনেক কিছুরই। কোন্টা কি, মিষ্টি না ঝাল, টক না নোনতা, কিছুই তার জানা নেই। কোন্টা আগে ছোঁবে, কি যে আগে খাবে—গঙ্গামণি তা ভেবেই পায় না। চোখ দুটো তার থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে।
কেষ্টর তাগিদে গঙ্গামণির বিমূঢ় ভাবটা কাটল।
হাত বাড়াল গঙ্গামণি, 'ভাতে মিষ্টি কেন রে কিষ্টো? লং ক্যানে ইয়াতে? মাগো মা, ঘিয়ে চপচপায়! ক্যাওটের বিটি আমি, বাপের কালেও মাছের সোয়াদ জ্ঞান হল না ইর পারা রে কিষ্টো। কী সুয়াদ—জিভে জড়াই যায় গ!

বিড়ি ধরিয়ে কেষ্ট একদৃষ্টে তাকিয়েছিল গঙ্গামণির দিকে। গঙ্গামণিকেই সে দেখছে। দেখার মতই না দৃশ্যটা। পা ছড়িয়ে, মুখ থুবড়ে থালার ওপর লুটিয়ে পড়েছে গঙ্গামণি। হাতের আঙুলগুলো তার পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে পাতের ওপর। বিরাম নেই গ্রাস আর গলাধঃকরণের। চোখ তুলে চায় না—সোজা করে না দেহটাকে। অদ্ভুত! অদ্ভুত দেখাচ্ছে গঙ্গামণিকে। দু-পাঁচ ক্রোশ ছুটে আসার পর ঘাড়-মুখ গুঁজে ঘোড়াগুলো ঠিক এমনিভাবেই দানা খায় না!

দৃশ্যটা কে জানে কেন, কেষ্টর ভালো লাগছে না। এমন হবে জানলে গঙ্গামণিকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিত না; খাওয়াত না চোখের সামনে বসিয়ে। কি যে খেয়াল হয়েছিল কেষ্টর, ইচ্ছে জেগেছিল ভীষণ—গঙ্গামণিকে সামনে বসিয়ে ভালোমন্দ দিয়ে পেটপুরে খাওয়াবে। এই প্রচণ্ড শীতে ঘরেব মধ্যে উনুনের আঁচের আরাম কি কম! সেই আরামে নিশ্চিন্তে বসে গঙ্গামণি ধীরে ধীরে খাক না কেন সব—যত তার পাতে আছে।—খাওয়ার খুশীতে গঙ্গামণির মুখে আনন্দ উপচে উঠুক, ক্ষুধা-তৃপ্তির সেই আরাম আর সুখ, যে আরাম, সুখ ও ভুলে গেছে অনেক কাল, অনেক শীত আগেই। অনেক সাধ ছিলো কেষ্টর, প্রবল বাসনাই, গঙ্গামণির সেই খুশী, পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ মুখখানি আজ ও দেখবে। আর সেই সঙ্গে একথাও বুঝুক গঙ্গামণি, কেষ্ট নিরুপায়; নয়তো গঙ্গামণিকে খাওয়াতে তার কি কিছু কম সাধ?

কিন্তু কই খাওয়ানোর সেই সুখ পাচ্ছে না তো কেষ্ট। গঙ্গামণির মুখ-ঘাড় গুঁজে বসা ওই দেহের কোথাও কি খাওয়ার আনন্দ আছে, কি সুখ?

আশ্চর্য! কেষ্ট অবাক মানছে মনে মনে। অপদেবতায় সূর্যের আলো মুছে দেয়, গাছের সবুজ পাতা এক নিশ্বাসে ঝরিয়ে ফেলে, সমুদ্রের জল শুকিয়ে আগুনের ঝড় তোলে, ভীষণ ঝড়; তেমনি কি—তেমনি কি, আকালের ঝড় মানুষের মুখ থেকে খাওয়ার খুশীও মুছে নিয়ে গেল!

সেদিক পানে তাকিয়ে তাকিয়ে বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত অপদেবতাকে কেষ্ট যেন হঠাৎ রেস্টুরেন্টের এই ঘরে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল। অনুভব করতে পারল তাদের বিষনিশ্বাস। সেই তীব্র কটু গন্ধকের হাওয়া দিয়েছে আবার। পুরোনো চাঁচুরিয়া আর গঙ্গামণি, গঙ্গামণির দল মনের নাগরদোলায় ওঠানামা করছে।

কে? কেষ্ট চমকে উঠল। পাত থেকে হাত গুটিয়ে গঙ্গামণিও তাকালো চোখ তুলে।

রেস্টুরেন্টের বাইরের দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা মারছে কে! কান পেতে শব্দটা শুনতেই কেষ্টর মুখ শুকিয়ে এলো। ঢিপ ঢিপ করে উঠল বুক।

বাইরের দরজায় ধাক্কা মারার শব্দটা থেমেছে। গঙ্গামণি তখনো পাত আগলে বসে।

মাংসটা তবু একটু খেয়েছে, কিন্তু বড় সাধের চপ দুটো তখনো তার পাতে। তারিয়ে তারিয়ে খাবে শেষ-পাতে, সেই ইচ্ছেতেই একপাশে সরিয়ে রেখেছিল।

ইঙ্গিতে কেষ্ট গঙ্গামণিকে উঠতে বললে চটপট। ফিসফিসিয়ে জানাল, পিছু-দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে।

মাংস আর চপ ছেড়ে পালিয়ে যেতে মন চাইছিল না গঙ্গামণির। চুপি গলায় সে বললে, ডরাস্ ক্যানে? উ কিছু লয়। বাতাস হবেক, কি কুকুর-টুকুর।'

দরজায় ধাক্কা মারছে না আর কেউ। শব্দ নেই কোথাও। কেষ্ট অপেক্ষা করলে। তবে? ওকি বেলসেবুব? কেষ্টব ভয় কমল না এতটুকুও।

'কাজ কি ঝামেলায়? তুই যা গঙ্গামণি।'

প্রচণ্ড অনিচ্ছা, তবু গঙ্গামণিকে যেতে হবে। রাগ হল তার খুব। চপ্ দুটো চট করে তুলে নিল। একটা কামড় বসিয়ে গরগর করতে লাগল রাগে আর বিরক্তিতে।

আস্তে আস্তে খিল খুলল কেষ্ট পিছন-দরজার। কপাটের একটু ফাঁক দিয়ে এক চিলতে অন্ধকার চোখে ঠেকে নি তখনো, হঠাৎ কে যেন বাইরে থেকে দড়াম করে একলাথি মেরে কপাট দুটো হাট করে দিল।

কপালে ঠোক্কর লাগল কেষ্টর, জোর ঠোক্কর কপাটের। ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা।

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে কেষ্ট এক চোখে চাইল। সেই চাওয়াতেই তার সর্বাঙ্গ অসাড়, পাথর হয়ে যায়। স্বপ্ন নয়, নটবরও নয়, বাবু স্বয়ং—মদনবাবু। একেবারে দরজার ওপরেই।

মদনবাবু এক নজরে সব দেখে নিলেন। আগেও দেখেছেন জালের ফুকরি দিয়ে। পিছন দরজার কপাটটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলেন মদনবাবু। ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরলেন কেষ্টর।

'নেমক্হারাম, জোচ্চোর, সোয়াইন—আমার ব্যাগ্ কোথায় বল? তারপর দেখছি সব'—

দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়েছিল কেষ্টর। মদনবাবুর হাত থেকে গলা ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল কেষ্ট। গলা দিয়ে দমবন্ধ হবার মতো ঘড়ঘড় শব্দ উঠল।

গলা ছেড়ে দিলেন মদনবাবু।

দম নিতে লাগল কেষ্ট। গলা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মুখ পাংশু।

'কোথায় আমার ব্যাগ?' মদনবাবু এক থাপ্পড় লাগালেন কেষ্টর গালে।

দু-পা হঠে আসতে হল কেষ্টকে।

'জানি না বাবু।'

'শালা, শুয়োর, ব্যাগ জানো না তুমি ? জানাচ্ছি, দাঁড়াও !'

কেষ্টর চুলের মুঠি নেড়ে আর এক থাপ্পড় কষালেন তার গালে। কেষ্ট দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছিটকে এলো।

এক লাফে মদনবাবু এগিয়ে গেলেন ক্যাশের দিকে। ক্যাশের চাবি খোলা ! টানাটা উঠোতেই ব্যাগটা হাতে ঠেকল। নিত্যদিন যেভাবে ব্যাগটা পড়ে থাকে, ঠিক সেই-ভাবেই পড়ে আছে। যথেষ্ট ভাবী ! হ্যাঁ, নন্দীবাবুর টাকায় ভাবী হয়েছিল বলেই না এই শীতের শেষরাতে ব্যাগের কথা মনে পড়ল বিছানায় শুয়ে। আর যেই-না মনে পড়া ছুটতে ছুটতে তিনি এলেন দোকানে। হাজার কাজে, ভিড়ে, বিয়ে বাড়ির খাবার পাঠানোর তদারকে কখন যেন ভুলেই ব্যাগটা দোকানে রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। মনে পড়তেই ছুটে এলেন। বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিলেন। কোন শব্দ নেই। এলেন পিছন-দরজায়। জালের ফুকরি দিয়ে তাকালেন অন্দরে। ঘুমন্ত কেষ্টকে ডাক দেবেন বলেই। কিন্তু তাকিয়ে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তাতে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল মদনবাবুর। নটবরের কথাই তা হলে ঠিক। এমনিভাবে কেষ্ট রোজ তাঁর দোকানের খাবার চুরি করে ছুঁড়িটাকে খাওয়ায়। টাকা-পয়সাও যে আজকাল ক্যাশ থেকে মাঝে মাঝে চুরি যায়—সেটাও তাহলে কেষ্টর কীর্তি। বিশ্বাস কি ? আর ব্যাগ ? ব্যাগটাও কি তিনি সত্যি ভুলে দোকানে ফেলে গেছেন না হাতিয়ে নিয়েছে কেষ্ট ? পলকে তাঁর বিচারবুদ্ধি লোপ পেল।

ব্যাগটা হাতে করেই মদনবাবু আবার কেষ্টর কাছে এসে দাঁড়ালেন। নোটগুলো বের করে গুণে নিচ্ছেন এমন সময় খুট করে শব্দ হল। গঙ্গামণি পিছন দরজার খিল খুলে ফেলেছে। পালাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে সবে।

মদনবাবু ছুটে এসে গঙ্গামণির হাত ধরে ফেললেন।

'শালী, হারামজাদী, লুঠতে এসেছিস এখানে ? তোর চোদ্দ ভাতারের জমিদারী এটা। রাখ্—রাখ শীঘ্রি চপ্—নামিয়ে রাখ্, ফেলে দে।'

হ্যাঁচকা টান দিলেন মদনবাবু। গঙ্গামণি সেই টানে ছিটকে কেষ্টর কাছে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেলে।

ব্যাগটা মদনবাবু ততক্ষণে পকেটে পুরে ফেলেছেন।

গঙ্গামণিও ছাড়ার মেয়ে নয়। তার সেই বহুদিন আগেকার বেপরোয়া ভাবটা হঠাৎ যেন ভর করল তাকে। চপ্ সে রাখবে না। হাতের মুঠিটা আরও জোর করে গঙ্গামণি চপ চেপে ধরল। যেন হাতের মুঠিতে আগলে রেখেছে তার জীবন।

'গাল দিয়ো নাই। থুবো নাই চপ্।'

গঙ্গামণি দরজার দিকে আবার এগিয়ে চলল।

মদনবাবু সাপ্টে ধরলেন গঙ্গামণিকে। চপ্, তিনি কেড়ে নেবেনই। রোখ চেপে গেছে। ধস্তাধস্তিতে, কাড়াকাড়িতে গঙ্গামণির চপ্ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে

ছড়িয়ে ছিটকে পড়ল। বাঁ হাতের চপটা তখনও বাঁচিয়ে রেখেছে ও।

'হেলানী মাগি, চপ্ তোকে রাখতেই হবে। খেতে দেবো না। দেখি কেমন করে খাস তুই!' মদনবাবু গঙ্গামণির বাঁ হাত চেপে ধরে মোচড় দিলেন।

'চামার'—কাতরে উঠে গঙ্গামণি মদনবাবুর বুকের পাশেই কামড়ে ধরল।

আর্তনাদ করে মদনবাবু হাত ছেড়ে দিলেন। গঙ্গামণি ছুটে পালাতে যাবে, আবার হাত বাড়ালেন মদনবাবু। শাড়ির ছেঁড়া আঁচলটা হাতে এলো। টান দিতেই বাধা পেল গঙ্গামণি; ছেঁড়া শাড়ি ছিঁড়ে গেল; এক টুকরো তো কাপড়, গা খুলে কোমর খুলল।

সমস্ত জোর দিয়েই বুঝি একটা লাথি মেরেছিলেন পেটে মদনবাবু, গঙ্গামণি তীব্র আর্তনাদ করে ঘুরে পড়ল উনুনের ওপর। হুমড়ি খেয়েই পড়েছিল গঙ্গামণি। গরম-জল-ভরা টিনটা লাগল কোমরে—উল্টে পড়ল উনুনের পাশেই। উনুনে জল পড়ে ভ্যাপসা কটু গন্ধ ভেসে উঠল, বিশ্রী একটা শব্দ হলো আগুনে জল পড়ার। বাকি জলটা গড়িয়ে পড়ল উনুন বয়ে মাটিতে। গঙ্গামণিও টলতে টলতে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে, অসহ্য কাতরানিতে ককিয়ে কেঁদে উঠল।

কেষ্ট পাথরের মতো এক কোণে দাঁড়িয়ে। তার কোন সম্বিত নেই। কাঠের মত দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখেই যাচ্ছে। কি ঘটছে তা অনুভব করার বোধটুকুও লুপ্ত তার। রণশেষে মদনবাবু বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়ে ক্লান্তশ্বাস ফেলতে ফেলতে গঙ্গামণিকে দেখছেন। নিষ্ঠুর, কদর্য একটা হাসি তার মুখে। চোখ দুটো তখনো হিংস্র, অপ্রকৃতিস্থ।

'চপ্ খাবে—? হারামজাদী মাগী! খা চপ্!'

মদনবাবু কেষ্টর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আর ব্যাটাচ্ছেলে, রাস্কেল, জোচ্চোর,—তুই! তোর বাপের দোকান এটা? পিরীত করে রাস্তার ছুঁড়ি ধরে এনে চপ্ কাটলেট্ খাওয়াবি? শুয়োরের বাচ্চা, এক আধ দিন নয়—বচ্ছর ধরে তুমি এই রকম চালাচ্ছ!'

মদনবাবু কেষ্টকে আরও কয়েক ঘা কষাবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ গঙ্গামণির মর্মান্তিক একটা আর্তনাদ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। কেমন যেন মনে হল! এক পা ঝুঁকে তীক্ষ্ন চোখে নজর করলেন। কেরোসিনের খুপির লালচে আলোতেও রঙ্ ভুল হল না। রক্তই। কাপড়ে, উরুতে, মেঝেতে। ফিনকি দিয়ে ছুটছে।

কী বীভৎস! মদনবাবুর সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠল। অদ্ভুত একটা ভয় বুকের হাড়ে হাড়ে জমাট বাঁধল, হৃৎপিণ্ডটা যেন নিজের কানের কাছেই উঠে এসেছে।

পাংশু মুখে মদনবাবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কেষ্টকেই আবার তাঁর নজরে পড়ল। দু মুহূর্ত আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবলেন মদনবাবু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপর হঠাৎ মানিব্যাগ থেকে কতকগুলো নোট পকেটে পুরে ব্যাগটা

তাগ করে ছুঁড়ে দিলেন কেষ্টর বিছানার ওপর। অন্ধকারে, কাঁথার ভাঁজে ব্যাগটা হারিয়ে গেল।

'ও! এই—' মদনবাবু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতেই কথাটা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলার স্বরে জোর এলো না, 'এখানে এই সমস্ত হচ্ছে? পেট খসানো! আচ্ছা—দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি তোমার। যাচ্ছি থানায়। মানুষ মাবার চেষ্টা! শয়তান—'

পরমুহূর্তেই মদনবাবু গঙ্গামণির দিকে এক পলক তাকিয়ে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন কেষ্ট তা বুঝতে পারল।

কেরোসিনের খুপির লালচে ম্লান আলোতে রেস্টুরেন্ট ঘরের দেওয়াল, বালতি, হাঁড়ি, কুঁড়ি যেন তালগোল পাকিয়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। উনুনের আঁচের আভা যেন আভা নয় একটা চিতাই হবে। তেমনি হিংস্রভাবে তাপ ছড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। কাটা ছাগলের মতো লুটোপুটি খাচ্ছে গঙ্গামণি। কী করুণ, অসহনীয়, মর্মান্তিক তার গোঙানি। রেস্টুরেন্ট ঘরের বন্ধ বাতাসও সে কান্নায় ককিয়ে উঠেছে।

কেষ্ট পাথর। ভয়ংকর এক জগতে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সে। বেলসেবুবের সাত অনুচর —সাত অপদেবতায় ঘেরা এই শ্মশান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো পায়ে জোর নেই তার। ক্ষমতা নেই, এতটুকু। পথ হাঁটতে হাঁটতে কেষ্ট চলে এসেছে সেই মরুভূমিতে, যেখানে ঝড় উঠিয়ে, সাপ ছেড়ে, আগুন বৃষ্টি করে বেলসেবুব ভোজের উল্লাসে মত্ত। গন্ধকের সেই কটু বিষাক্ত হাওয়া ফুলে ফুলে ভূতের নাচ নাচছে। গঙ্গামণির পায়ের কাছে, পেটের কাছে, গায়ে, হাতে, মাথায়। গন্ধকের সেই গরম হাওয়া। ভোজের আগে খানিকটা মাংসই সেঁকে নিচ্ছে নাকি শয়তানরা?

'কিষ্টো—কিষ্টো রে, আর লারি। উ মাগো, দায়ে গতর কাটে কোন চামারে—' পেট কোমর কাটে; বাঁচারে আমায়। বাঁচা। টুকুন জল দে।'

জল? কেষ্ট তবু খানিকটা সম্বিত ফিরে পেল এই জল চাওয়ায়। গেলাসে করে জল এগিয়ে দিলে গঙ্গামণিকে। জল খাওয়ার চেষ্টা করলে গঙ্গামণি, পারলে না। আবার লুটিয়ে পড়ল। বাঁ হাতের মুঠিতে তখনও তার আধখানা চপ।

গঙ্গামণির কটিতটের দিকে এতক্ষণে ভাল করে চাইল কেষ্ট। দু হাতের ব্যবধান থেকে। চেয়েই চোখ বন্ধ করলে। সর্বাঙ্গ শিহরিত হবার অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেল তার জিবে আর ঠোঁটে। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। পিছু হটে ধপ করে বসে পড়ল কেষ্ট দু হাতে মুখ ঢেকে।

হঠাৎ একটা ডাক ছাড়া, ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দে চমকে উঠে কেষ্ট তাকাল গঙ্গামণির দিকে। আথুলি পিথুলি থেমে গেছে গঙ্গামণির। কাটা ছাগল যেমন শেষ ডাক দিয়ে থেমে যায়, তেমনি।

কেষ্টর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। বিস্ফারিত, নিষ্পলক-নয়ন, বিমূঢ় চিত্ত সে। পরমাশ্চর্য একটি জীবনকে সে দেখতে পেয়েছে। কেরোসিনের লালচে বিবর্ণ আলোয় অস্পষ্ট একটা মাংসপিণ্ডকে। কোন যাদুবলে হঠাৎ গঙ্গামণির জানুদেশে এসে ঠাঁই নিল এ প্রাণ, এই পিণ্ড? বুকের ওপর দিয়ে যেন রেল গাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে কেষ্টর। অব্যক্ত যন্ত্রণা আর গুরু গুরু। দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু পাগল হয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছে ছুটে আসছে।

আলোছায়ার সেই অতল রহস্যের পাতায় গঙ্গামণির শত নাড়ির রক্তের আলপনা আঁকা ছিল—অদ্ভুত আলপনা, সেই আলপনার স্নেহ-পিঁড়িতে নিশ্চিন্ত একটি প্রাণ নিঃশব্দে পড়ে থাকল।

গঙ্গামণি একটু থেমে একবার উঠে বসার চেষ্টা করে কাতরে, কঁকিয়ে আবার নেতিয়ে পড়ল।

ছটফট করছে কেষ্ট। পায়চারি করছে পাগলের মতো। গঙ্গামণি নিশ্চল, নিস্পন্দ। তবে কি সে মরে গেল? চলে গেল এই পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধভরা বদ্ধ রেস্টুরেন্ট ঘরের দেওয়াল ডিঙিয়ে, ওই ফুকরি কাটা জালের মধ্যে দিয়ে বাইরের হাওয়ায়—আকাশে?

বিমূঢ় কেষ্ট কি করবে বুঝতে না পেরে এক মগ জল নিয়ে গঙ্গামণির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঠক্ ঠক্ করে তার পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে। খানিকটা জল ছলকে পড়ল গঙ্গামণির পেটে, পায়ে—সদ্যজাতের গায়ে। বাকি জলটা কেষ্ট গঙ্গামণির মুখে মাথায় ঢেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

দেখছে কেষ্ট। দেখছে এক মনে; দু চোখে অজস্র মমতা আর উদ্বেগ ভরে, গঙ্গামণি একটু কেঁপে ওঠে কি না! আর একবার কাতরে ওঠে কি না!

গঙ্গামণি কেঁপেই উঠল। আর হঠাৎ—হঠাৎ সেই অস্পষ্ট মাংসপিণ্ডটা কোন অজেয় শক্তি বলে কেঁদে উঠল এতক্ষণে, এই প্রথম, দুর্বল, অসহায় গলায়।

কেষ্টর সর্বদেহ শিহরিত হল সেই কান্নার শব্দে। আরও বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ও। যেন বনের পথে পথ-ভুলে হাতড়ে মরছে একটা আলোর নিশানা।

কেমন করে যেন অকস্মাৎ, অতর্কিতে কেষ্টর চোখ পড়ল দেওয়ালে আঠা দিয়ে আঁটা সেই ধুলি-ধোঁয়া-মলিন, বিবর্ণ যীশুর ছবির ওপর। চোখ পড়ে তো থমকেই থাকে, নড়ে না আর। কেষ্ট যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। আজ এই মুহূর্তে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ছবিটা! উনুনের আঁচের লাল আভার খানিকটা তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে ছবির গায়—সেই আভায় যীশু আজ আলোকিত।

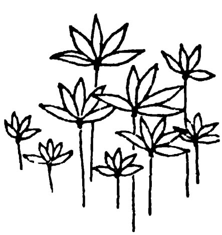
কেষ্ট পলকহীন। চোখে তার অগাধ বিস্ময়। মন তার হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায় বুঝি ভেসে গেছে। মনে পড়ছে অনেক কাল আগেকার একটি দৃশ্য: দোপাটি

ফুলের বাগান ঘেরা ইটরঙের কাদামাটির চার্চ। কেষ্টরা গিয়ে বসেছে চার্চের ভেতর। সাদা লম্বা জামা গায়ে পাদ্রী বুড়ো বাইবেল পড়ছে। চশমাটা নাকের তলায় নামানো। কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে, কাঁপছে তার শিখা। সে আলোয় যীশুর প্রকাণ্ড ছবিটার অন্ধকার ঘোচে না। মুখটা থাকে অস্পষ্ট। পাদ্রী বুড়ো সেই দিকে বার বার চায় আর চাপা গলায় পড়ে—ঠিক এই রকমই হবে। যখন দেখবে ওই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটছে তখন নিশ্চিত জানতে পারবে যে, ধর্মরাজ্য হাতের কাছে এসেছে। আমার কথা বিশ্বাস কর। মাটি এবং আকাশ লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার কথার অন্যথা হবে না। সে সময় সেই দুর্ঘটনার পর সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, চাঁদ আর আলো দেবে না, এবং সমস্ত নক্ষত্র আকাশ থেকে খসে খসে পড়বে। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল কাঁপতে থাকবে। তারপর আকাশে মনুষ্য-পুত্রের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সকল জাতি তখন অনুশোচনা করতে থাকবে। তারা দেখতে পাবে, মনুষ্যপুত্র মহামণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘের ওপর দিয়ে আসছে।

কী এক অদ্ভুত, তীব্র অনুভূতিতে বেদনায় আকুল হয়ে কেষ্ট তাকাল নীচে, রসুন-পিঁয়াজ, মাংস-মশলা এঁটো-কাঁটা ছড়ান ধোঁয়া-কয়লার কটু বাষ্পভরা রেস্টুরেন্টের আধো-অন্ধকার মাটির দিকে, গঙ্গামণির রক্ত আলপনার পাত্রে সাজান মাংস পিণ্ডটা যেখানে ককিয়ে উঠছে থেকে থেকে।

বিমূঢ়, বিচলিত, বিহ্বল কেষ্ট সেখানে কি যেন দেখছে, কি যেন খুঁজছে।

[দেশ : এপ্রিল ১৯৫৩]



কাচঘর

হলুদ-রং একতলা বাড়ি। উঁচু ভিত, উঁচু ছাদ। একপাশে টালি-ছাওয়া টানা বারান্দা। প্রান্তে তার 'কাচঘর'। এপাশ ওপাশ ধুধু মাঠ, দূরে জঙ্গলের ঝাপসা গাছপালা। এই ফাঁকায় নিম-কাঁঠালের ছায়ায় হলুদ-বাড়িতে হাওয়া খেতে এসে পড়ে নতুন লোক! চেঞ্জার হয়ত।

ভুল ভাঙে হলুদ-বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়ে। বাড়ি নয়; হাসপাতাল। কি আশ্চর্য এই কিনা হাসপাতাল! চারপাশে করবীর ঝোপ, কয়েকটি কাঠ-চাঁপা গাছ, লাল পাথরের আঁকা-বাঁকা ঘাসের পাড় বসানো একটি সরু পথ—এদিক-ওদিক আরও ক'টি খাপরা-ছাওয়া ফালি ফালি ঘর—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে পরিবেশটাই যার অমন চোখ-জুড়নো, তাই কিনা শেষে হাসপাতাল! হাসপাতাল দেখতে এত ভাল লাগে, কে জানত? কে দেখেছে আর?

সত্যি এমনটিও কেউ দেখে নি, যেমনটি দেখেছে ওই 'কাচঘর'! দূর থেকে মনে হয়েছে, ছবি আঁকার ঘর বুঝিবা; কাছে এসে সে ভুল ভেঙেছে। এখানে তুলি নয় তুলো, রং নয় রক্ত। 'অপারেশন থিয়েটার' তা হলে এই-ই! এই কাচঘর! কিন্তু কোথায় সেই টেবল, ঝুলনো আলো?

নেই, নেই। তিরিশ বছর আগে অবশ্য ছিল। সবই ছিল রেল-লাইন পাতার কাজ হয়েছে যখন এই জঙলী দেশে। তখনই সব তৈরি রেল-কোম্পানীর পয়সায়। বিরাট সে হাসপাতাল। এখন তো ভেঙে-ভুঙে সব মাঠ! শুধু ওইটুকু হাতে-পায়ে ধরে চেয়ে-চিন্তে নিয়েছে ডিস্ট্রিক বোর্ড। ওই হলুদ-বাড়ি হাসপাতাল, আর কাচঘর।

এখন যা আছে, তা আরও অদ্ভুত। কাচঘরের গা-লাগানো করবীর ঝোপ। ডালে পাতায়, ফুলে কাচ-গা ছোঁয়াছুঁয়ি। ভোরের সাদায় মেঘ মেঘ। সকালের আলোয় সোনা-রং। তারপরও থাকে স্তিমিত রৌদ্র বিকেল, আর গোধূলি। হাল্কা রঙের ঢেউ খেলে যায় কাচ-দেওয়ালে। রাত্রের অন্ধকারে ঘন-কালি আঁধার। বিলীন চিহ্ন।

অবশ্য জ্যোৎস্না রাত্রে নয়! ধবধবে জ্যোৎস্নায় কাচঘর কুহকের রাজ্য যেন। দুধ-আলোর দেশ। তেপান্তর পুরী।

একদিন হিরণ সেন এই পথেই এসেছিল। এই দুধ-আলোর দেশেই। তখন শুক্ল-পক্ষ, তিথিটা বোধহয় ত্রয়োদশীই হবে। মাঠ ভেঙে হিরণ হাসপাতালের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নিম-কাঁঠালের ছায়ার পাশে পাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো ঘাসের

বিছানায় নিঝুম ঘুমে অঘোর। হাওয়ায় হাওয়ায় করবীর ডালপাতা কাচ-দেওয়ালে অদ্ভুত এক শব্দ তুলেছে। একটা বুনো পাখি কাচঘরের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দ্রুতগতি পাখনার কাঁপনটুকুও চোখে পড়ল হিরণের।

ঘোর লেগেছে হিরণের তাকিয়ে থাকতে থাকতে! কুহকে পেয়েছে তাকে। নিষ্পলক নয়নে দেখেছে সেই দড়ির রাশি। স্কাইলাইটের দড়ি। কাচের দেওয়াল বয়ে ঝুলেছে অনেক নীচু পর্যন্ত। আর কিছু না, কেউ না। বেবাক ফাঁকা সেই কাচঘর। শুধু খানিকটা বন্ধ হাওয়া, আর আলো। আর আশ্চর্য করুণ শূন্যতা।

তন্ময় হয়ে হিরণ তাকিয়েছিল। চমক ভাঙল শোভনার বিস্মিত প্রশ্নে।

সেই দেখা ওদের, হিরণ আর শোভনার। প্রথম দেখা—অপরিচিত দুটি নরনারী পরস্পরের দিকে চোখ রেখে বিমূঢ় হয়েছে আরও।

অবশেষে কথা বলতে হয়েছে শোভনাকেই। ডাক্তারবাবু ছিলেন না তাঁর কোয়ার্টার্সে। বুড়ো কম্পাউণ্ডার নিজের বাসায় আফিং-নেশায় ঝিম মেরে পড়েছিল। হাসপাতালের চাবি নিয়েছে শোভনা, লণ্ঠন ঝুলিয়েছে হাতে। ডিস্পেন্সারির দরজা খুলেছে নিজেই। অ্যালকালি, অ্যাসিড আর সল্টের বিমিশ্র উগ্র গন্ধে হিরণের চেতনা বুঝি আরও অসাড় হয়ে এসেছে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শোভনার সঙ্গী হয়েছে হিরণ কম্পাউণ্ডারের বাসা পর্যন্ত। কয়েক পা অবশ্য। চাবি রেখে, লণ্ঠন ফেরত দিয়ে আবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছে কাচঘরের সামনাসামনি। হিরণের হাতে স্পিরিট-লোশনের বোতল। পকেটে তুলে।

বাক্যালাপের ছেদ টানল শোভনা এখানে দাঁড়িয়েই। একটু হাসি, ছোট্ট একটি নমস্কার। চাঁদের আলো-ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে চলে গেল—কাচঘর বরাবর। দূরত্ব সামান্যই; নেই বললেও বুঝি চলে। ওই তা হলে শোভনার কোয়ার্টার্স—এক চিলতে ঘর!

শোভনার ঘরের জানালায় বাতি জ্বলতে দেখে হিরণের ঘোর ভাঙল, মোহ কাটল। স্পিরিট-লোশনের শিশিটা মুঠোর মধ্যে জোর করে চেপে ধরল হিরণ। এ তবে স্বপ্ন নয়! দুধসাগরের অতলপুরীর মাঠে-ওড়া সেই পরীও না। নিছক মানুষ। হাসপাতালের নার্স; মিডওয়াইফ। সেবাময়ী একটি নারী।

হিরণ সেন কৃতজ্ঞ বোধ করেছে স্পিরিট-লোশনের বোতল হাতে নিয়ে। এই লোশনে দিদির পায়ের ব্যথা মরবে। আহা বেচারি দিদি। তবু দু'দণ্ড ঘুমুবে রাত্রে!

বাড়ির পথে পা বাড়াতে গিয়ে হিরণ আর একবার তাকিয়েছে। কাচঘরের গায়ে রুপো-জল টলমলে হাসি।

পরিচয়ের সূত্রপাত এভাবেই। এর পর একদিন দিদিকে সঙ্গে করে হিরণ এলো। শোভন এতটা ভাবে নি। খুব খুশীও হয় নি প্রথমটায়। অভ্যর্থনা করেছে সসংকোচে, অনেক কষ্টে হাসি হাসি মুখ ক'রে। দিদির কাছাকাছি বসে নি, কথাও

বলে নি খুব বেশী। ভয়-ভয় করেছে সারাক্ষণ—যতক্ষণ দিদি ছিলেন। অবশ্য তাতে গুলপগুজব জমে উঠতে আটকাল না। দিদি একাই চার। কথা শুরু করলে শেষ করতে জানেন না। হাসতে আরম্ভ করলে থামেন না। দিদিই কলকল করে কথা বলে গেলেন। কবে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসেছেন। এখন সংসার বলতে ওরা দুই ভাইবোন। আজ দু'বছর ধরে হিরণ চাকরি করছে—দু'বছরেই তিন ঘাটের জল খেতে হল। এখানে এসেছেন পুরো দু'সপ্তাহও হয় নি এখনও। তবে এ জায়গাটা তাঁর বেশ ভালই লেগেছে। এখান থেকে বদলি না করলেই ভাল।

শেষ পর্যন্ত দিদি তাঁর টুল থেকে উল্টে পড়ার কাহিনী শোনালেন। বললেন, কি কষ্টই সহ্য করেছেন তিনি পায়ে-কোমরে সেদিন! তবু ভাগ্যই বলতে হবে, ডাক্তার-বাবু না থাকলেও শোভনা হাসপাতালে ছিল!

দিদি বললেন, 'তোমার হাতগুণ আছে, ভাই। মায়া মমতা, কর্তব্যজ্ঞানও খুব। না হলে তখন কে আর হাসপাতাল খুলে ওষুধ তৈরি করে দেয়, বল।'

শোভনা স্পষ্ট দেখল, দিদির মুখে কমনীয়তা আর কৃতজ্ঞতায় মেশামেশি। তাকাল হিরণের দিকে। সে মুখেও তাই। একটু বুঝি অস্বস্তি বোধ করল শোভনা; কিন্তু ভাল লাগল এই কথা, এই মুখ।

'দরকারের সময় আর উপায়ই বা কি ছিল, দিদি!' শোভনা চোখ নামিয়ে বললে, একটু হাসল, 'হাতুড়ে বিদ্যেই ফলিয়ে দিলাম।'

'কি যে বল! সারা দিন এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ তোমরা। কিছু না জানবে কেন? আচ্ছা, এই হাসপাতালে তুমি কতদিন আছ?'

'তা প্রায় আট মাস।'

'ও মা! বেশি দিন তো নয় তাহলে! এর আগে কোথায় ছিলে? কলকাতায়?'

'না; কলকাতায় নয়।' শোভনা মাথা নেড়ে হাসল, 'এর আগে ছিলুম এক কোলিয়ারীর হাসপাতালে। তার আগে আসানসোলে। তার আগে গিরিডি। কলকাতা ছেড়েছি বছর চারেক।'

'বলেন কি!' এবার হিরণ অবাক হয়ে বললে, 'চার বছরের মধ্যে এত জায়গায় ঘুরেছেন? আমাকেও হার মানালেন!'

'বদলির চাকরি, ও আর কি করবে?' দিদি বললেন।

'না। বদলির চাকরি আমার ছিল না, দিদি। এমনিই কাজ ছেড়েছি, কাজ নিয়েছি।' শোভনা হঠাৎ থামল।

'কেন, এক জায়গায় ভাল লাগত না বুঝি?' দিদি প্রশ্ন করলেন।

শোভনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকালে।

দিদি উঠলেন। যাবার সময় শোভনার কাছে এসে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন, 'তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে বড্ড ভাল লাগল, ভাই। মেয়েমানুষের এমনটি না হলে

মানায় না। স্নেহ মমতাই আসল—রূপ ছাই। তোমার ভাই, কিন্তু দুই-ই আছে।
দিদি স্নেহময় হাসি হাসলেন, একদিন এস আমাদের ওখানে। নিশ্চয় আসবে। হিরণ তোমায় নিয়ে যাবে!

শোভনা সায় দিয়ে তাড়াতাড়ি দূরে সরে দাঁড়াল। ভয়ে তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। মুখটাও ফ্যাকাশে দিদির এই ঘন সান্নিধ্যে তার সর্বাঙ্গ শিহরিত।

মাঠে নেমে হাঁটতে হাঁটতে দিদি হঠাৎ বললেন, 'একটা কথা একদম ভুলে গেছি রে, হিরণ!'

'কি?'

'শোভনার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করা হল না। নিজের কথাই সাতগাছ করে বললুম। ছি, ছি! কি ভাবছে শোভনা, কে জানে!'

'পরের বাড়ির কথা না জানাই ভাল।'

'পাগল নাকি তুই? আমি তো হাঁড়ির খবর জানতে চাই নি! ওর বাড়ির খবর জানতে চেয়েছি। এতে দোষ নেই। বরং মানুষ নিজের মা-বাবার কথা বলতে পারলে খুশী হয়।'

'হ্যাঁ; যেমন তুমি।' হিরণ সজোরে হেসে উঠল।

কাচঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দিদি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'এটা কি রে?'

'কাচঘর।'

'কি হয় এখানে?'

'ভূত ঘুরে বেড়ায় রাত্তিরে।'

কথা শেষ ক'রে হিরণ হো হো ক'রে হেসে উঠল। তাকাল পিছনে। শোভনা তার কোয়ার্টার্সের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তখন। দেখছে ওদের ভাইবোনকে।

তৃতীয় সাক্ষাতে হিরণ বললে, 'দিদি আপনার খোঁজ খবর নিতে পাঠালে। কেমন আছেন?'

'ভাল!' শোভনা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে হাসল।

'হাসপাতাল থেকে ফিরলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ; একটু আগে।'

'তবে তো খুব ক্লান্ত রয়েছেন! আমি উঠি।'

'না, না, সে কি! উঠবেন কেন? বসুন।'

'কিন্তু—এখন—এখন আপনি অ্যাপ্রন পর্যন্ত ছাড়েন নি! স্নানটান করবেন হয়ত। এ সময়—

হিরণ কিন্তু কিন্তু করে।

'তাতে কি ? আপনি তো আর হাতে কাজ নিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান নি। বসুনই না একটু একা-একা। আমি আসছি। দেখবেন, একটু দেরি হলে যেন পালিয়ে যাবেন না !' শোভনা মুখ টিপে হাসল। যাবার সময় বাইরে থেকে ঘরের জানলাটা ভেজিয়ে দিলে। দরজাও বন্ধ করলে ঘরে ঢুকে।

হিরণ চুপচাপ বসে থাকল। শোভনার শেষ কথাটাই ভাবছে ! পালিয়ে যাবে কেন সে ? পালিয়ে যাবার হলে এখানে কি আসত ও ? সত্যি, আজ ক'দিনই ঘুরে-ফিরে একটা কথাই মনে ভাসছে হিরণের। হঠাৎ কি যে সে খুঁজে পেয়েছে এখানে, কে জানে ! রোজই সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে বেড়াতে এ পথে তার আসা চাই-ই। কে যেন টানে তাকে। কি আছে এখানে ? কাচঘর ? শোভনা ? বোধহয়, দুই-ই। দুই-ই তার কাছে বিস্ময়, দুই-ই আনন্দ।

চোখের ওপর হাসপাতালের মাঠে শেষ-বিকেলের আলো কখন যে ফুরিয়ে গেল, হিরণ জানল না। আবছা অন্ধকারে পাখিরা ফিরে এলো ! গাছে গাছে কাকলি। হাওয়া উড়ে গেল করবীর ঝোপের মাথার ওপর দিয়ে, ক'টি কাঠচাঁপা ফুল ঝরে পড়ল। হিরণ কিছুই লক্ষ করল না। কাচঘরের গায়ে পশ্চিম আকাশের এক টুকরো তামা-আলো ছিটকে পড়েছে, সেদিকে তাকিয়ে হিরণ। আনমনা।

'তা হলে এখনও আছেন। পালিয়ে যান নি ?' শোভনার ডাকে হিরণ সজ্ঞান হল। তাকিয়ে দেখে, বিকেল শেষ। সন্ধে নেমেছে। সামনে তার ছোট একটি বেতের গোল টেবল। একটি প্লেটে কিছু খাবার, চায়ের কাপ। পাশে আর একটি চেয়ার।

'এসব কি ?'

'কিছু না।' শোভনা খালি চেয়ারটায় বসল, 'একটু চা খান।'

'আপনি ?'

'এই তো হাতেই রয়েছে !' শোভনা চায়ের কাপ দেখিয়ে হাসল।

চা খেতে খেতে হিরণ লক্ষ করল শোভনাকে। সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। সারাদিনের ক্লান্তি জলে-সাবানে ধুয়ে ফেলেছে। প্রসাধন সেরে এসেছে এইমাত্র। কমলারঙ শাড়ি পরনে, এলো খোঁপা কাঁধের পাশে ভেঙে পড়েছে। কপালে একটি কুমকুমের টিপ। শোভনার সাজসজ্জায় স্নিগ্ধ ঘরোয়া রূপ। চোখ আরও যেন জড়িয়ে আসে।

'দিদি কেমন আছেন ?'

'ভালই।'

'যাব একদিন আপনাদের ওখানে।'

'চলুন না। কবে যাবেন ?'

'দেখি কবে যাই। অনেক দূর নাকি আপনাদের বাড়ি ?'

'তা একটু দূরই হবে।'

দু'জনেই আবার চুপ। আর কথা নেই।

'আপনি রোজ এদিকে বেড়াতে আসেন, না?' শোভনা প্রশ্ন করলে।

হিরণ হঠাৎ কেমন যেন লজ্জা পেল এই প্রশ্নে। মাথা নেড়ে সায় জানাল!

'রোজই দেখি আপনাকে।' শোভনা একটু হাসল বুঝি ঠোঁটের কোণে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে হাসপাতাল অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

হিরণ বললে, 'চলুন, মাঠে মাঠে একটু বেড়াই।'

হাসপাতালের একটু দূরে একটা পুকুর। সেই পুকুর পর্যন্ত পাশাপাশিই হেঁটে গেল ওরা। বেশি সময়টা মুখ বুজে, কখনও-কখনও কথা বলে। একটু বসল পুকুর পাড়ে—ঘাসে। বসে বসে আকাশের তারা দেখল, পুকুরের হু হু হাওয়া খেল।

ফেরার পথে হিরণ বললে, 'জানেন, দিদির বড় আফসোস!'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে গেল, কিন্তু আপনার খোঁজ খবর নেয় নি।'

'সে কি! আবার কিসের খোঁজ-খবর?'

'বলেন কেন আর! দিদির ধারণা, কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে তার বাড়ির পিতা-মাতা-ভগিনীর খোঁজ-খবর নিতে হয়। না নেওয়াটা নাকি অসামাজিকতা, হৃদয়হীনতা।' হিরণ সজোরে হাসল। ফাঁকা মাঠে সে হাসি উড়ে উড়ে ছড়িয়ে গেল!

হাঁটতে হাঁটতে কাচঘরের সামনে এসেছে ওরা। হিরণের কথায় শোভনা কেন যেন বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। হঠাৎ খুব চাপা গলায় দ্রুত উচ্চারণে বললে, 'কেউ নেই আমার! কেউ না!'

ঝাপটা বয়ে গেল হাওয়ার আচমকা। শুকনো পাতাই বোধহয় উড়ে এসেছিল। একটা কুটো পড়ল হিরণের চোখে। চোখ বন্ধ করলে হিরণ। করকর করছে। চোখ রগড়ে হিরণ দেখে, শোভনা পাশে নেই। অনেকটা এগিয়ে গেছে। সামনে সেই ফাঁকা কাচঘর। নির্জন, নিস্তব্ধ, শূন্য।

অন্ধকার বারান্দায় একা বসে শোভনা তন্নতন্ন করে আর একবার মন হাতড়েছে; ভেবেছে নিজের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবার। সেই দিনই। অনেক মাস পরে। হিরণকে কথাটা মিথ্যেই বলেছে শোভনা। তার কেউ নেই—এ কথা সত্যি নয়। মা-বাবা নেই কিন্তু দাদা-বৌদিরা আছেন। আরও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। তবু থেকেও তারা নেই।

কবেই যেন সব হারিয়ে গেছে। সব। তখন শোভনা কিশোরী। কতই বা বয়স! তেরো-চোদ্দ হবে বড় জোর। সেই তখনই ও জানতে পারল, ওর জীবনের কোন

মূল্যে নেই। নেই, নেই। বাড়িতে, দেওয়ালে, টেবলে, বিছানায় মা-বউদিদের, এমন কি দাদাদেরও চোখে-মুখে সর্বত্রই সে দেখেছে এই 'নেই-নেই'। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে শোভনাকে ভাবতে হয়েছে তার রিক্ততার কথা। সারাক্ষণ তার মাথায় ভর করেছে একই চিন্তা।

মা কেঁদেছেন, বউদিরা মুখ ভার করেছে ; ফিসফিস করেছে আড়াল-আড়ালে, বন্ধুরা আভাসে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। কি নিষ্ঠুর সেই সান্ত্বনা ! বিশ্ব-সংসারের ওপরই বিরূপ হয়েছে সে। মাঝ-রাতে বিছানায় উঠে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে শোভনা। কুটিকুটি করেছে ভগবানকে। নির্মম আক্রোশে দেওয়াল থেকে মার গুরু-দেবের টাঙানো পটখানা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মেঝেতে। না, না, মানে না ঈশ্বর, গুরু, তুক-তাক, ধর্ম—কিছুই না !

আবার মন শান্ত হলে শুধুই গালে হাত দিয়ে বসে থেকেছে। ঝরঝর করে দু'চোখ বেয়ে জল ঝরেছে।

সে দুঃখ, সে অসহ্য যন্ত্রণা, আর আত্মনিপেষণের খোঁজ কেউ রাখে নি।

শেষ পর্যন্ত একদিন বাবার সঙ্গে এক নামকরা ডাক্তারের কাছে গিয়ে শোভনা যেন দিশে খুঁজে পেল। সেই ডাক্তার ভদ্রলোকই বলেছিলেন তাঁর চেম্বারের গায়ে অপুষ্পক একটি গাছ দেখিয়ে, 'ও গাছটা দেখ ! ওতে ফল-ফুল দুই-হবার কথা। কিন্তু প্রকৃতির এমনি পরিহাস, কোন ঋতুতেই ওতে ফুল ফুটল না, কোনদিন ফল দেখলাম না। স্টিল, ওই ব্যারেন গাছ, ওর জন্যে আমার ঘুম নেই। নিজের হাতে ওর গোড়ার মাটি খুঁড়ি, জল দি, পোকা মারি। বড় ভালবাসি গাছটাকে। দেখ না, কি সুন্দর ছায়া দিয়েছে। ওই ছায়ায় বসে বসে আমি জার্নাল পড়ি।'

শোভনা অবাক চোখে সেই গাছটি দেখেছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, 'দুর্ঘটনার উপর কোন হাত নেই, মা। মন খারাপ ক'রো না। তোমার ছায়াতেও লোকে আরাম পাবে।'

শোভনা আরও একটু ভেবেছে ; আর সে ভাবনা শুধু এই যে, ওই গাছের মত সেও না কোন একজনের ভালবাসাটুকু পাবে। ভালবাসা অন্য জিনিস—স্থূল শারীরিক বিকাশ কখনই তার অন্তরায় হতে পারে না ! পারে না !

এতদিনে শোভনা আঠারোয় পা দিয়েছে। পড়েছে নার্সিং, পাস করেছে জুনিয়র মিডওয়াইফারি।

পাঁচজনের চোখের সামনে ঘোরা-ফেরা করতে হবে ; আছে সমাজ, লোক, হাসপাতাল, নিত্য অপরিচিতের মুখোমুখি দাঁড়ানো। শোভনা তাই বিশেষভাবে শোভন করেছে নিজেকে। চোখে কারুর বিসদৃশ ঠেকে নি। আর, সত্যিকারের লজ্জা তো এই বাই-রের কাছে। ভেতরে তো লজ্জা নয়, দুঃখ। সে দুঃখের পরিধি নেই। আর ভেতরের যে ব্যর্থতা, তার গোপন কথাটুকু তো একান্তভাবে ও-ই জানে। আর জানে

বাড়ির লোক।
বোধহয় তাই বাড়ির লোকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল শোভনা। একা হয়ে দিন কাটায়। নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে, পছন্দ করে নির্জনতা। আর, আর যেখানে অপরিচয়, যেখানে কাছে যাওয়া-যাওয়া নেই, শোভনার তাই ভাল লাগে।
এই সময়ই প্রথম ধাক্কা খেল শোভনা।
হাসপাতালেই আলাপ; অর্থোপেডিক্স-এর ছোকরা হাউস-সার্জন। সব সময়ই সিস্টার সিস্টার করত। শোভনা ভেবেছিল—। যাক, সে ভুল ভাঙল। সে ছোকরা হাউস-সার্জন অন্তত একটা উপকার করেছে শোভনার। পুরুষমানুষের মনটাকে জানতে দিয়েছে।
কলকাতা ছেড়ে তার পরই শোভনা চলে এলো। পরিচিত পরিবেশ তার কাছে যেন আরও অসহ্য লেগেছে তখন থেকে।
চাকরি নিয়ে শোভনা মফস্বল শহরে চলে এসেছে। থেকেছে একা-একা; কাজ নিয়ে, নিজের মন নিয়ে।
ভালই কেটেছে প্রথম-প্রথম। কোন রহস্যময় হাসি কাউকে হাসতে দেখে নি। কেউ ফিসফিস করে নি তাকে লক্ষ করে। কিন্তু মজা এমনই—চার মাস, বড় জোর ছ'-মাস। এর বেশি কোথাও টিকতে পারল না শোভনা। এর মধ্যেই উড়ো চিঠি আসতে শুরু করেছে, রঙিন খামে মোটা মোটা প্রেমপত্র। ওর বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করেছে অনেক তরুণ।
ভয় পেয়েছে শোভনা। ও জানে, ওদের মোহ কোথায়। আর জানে তার শেষ কোথায়। ধরা দিতে গেলে ধরা পড়তে হবে। শোভনা ধরা পড়তে চায় না।
যত তাড়াতাড়ি পেরেছে, শহরের তরুণকুলকে হতাশ করে শোভনা মিত্র উড়ে গেছে অন্যত্র।
এখানেই যা বেশি দিন অন্ন-জল ছিল তার। আট-আটটা মাস কাটিয়ে দিয়েছে ফাঁকায় নির্জনে। কারুর সঙ্গে কোনও পরিচয় রাখে নি; কোথাও হৃদ্যতার প্রলেপ লাগে নি। বেশ ছিল ও এখানে। তার মনোমত জায়গা। ভেবেছিল, কিছুকাল কাটবে এখানে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে—এবার এখানের পালাও শেষ করার সময় এলো। কি কুক্ষণেই দেখা পেট্রোল ডিপোর ইন্সপেক্টর হিরণ সেনের সঙ্গে। আর যদিও বা দেখাই হয়েছিল, কেন মরতে শোভনা অত গায়ে পড়ে কর্তব্য করতে গেল? কি যেত আসত হিরণের দিদি সারা রাত পায়ের-কোমরের ব্যথায় চিৎকার করলে? কিছু না।
আর সেদিন—সেদিন কি ভয়ই পেয়েছে শোভনা, দিদি যখন ওর থুতনিতে হাত দিয়ে আদর জানাচ্ছিলেন! মেয়েদের চোখকেই না বেশি ভয়।

শোভনা উঠে দাঁড়াল। রাত হয়ে গেছে। এক্সপ্রেস গাড়িটা সমস্ত প্রান্তে গুরু-গুরু ধ্বনি তুলে বেরিয়ে গেল।

বুক বয়ে শোভনার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। চোখেও জল এসে পড়েছে। এই বাড়ি, এই হাসপাতাল এবার ছেড়ে যেতে হবে। হ্যাঁ—হিরণের চোখের দৃষ্টিতে শোভনা দেখেছে সেই আবেশ, সেই আবেগ। বিশ্বাস নেই ওকে।

যেতে হবে, যেতে হবে করেই শোভনার দিন কেটে গেল ; যাওয়া আর হল না। হিরণের আসা-যাওয়া বাড়ল। বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে দু'জনে মুখোমুখি হয়ে গল্প করে অনেক রাত পর্যন্ত। কোনদিন বেড়াতে বেরোয়, কোনদিন বা শুধুই চুপ করে ওরা আকাশ দেখে। আর মনে মনে ভাবে।

হিরণ, শোভনা—কেউ ছেলেমানুষ নয়। ওদের প্রতি আকর্ষণকে মনে মনে দু'-জনেই স্বীকার করে নিয়েছে। দিনে দিনে তাই একের কাছে অন্যে সহজ হয়ে উঠতে লাগল, কেটে যেতে লাগল অনাত্মীয়তার সংকোচ, একের ওপর অন্যের একটা দাবি গড়ে উঠতে লাগল ওদেরই অজ্ঞাতে।

হিরণ একদিন বললে, 'একটা কথা বলব, শোভনা ?

'বল'।'

'তুমি যেন দিন-দিন বড় অন্যমনস্ক হয়ে উঠছ !'

'কই, না তো !'

'না বললে আমি শুনব কেন ? কি হয়েছে তোমার ?'

'কিছু না। সত্যি বলছি কিছু হয় নি। বরং তুমিই যেন আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছ।' শোভনা চোখ তুলে চাইল।

হিরণ শোভনার চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকল। আজকাল চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে হিরণ আর লজ্জা পায় না। বরং শোভনার দু'টি কাল কাল ডাগর চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে হিরণ সব ভুলে যায়। স্তিমিতআভা, করুণ, শান্ত দুই চোখ। শোভনার জীবনে কোথাও একটা শূন্যতা আছে, হিরণ তা জানে না, তবে অনুভব করে এই চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। অনুমান করেছে সে, আত্মীয়স্বজনহীন একক নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যেই হয়ত শোভনার এই শূন্যতা। ও ক্লান্ত ; ক্লান্ত তার এই প্রাত্যহিক কর্মপরিবেশে। খাপ খায় না ওর মনের সঙ্গে এই হাসপাতাল আর অ্যাসিড, অ্যালকালি, আয়োডোফর্মের উগ্র গন্ধ।

আর একদিন মাঠ ধরে বেড়াতে বেড়াতে হিরণ বললে, 'ভাল লাগে না আর !'

'কি ?' শোভনা একটু চমকে উঠল।

'তোমার এই ছাড়া-ছাড়া ভাব।' হিরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

'হঠাৎ আবার এ কথা কেন ? আমি তো তোমায় বলেছি—'

'বল নি, বল নি, কিছুই বল নি আমায় !' হিরণ ছেলেমানুষের মতন বললে,

আবেগে অভিমানে শোভনার কথায় বাধা দিয়ে।
'বলি নি তোমায় ?' শোভনার বুক দুড়-দুড় করে।
'না। বললে তো আমি বেঁচে যাই !'
'বেশ। কি শুনতে চাও, বল ?'
'আর কিছু না ; শুধু শুনতে চাই, তুমি কেন এমনভাবে কাছে থেকেও দূরে 'সরে আছ !'
'কাছে থাকার মতো কপাল করি নি, তাই হয়ত।' শোভনার গলা বুজল ; এক কণা হাসি ঠোঁটের কোণে ম্লান আলোর মতো চিকচিক করে উঠল।
কপালটা যাচাই করে দেখেছ কখনও ?'
'দেখে লাভ ? শেষটুকু তো জানি।'
'না, জান না। বিশ্বাস করে একবার যাচাই করেই দেখ।'
'বিশ্বাস !' শোভনা ঠোঁট নাড়ল। ঘূর্ণি উড়ে যাচ্ছে সোঁ সোঁ। গাছের পাতা কাঁপছে, উড়ছে খড় কুটো।
হিরণ-শোভনা দ্রুত পায়ে পথ ধরেছে।
কাচঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে হিরণ। আর আজ, হঠাৎ, হঠাৎ তার মনে হয়েছে, ওই কাচঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে ঝড়ের ধুলো-বালি তাদের স্পর্শ করতে পারত না।
বাড়ির বারান্দায় পা দিয়ে শোভনা বলেছে, 'কাল তুমি এস না। আমার একটু কাজ আছে। পরশু দিন এস। সন্ধ্যে ক'রেই। কথা আছে।'

সারা রাত, সারা দিন—আবার সারা রাত ভেবেছে শোভনা ! ভেবে ভেবে এইটুকু জেনেছে, হিরণের আকর্ষণ তার কাছে বড়ই তীব্র। হিরণকে সে আর পাঁচজন ছেলের মতো ভাবতে পারে নি, পারে না। তাই যদি ভাবত, তবে তো কবেই চলে যেতে পারত এই হাসপাতাল ছেড়ে! সে চেষ্টাও কি করে নি! করেছে। কাজও পেয়েছিল এক মাইকা মাইনের হাসপাতালে। তবু কেন শোভনা গেল না ! সহজ কথা, সে যেতে পারে নি। যেতে চায় নি।
এত কাছাকছি থেকে যে চিরকাল এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, শোভনা তাও জানত। তবু এড়িয়ে গেছে, বড় ভয় করেছে তার। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়েছে, এই ভয়টুকুই সে কাটিয়ে উঠুক। হিরণ তো তাকে ভালবাসে। সত্যি ভালবাসে। হয়ত, হিরণ সব সহ্য করে নেবে।
দিনের পর গেছে দিন, একটু একটু করে শোভনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছে হিরণের মন। খুব ভাল করে না বুঝলেও এটা বুঝেছে হিরণ তেমন পুরুষ যার কাছে শোভনা অনেক আশা করতে পারে।

বিশ্বাসের কথা যেদিন হিরণ নিজেই বললে, সেদিন শোভনার সমস্ত সংযম যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল। অনেক কষ্টে সংবরণ করেছে নিজেকে।

আজ দু'দিন শুধু ভাবল শোভনা, বিশ্বাস—বিশ্বাস। জগতে কাউকে-না-কাউকে তো বিশ্বাস করতেই চেয়েছে শোভনা! তার জীবনে এই সত্যিকারের ভালবাসা, এবং প্রথমই বলা চলে। হিরণেরও তাই। শোভনার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গভীরভাবে ভালবাসে ওরা পরস্পরকে। একই নৌকোয় এ হাল ধরেছে, ও উজান বাইছে। বিশ্বাস না করে উপায় কি? তা ছাড়া, এ জগতে সব তো এক নয়! নিজের দিকে তাকিয়ে শোভনা তাও বুঝতে পারে। সকলেই সেই অর্থোপেডিক্স্-এর হাউস-সার্জন নয়! সকলেই নীলখামে প্রেমপত্র লিখে প্রাণ নিবেদন করে না। এ জগতেও মানুষ আছে! আছে মমতা, করুণা, স্নেহ, আর সেই ফুলের মতো ভালবাসা যাতে কাঁটা নেই, যা আগুন চায় না, রূপও নয়। শুধু বুক-ভরা ভালবাসা, সেবা, নিবিড় ছায়ার আশ্রয়, শান্তি—এতেই যে খুশী, এতেই যার সব পাওয়া।

হিরণ তাই। শোভনা হিরণের কাছে এতটাই আশা করে। এমনই চায়। তাই আজ ওকে বিশ্বাস সে করবে, করবে।

অপেক্ষা করছিল শোভনা মাঠ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বিকেল থেকেই মেঘ জমে উঠেছে আকাশে। থমথম করছে চারপাশ। একটু হাওয়া নেই। ঝড় উঠবে বুঝি। ঝড় উঠলে হিরণ কি আসবে? যদি না আসে?

ঝড় ওঠার আগেই হিরণ এসে পৌঁছল। হাতে তিন সেলের টর্চ।

আজ আর বারান্দায় নয় সোজা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল শোভনা হিরণকে। দরজা দিল বন্ধ করে। খোলা রইল জানালাটা শুধু।

হিরণ চেয়ারে বসল। সামনে টেবলের ওপর সুদৃশ্য একটা টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। সাদাটে আলো। টর্চটা পাশে রেখে দিল হিরণ।

ওই আলোয় হিরণ দেখল শোভনাকে। শোভনার আজ নতুন রূপ। শাড়ি পরেছে আকাশ-রঙের; গায়ে গভীর নীল ব্লাউজ। গলায় দুলছে সরু হার। কণ্ঠার কাছে ধবধবে সাদার ওপর সুন্দর একটি লকেট। কর্ণে আভরণ, হাতে নতুন দুটি বালা। কপালে কুমকুমের টিপ। খোঁপা বেঁধেছে নতুন ছাঁদে, তাতে একটি কাঠচাঁপা গোঁজা। শোভনা যেন অভিসারে মেতেছে আজ।

হিরণ অভিভূত হল। মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসছে ঘরে!

'কি দেখছ?' শোভনা একটু দূরে বিছানায় বসে বলল। মুখ-ভরা হাসি তার।

'তোমাকে।'

'আমি কি নতুন?'

'আমার চোখে অন্তত!'

‘চোখের দোষ হয়েছে তোমার।’ শোভনা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসি উচ্ছল, চপল।

সময় কাটছে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক-একটি গলে পড়া মোমের বিন্দু। জানালা দিয়ে একটা পোকা উড়ে এসেছে কখন। টেবল-ল্যাম্পের শেডের কাছে ফরফর করে উড়ছে। চক্কর দিয়ে দিয়ে।

‘শোন!’ হিরণ ডাকল।

‘বল!’ শোভনা বিছানার ওপর হাত পিছু করে এলিয়ে বসেছে। মনোহর ভঙ্গি করে।

‘এখানে এস।’

‘কেন? আমি কি খুব দূরে?’ শোভনা হাসল। মাদকতা মাখানো সে হাসি। কিন্তু কাছে এলো। একেবারে হিরণের কাছে। গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

টেবল-ল্যাম্পের শেডে কাঁচপোকাটা মুখ ঠুকরে পড়েছে। জানালা দিয়ে হু-হু হাওয়া এলো দমকা। ঘুটঘুটে অন্ধকার বাইরে, ঝড় এলো বুঝি।

‘বল!’

‘কি বলব?’

‘তা আমি কি জানি! যা তুমি বলবে, বলেছিলে!’ হিরণ শোভনার হাত ছুঁলো। সরে গেল শোভনা। ঝড় উঠেছে বাইরে। দুরন্ত হাওয়ায় সোঁ-সোঁ শব্দ। নিম-কাঁঠালের ডাল-পাতার ঝাপটানি। ভয় পেয়েছে রাত-শান্ত পাখিরা। গাছের মাথায় ককিয়ে উঠছে দল-বেঁধে।

পোকাটাও নিস্তেজ হয়ে এসেছে। শেডের গায়ে আছড়ে পড়ে আবার সরে যায় দূরে।

জানালা বন্ধ করে দিলে শোভনা। ওর বুক কাঁপছে। ঘাম জমে উঠেছে কপালে। থরথর করে কাঁপছে পা।

‘কি চাও তুমি আমার কাছে?’ শোভনা পা-পা ক’রে এগিয়ে আসতে আসতে বলল। গলায় চাপা, কাঁপা সুর।

‘কি আর চাইব? যা তুমি দেবে!’ হিরণের গলায় আবেগ।

‘আমি?’ শোভনা হিরণের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ওর মাথা শোভনার বুকে ছুঁয়েছে। হাতটি তুলে নিয়েছে নিজের হাতে, ‘আমার দেবার মতো কিছু নেই, হিরণ!’

‘রাজ্যপাট তোমার কাছে কে চেয়েছে? সবাই যা দেয়, তাই দিও। তাতেই আমি খুশি হব।’

‘স-বা-ই-যা দেয়!’ শোভনা যেন বিড়বিড় করল নিজের মনে। একটা হাত তার টেবল-ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেছে আস্তে আস্তে। শিখাটা কমে আসছে! একটু একটু করে অন্ধকার জমেছে। শোভনার তপ্ত নিশ্বাস হিরণের মুখে। জ্বরের

ঘোরে যেন বিকার বকছে শোভনা, 'সবাই যা দেয়, তাও যে পারি না আমি !'

'তার মানে ? বউ হতে পার না ?'

'পারি ।'

'তবে আবার কি !' হিরণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ।

'শুধু বউয়েতেই তোমার মন উঠবে ? আমি—' শোভনা কথা শেষ করতে পারল না ।

'কি ?' হিরণ অবাক ।

টেবল-ল্যাম্পের বাতি জোনাকির মতো জ্বলছে । সারা ঘর অন্ধকার । মৃদু ফট-ফট খস-খস শব্দ উঠছে একটু ।

'তার বেশি কিছু চাইবে না তো ?'

'মানে ? কি হেঁয়ালি বকছ—বুঝি না । বাতিতে তেল নেই নাকি ?' হিরণ কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছে, 'স্পষ্ট ক'রে বল, কি বলতে চাও ! বউ ছাড়া আর তোমার কি হতে হবে ? ও ! তুমি মা হবার কথা বলছ ? মা হতে চাও না ?'

চুপ । চুপ । সব চুপ । বাইরে ঝড়, ভেতরে অন্ধকার ।

শোভনার দ্রুত নিশ্বাসের উত্থানপতন । টিক্-টিক্ শব্দ টাইমপিসে ।

ফুঁপিয়ে উঠেছে শোভনা । বিকার বকছে আবার, 'চাই—চাই ! কিন্তু পারি না ।'

গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতো শোভনা যেন প্রাণে-মনে ছিঁড়ে গেল । গলা চিরে অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা ককিয়ে উঠেছে । হিরণের হাত টেনে নিয়েছে নিজের বুকে । যেখানে ধক ধক করছে ওর হৃৎপিণ্ডটা, যেখানে অনেক তাপ, অনেক জ্বালা আর শুধুই একটা কঠিন স্পর্শ । কোনও কৃত্রিমতা আজ আর যেখানে নেই ।

হিরণের হাতে যেন সাপে ছোবল মেরেছে । সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায় ওর ! চকিত হিরণ বাম হাত বাড়িয়ে টেবল-ল্যাম্পের নিবে আসা শিখাকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয় ।

বাজপড়া গাছের মতো শোভনা ঝুঁকে রয়েছে হিরণের মাথার কাছে, নিশ্চল । নিস্পন্দ । শাড়ির আঁচল পড়েছে লুটিয়ে, নীল ব্লাউজের বুক চিরে একটা পর্দা উঁকি দিয়ে আছে । দাউ-দাউ আলোয় হিরণ নিমেষের জন্য দেখল শুধু অস্থিসার পাঁজরার ওপর একটা সাদা পর্দা কোনরকমে আটকানো । ধুধু মাঠ, মরুভূমি । স্তনহীন কঙ্কালসার প্রেতিনী ।

সাপের বিষ যেন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে হিরণের । অসাড় অচেতন তার সর্বাঙ্গ । দুটি চোখে অতল বিস্ময় । সারা মুখ ভয়ে পাংশু । হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এসেছে যেন । একটা পিশাচ-পাথর কাঠিন্যের মুখোমুখি ও বসে ।

অস্ফুট, ভয়ার্ত একটা চিৎকার করে হিরণ ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে । খোলা দরজা দিয়ে ঝড় ঢুকল নিমেষেই । তোলপাড় হল বিছানা, টেবল, বই ; টেবল-

ল্যাম্পটা দপ দপ ক'রে নিবে গেল।

বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। দুরন্ত ঝড়। হাসপাতালের মাঠ-গাছ-ঝোপ হাওয়ার চাবুকে চাবুকে অস্থির। নিম-কাঁঠালের ডাল-পাতা ঝুঁটি দুলিয়ে রুখে উঠেছে। একটানা গর্জন। একদল শেয়াল বিকট চিৎকার করে অন্ধকারে অন্ধকারে ছুটে যাচ্ছে কোথায় যেন।

এই অন্ধকারে হিরণ মাঠে। পায়ে পায়ে বাধা! কে যেন ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটিতে ঠেলে দিচ্ছে। ধুলোয়-পাতায় চোখ-মুখ একাকার। নিশ্বাস নিতে পারে না। ঠাওর হয় না কিছু, দিশে পায় না।

গাছে পা জড়িয়ে ছিটকে পড়েছিল হিরণ। আবার উঠেছে। হাতড়ে হাতড়ে ডাল ধরেছে করবী ঝোপের, কোনরকমে উঠে এসেছে বারান্দায়। ফাঁকা বারান্দার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে; পা পা করে এগিয়ে গিয়েছে তবু। হাতে ঠেকেছে দরজা। ধাক্কা দিয়েছে গায়ের সব জোরটুকু নিঃশেষ করে। ঝনঝন শব্দ হয়েছে একটা। খান-খান হয়ে ভেঙে পড়েছে কি যেন। দরজা তবু খোলে নি। দু'হাতে মুখ ঢেকে হিরণ বসে পড়েছে দরজার গোড়ায়।

শোভনার সংবিত ফিরে এলো যখন, তখন ঝড়ের হাওয়ায় ঘর একাকার। খোলা দরজা দিয়ে ভাল্লুক-গা অন্ধকার ঢুকছে।

হিরণ কি চলে গেল এই ঝড়ে, অন্ধকারে! নাকি এখনও আছে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে, কিংবা মাঠে। চলেই গেছে হয়ত কিন্তু এই দুর্যোগে মানুষ যাবে কি করে!

টেবল হাতড়াতে গিয়ে হিরণের ফেলে-যাওয়া টর্চটা হাতে ঠেকল শোভনার। আস্তে আস্তে তুলে নিল এই শেষ লুকনো আলোটুকু আবার।

বারান্দায় কেউ নেই। মাঠে আলো ফেলল শোভনা, কেউ নেই। তবে? মাঠে নেমে এসেছে শোভনা। এদিক-ওদিক টর্চ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছে থেমে থেমে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আলোয় চোখ পড়ল। কাচঘরের দরজার সামনে বারান্দায় ঝড়ো-মূর্তি হিরণ। মাটিতে হাত-পা গুটিয়ে বসে।

কাছে এলো শোভনা। দাঁড়াল একটু। কোনও কথা নয় কোনও আবেগ নয়—শুধু টর্চটা এগিয়ে দিলে।

হাত বাড়িয়ে টর্চ নিল হিরণ। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওরা দু'জনে আবার। হিরণ টর্চের আলো ফেললে। কাচঘরের দরজার ওপরের কাচগুলো ভেঙে পড়েছে। দরজাটাও থরথর করে কাঁপছে! শব্দ হচ্ছে মচমচ। ভেঙে যাবে এখুনি হয়ত। ঝড়ের হাওয়া ঢুকে পড়েছে বন্ধ কাচঘরে। কাচ-গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফুঁসে উঠছে সেই হাওয়া। আর—আর হিরণ সভয়ে দেখলে সেই লম্বা লম্বা স্কাই-লাইটের ঝুলন্ত দড়িগুলো সাপের ফণার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, দুলছে, জড়িয়ে যাচ্ছে গায়ে

গায়ে। শূন্য ঘরে দড়ির ফণা অদ্ভুত এক হিংস্র আকর্ষণে ডাকছে যেন।
কাচঘরের কপাট বুঝি ভাঙল।
মাঠে নেমে এলো হিরণ একা। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। কাচঘরের ওই তীব্র ভৌতিক আকর্ষণকে সে বিশ্বাস করে না। পড়ে থাক পিছনে কুহক আচ্ছন্ন রহস্যময় ওই কাচঘর, পড়ে থাক ওর বাইরের সৌন্দর্য, থাক ওই শূন্যতা। অত শূন্যতা, অত হাহাকার ও সহ্য করতে পারে না। পারবে না।
হিরণ এগিয়ে চলল। যেতে যেতে মনে হল, অনেক পথ হেঁটে এ কোন্ আলো দেখে ও আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিল! আশ্রয় কই? এ যে শুধু জলা মাঠে আলেয়ার আলো। ফাঁকা কাচঘর।
আর একবার কাচঘরের দরজার শব্দ উঠেছিল। হিরণ শোনে নি। তখন সে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আর শোভনা তখন না বারান্দায়, না মাঠে। তার ঘরেও নয়!

[দেশ : জুন ১৯৫৩]



জোনাকি

ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে অল্প যে ক'জনকে আজও মনে পড়ে, স্যামুএল পল্ আর আমি একই সঙ্গে মফস্বলের মিশনারি কলেজে পড়েছি, কলেজ হস্টেলের একই রুমে থেকেছি দু'জনে প্রায় দু'বছর। ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের পর বোধহয় পুরো হপ্তাও কাটে নি, আমি আবিষ্কার করলাম—স্যামুএল আমার আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে—সর্বত্র বিরাজ করছে সর্বক্ষণ। স্যামুএলও সেটা বুঝতে পারল। তারপর একদিন কলেজে যেতে যেতে হঠাৎ তার বই দুটো আমার হাতে চাপিয়ে দিয়ে রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, তুমি যদি মেয়ে হতে, এক্ষুনি হাত ধরে তোমায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতাম চার্চে। বিয়ে করে ফেলতাম। কিন্তু লর্ড বাঁচিয়ে দিয়েছেন! ভাগ্যিস প্রিটি গার্ল হওনি! মেয়ে আর বিয়ে দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি! তোমাকে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত আমি কাট মারতাম। বাট, গড হ্যাজ সেভড! বন্ধুত্বটা আমাদের থাকবে, পরিমল!

স্যামুএল তার স্মার্ট দেহটাকে বেঁকিয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিল। হাসল হোহো করে। পিটে থাপ্পড় মেরে বললে, ফ্রেনডশিপ একটা নোব্‌ল্ রিলেশন—নাথিং আনডার দি সান ইজ সো বিউটিফুল অ্যান্ড সুইট!

আমার হাত থেকে সব ক'টা বই উঠিয়ে নিয়ে ও কলেজের রাস্তার উল্টো দিকে মুখ ফেরাল।

'আজ আর কলেজ নয়! চল্, কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'বলিস কি। অ্যাডমিশন নিতে-না-নিতেই ক্লাস কামাই করব?'

'অব কোর্স! ক্লাস পালাবি না, ফেল করবি না—তবে মরতে এসেছিস কেন পড়তে।' স্যামুএল যেন আমায় ধমক দিল, 'আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি তিনবারের বার। একটা 'রাজ কলেজে' গিয়ে ফার্স্ট ইআরে ঢুকেছিলাম—সুবিধে হল না সেখানে। ওরা আমায় সেকেন্ড ইআরে তুলবেই! শেষ পর্যন্ত রাজার ভাগনেটাকে ফুটবল-মাঠে অ্যায়সা মার দিলুম যে, কলার-বোন ফ্র্যাকচার! প্রিনসিপ্যাল তাড়িয়ে দিলেন। বাঁচলাম আমি। রাজকুমারকে ঈশ্বর দীর্ঘজীবী করুন।'

অট্টহাসি হাসল স্যামুএল।

স্যামুএলের সব পরিচয় পেতে আমার খুব বেশী সময় লাগে নি। না লাগবারই কথা। ওর চরিত্রে যত সদ্ ও বদ্ গুণ, স্যামুএল যত তাড়াতাড়ি পারত, জাহির করে ফেলত—হয় কথার মধ্যে, না-হয় কাজের মধ্যে দিয়েই।

কলেজে সেবার তো আমরা নতুনই ! কলেজ টিমের ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। পুরনো ছেলেরা আছেই—খেলছে সব। থার্ড ইআরের রবীন চক্রবর্তী টিমের ক্যাপ্টেন। স্যামুএলকে তারা চেনে না, জানে না। সেই স্যামুএলই ফুটবল-মাঠে কলেজ টিমের প্র্যাকটিস-খেলা দেখতে গিয়ে আচমকা আমায় বললে, তুই কোন্ পজিশনে খেলিস রে, পরিমল ?

'রাইট আউট।'

'ঠিক আছে। রবীন কোম্পানিকে আজই তাড়াব।'

কথাটা শেষ করতে-না-করতেই দেখি, স্যামুএল আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে মাঠে নেমে পড়ল।

রবীন চক্রবর্তী তার দলবল নিয়ে ছুটে এলো। খেলা দেখছিল যারা, তারা চেঁচা-মেচি শুরু করলে।

'কি চাও, কি চাও ? মাঠের মধ্যে এলে কেন ? পাগল নাকি ?'

'ননসেন্স ! স্যামুএল তার ট্রাউজারসটা গুটিয়ে গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলছে, 'আমরা দুজন কলেজ টিমে খেলব—সেনটার ফরোআর্ড আর রাইট আউট।'

'হাফ-টাইম হয়ে গেছে, সে খেয়াল আছে তোমাদের ?'

'যথেষ্ট আছে, মশাই ! তিন গোলে তো হারছেন ! বোগাস ! যেমনি ক্যাপ্টেন, তেমনি টিম সিলেকশন। অন্য কোথাও হলে ইআর পুল করে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিত। হটিয়ে দিন দুজনকে—আমরা খেলব। কিছু না হোক, রেস্ট-এর গোল তিনটেও তো শোধ করতে পারব !'

স্যামুএলের ঔদ্ধত্য দেখেই হোক বা ওর ভাব-ভঙ্গিতেই হোক, রবীন চক্রবর্তী আমাদের খেলতে দিলে ; হটিয়ে দিলে দুজন খেলোয়াড়কে।

স্যামুএল আমায় ফিসফিস করে বললে, 'আমার অনার এট স্টেক, শালা ! জান লড়িয়ে দিয়ে খেলবি। বন্ধুত্বটা একবার দেখিয়ে দে !'

আজ আর ঠিক মনে নেই। কেমন একটা উগ্র উত্তেজনার মধ্যে সেদিন খেলে গিয়েছি। কোনও হুঁশ ছিল না।

আর স্যামুএল ? তার পা দুটোয় যেন ম্যাজিক মাখানো ছিল। খেলার শেষে সারপ্রাইজিং, টেরিবল—এমনি কত কি বিশেষণে তাকে আপ্যায়িত করে ঘাড়ে নিয়ে নাচানাচি করেচে সকলে। একাই গোল শুধেছে স্যামুএল। যেমন কথা তেমনি কাজ।

সে বছর স্যামুএলই হলো ফুটবল টিমের ভাইস-ক্যাপ্টেন। ক্রিকেটে ওর খুব বেশি উৎসাহ দেখি নি। কিন্তু হকির মরসুম পড়তে না-পড়তেই স্যামুএল আমাদের ধ্যানচাঁদ হয়ে উঠল। স্যামুএল, স্যামুএল !

প্রফেসররা বলতেন, ছোকরা যে পরিমাণ ভালো খেলে, তার ওআন-টেনথও পরীক্ষার

খাতায় লিখতে পারলে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করে যায়।

দশজনের কাছ থেকে নির্ভেজাল প্রশংসা আদায় করার মতো আর একটা গুণ ছিল স্যামুএলের। চমৎকার বাঁশি বাজাতে পারত ও। আমার বেশ মনে আছে কলেজের কি একটা ফাংশনে স্যামুএল বাঁশি বাজানর পর আমাদের সহপাঠিনী চারজন তরুণীই ক্লাসে বার বার আড়চোখে স্যামুএলকে লক্ষ করতে শুরু করেছিল।

একদিন আমাদের রুমে বসে তাস খেলতে খেলতে স্যামুএলকে আমি সে-কথা বললাম, ইয়ার্কি করেই।

আমার কথা শুনে হাত দিয়ে তাসগুলোকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করতে করতে স্যামুএল জবাব দিল, 'জানি। কিন্তু তুই বোধহয় জানিস না, পরিমল—মেয়েদের সম্বন্ধে আমার অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা আছে, ভাই! একেবারেই বেঅর করতে পারি না ওই ডেলিকেট ডাচেসদের!'

স্যামুএল উঠে পড়ল। বইয়ের র‍্যাকের মাথায় ওর নানা শার্পের আধ ডজন বাঁশি সাজান থাকত। ফুঁ দিয়ে দিয়ে বাঁশি বেছে নিলে। জানলার কাছে আমার পাশেই আমারই বিছানায় এসে বসল।

'দরজাটায় ছিটকিনি দিয়ে আয় তো!'

স্যামুএলকে হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম।

'তুই আমার বন্ধু, তোকে বলতে কোনও আপত্তি নেই।' স্যামুএল আমারই কাঁধে হাত রেখে জানলার বাইরে চোখ রেখে বললে, 'এই বাঁশিই আমার সান্ত্বনা। আমার মা যেদিন পালিয়ে গেল, সেদিন হয় আমি আমার বাবাকে খুন করতাম, না-হয় নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তাম। কিন্তু কোনোটাই পারি নি, পরিমল। ঠিক সেই সময় শেষবারের মতো বাঁশি বাজাতে বাজাতে মনে হয়েছে, সেই প্রথম যেন বাঁশি বাজাতে শিখলাম জীবনে। আর মরতে ইচ্ছে হয় নি, সমস্ত রাগ আমার শান্ত হয়ে গেছে।'

স্যামুএল একটু চুপ করল।

আমি নির্বাক। নিষ্পলক চোখে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকলুম। স্যামুএলের মা পালিয়ে গেছে—কি আশ্চর্য, বিনা দ্বিধায় আমায় এ কথা বললে ও!

'আর একবার', স্যামুএল বললে আবার, আমার এক ডিসট্যাণ্ট কাজিন সিস্টার—তারা এখনও হিন্দুই আছে—সে আমার বাঁশি শুনে শুনে প্রেমে পড়ে গেল। আমায় বললে তাকে নিয়ে ইলোপ করতে, বিয়ে করতে! আমার কোনোটাই করতে ইচ্ছে ছিল না। সেই কথা, ভাই, যেই না বললাম—মেয়েটা কেঁদে-কঁকিয়ে তিড়িং-বিড়িং করে কি কাণ্ডটাই করলে! তার প্রায় মাস দেড়েক পরে—বুঝলি, পরিমল—পাক্কা দুটো মাসও হয় নি রে, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল এক মিঠাই-ওয়ালার

সাথে। স্রেফ একটা নাদুস-নুদুস বাবাজি ছেলেটা। বাপের মিষ্টির দোকানে ক্যাশ-বাক্স আগলে বসে থাকে, আর নস্যি নেয়। বেটার না চেহারা, না বিদ্যেবুদ্ধি, না কোনও গুণ! ভাবলাম, মেয়েটা খুব অসুখী হবে। বড় কষ্ট হয়েছিল তার জন্যে। কত ভেবেছি, মন খারাপ করেছি! গুড লর্ড! বিয়ের মাসখানেক পরে দেখা করতে গিয়ে দেখি আমার সেই বোনটি একেবারে হিন্দু ওআইফ হয়ে গেছে! আমায় একটু মিষ্টি আর জল খাইয়ে আসার সময় বললে, তুমি ভাই, লক্ষ্মীটি, একটু জল দিয়ে ওই এঁটোগুলো ধুয়ে দিয়ে যাও। আমি এক ঘটি জল নিয়ে আসছি।'

'বলিস কি, স্যামুএল?'

'যা ঘটেছে, তাই বলছি ভাই।'

'ধুয়ে দিলি তুই?'

'হ্যাঁ, দিলাম। আসবার সময় একটা অত্যন্ত শকিং কথা মনে এসেছিল। ভাবলাম, বলি; কিন্তু বলি নি। বাড়ি ফিরে এসে সেদিনও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। যা দেখছিলাম, তাই খারাপ লাগছিল আমার; যাকে ভাবছিলাম, তাকেই শয়তান বলে মনে হচ্ছিল। এমন কি আমার এক মাসি ছিল রে, বড় ভালবাসত আমায়, তাকে পর্যন্ত যা-তা বলেছি। আর একবার ইচ্ছা হয়েছিল গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে। আর, দ্বিতীয়বার জীবনে শেষবারের মতো বাঁশি বাজাবার জন্যে বাগানে গিয়ে বসেছিলাম। বাঁশি শেষ করে মনে হল, আর একটা নতুন সুর শিখলাম জীবনে—সত্যিকার জীবনের সুর। সব রাগ শান্ত হয়ে গেল। সেই থেকে—'

কথাটা শেষ করে নি স্যামুএল; চুপ করে গিয়েছিল। খানিক পরে বাঁশিতে ঠোঁট ঠেকাল। সুর উঠল ফুলে; বাতাসে ছড়াল আস্তে আস্তে—যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে। তারপর সেই হেমন্তের কুয়াশা-নামা বিকেল যখন অন্ধকারে হারিয়ে গেল, আলো জ্বলে উঠল মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায়, চন্দনঝিলের ভাঙা মানমন্দিরের মাথায় একটা তারা ঝিকমিক করে উঠল, স্যামুএল তার সুরবিস্তার বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে থাকল আমার গলা জড়িয়ে। আমার কানে তখনও সেই অপূর্ব সুরমূর্ছনা লেগে রয়েছে। ঘরের মধ্যে বাতাস কেমন যেন বিষণ্ণ। বাইরে পৃথিবীটাও আলো-কুয়াশা-অন্ধকারে ভরা দূরান্তের কোনো জগৎ বলে মনে হয়।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে স্যামুএল বললে, 'জানিস পরিমল, আমার মরতে ইচ্ছে করে। তবে অসুখ-বিসুখে ভুগে বা রাগ-মাগ করে গলায় দড়ি দিয়ে নয়—খুব সুন্দরভাবে, অনেক দুঃখ-কষ্ট বুকে নিয়ে ঠিক একজন পুরুষমানুষের মতন।'

স্যামুএলের গলা গাঢ় হয়ে এসেছিল।

আমিও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম, কোনো কথা বলতে পারি নি—একটা শব্দ করারও ক্ষমতা ছিল না আমার। শুধু স্যামুএলের গলায় জড়ান হাতটা আরও

একটু গভীর করে জড়িয়ে ধরেছিলাম !

তখন আমরা সেকেণ্ড ইআরে, হঠাৎ কলেজে এক গণ্ডগোল বেঁধে গেল। সুশান্ত সরকার ছিল আমাদের কলেজের থার্ড ইআরের নামকরা বখাটে ছেলে। একদিন দোতলা থেকে ক্লাস শেষ করে নামছিল থার্ড ইআরের দল, আর সেকেণ্ড ইআর আর্টসের চার-পাঁচটি মেয়ে উঠছিল একতলা থেকে দোতলায়। দোতলা থেকে ফটাস ফটাস করে চটি ঘষড়াতে ঘষড়াতে নামবার সময় সুশান্তর পায়ের চটিটা স্রেফ পা থেকে ছিটকে সেকেণ্ড ইআরের অরুণা হালদারের মুখে এসে লাগল। সিঁড়ি-উঠতি পথে অরুণা থমকে দাঁড়ায় ; থমকে দাঁড়ায় তার সহগামিনীরা। এদিকে সুশান্ত সরকারের সঙ্গে যারা আসছিল, তারাও সব দাঁড়িয়ে পড়ে।

অভাবনীয়, বিমূঢ় অবস্থা। সিঁড়ির ওপর থার্ড ইআর, সিঁড়ির নিচে সেকেণ্ড ইআর আর্টসের ক'টি মেয়ে।

অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে সুশান্ত যখন নেমে এসে অরুণার কাছে ক্ষমা চাইতে দাঁড়িয়েছে, অরুণা হালদার সকলকে দ্বিতীয়বার চমকিত করে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল সুশান্তর গালে।

পরে শুনলাম, রাগ-গন-গনে মাথায়, আবির-মুখে, দাঁতে দাঁত পিষে অরুণা সুশান্তকে ছোটলোক, স্কাউনড্রেল—ইত্যাদি কটুবাক্য বলেছে।

ব্যাস, এই নিয়ে হই-চই বেঁধে গেল। অরুণা হালদার যে-সে ঘরের মেয়ে নয়, একেবারে খাস এস. ডি. ও. সাহেবের মেয়ে। খবরটা মুহূর্তেই সারা কলেজ, কলেজ থেকে রাস্তা, এবং রাস্তা থেকে বাজার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ফাদার মেরিটন। ফাদার ছুটে এলেন, ছুটে এলেন অন্যান্য অধ্যাপকরা। ক্লাস ছেড়ে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। একদিকে আমরা একজোট, আর একদিকে মেয়েরা।

ছেলেদের মিটিং বসে গেল খেলার মাঠে, গাছের তলায়। সকলের সামনে প্রকাশ্য-ভাবে অরুণাকে ক্ষমা চাইতে হবে সুশান্তর কাছে। এস. ডি. ও.র মেয়ে বলে ওর প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব চলবে না।

মেয়েরাও মিটিং বসালে তাদের কমন-রুমে। তাদের দাবি—সুশান্তকে প্রকাশ্য-ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে হাত জোড় করে অরুণার কাছে। আর, আজ থেকে কোনও ছেলে চটি পায়ে দিয়ে কলেজে আসতে পারবে না।

ফাদারের কাছে ডেপুটেশন গেল আমাদের পক্ষ থেকে। স্যামুএল পল হল লিডার। মেয়েদের তরফ থেকে যে চারজন ডেপুটেশনে এলো, অরুণা হালদার হল তাদের নেত্রী !

প্রিন্সিপ্যালের ঘরের মধ্যে সে এক সাংঘাতিক অবস্থা।

ফাদার মেরিটন বললেন, 'ছেলেদের পক্ষই অন্যায় করেছে। সুশান্তর ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

স্যামুএল পাল্টা জবাব দিল, 'কখনই নয়; এটা ইনজাস্টিস। সুশান্তবাবুর পা থেকে অ্যাকসিডেনট্যালি স্লিপার খুলে গিয়েছিল! তিনিও এজন্যে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই মিস্ হালদারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মিস্ হালদার তাঁর অ্যারিসটোক্র্যাট হট টেম্পার দেখিয়ে আমাদের বন্ধুকে অ্যাসাল্ট করেন এবং ফিলদি ল্যাংগোএজে তাঁকে অপমানিত করেন। ক্ষমা চাইবেন মিস হালদার—সুশান্ত সরকার নয়।'

অরুণা হালদার দৃঢ় অসম্মতি জানিয়ে বলে, 'নেভার ফাদার। আই ক্যানট বো ডাউন বিফোর এ ক্লাউন। যিনি এই অন্যায় কাজ করেছেন, তিনি ইনটেনশন্যালি করেছেন! আমরা তাঁকে বিলক্ষণ চিনি। সারা কলেজে এমন অসভ্য ছেলে আর নেই। মেয়েদের তরফ থেকে তাঁকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবি জানানই উচিত ছিল।'

গণ্ডগোলটা মেটে না। ছেলেরা বেরিয়ে যায়। মেয়েরাও।

সেদিন রাত্রেই আবার এস. ডি. ও. স্বয়ং এসে ফাদারের সঙ্গে দেখা করে যান।

গণ্ডগোলটা তো মিটলই না, উপরন্তু সামান্য ব্যাপারটা দেখতে দেখতে সাংঘাতিক হয়ে উঠল। এস. ডি. ও.র গাড়ি এসেছিল কলেজে; তাতে কে যেন এক থান ইট কশিয়ে দিলে। কলেজের ল্যাবোরেটরির কিছু শিশি, বোতল, জার ভাঙল ছেলেরা। ডি. এস. পি. পুলিশ নিয়ে কলেজ কমপাউণ্ডে ঢুকে পড়ল।

তিনদিনের মধ্যে অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, সারা শহর উত্তেজনায় কাঁপছে; কলেজে স্ট্রাইক, হস্টেলে ঘন ঘন মিটিং বসছে, রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার। আমরা ছেলেরা একজোট হয়ে প্রসেশন শুরু করে দিলাম। মিটিং বসতে লাগল রোজ খেলার মাঠে। আমাদের মধ্যে যারা পলিটিকস-করা ছাত্র ছিল, তারা শহরের ক্ষুদে ক্ষুদে পলিটিক্যাল নেতাদের গিয়ে ধরে আনল। তাঁরা এসে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—ইস্যুটা এখন আর ছেলে-মেয়েদের বিবাদের মধ্যে আটকে নেই। গভর্নমেন্টের উস্কানিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের তথা সাধারণ মানুষের সিভিল রাইটসে হস্তক্ষেপ করেছে। অতএব, বিরোধটা গভর্নমেন্ট ভার্সেস জনসাধারণের।

এতটা হয়ত হতো না; কলেজে পুলিশ ঢুকে লাঠি চালিয়েই সব বিগড়ে দিলে। আমাদের প্রসেশন বন্ধ করে দেওয়া হল, কলেজ-হস্টেল বন্ধ করার হুমকি শুনলাম, পুলিশ গার্ড দেওয়া হলো কলেজ কমপাউণ্ডে। মিটিংও বন্ধ।

স্যামুএল পল্ বললে, 'নেভার মাইণ্ড। হাংগার স্ট্রাইক করব।'

আমি বললাম, 'দেখ স্যামুএল—বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই তো সুশান্ত

ছোকরাটা বিশ্ব-বখাটে, বদ চরিত্র ; এই হুজুগে তাকে আমরা হিরো করে তুললাম। এর ফল ভালো হবে না। আর, আর দ্বিতীয় কথা কি জানিস ? আমাদের ঘরোয়া মনোমালিন্য চেষ্টা করলে এমনিতেই মেটান চলত ; কিন্তু অযথা কতকগুলো অপারচুনিস্ট বাইরের লিডার এনে সমস্ত জিনিসটার ভোল পাল্টে গেল। এর পরিণামও ভাল নয়।'

স্যামুএল ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলে, 'তবে কি তুই বলতে চাস, ওই হাকিম-নন্দিনীর পায়ের তলায় বসে সুশান্ত মাফ চাইবে ?'

'চাওয়াই উচিত। সুশান্তর মতন ছেলে সব সময়ে সব নন্দিনীদের পা তো পা—পায়ের জুতো চেটে বেড়াচ্ছে, সে খবর তুইও জানিস ! কি ক্ষতি তার অরুণার পা চাটতে ? সে চেষ্টাও কি আগে ও করে নি, ভাবছিস।'

'করুক। সে-সব কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তো একা সুশান্তর কথা নয়, আমাদের সমস্ত ছেলেদের প্রেসটিজ এট স্টেক।'

স্যামুএল আমার কথা শুনল না ; হাংগার স্ট্রাইক আরম্ভ করে দিল।

হাংগাব স্ট্রাইকের খবর পেয়ে ফাদাব মেরিটন ছুটে এলেন। বুড়ো ফাদার স্যামুএলেব হাত ধরে কত বললেন, 'ওঃ চাইল্ড ! হোআট ইউ অল আর ডুইং ? ডু ইউ ওআণ্ট টু ক্লোজ দিস ওল্ড ইন্‌স্‌টিটিউশন ? আর ইউ গোইং টু মেক মি ম্যাড ?'

স্যামুএল চুপ, আমরাও নির্বাক।

সুপারিনটেনডেন্ট অমিয় দাস বিশেষ পছন্দ করতেন না স্যামুএলকে। তিনিও এসে বললেন, 'স্যামুএল, তুমি কি করছ ? যাকে নিয়ে অযথা এই নোংরা গণ্ডগোল, কই—সে দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, সিগারেট ফুঁকছে ! শয়তান ছেলে সে ! তোমবা কেন তার জন্যে জীবন পাত করছ ?'

'ম্যানলি প্রেসটিজই আমার মটো, স্যার ! আপনাদের অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।'

সুপারিনটেনডেনট অমিয় দাসও ফিরে গেলেন।

সেইদিনই রাত্রে আমাদের চমকে দিয়ে অরুণা হালদার হস্টেলে এসে হাজির। সঙ্গে তাব ফাদার মেরিটন !

স্যামুএলের পাশে বসে অরুণা আস্তে আস্তে বললে, 'আপনারাই জিতলেন। কাল আমি ক্ষমা চাইব, কথা দিচ্ছি। আপনারা হাংগার স্ট্রাইক বন্ধ করুন।'

কথা শেষ করে অরুণা উঠে দাঁড়াল। আমরা দেখলাম, সে কাঁদছে। ছলছল তার চোখ, ঠোঁট কামড়ে ধরেছে দাঁতে, কাঁপছে তার চিবুক।

ফাদারেব হাত ধরে অরুণা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

পরের দিন আবার কলেজ। ছেলেরা বিজয়গর্বে স্যামুএলকে মাথায় নিয়ে নাচছে।

নর্থ গ্যালারিতে সব জমা হলাম আমরা। ফাদার মেরিটন এলেন, সঙ্গে অরুণা। কথা বললেন প্রথমে ফাদারই। বললেন, 'আমার প্রিয় ছাত্ররা, আমার কলেজে এমন আনপ্লেজ্যান্ট ঘটনা আর কখনও ঘটে নি। তোমাদের কাছে আমি অনেক আশা করেছিলাম—আমার সে আশা তোমরা পূর্ণ করেছ কিনা তা নিজেরাই ভেবে দেখ। তবে এ-কথা আমি সানন্দে স্বীকার করছি, আমার কন্যাতুল্যা এই ছাত্রীটি তার বৃদ্ধ ফাদার মেরিটনের দুঃখ বুঝেছে। আমার সম্মান, আমার এই কলেজের সম্মানকে সে রক্ষা করেছে। তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞ।'

ফাদার বসতেই স্যামুএল উঠে দাঁড়াল। আমরা একটু হর্ষোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়েছিলুম, বাঘের মতো গর্জে উঠে স্যামুএল বাধা দিল। তারপর বললে, 'ডিআর ফ্রেন্ডস! ফাদার যা বললেন, তা সত্যি। আমরা, ছাত্ররা, কলেজের ডিসিপ্লিন রাখতে পারি নি। বিশেষ করে ফাদারের সম্মান রক্ষার মধ্যে যে গৌরব আছে, তাঁর ছাত্র হয়েও সে কথা আমি বুঝি নি। মিস হালদার সেদিক থেকে সেন্ট পেট্রিক কলেজের সমস্ত পুরুষ-ছাত্রদের লজ্জা দিয়েছেন। এ লজ্জা অরও বাড়বে, যদি এই সভায় তিনি প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা চান আমাদের কাছে। আমরা নিজেদের সে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রস্তাব করি—যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে; উভয় পক্ষই আমরা দুঃখিত। ফাদার মেরিটন, আমাদের প্রফেসর্স এবং সহপাঠিনী বান্ধবীরা যেন পুরনো কথা ভুলে যান। লেট আস বি ফ্রেন্ডস্ এগেন।'

স্যামুএল থামল। আমরা চিৎকার করে সমর্থন জানালাম।

ফাদার তাকালেন স্যামুএলের দিকে, অরুণার দুচোখ স্থির হয়ে থাকল তার মুখে। আর, আমরা সমানে হাততালি দিতে লাগলাম।

স্যামুএল ডায়াস থেকে নিচে নেমে এলো হাসতে হাসতে। ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিলাম আমরা।

ফাদার আর অরুণা ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

বিকেলে হস্টেল-রুমে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বললাম, 'খুব খেলা দেখালি, স্যামুএল! ফাদার তো ফাদার, তাঁর ফোরটিন্থ ফাদারে তাক লেগে গেছে। আর ওই ডার্টিয়াল হাকিম-নন্দিনী অরুণা হালদার—সে বোধহয় তোর পায়ে মাথা খুঁড়ছে, মাইরি, মনে মনে। ইস! তার কি প্রেসটিজটাই তুই বাঁচালি! হাত জোড় করে আর মাফ-চাইতে হল না!'

স্যামুএল হাসল। সিগারেটের শেষ টুকরোয় জোর জোর দুটো টান দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাঁশি নামিয়ে এনে পাশে বসল আমার। বললে, 'দেখ পরিমল—রিভেন্জ মাস্ট বি নোবল্! পুরুষ মানুষ স্টেনলাইক হবি, বাট নেভার এ স্যাটান!

অনেকদিন পরে স্যামুএল আবার তন্ময় হয়ে বাঁশিতে সুর জুড়ল। চন্দনঝিলের

মানমন্দিরের মাথায় তখন আকাশের প্রথম তারাটি জেগেছে।

অরুণা হালদার অবশ্য তারপর থেকে কলেজে আসা বন্ধ করে দিলে। প্রথম প্রথম আমরা ভেবেছিলাম, লজ্জায় আসছে না প্রথমটায় দু-দশদিন পরে আবার আসবে। অরুণা কিন্তু সত্যিই আর এলো না। এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহ করে একমাস কেটে গেল। মাস থেকে মাসান্ত। শুনলাম, অমিয় দাস তাকে বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসে।

আমরা বলাবলি করলাম, ওর ভ্যানিটিতে লেগেছে। কলেজই ছেড়ে দিল বেচারি!

স্যামুএল শুনে জবাব দিল, 'ভ্যানিটি নয় রে, ডিগনিটি।'

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। সামনে আমাদের সেকেন্ড ইআর টেস্ট। সারা বছর ফাঁকি মেরেছি। না জানি ফিজক্স—না কেমিসট্রি। বিলকুল কিছু জানি না। কাজে কাজেই, পড়ায় ভীষণ চাপ পড়ল হঠাৎ—টেস্টের আগে। বই মুখে করে বসে পড়লাম।

স্যামুএলের কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পরীক্ষা সম্পর্কে আগের মতোই নির্বিকার সে। তাই বইপত্র যেমন পড়ে থাকত, তেমনি পড়ে থাকল।

স্যামুএল বিকেলে বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে খাওয়ার সময়। খেয়ে-দেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

আমি বলি, 'স্যামুএল, কি হচ্ছে তোর এটা?'

—'কি?' লেপের মধ্যে থেকে স্যামুএল জবাব দেয়।

'তুই কি সত্যিই পড়াশোনা করবি না?'

'না।'

'কেন?'

'আমি পরীক্ষায় পাস করতে চাই না।'

'কিন্তু তোর বাবা?'

'বাবা যদি খরচ পাঠান বন্ধ করে দেয়, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব। পড়াশোনা আমার ভাল লাগে না।'

'ও!' আমি একটু চুপ করে থেকেই বলি, 'রোজ বিকেলে যাস কোথায়?'

'যেখানে খুশি। ঘুরে বেড়াই।'

'কেন?'

'ঘরে থাকলে তোর ডিসটার্ব হবে রে, পরিমল! পড়তেই পারবি না! কিন্তু ওসব কথা থাক। কাল থেকে তুই তিনুকে এ ঘরে এনে একসঙ্গে পড়তে বসিস। আমি সাড়ে ন'টার আগে ফিরব না কোনদিনই।'

স্যামুএল সত্যি সত্যিই সাড়ে ন'টা দশটার আগে ফিরত না। শীতটাও পড়ল

জোরে। বিকেল ছোট হয়ে গেল। পাঁচটা বাজতে-না-বাজতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। কোথাও বেরোবার সময় হয় না আমাদের, স্যামুএল কিন্তু রোজ পাঁচটার সময় ফ্লানেলের ট্রাউজারস আর পুলওভার চাপিয়ে, একটা মাফলার কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

যতই দিন যেতে লাগল, স্যামুএলের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ এবং বাক্যালাপের সময়টুকু পর্যন্ত কমে আসতে থাকল। কথা নেই, বার্তা নেই, স্যামুএল হয়ত সাত-সকালেই বেরিয়ে গেল কিছু না বলে, ফিরল রাত দশটা-এগারটার সময়—হস্টেলের পাঁচিল টপকে। কোনদিন হয়ত ফেরেই না রাত্রে। স্যামুএল যেদিন রাত্রে ফিরত না, সেদিন ভীষণ ভয় পেতাম আমি। ভয় হতো, যদি ধরা পড়ে যায় স্যামুএল, যদি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অমিয় দাস কোনোদিন হঠাৎ রাত্রে ডেকে পাঠায় স্যামুএলকে—কি জবাব দেবো আমি, কি কৈফয়ত দেবে স্যামুএল?

এমন দিনও গেছে, দিব্যি দুপুরে স্যামুএল ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই—হঠাৎ সন্ধ্যে-বেলা তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

'ক'টা বেজেছে রে, পরিমল?'

'সাতটা বেজে গেছে।'

'বেজে গেছে? গুড লর্ড! দেরি হয়ে গেল যে!' ব্যস্ত হয়ে উঠল স্যামুএল। ক্ষিপ্র হাতে পোশাক চড়িয়ে তৈরি হয়ে নিল ও। ড্রয়ার খুলে কিছু পয়সা পকেটে পুরে নিল, বাঁশি পকেটে—তারপর পা বাড়ালে দরজার দিকে।

'স্যামুএল!' বাধা দিলাম আমি।

স্যামুএল পিছু ফিরে তাকালে।

'কোথায় যাচ্ছিস?' একটু রাগ করেই আমি জানতে চাই।

'বলা নিষেধ!' স্যামুএল চুপ-মুখে হাসে।

'আমাকেও?'

'হ্যাঁ, তোকেও।'

'কখন ফিরবি?'

'কি জানি? যখন ছাড়া পাব!'

'ও!' প্রচণ্ড অভিমান হয় আমার। বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে বলি, 'এটা কি ভাল হচ্ছে স্যামুএল! অমিয় দাস যদি রাত্রে কোনোদিন রুমে এসে ঢোকে; ধর, ডেকে পাঠায়—

ঠিক যে কি হয় স্যামুএলের, বুঝি না; আমার কথায় হো হো করে হেসে ওঠে। বিলিতি নাচের ভঙ্গিতে তিন-পাক ঘুরে স্যামুএল আমার কানের কাছে তার মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, 'অমিয় দাস এখন অন্যত্র দাসানুদাস। কোনোও ভয় নেই রে, পরিমল! ঘাবড়াস না। তোর টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাক—তারপর বলব

সব তোকে। ততদিন—'

কথা আর শেষ করে না স্যামুএল। ফস করে একটা সিগারেট ধরায়, একটা সিগারেট ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। তারপর ইংরেজি গানের একটি কলিতে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

এরই কয়েকদিন পরে তিনু কোথা থেকে এক খবর এনে হাজির করলে। বললে, 'এই পরিমল—মোস্ট ইন্টারেস্টিং নিউজ। শুনলে হাঁ হয়ে যাবি। স্যামুএলের অজ্ঞাতবাসের ইতিবৃত্ত ধরা পড়ে গেছে।'

'মানে?'

'মানে আর কি? ও শালা ডুবে ডুবে জল খায়।'

'হেঁয়ালি রাখ। সাফ কথা বল!' আমি তিনুকে ধমক দিয়ে উঠি।

'আবার কি! লভ করছে বেটা! আর, যার-তার সঙ্গে নয়, সেই হাকিম-নন্দিনী অরুণা হালদারের সঙ্গে। কি ডেনজারাস ছেলে, বাবা!'

'বলিস কি!' কথাটা বিশ্বাস করতে আমার বাধে, 'অরুণা হালদার কলেজেই আসছে না বছর-খানেক ধরে! তা ছাড়া সে একজন উঁচু ঘরের মেয়ে। স্যামুএলের জন্যেই একরকম বেচারিকে কলেজ ছাড়তে হল। হাউ ক্যান ইট বি ট্রু? না, না—বাজে কথা!'

'মোটেই বাজে কথা নয়, ভাই! একেবারে আই-উইটনেসের কথা। লুকিয়ে লুকিয়ে চন্দনঝিলের অন্ধকারে এসে দুজনে প্রেম করছে।'

'যা!'

'ইউ ক্যান্ আস্ক সুশান্তবাবু!'

'সুশান্ত? দরকার নেই। আমি স্যামুএলকেই জিজ্ঞেস করব।'

রাত্রে স্যামুএল ফিরে এলেই আমি ডাকলাম, 'স্যামুএল, এদিকে আয়।'

স্যামুএল কাছে এসে দাঁড়াল।

'শুনলাম, তুই নাকি অরুণা হালদারের সঙ্গে প্রেম করছিস?'

'তুইও শুনেছিস?' স্যামুএল ভুরুতে বিস্ময় প্রকাশ করল, 'তবে তো জোর ছড়িয়ে গেছে রে, কথাটা!'

'ওসব বাজে কথা রাখ! ঠিক জবাব দে। সত্যি?'

'মিথ্যে হবে কেন?'

'চন্দনঝিলে তোরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করিস?'

'হ্যাঁ।'

'অরুণা হাকিমের মেয়ে, এ-কথা বোধহয় সে ভুলে গেছে—কি বল্?'

'ভেরি ন্যাচার‍্যাল! প্রেমে পড়লে রাজার মেয়েও রাজত্বের কথা ভুলে যায়; রাখাল বালকের চরণচিহ্ন বুকে আঁকড়ে পড়ে থাকে।' স্যামুএল কেমন যেন অস্বস্তিকর

একটা দমকা হাসি হেসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। ভক করে খানিকটা মদের গন্ধ বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে।

চমকে উঠি আমি। চোখ-নাক কুঁচকে ওঠে আমার। ঘিনঘিন করে গা।

'মদ খেয়েছিস তুই ?'

'সামান্য। খুব সামান্য। ডোণ্ট মাইণ্ড! অরুণা তো রোজ আসতে পারে না! যেদিন না আসে, সেদিন ভাই মরমে মরে গিয়ে একটু মদ খাই! বাট ভেরি স্মল ডোজ।'

টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

তিনুর বাড়ি কাছেই। তিনু বাড়ি চলে গেল। আমি একা। পরীক্ষা দিয়ে এসে শেষ দিনটা ঘুমিয়ে কাটালাম।

পরের দিনও সারা দুপুর ঘুমিয়ে শীতের শেষ বেলায় যখন চোখ মেলে তাকালাম, দেখি, স্যামুএল টেবিলের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

আমার ঘুম ভাঙতে দেখে ও ফিরে তাকাল।

'উঠেছিস ? নে, চল! তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে নে!'

'কোথায় যাব ?' আলস্য ভাঙতে ভাঙতে বললাম।

'চল না! বেড়িয়ে আসি।'

'তা তো বুঝলাম! কিন্তু কোথায় যাব ?'

'ঘাবড়াসনে, সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাব—একেবারে ইন্দ্রলোকে। নে, নে—ওঠ! শিগ্গির নে।'

স্যামুএলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যেখানে এলাম, সেখানে আসার কৌতূহল আমার কিছু কম ছিল না! তবে একা একা কোনোদিন চন্দনঝিলের ভাঙা মানমন্দিরে যে আসতাম না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

সন্ধ্যে কখন হয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষ রাত। স্যামুএলের সঙ্গে ঝোপঝাপ পেরিয়ে, গর্ত টপকে, কাপড় ফাঁসিয়ে অনেক কষ্টে চন্দনঝিলের পূর্বদিকে ভাঙা মানমন্দিরে এসে পেঁছিলাম।

ভেতরে সিঁড়ি আছে। পুরানো ধ্বসা সিঁড়ি। চামচিকে-বাদুড়-আরসোলাতে ভরা দেওয়াল, চুনকাম খসে খসে পড়ছে, বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ।

স্যামুএলের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম।

'কোথায় নিয়ে এলি আমায় ? মারতে চাস নাকি ?'

'চুপ! পা টিপে-টিপে আয়। কথা বলিস না!'

রুমালে মুখ-নাক গুঁজে কোনোরকমে উঠলাম স্যামুএলের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত খোলা ছাদে। ফাঁকা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। অমন শীতও

আর শীত বলে মনে হল না।

স্যামুএল বললে, 'এইখানটায় আয়। বস তুই। দেখিস, খুব বেশি হেলে বসিস না যেন! ছিটকে তা হলে একেবারে ঝিলের জলে গিয়ে পড়বি।'

সেই ধুলোর ওপরই আমি বসে পড়লাম।

'অরুণা কই?' প্রশ্ন করলাম।

'আসবে।'

'কখন?'

'এখুনি। হয়ত এসেই গেছে।'

'কই? কোথায়?'

'কাছেই আছে কোথাও!' স্যামুএল অন্ধকারে হাসল, 'না রে, এখানে নেই। ওদিকে তাকিয়ে থাক। ওই যে ঝিলের বাঁধন ঘাট, একটা ছোট হ্যারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে—ওখানেই ওরা আছে।'

'ওরা? ওরা মানে, কে?'

'অরুণা হালদার আর অমিয় দাস।'

'অমিয় দাস!' আমার গলা বুজে আসে।

অন্ধকারেই মাথা নাড়ে স্যামুএল। খুব আস্তে আস্তে বলে, 'ওরা আসে, ওবা পাশাপাশি বসে। হেঁটে বেড়ায়, গল্প করে, জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে হাত ধরাধরি করে। অরুণা কখনও গান গায়।'

স্যামুএল যেন অনেক দূর থেকে ফিস ফিস করে কথা বলছে, হাওয়ায় সে সুর ভেসে আসছে।

'তবে তুই?' আমি অগাধ বিস্ময় প্রকাশ করি।

'আমি! আমি আর কি করব! দেখি বসে বসে। বাঁশি বাজাই খুব আস্তেআস্তে—এত ধীরে, যেন মনে হয়, ঝিলের ওপার থেকে কেউ বাজাচ্ছে। সেই সুর এখানে ওদের কানে এসে পেঁছায়—বেশ ভালোই লাগে বোধহয়।'

স্যামুএল একটু থেমে পকেট থেকে বাঁশিটা বের করে নিল। বললে, 'ওই দেখ, ওরা এসেছে।'

আমি দেখলাম। অস্পষ্ট এবং আবছাভাবেই দেখলাম, অরুণা হালদার আর অমিয় দাসকে।

স্যামুএল সবেমাত্র বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছিল, আমি ওর হাত থেকে বাঁশিটা কেড়ে নিলাম।

'ওরা প্রেম করছে করুক। তোর কি? তুই কেন বাঁশি বাজাবি?'

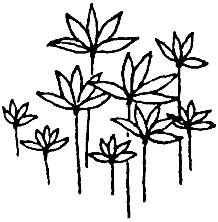
'তার বেশি কিছু আমার করার ক্ষমতা নেই, পরিমল! বিয়াল্লিশ বছরের অমিয় দাসকে অরুণার ভালো নাও লাগতে পারে! কিন্তু চন্দনঝিলের মধ্যে অমন জোনাকি-

জ্বলা অন্ধকারে বাঁশির সুর শুনতে শুনতে বিয়াল্লিশ বছর কি বিয়াল্লিশই থাকে! কখনই নয়। আমার মাও বত্রিশ বছরের অমিয় দাসকে দেখে ভুলেছিল। অরুণাও ভুলুক—ভুলুক।'

কল্পান্ত বিস্ময়ে আমি নির্বাক, নিথর হয়ে বসে থাকলাম। স্যামুএলের মুখটা পর্যন্ত যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ কানে এলো বাঁশির সুব। মানমন্দিবেব ভূগর্ভের কক্ষ থেকে যেন রন্ধ্রপথে একটি বেদনার্ত নিশ্বাস ভেসে এসে গুমবে গুমবে ছড়িযে পড়ছে। বাতাসে কাঁপছে সেই আশ্চর্য সুব। চন্দনঝিলের কাল প্রচ্ছদপটে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। ফুটকি ফুটকি লালচে আলোয় অদ্ভুত এক পৃথিবী জেগে উঠেছে। যে পৃথিবীতে অমিয দাস আব অবুণা হালদাব হাতে হাত ছুঁয়ে বসে থাকে; স্যামুএল শুধু জ্বলে আমারই চোখের সামনে—আশ্চর্য এক জোনাকিব মতন।

[তবুণেব স্বপ্ন: আনুমানিক ১৯৫৩]



আত্মজা

হিমাংশু স্বামী ; যূথিকা স্ত্রী। ওরা বছর পাঁচেকের ছোট-বড়। দেখলে মনে হবে, ব্যবধান পাঁচের নয়, আট কিংবা দশের। মেয়ে পাশে থাকলে এ-হিসেবটাও গোলমাল হওয়া বিচিত্র নয়। পুতুল যদি পনেরোয় পা দিয়ে থাকে, আর যূথিকা সত্যি-সত্যিই গর্ভধারিণী হয় ও-মেয়ের, তাহলে বলতে হবে, রোগা, খাটো চেহারার মেয়েরা বেশ বয়স লুকোতে পারে। যেমন যূথিকা। অবশ্য যূথিকা কখনো বয়স লুকোবার চেষ্টা করত না। বরং পুতুল যে তার মেয়ে—এ-কথা হাবে-ভাবে, সাজে-পোশাকে পরিস্ফুট করার ঝোঁকটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। এই চেষ্টা সত্ত্বেও পুতুলের মা যূথিকাকে মোটেই পঞ্চদশী কন্যার জননী বলে মনে হত না। বরং এই ধরনের সাজ-পোশাক ওর রোগা, খাটো চেহারার ওপর শালীনতা ও আভিজাত্যের একটা সুষমা ফুটিয়ে তুলত—যা দেখলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, পনেরো বছরের মেয়ের মা সাজার চেষ্টাটাও কৃত্রিম। আসলে, পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত সজ্জার আশ্রয়ে একটি খাটো লঘু নারীদেহে মেদ-শুষ্ক দুর্বল অস্থিগুলো আশ্চর্যভাবে আত্মগোপন করত; এমন কি, পানপাতা ঢঙের ছোট একটি মুখে ব্যাধির যে বিবর্ণ রেখাঙ্কন স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা—তাও ঢাকা পড়ে যেত। বলা মুশকিল, যূথিকার মনের সুগোপন কোণে, ওরই অজ্ঞাতে এই দ্বিতীয় বাসনা ছিল কিনা— যদিও আচরণে উলটোটাই প্রকাশ পেত।

স্ত্রীর তুলনায় স্বামী বিপরীত মেরু। যূথিকা একত্রিশ হলে হিমাংশুর ছত্রিশ হওয়ার কথা। স্বতন্ত্রভাবে ওকে দেখলে পরিণত যৌবনের দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যায়। সুগঠিত অঙ্গ ; স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ। সর্বাঙ্গে তার সেই প্রাণবন্ত যৌবনের খুশী, হাসি। আর হিমাংশু তো সব সময়েই হাসছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে—সব সময় ; সর্বত্রই। একটা মানুষ যে এত হাসতে পারে, ওকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এমনিতেই গলার স্বর ভরাট। জোরে হাসলে বাতাসের ঢেউ এমনভাবে গলা দিয়ে বাইরের হাওয়ায় এসে শব্দ তুলত, যা শুনলে মনে হবে—এক জোড়া পায়রা আগল-দেওয়া ঘরে ডানার শব্দ তুলে উড়ছে। এমন হাসি দিনে অসংখ্যবার শোনা যায় হিমাংশুর পাশে থাকলে ; যদিও সব সময়ের হাসিটা তার ঠোঁটে-গালে লেগে থাকে, চোখেও কিছুটা। অনেকের এ-হাসি পছন্দ ; অনেকের নয়। যেমন, পুতুলের খুবই ভালো লাগে ; যূথিকার লাগে না। বরং দেখা গেছে—মাঝে মাঝে রীতিমত বিরক্ত হয় যূথিকা, কড়া সুরে ধমক দেয় ; বলে, ইস্ অমন বিকট শব্দ করে কি

হাস ?'…অফিস যাবার মুখে হিমাংশু তখন হয়ত রুমালটা ট্রাউজারের পকেটে পুরছে, খুবই ব্যস্তভাব ; তবু এক লহমা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখে বিস্ময় তুলে বলে 'বল কি—যে-হাসি এককালে বাঁশির চেয়ে মধুর মনে হত তোমার, আজ তা বিকট হয়ে গেল !' একটু হয়ত অপ্রতিভ হয় যূথিকা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে জবাব দেয়, 'এককালে রঙ্গ করার বয়স ছিল—করতুম। তা বলে আজও কি তোমার মতন ছেলেমানুষি করতে হবে ?' স্ত্রীর কথায় আর একদফা হেসে দমকা হাওয়ারমতন বাইরে এসে দাঁড়ায় হিমাংশু, পাশের ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, 'পুতুল, রেডি ? আমি নীচে নামলাম। তাড়াতাড়ি আয়।' কথা শেষ হতে না হতে দেখা যায় তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে হিমাংশু নীচে নেমে গেছে। পুতুল সবে বারান্দায়। মা-মেয়েতে চোখাচোখি হয়। যূথিকা পাশ কাটিয়ে নীচে নামতে থাকে হঠাৎ, তারপর সিঁড়ির মাঝ-বাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হিমাংশু পায়ে ক্লিপ লাগিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে অপেক্ষা করছে ; চোখ সিঁড়িতে। যূথিকা বিরস চোখে তাকিয়ে শুরু করে, 'তুমি যাও, পুতুল যাবে না।'…'যাবে না ! কেন ?' হিমাংশু বুঝেও না-বোঝার ভান করে। অসহ্য বিরক্তি মেশানো গলায় যূথিকা এবার জবাব দেয়, 'এক কথা একশোবার বলতে আমার ভালো লাগে না। কতবার না বলেছি, ওকে তুমি সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে না !' হিমাংশু চকিতে একবার স্ত্রীর মাথা টপকে দেখে নেয়। পুতুল এক এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করে নিঃশব্দে মারপ্রায় পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।
চোখে-মুখে চট করে একটু অপরাধের ভাব ফুটোয় হিমাংশু, 'আজ কিভাবে যে একটু দেরি হয়ে গেল গো—বুঝতেই পারলাম না! পুতুলের স্কুলের বাসটাও ফিরে গেল। কিন্তু অযথা স্কুল কামাই করা কি ভাল হবে ? ওর আবার আজ অংকের ক্লাস। কি রে, আজ না-হয় নাই গেলি, পুতুল !' বাপের কথায় মা ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকায়। কান্না-কান্না মুখ করতে তিল মাত্র দেরি হয় না মেয়ের। আস্তে অথচ শব্দটা যাতে বাবার কানে যায় ততটুকু চড়িয়ে পুতুল বলে, 'অংকের ক্লাস কামাই গেলে বড্ড যা-তা ক'রে বলে মিস্ সরকার।' যূথিকা চূড়ান্ত শাসনের সুরে জবাব দেয়, 'সে-কথা আগে মনে থাকে না ; হেলাফেলা করে কেন তুমি স্কুলের বাস ফেল কর ? শুনবে, বকুনি শোনাই উচিত।' একটু থেমে যূথিকা এবার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ট্রাম বাসে পৌঁছে দিতে বললে এক্ষুনি বলবে তোমার অফিসের লেট হয়ে গেছে। বুড়ো-ধাড়ি মেয়েকে সঙ সাজিয়ে সাইকেলের পেছনে করে রাস্তা দিয়ে না নিয়ে গেলে তোমার বাহার হয় না ! যাও, যা খুশি কর গে।' কথা শেষ করেই যূথিকা ওপরে উঠতে থাকে—মেয়ে, স্বামী কারুর দিকে ফিরে তাকায় না। না তাকাক যূথিকা। পুতুল হরিণ গতিতে নীচে নেমে এসে বাবার পাশটিতে দাঁড়ায়। হিমাংশু মুচকি হেসে মেয়েকে সদরের দিকে পা

বাড়াতে ইঙ্গিত করে।

মেয়ে-শাসনের রাশটা ইদানীং যূথিকা শক্ত করেই ধরেছে! ফলে, সাইকেলের পেছনে চেপে স্কুল যাওয়াই শুধু নয়, আরো অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিত্যই স্বামীকে ভর্ৎসনা করেছে। মেয়েকেও। তবু যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। গায়ে মেখেও মাখে না। শতেক রকম ফন্দি করে এড়িয়ে যায় সমস্ত শাসন। কাজেই যূথিকার তরফ থেকে প্রায়ই কথা ওঠে।

মেয়েদের সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছিল পুতুল। কাপ পেল, মেডেল পেল; সুইমিং কস্টিউম-পরা ছবি উঠল তার। কাপ-মেডেল দেখে যূথিকা অখুশি হয় নি। কিন্তু যেদিন পুতুলের সেই বিজয়িনী ছবিটা নিয়ে এলো হিমাংশু, যূথিকার সারা মুখ কুঁচকে উঠল। মেয়ের অসাক্ষাতে ছবিটা বাক্সের অন্ধকারে চালান করে দিয়ে যূথিকা স্বামীকে বলল, 'আচ্ছা, মেয়ের তোমার বয়েস বাড়ছে না কমছে?'

'কেন?' হিমাংশু অবাক হয়ে চোখ তোলে।

'কেন কি, ওই নেংটিটা পরিয়ে কেউ ছবি তোলে ডাগর মেয়ের? ছি-ছি।'

'নেংটি? নেংটি আবার কোথায় পেলে তুমি? ওটা ত সাঁতারের জামা। বাঃ, আমারও ত অমন জামা আছে, ছবিও আছে; দেখনি নাকি তুমি?'

'তোমার থাকে থাক, মেয়ের থাকবে না।' যূথিকার গলায় এবার স্পষ্ট আদেশ, 'হেদোর জলে সাঁতার কেটে মেয়ের তোমার জীবন কাটবে না; তাকে ঘর সংসার করতে হবে।—ছি-ছি, কী জঘন্য ছবি! পাঁচজনে তো চোখ দিয়ে তাই গিলে খাবে!'

'কি যে বলো?' হিমাংশু স্ত্রীর কথায় হেসে ফেলে, 'রসগোল্লা না পান্তুয়া যে গিলে ফেলবে! তবে হ্যাঁ, দেখবে। দেখানোর জন্যই তো ওই ছবি, ; ওতে তোমার মেয়ের গর্ব। আর যদি অন্য কথা বলো, তবে বাপু, সত্যি কথাই তো; ভালো চেহারা দেখাবার জন্যেই।' একটু থেমে আবার, 'এই ধর-না তোমার আমার কথা। বিয়ের আগে দাদু, মা—দুজনই তোমায় দেখেছিলেন; লুকিয়ে-চুরিয়ে আমিও। আর দিব্যি করে বলো তুমি, আমাকেও তুমি দেখেছিলে কিনা? হুঁ-হুঁ, বাব্বা—এত দেখাদেখি, ভালোলাগা, তবেই না বিয়ে?'

স্বামীর বাকবিন্যাসের তরলতায় যূথিকার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হতে চলেছিল। তাড়াতাড়ি অন্তিম উষ্মাটুকু প্রকাশ করে ও বলল, 'সব কথা নিয়ে হ্যালহেলে ভাব আমার ভাল লাগে না! ওসবের বয়স পেরিয়ে গেছে, এখনো তোমার এই ছেলেমানুষি কি ভাল লাগে, না মানায়?' কথা শেষ করে যূথিকা আর দাঁড়ায় না, চলে যায়।

স্ত্রীর কথায় মুচকি হাসে হিমাংশু। ও লক্ষ করেছে—যূথিকা দিনে অন্তত দু-পাঁচবার চেষ্টা করে, হিমাংশু যে ছেলেমানুষির বয়স কাটিয়ে প্রায় প্রবীণত্বের সীমানায় এসে পেঁ।ছেচে সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার। অথচ হিমাংশু জানে, এটা বাড়াবাড়ি

যূথিকার। জোর করে বয়স পাকাবার চেষ্টা। বাস্তবিক, কি এমন বয়স ওর বা যূথিকার। নেহাত এক সেকেলে দাদুর পাল্লায় পড়ে গোঁফ ঘন হওয়ার বয়সে, সেই কুড়িতে, কলেজে পড়ার সময়ই তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল পনেরো বছরের যূথিকাকে! নয়ত আজ তার বা যূথিকার এমন একটা বয়স হয় নি, যাতে বুড়োটে মেরে যেতে হবে। বরং আজকাল ছেলেরা কে-ই বা ত্রিশ-বত্রিশের আগে, আর মেয়েরা তেইশ-চব্বিশের আগে বিয়ে করে? একটু বয়সে বিয়ে হওয়াই ভাল—হিমাংশুর আজকাল এই ধারণা। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় তার বা যূথিকার কিছু ক্ষতি হয়েছে বই কি! একটা আশ্চর্য সিরসিরে তারুণ্যের আনন্দ যদিও বিয়ের সময় ওদের ঘিরে ছিল, বিয়ের পরেও, তবু ষোল বছরে মা হয়ে যূথিকা মরতে বসেছিল। কী কষ্ট তার, কী ভয় হিমাংশুর! ভেবে ভেবে ভয়ে দুশ্চিন্তায় হিমাংশুর চেহারা শুকিয়ে গিয়েছিল, অমন সাঁতারু বুকের ফুসফুসটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কালি ধরেছিল চোখের নীচে। যাক্ ঈশ্বরের কৃপায় প্রচুর অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করার পর যূথিকা বেঁচে উঠল। আবার সে ফিরে এলো এই আলোয়, হিমাংশুর স্পর্শানুভূতির গণ্ডির মধ্যেই। কিন্তু সে-যূথিকা আর নয়। মিষ্টি, মোলায়েম চেহারা আর নেই; বিবর্ণ, শুষ্ক, অস্থিসার, দীপ্তিহীন। তার শরীরে একটা গোলমেলে অঙ্গই চিরকালের জন্যে বিকল করে দিল ডাক্তাররা। দ্বিতীয় কোনো পুতুলের সম্ভাবনা থাকল না আর ওর জীবনে। না থাকুক; এক পুতুলই যথেষ্ট। যাকে হারাবার আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, সেই যখন ফিরে এলো, তখন হৃতস্বাস্থ্য, বাঁ-পা টেনে টেনে হাঁটা নির্জীব স্ত্রীই এক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের আনন্দস্বাদ বয়ে এনেছে হিমাংশুর জীবনে। খুঁত নিয়ে কে তখন মাথা ঘামায়? হিমাংশু ঘামায় নি; আজও ঘামায় না বোধহয়। খালি এইটুকুই মনে হয়, দুর্বল স্বাস্থ্যের আর সম্ভবত শারীরিক গোলমালের জন্যে যূথিকার স্বভাবেও কেমন একটা নির্জীবত্ব এসে পড়েছে দিনে দিনে।

সে-তুলনায় হিমাংশু অবশ্য ছেলেমানুষই, অন্তত ছেলেমানুষের মতন চঞ্চল, চপল, দুরন্ত স্বভাবের। এর জন্যে যদি দোষারোপ করতে হয়, তবে তার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনীশক্তিকেই করা উচিত। প্রখর যৌবনের অমিত তাপে তার প্রাণশক্তি উথলে উঠছে, উপচে পড়ছে। তা নিয়ে কী করবে হিমাংশু তাই যেন ভেবে পায় না। অফিস-শেষে সাইকেলটাকে হাওয়ার গতিতে রাস্তার পাশ ছুঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, র‍্যাকেট হাতে খেলতে নামলে হার্ড সার্ভিসে অপর পক্ষকে নাস্তানাবুদ করে তোলে, প্রতিটি অঙ্গ মত্ত হয়ে ওঠে টেনিস বলের চকিত বিচরণে। এতেই সে শেষ নয়, বা এতটুকুতেই। সুইমিং ক্লাবে আজও সে ট্রেনার; ব্যাকস্ট্রোকে সাঁতারু যুবকদের ভীতিস্থল। ছোটদের দল হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় চাঁদা উঠোতে, পুজোর প্যাণ্ডেল সাজাতে। বন্ধুরা ধরে নিয়ে যায় তাসের আড্ডায়, চৌরঙ্গী

পাড়ার পানীয়-কক্ষে কখনো হয়ত। শেষের জিনিসটা সম্পর্কে তার আকর্ষণ বা অনুৎসাহ কোনোটাই নেই। কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় চলে যায়। আর দেখা যায়, এমন দিনে বেশ রাত্রেও কার্জন পার্কে চক্কর মারছে হিমাংশু। মনে মনে হিসেব কষে যতক্ষণ না স্থির ধারণা জন্মাচ্ছে পুতুল ঘুমিয়ে পড়েছে, ততক্ষণ ট্রামে উঠবে না ও। রাগ করলেও যূথিকার কাছে এই ক্বচিৎ-কদাচিৎ অপরাধের মার্জনা আছে। ভয় পুতুলকে। পাছে পুতুল বুঝতে পারে, বাবা তার মদ খেয়েছে —সেই ভয়ে অনেক রাত করে অসাড় পায়ে হিমাংশু বাড়ি ঢোকে; উঁকি দিয়ে দেখে, মেয়েটা ঘুমিয়েছে কিনা। বিছানায় শুয়ে সেদিন নিজের ওপর যত রাগ, তত ঘৃণা হিমাংশুর। ছি-ছি—এমন নেশার দরকার কি, যাতে মেয়ের কাছে যেতে লজ্জা, মেয়েকে পাশে ডাকতে ভয়। সারা সন্ধ্যে মেয়েটা নিশ্চয়ই কান পেতে বসে থেকেছে, পড়ার টেবিলে বসে বই খুলে রেখেছে অযথাই, একটা অক্ষরও চোখে দেখে নি। খেতে বসে খুঁতখুঁত করছে। শেষ পর্যন্ত অভিমানভরেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। মনটা ভয়ংকর রকম মুষড়ে পড়ে হিমাংশুর। শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করে, আর নয়—বন্ধুদের এই বাজে ফুর্তির পাল্লায় পড়ে নেশা-টেশা আর করছে না সে।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই মেয়েকে নিয়ে আদরের আতিশয্য শুরু হয়ে যায়। যেন প্রায়শ্চিত্ত করছে হিমাংশু। সকাল-দুপুরটুকু কোনোরকমে কাটল, বিকেল থেকে বাপ-মেয়ে পাশাপাশি, ছায়ায়-ছায়ায় জোড়া। দোতলার খোলা বারান্দায় ফুলের টবে জল দিচ্ছে হিমাংশু, একদমে দুশো আড়াইশো ক্রস স্কিপ করে পুতুল ঘন ঘন শ্বাস টানছে, মুখ লালচে। তারপর মুখ হাত ধুয়ে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোয় মেয়ে নিয়ে হিমাংশু। ট্যাক্সি চড়ো, টফি কেনো, গল্পের বই চাও ত তাই: রিবন, পেনসিল, গ্রামোফোনের রেকর্ড—যা চাও!

এমনি এক প্রায়শ্চিত্তের দিনে সকাল থেকে যা শুরু হয় যূথিকা তা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মুখ-ফুটে স্পষ্ট করে বলাও যাচ্ছে না কিছু। এক পিসতুতো বোন এসেছে দিল্লি থেকে আজ সকালেই। বিকেল পর্যন্ত থাকবে; তারপর যাবে তার ভায়ের বাসায়। সেই বোন শিপ্রা যার নাম, দিল্লির কোন এক মেয়ে-কলেজে পড়ায়, এখনো কুমারী। যূথিকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে শিপ্রা। ওর সংসারের খুঁটিনাটি দেখছে আর গল্প করছে দিল্লির, আত্মীয়স্বজনের। আর বলতে কি, এরই ফাঁকে তার রোল্ডগোল্ডের চশমার ফাঁক দিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে বাপ আর মেয়েকে। যূথিকাও সেটা লক্ষ করছে। কিন্তু অবস্থাটা এমন, কিছুই বলা যায় না। সবচেয়ে বেশী রাগ হয় যূথিকার ক্যালেন্ডারের লাল তারিখের ওপর। এত ছুটি যে কেন থাকে অফিস আর স্কুলের—যূথিকা বুঝতে পারে না। না থাকত ছুটি আজ, মেয়ে নিয়ে অত ঘটাপটা করে আদিখ্যেতা করার

অবসর জুটত না হিমাংশুর। ছি ছি, শিপ্রাদি দেখছে তো! কি ভাবছে কে জানে! নিশ্চয়ই ভাল কিছু নয়। আভাসে, যেন শিপ্রাদি বুঝতে না পারে, তেমন ইঙ্গিতে, তবু কয়েকবার চেষ্টা করল যূথিকা হিমাংশুকে সরিয়ে নেবার—কিন্তু কেউ গায়ে মাখল না সে-কথা। প্রকাশ্যে কিছু বলতেও সংকোচ হয়। কে জানে শিপ্রাদি যদি তেমন একটা খারাপ চোখে না নিয়েও থাকে, যূথিকার কথায় হয়ত অন্যরকম একটা ধারণা হবে। অগত্যা রুষ্ট হলেও ভয়ংকর একটা অস্বস্তি চেপে রেখে যূথিকাকে সহজভাবেই সব দেখতে হয়, সহ্য করতে হয়। ওদিকে, ফাঁকা উঠোনে শীতের রোদ্দুরে, বালতিতে ঠাণ্ডা-গরম জল মিশিয়ে হিমাংশু তরল সাবানের ফেনা দিয়ে পুতুলের চুল ঘষে দেয়, পা-হাত রবারের স্পঞ্জ দিয়ে রগড়ে তেল উঠিয়ে ধবধবে করে, অলিভঅয়েল মাখায়।

বেলা গেল, দুপুরও। বিকেলের দিকে শিপ্রাদির ভাইপো গাড়ি নিয়ে হাজির। জোর তাগিদ তার। তাড়াতাড়ি চলে গেল শিপ্রাদিও।

খানিক পরে দেখা যায়, বাপ মেয়ের সাজগোজও শেষ হয়েছে। এবার তারা বেরুবেন। যূথিকা থমথমে মুখে সব দেখে যাচ্ছে, একটাও কথা বলে নি। বলবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা বোধহয়। শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং তারপর—। আজ যেন সেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, ধূমায়িত হচ্ছে ভেতরে ভেতরে।

যাবার আগে হিমাংশু স্বভাবমতন কিছু টাকা চাইল। চাবিটাই দিয়ে দিল যূথিকা। তারপর কাপড় কাচতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ফিরে এসে দেখে, হিমাংশুরা চলে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। বেশ অন্ধকার।

একটু রাত করেই ফেরে হিমাংশুরা। পায়ের শব্দ শোনে ঘরে বসে যূথিকা। হাসি-খুশী মুখ আর একটা অয়েলপেপারে মোড়া প্যাকেট হাতে ঘরে ঢোকে হিমাংশু একাই। চেয়ারে বসতে বসতে প্যাকেটটা যূথিকার দিকে এগিয়ে দেয়, 'নাও, দেখ তো কেমন হল তোমারটা।'

হাত বাড়াবার আগ্রহ দেখা যায় না যূথিকার। নিস্পৃহভাবে ও বসে থাকে, নির্বিকার মুখে। ধৈর্য ধরতে পারে না হিমাংশু। অয়েলপেপারের আচ্ছাদনটা খুলে ফেলে পশমের জামাটা এবার এগিয়ে দেয়। যূথিকা দেখে অল্প একটু সময়, তারপর কেমন একটা অভ্যাসবশে হাত বাড়িয়ে জামাটা টেনে নেয়।

জামা দেখছে না মনে মনে কিছু ভাবছে যূথিকা, ঠাওর করা মুশকিল। হয়ত ভাবছে এবং ভাবনাটাই ওর আড়ষ্ট হাতকে অল্প একটু চঞ্চল করেছে; যার ফলে পাট খুলে গেছে পশমের জামার। নরুন-সরু হাসির ছোঁয়া যূথিকার ঠোঁটে ফুটি-ফুটি করছে যেন।...এমন সময়টিতে দেখা গেল পুতুলকে, দরজার গোড়ায়, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যূথিকার। চোখাচোখি হল মা আর মেয়েতে। মার চোখ মেয়ের সর্বাঙ্গ লেহন করল। আর পরমুহূর্তেই যূথিকার সারা মুখ থমথমে হয়ে

আসে, একটু রোদের আভাস ফুটতে-না-ফুটতেই আকাশ যেন আবার কালো মেঘে ছেয়ে যায়। থমথমে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় যূথিকা। ভুরুর ওপর আঁচড় কেটে অদ্ভুত একটা বিরক্তি চোখের পাতায় এসে জমেছে। দৃষ্টিটা এখন তার দেওয়ালে ; তীরের ফলার মতো ছুঁচলো হিংস্র একটা টিকটিকির মুখের ওপর। হাতের আঙুলগুলোও যে জ্বালা করছে, এতক্ষণে স্পষ্ট যেন অনুভব করতে পারে যূথিকা। তবে তাই হবে, মোলায়েম পশমে নয়, তুষের আগুনেই অজান্তে হাত রেখেছিল ও।

ছুঁড়েই দিয়েছে, নাকি হাত থেকে খসেই পড়েছে ঠিক বোঝা যায় না, দেখা গেল পশমের জামাটা যূথিকার পায়ের তলায় মেঝেতে পড়ে। এক পলক মা'র দিকে তাকিয়ে, এগিয়ে এলো পুতুল, টুপ করে জামাটা কুড়িয়ে নিল। চোখেমুখে তার অনেক বিস্ময়, কিছু কাতরতা। কি হল মা'র ? পছন্দ হয় নি ? এমন আকাশ-নীল রঙ জামাটার, গলার কাছে দু-সুতোয় তোলা শাদা ফুল আর লতার কাজ, দামও প্রায় বাইশ, বাস্তবিক যা সুন্দর, খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের—ওর আর বাবার, তাই কিনা অপছন্দ মার ? মনটা মুষড়ে পড়ে পুতুলের। তবু চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকে, মোলায়েম পশম মুঠোয় ভরে, বোকার মতন, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে।

হিমাংশু মেয়েকেই দেখছে, সেই মেয়েকেই যার নাম পুতুল, দেখতেও পুতুলের মতনই—অমনই নধর গঠন, সুডৌল, সুশ্রী। টিয়াপাখি রঙের নিউ স্টাইল সোয়েটারে পুতুলকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে, এতই অপরূপ যে, হিমাংশু মেয়ের দিকে তাকিয়ে তন্ময়, তদ্গত। ওই যে পুরু জমাট রক্তগোলাপ—পুতুলের সোয়েটারে বুকের ওপর নকশা তোলা—ওই গোলাপের লাল আভা যেন পুতুলকে আলো করে তুলেছে ; তার গায়ের সবুজ, মুখ চোখ হাত-পা'র লালচে শাদায় সেই আলোর ঢেউ ফেনার মতন ছড়ানো-ছিটানো।

খুশীতে উপচে উঠে হিমাংশু ডাক দেয়, 'গ্র্যান্ড ! কাছে আয়, কাছে আয় তো পুতুল দেখি—'

হিমাংশুর উচ্ছ্বাস আর ঘরের আলো দুইই যেন বেশ তীব্র। কাজেই যূথিকা চোখ না ফিরিয়ে পারে না। আর আশ্চর্য, হিমাংশুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াবার আগেই যূথিকা মেয়ের চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছে বিষাক্ত দৃষ্টিতে।

পুতুল মার কুঞ্চিত চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। সামনে বাড়ানো পা আস্তে আস্তে টেনে নেয় পেছনে। হঠাৎ সব যেন আড়ষ্ট হয়ে এসেছে ওর।

মেয়ের মুখ থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে স্ত্রীর ওপরই রাখতে হয় হিমাংশুকে। আর সেদিকে তাকিয়ে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় না। সহাস্য, উজ্জ্বল, মুগ্ধ একটি মুখ ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসে।

যূথিকা এক পাও সরে আসে নি ; একটুও নড়ে নি—শুধু ঘাড় ফিরিয়েছিল যতটুকু, ততটুকুই ফিরিয়ে রেখেছে এবং মেয়েকেই দেখছে এখনো, ঠিক তেমনিভাবেই, অসহ্য একটা বিরক্তিতে। বোঝা যায় নি যূথিকা এবার কথা বলবে, ঠোঁট নড়তেই বোঝা গেল। একটা চিকন স্বর থেমে থেমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল, ঘরের নীরবতা নিষ্করুণ একটি আদেশের কাঠিন্যে থমথমে হয়ে ভেঙে পড়ল।

'ও-ঘরে গিয়ে জামা ছেড়ে চুপচাপ বসগে যাও। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিও।'

চোখ নামিয়ে নিয়েছে পুতুল অনেক আগেই। মার আকাশ-নীল রঙের পশমের জামার বোতামটাই অনর্থক খুঁটে চলেছে ও। বড্ড শক্ত, নখ বসে না। দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারলেই যেন বেশ হত।

পুতুল ফিরেই যাচ্ছে, হিমাংশুর কথায় দাঁড়াল।

'তোমার শাসনের ঠেলায় বাপু অস্থির! তোর মার জামাটা দে তো, পুতুল।' হিমাংশু হাত বাড়ায়। পুতুলকে বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে আসতে হয় আবার। আসতে আসতেই বাবার কথা আবার কানে যায়, 'পুতুলের গায়ে কেমন মানিয়েছে সোয়েটারটা বললে না? এবারে এই ডিজাইনটাই নতুন এসেছে।'

মার দিকে না তাকিয়েও পুতুল বুঝতে পারে, ভাল লাগে নি মার ; কিছুতেই ভাল লাগতে পারে না।

'টাকাগুলোকে খোলামকুচির মতন ভাব তুমি'—যূথিকা বলছে, পুতুলও শুনে যাচ্ছে, 'ছাইভস্ম কিনে আনছ, যা-তা ভাবে খরচ করছ। বলার কিছু নেই, ভাল লাগে না বলতে আমার।'

জানা কথাই মা এই ধরনের কিছু বলবে। পুতুল তাড়াতাড়ি বাবার হাতে মায়ের জামাটা কোনোরকমে ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায়।

পুতুল চলে যেতে হিমাংশু যূথিকার দিকে তাকাল। যূথিকাও স্বামীর দিকে। দু-তিন পা সরে এসে বিছানায় বসে পড়ে ও।

'কি হল তোমার আবার?' হিমাংশু জানতে চায়, 'অযথা মেয়েটাকে ধমকালে কেন?'

'ধমকালেই বা কি—!' যূথিকা হাত বাড়িয়ে হিমাংশুর হাত থেকে জামাটা টেনে নেয়। বিছানার একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'তোমার মেয়ের এসব ধিঙ্গিপনা আমার ভাল লাগে না। তুমি ওকে দিন দিন কি করে তুলছ? আমি ভেবেই পাই না—এরপর ওর কি হবে?'

'ও, এই! সেই পুরোনো কাসুন্দি!' খানিকটা স্বস্তি পায় হিমাংশু। মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। কোলের ওপর থেকে গরম শালটা তুলে বিছানার ওপর রেখে দেয়। আরাম করে সিগারেট ধরায় একটা।

যূথিকা তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখে। স্বামীর ভাবভঙ্গি থেকে মনের কথাটাও বোঝা যায়। অর্থাৎ হিমাংশু যে তার কথাগুলো পরম অবহেলায় সরিয়ে রাখল, যূথিকা তা বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে রাগটা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে ওর।

'এসব তোমায় ছাড়তে হবে,' যূথিকা আদেশের সুরে বলে।

'কী ?'

'মেয়ে নিয়ে এই ন্যাকামি।'

হিমাংশু স্ত্রীর দিকে চেয়ে এবার হেসে ফেলে; বলে, 'মুশকিলে ফেললে। মেয়ের মাকে নিয়ে ন্যাকামি করতে চাইলেই কি তুমি রাজী হবে ?'

যূথিকা ধমক দিয়ে ওঠে, 'সব সময় তোমার তাচ্ছিল্যভাব আমার ভাল লাগে না।'

'কি-ই বা আমার ভালো লাগে তোমার ?' হিমাংশু উঠতে উঠতে বলল, 'ওই ত জামাটা কিনে আনলাম তোমার—ওটাই কি ভাল লেগেছে ?'

'উঠো না ; বসো।' যূথিকা হাত বাড়িয়ে স্বামীর পাঞ্জাবির হাতা ধরল, 'আমার জন্যে তোমায় জামা কিনে আনতে বলি নি।'

'না বললেই কি আনতে নেই ?' হিমাংশু আবার বসে পড়েছে, 'ইচ্ছে করে, আদর করেও তো মানুষ কিনে আনে।'

'আমার বেলায় ইচ্ছেও নয়, আদরও নয়'—যূথিকা কুটিল সুরে বললে, নিষ্ঠুরের মতন, ধারাল গলায়, 'নেহাতই না আনলে নয়, বাধ্য হয়ে, মন রাখতে এনেছ !'

হিমাংশু চুপ। যূথিকার মুখ থেকে দৃষ্টিটা তুলে নিয়েছে। এখন দেওয়ালের টিকটিকিটা তার লক্ষ্যে।

যূথিকার গলায় একটা শিরা নীল হয়ে ফুটেছে, কাঁপছে দপদপ। একটু থেমে কথাগুলো যেন গুছিয়ে নিল ও।

'এভাবে আমায় তুমি ভোলাতে চাও কেন ? আমি কি ছেলেমানুষ ?'

'বোধহয় তাই।' হিমাংশু আবার একবার চেষ্টা করল সহজ হবার। ফিকে একটু হাসি টেনে বলল, 'তুমি আজকাল অল্পতেই বড় চটে ওঠ। তোমাদের মা-মেয়ের দুটো জামা কিনে এনে কি এমন অপরাধ করেছি, বুঝছি না !'

'বুঝবে না, বুঝবে না—।' যূথিকা অধৈর্য হয়ে উঠেছে, 'মেয়ের তোমার গরম জামার অভাব আছে কিনা তাই একটা আঁটবুক, আধ-কোমরে মেমজামা কিনে আনলে ? ছি-ছি—, চোখেরও একটা ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে মানুষের !'

'ফ্রকের সঙ্গে অমন জামাই তো পরে ; মানানসই বলে না কিনেছি !'

'যে পরে পরুক, আমার মেয়েকে আমি পরতে দেব না। বেহায়াপনার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তোমরা বাপবেটিতে। কি ভাবে লোকে—ছি-ছি—! পনেরো বছরের আইবুড়ো মেয়েকে তুমি—তুমি—' যূথিকা ঠোঁটের কথাটা যেন চেপে নিয়ে অনেক কষ্টে অন্য কথা টানল, 'তুমি ফ্রক পরিয়ে রাস্তা-ঘাট ঘুরিয়ে আনছ !' ঘৃণায় নাক,

চোখ, মুখ কুঁচকে ওঠে যূথিকার।
'বয়সটা এমন কি বেশী?' হিমাংশুকে যেন আজ তর্কের নেশায় পেয়েছে, 'শাড়ি সামলাতে পারবে কেন পুতুল?'
'আমরা কিন্তু পেরেছি।' যূথিকার গলায়, ঠোঁটে শ্লেষ ফুটেছে তীক্ষ্ণতর হয়ে 'পনেরো বছরেই আমার বিয়ে হয়েছে; ষোল বছরে মা হয়েছি। শুধু শাড়ি নয়, মেয়েও সামলেছি।'
বলার কথা আর খুঁজে পায় না হিমাংশু। তর্কের নেশাটাও হঠাৎ থিতিয়ে যায়। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন ও পনেরো বছরের সেই কিশোরী যূথিকাকে খোঁজবার চেষ্টা করছে এবং তুলনা করবার চেষ্টা কবছে এই একত্রিশ বছরের যূথিকার সঙ্গে।
যূথিকাও উঠে পড়েছে। স্বামীর পাশে বসে থাকার মতন ধৈর্য নেই আর তার। অদ্ভুত একটা রি-রি সারা গায়ে-মনে। অস্বস্তিকর, অসহ্য জ্বালা। বাইরে শীত; তবু সেই শীতের হাওয়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে ঘামের মতন লেপটে থাকা এই অস্বস্তিকর জ্বালা থেকে যেন মুক্তি নেই।
বাঁ পা-টা টেনে টেনে যূথিকা চলে যায়। হিমাংশু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তারপর দুটো দিন যূথিকা গুম হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব কম কথা বলে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে সংসারে তার উপস্থিতিটাকে নিরাসক্ত রাখতে চায়। তিন দিনের দিন গুমট ভাবটা কাটতে শুরু করে, পর্দা চড়ে যূথিকার স্বরের। আড়ালে বাপ আর মেয়ে মজা পাওয়ার হাসি হাসে। ওরা জানে, যূথিকার রাগের বহর কতখানি, তার পরিণতি কোথায়। এবার জেরটা একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল, এই যা। তা হোক, গুমট ভাবটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশু আর পুতুল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এখন কিছুদিন শাসনের রাশটা একটু আলগাই থাকবে। যূথিকার স্বভাবই তাই। মেয়ে-বাপ—দুজনাই তা জানে। আর সেই কথা ভেবে দুজনাই পরম খুশী।
চার দিনের দিন পড়ল শনিবার। জানা গেল, দুপুরে যূথিকা যাবে শিপ্রাদিদের বাসায়। ফিরবে সন্ধ্যেবেলায়। পুতুল স্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়িতে একাই থাকবে, হিমাংশু যেন অফিসের ছুটির পর আড্ডা মারতে না গিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে।
স্কুলের বাসে ওঠার আগে পুতুল চুপি চুপি হিমাংশুকে তারিখটা স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আজই কিন্তু থার্টিনথ্, বাবা; ভুলো না! সেই রসিদটা আমি তোমার শার্টের বুকপকেটে রেখে দিয়ে গেলাম।'
রসিদের কথা ভোলে নি হিমাংশু, কিন্তু অফিসের পর অন্য এক ঝামেলায় পড়ে

তার দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে বেশ বিকেল। পুতুল তখন ঝি রাসমণির সাহায্যে পিঠের উপর সাপের মতো দুই বেণী ঝুলিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাবার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে খুশির দাপটে পুতুল বলল, 'আমি ভাবছিলাম তৈরি-ই হয় নি বোধহয়; দর্জিদের কাণ্ড! তুমি এত দেরি করলে কেন, বাবা?'

মেয়ের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে হিমাংশু চেয়ারে বসল পা ছড়িয়ে। টানটান হয়ে। ঝুপ করে বাবার পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল পুতুল। ত্বরিত হাতে জুতোর ফিতে খুলে, মোজা খুলে—জুতো জোড়া হাতে করে উঠে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণে রাখল। বলল, 'আমি তোমার চা করে আনি, হ্যাঁ—তুমি একটু জিরোও।'

'তা না হয় জিরোচ্ছি! কেমন করল ওটা দেখলি না?'

'দেখব, দেখব। দাঁড়াও না। তোমার চা দিয়ে নি আগে। হাত-মুখ ধুয়েই একেবারে পরব।' সাপের মতন দুই লিকলিকে বেণী নাচিয়ে পুতুল ছুটল চা তৈরি করতে।

চা শেষ করে হিমাংশু আরাম করে সিগারেট ফুঁকল। উঠে ট্রাউজার ছেড়ে ধুতিটা জড়িয়ে নিল। বাইরের ফাঁকা দালানে অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। তাতে কি? বেশ একটা আমেজ আর আরাম লাগছে। হিমাংশু চেয়ারের ওপর এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকল। টুক করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের। চোখ খুলে হিমাংশু দেখে, পুতুল একেবারে ঘরের মাঝটিতে দাঁড়িয়ে, আলোর তলার সদ্যপরিচ্ছন্ন ধবধবে মুখটিতে ফুটফুটে হাসি। চোখের তারায় ফুলঝুরির দীপ্তি। গায়ে তার সদ্য-আনা ক্রিমসন রঙের সেই লুজ ফ্রক। চুলের একটা বিনুনি গলার পাশ দিয়ে বেঁকা হয়ে বুকের মাঝটিতে এসে পড়েছে—আগায় যার সাদা জরির রিবনের তৈরি ফুল। ঝিকমিক করছে আলোয়। ঠিক যেন একটি লতান ডাঁটার ওপর এক থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। আশ্চর্য, আশ্চর্য সুন্দর এই পুতুল। কি নিখুঁত অঙ্গ! কপাল, মুখ, চোখ, ঠোঁট, গলা—সব যেন সামঞ্জস্য করে কেউ এঁকেছে নিপুণ তুলিতে। দুটি হাত—যত নিটোল তত কোমল; দুটি পা তাও যেন লালচে মোমের ছাঁচে গড়া, মসৃণ, মোলায়েম, মধুর।

'মন্দ করে নি, না বাবা?' পুতুল লাজুক হাসি হাসে।

মেয়ের গলার স্বরে তন্ময়তা ফিকে হয় হিমাংশুর।

'ওয়াণ্ডারফুল! রঙটা তোকে বিউটিফুল মানিয়েছে।'

'একটু কিন্তু বেশি ঢিলে করে ফেলেছে, যাই বল—।' মেয়ে খুঁত ধরছে এবার।

'নাম যখন লুজ ফ্রক তখন তো একটু ঢিলে-ঢালা হবেই, বোকা—!'

'বই-কি, তা বলে এত! এই দেখ না, হাঁটুর কাছটা ঘাঘরা মতন হয়ে গেছে, আর পিঠের কাছটায় বড্ড বেশি কাপড় রেখেছে, বুকের কাছে একটা কুঁচি দিয়ে নিতে

হবে নিজেকেই—।' পুতুল একে একে টুকটাক খুঁত ধরিয়ে দিচ্ছে।

হিমাংশুকে উঠতে হয়। এত খুঁত যখন, তখন একবার ভাল করে দেখতে হয় অবশ্য। মেয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায় ও। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে। ফ্রকের কাপড়ের ঝুলের অংশটা একবার উঁচু করে একটু। মেয়ে বলে, হ্যাঁ—ওই পর্যন্ত হলে ভাল হত। হিমাংশু মাথা নাড়ে, ঠিক। তারপর বুক। হিমাংশু বুকের দু-পাশের কাপড় দু-হাতের আঙুলে আলতো করে ধরে কাপড়ের বিস্তৃতিটা পরখ করে, সংকুচিত করে বুকের বস্ত্রাংশটা।—'কুঁচি দিয়ে নিলে কি ভালো দেখাবে রে—বরং একটু ছোট করতে দিয়ে এলে হয়।'—'না, না, দরকার কি', পুতুলের আপত্তি, 'আমি হাতেই এমন সুন্দর করে একটা হনিকম্বের কাজ করে নেব, দেখো—।' এরপর কোমর। সত্যি বেঢপ বড়ো করেছে, কাপড় রেখেছে একরাশ। হিমাংশুর দুই বিঘতের মধ্যে পুতুলের কোমরটা আঁট হয়ে থাকে। কি সরু, সুন্দর কোমর পুতুলের—হিমাংশু পরখ করে, ভাবছে, হাসছে, 'তুই এবার একটু-আধটু নাচ শিখলেই ত পারিস, পুতুল—যা সরু কোমর তোর…'। পুতুল আনন্দে আত্মহারা: 'সত্যি নাচ শিখতে ভীষণ ইচ্ছে আমার। আমাদের ক্লাসের রেখা, ছন্দা ওরা ত শেখে, কোথায় যেন। কিন্তু আমি যেন একটু ভারী বাবা; ওরা বেশ হালকা।'…'ভারী?' হিমাংশু হো হো করে হেসে ওঠে, টপ করে কোমরে বিঘত জড়িয়ে শূন্যে তুলে নেয় মেয়েকে! আচমকা মাটি থেকে পা উঠে যেতেই পুতুল ভয়ে হিমাংশুকে আঁকড়ে ধরে—তার হাত হিমাংশুর মাথার চুলে ঘাড়ে টলে পড়ে। ক্রিমসন রঙের লুজ ফ্রকের আড়ালে হিমাংশুর নাক, চোখ মুখ সব ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু একটা অট্টহাসির অনেকখানি শব্দ ঘরের বাতাসে।

পুতুলকে নামিয়ে দিতেই সে গা মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। অর্ধস্ফুট শব্দ বেরুল, 'মা!'

তাকাল হিমাংশু। দরজার গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যূথিকা আর শিপ্রা। মনে হল, ওরা অনেকক্ষণই এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

'কখন এলেন আপনারা?' হিমাংশু শিপ্রার মুখে চোখ ফেলে হাসল, 'আসুন—।'

'এসেছি অনেকক্ষণ, মেয়ে নিয়ে যা মত্ত ছিলেন, বুঝবেন কি করে?' শিপ্রার ঠোঁটের পাশে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই যূথিকা শিপ্রাকে টেনে পাশের ঘরে চলে যায়।

আগের দিন কিছু না বললেও আজ শিপ্রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা তুলল, 'তোর মেয়ের বয়েস কত হল রে যূথি?'

'পনেরো।' বিরস, গম্ভীর মুখ যূথিকার।

'দেখলে যেন আরো একটু বেশি মনে হয়। তা বড়-সড় হয়েছে; ওকে ফ্রক পরিয়ে

রাখিস কেন ? চোখে কটকট করে লাগে ।'

'সাধ করে কি পরিয়ে রাখি ?' যূথিকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তিক্তস্বরে বলছে, 'ওর বাবার শখ, মেয়েকে শাড়ি পরতে দেবে না ।'

'বাবার শখ ?' ঠোঁট উলটে শিপ্রা একটা বিশ্রী শব্দ করল, 'হিমাংশুর এই শখ নিজের চোখেই দুদিন দেখলাম ।' আবার একটু থামল শিপ্রা, তারপর গলার স্বর নীচু করে, যেন উপদেশ দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'জিনিসটা মোটেই ভালো নয়, যূথি । এসব আসকারা তুই দিবিনে । এ এক ধরনের কমপ্লেক্স !'

যূথিকা শেষ কথাটা বুঝল না । শিপ্রাদির চোখের দিকে তাকাল ।

'মানে ?'

'মানে—? ও, সে তুই বুঝবি না !' শিপ্রা যূথিকার অজ্ঞতাকে উপেক্ষা জানিয়ে অনুকম্পার হাসি টেনে আনল ঠোঁটে, 'আসলে যূথি, এই—এই—ধরনের রুচি—কি বলব যেন একে—হ্যাঁ, এই ধরনের রুচি খুব খারাপ, নোংরা ।'

যূথিকা কয়েক মুহূর্ত ফ্যাকাশে, অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে শিপ্রাদির মুখের দিকে । তারপর উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে । আলমারি খুলে টাকা বের করে । খান পাঁচেক দশ টাকার নোট এনে শিপ্রার মুঠোর মধ্যে গুঁজে দেয় ।

'এতে হবে তোমার ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ; যথেষ্ট । আমি তাহলে উঠি যূথি । বেশি রাত হলে বাড়ি খুঁজতে বিপদ হবে । টাকাটা তোকে দিল্লি ফিরে গিয়ে পাঠাব কিন্তু ।'

'সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও না ।'

'না, না ; দরকার নেই । একাই বেশ যেতে পারব । চলি, অ্যাঁ—।'

শিপ্রা চলে যায় । নিচে নেমে বিদায় দিয়ে আসে যূথিকা ।

ওপরে উঠে শাড়িটা বদলে নিয়ে কোনোরকমে বাথরুমে গিয়ে তপ্ত চোখে-মুখে, হাতে-পায়ে অনেকখানি জল ঢালে, তারপর সেই সপসপে ভিজে অবস্থাতেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে । বাতি নিবিয়েই ।

যূথিকা যে সেই শুয়ে পড়ল আর উঠল না, কথা বলল না । রাত বাড়ল । পুতুল এসে ডাকল মাকে । কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ভাঙা চাপা গলায় যূথিকা বলল, 'তোমরা খেয়ে-দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় । রাসমণিকে বল, সব গোছগাছ করে নীচের চাবি রেখে দিয়ে যাবে ।'

রাত বেড়ে চলেছে । ঘড়িতে দশটা বেজে গেল । পুতুল এসে শুয়ে পড়ল মার পাশে । ধোয়া-মোছা সেরে রাসমণি ওপরে এসে চাবি রেখে গেল । বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল দরজা । হিমাংশু অনেকক্ষণ হল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে । ও-ঘর এ-ঘরের মধ্যে যে-দরজা তাতে কপাট থাকলেও সে-কপাট বন্ধ হয় না ; একটা পর্দা শুধু ঝোলে । ও-ঘরেই হিমাংশু শোয়, তার নিজস্ব কাজ-কর্ম করে । স্বামীর

শোয়া-বসার জন্যে, পুতুল বড়ো হবার পর, যূথিকা নিজের হাতেই এ-ব্যবস্থা করেছে।

হিমাংশুর ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই সে ঘুমোয় নি। হয় কোনো বইয়ে, না হয় ক্রসওয়ার্ড পাজলে ডুব দিয়েছে।

ঘড়ির কাঁটায় শব্দ ঠেলে রাত গভীর হয়ে আসে। সব নিস্তব্ধ। শীতের রাত। সমস্ত পাড়াটাই এতক্ষণে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাড়িটাও। একটা বেড়াল সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে গেলে তার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, কেউ খিল খুললে; জানালার ছিটকিনি দিলেও খুট করে আওয়াজ ওঠে। এমন কি, পুতুল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেশে উঠছে—সেই খসখসে ভাঙা আওয়াজ নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে লাগে। অনেকখানি ঠান্ডা খড়খড়ির ফাঁক দিয়েও যেন যূথিকাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। বারোটাও বেজে গেল। ঘড়ির সেই ঘণ্টা পেটার শব্দটা যেন বারোটা মুগুর পিটে গেল ঘরের অন্ধকারে। ধকধক করে যাচ্ছে যূথিকার বুক, খসখসে একঘেয়ে কাশি কেশে চলেছে পুতুল। ফট করে বাতি জ্বলে উঠল। যূথিকার বিছানার পাশে হিমাংশু।

দেখছে বই-কি হিমাংশু—পাশাপাশি মা আর মেয়েকে। যূথিকা ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে, বালিশের ভাঁজের তলায় মুখ চাপা, ডান হাতটাও গালের ওপর দিয়ে কপাল বেয়ে বালিশের প্রান্তে এলিয়ে রয়েছে। কিছু ভাল করে দেখা যায় না। চোখের পাতা বোজা।

মার দিকেই মুখ করে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে পুতুলও। ক্রিমসন রঙের সেই লুজ ফ্রক এখনো তার অঙ্গে। গায়ের লেপটা সরে গেছে—অর্ধেক দেহটাই তার খোলা। হিমাংশু আরো একবার মুগ্ধ চোখে মেয়েকে দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! সাদা চাদর আর বালিশের ফেনার মধ্যে সূর্যাস্তের রঙ ছোপানো একটি ঢেউ যেন। হয়ত দুঃস্বপ্ন দেখে ঠোঁট খুলে কেমন একটু ককিয়ে উঠে থেমে গেল পুতুল, আবার কাশল খুকখুক করে। নড়েচড়ে উঠে ফের শান্ত। রাত্রে কাশিটা বেড়েছে মেয়েটার। যেভাবে শোয়, রোজই হয়ত ঠান্ডা লাগে। গলার কাছটায় অত খোলা না রাখলেই কি নয়। হিমাংশু হাত বাড়িয়ে গলার কাছটায় জামার টিপকলটা এঁটে দেয় পুতুলের, লেপটা টেনে দেয় গলা পর্যন্ত। কতকগুলো চুল কপালের পাশ দিয়ে চোখ এসে পড়েছিল। আস্তে আস্তে সরিয়ে দেয়। গভীর সোহাগে গালে মুখে কপালে হাত বুলিয়ে সরে আসে। বারান্দার দিকের দরজাটা ফাঁক হয়েছিল। বন্ধ করে দেয় হিমাংশু। ছিটকিনি তুলে দেয়। বাতি নেবায়। তারপর পর্দা সরিয়ে যায় নিজের ঘরে।

বিছানার দিকেই এগুতে যাচ্ছে হিমাংশু, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে টান দিল চাদরে।

মুখ ফেরাতেই দেখে যূথিকা।
'তুমি ঘুমোও নি ?' হিমাংশু অবাক।
'না।' ঘুম থেকে তো নয়ই যেন খুব জ্বর থেকে ও উঠে এসেছে, তেমনি শুকনো টকটকে ওর চোখ মুখ, তেমনি বিশ্রী ঝাঁঝ আর তিক্ততা তার গলায়।
'কি করছিলে তবে এতক্ষণ ?' হিমাংশু আবার এগুতে চায়।
'তোমার কীর্তি দেখছিলাম।' যূথিকা আবার বাধা দেয়।
'কীর্তি !' অবাক চোখে চায় হিমাংশু।
'তাই।' ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরেছে যূথিকা।
'স্পষ্ট করে বল যা বলতে চাও, হেঁয়ালি করো না। আমার ঘুম পাচ্ছে।' হিমাংশু এই প্রথম বিরক্ত হল।
'বলবই তো।' যূথিকা স্বামীর চাদর ছেড়ে দিল, অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে তাকাল ঘরের এদিক-ওদিক। তারপর হঠাৎ, যে-কপাট এতকাল খোলাই থাকত রাত্রে, সেই পাশের কপাটটা পর্দা সরিয়ে বন্ধ করে দিল। এক মুহূর্ত থামল। কি ভাবল সে, কে জানে। দু-পা এগিয়ে সুইচটা অফ করে দিল। মুহূর্তে সারা ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। একপাশের এক খোলা জানলা দিয়ে বাইরের একটু আলোর আভাস জেগে থাকল।
'বাতি নেবালে কেন ?' অন্ধকারেই বিছানার পাশে এগিয়ে গিয়ে বসল হিমাংশু।
'অন্ধকারই ভাল। আলোয় তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়।'
হিমাংশু কতদূর বিস্মিত হয়েছে অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না।
'রাত দুপুরে কী পাগলামি শুরু করলে, যূথি ? কী যা-তা বলছ ?'
'পাগলামি নয়, যা বলছি তা তোমায় শুনতেই হবে। আমি আর পারছি না—আমার সহ্য-শক্তি আর নেই—নেই।' যূথিকা সত্যিই বুঝি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, 'তোমরা দুজনে—মেয়ে আর বাপে মিলে আমায় শেষ করে ফেলছ। কী চাও তুমি, আমি চলে যাই, আমি মরে যাই ?'
',এসব কী বলছ !'
'ঠিক কথাই বলছি। তুমি কী বল ত, মানুষ না পশু ? পুতুল না তোমার মেয়ে ?'
অন্ধকারেও হিমাংশু একবার চমকে উঠে স্ত্রীকে দেখবার চেষ্টা করল।
'রাত দুপুরে তুমি এই কথা বলতে এসেছ ?'
'হ্যাঁ—হ্যাঁ। রাত দুপুরে তুমি যেমন লুকিয়ে পনেরো বছরের মেয়ের ঘুমন্ত চেহারা দেখতে যাও।'
'যূথি'—হিমাংশু কিছু যেন বলতে চায়। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা দিয়ে যূথিকার তীক্ষ্ন, অসম্ভব তিক্ত, একরাশ অভিযোগ স্রোতের মতন বেরিয়ে আসে।

'তুমি বাপ হতে পার, কিন্তু সে মেয়ে ; তার রূপ আছে, বয়স আছে। তার কী নেই, কী হয় নি। জান না তুমি ? তবু, এই মেয়ে নিয়ে তোমার বেহায়াপনা রোজ রোজ আমি দেখে যাচ্ছি। বাইরের লোক এসেও আজ দেখে গেল। ছি, ছি, ছি। কোন্ আক্কেলে তুমি ওর বুকে মুখ গ'ুজে থাক, কোমর জড়িয়ে ধরো।' যূথিকার হাঁপ ধরে যায়। তবু অনেক কষ্টে দম নিয়ে আবার সে বলে, 'এতদিন বুঝি নি, আজ বুঝতে পেরেছি, মেয়েকে ফ্রক পরাবার বায়না তোমার কেন।'

'চুপ কর, চুপ কর যূথি !' অন্ধকারেই হিমাংশু দাঁড়িয়ে উঠেছে। কাঁপছে তার গা, গলা।

'করব বইকি, চুপ ত করবই, চিরকালের মতনই। এত পাপ তোমার মনে তবু আমি থাকব ভেবেছ ! আমি—'

যূথিকা আর পারে না, কান্নায় তার গলা একেবারেই বুজে এসেছে। অনেকটা ফোঁপানো আবেগের অদ্ভুত একটা ছমছমে শব্দ উঠিয়ে, আশ্চর্য করুণভাবে ডুকরে কেঁদে উঠে অন্ধকারেই ও চলে যায়। একটা শব্দ শুধু ওঠে। পাশের কপাট খুলে আবার বন্ধ হওয়ার শব্দ। সেই শব্দটা যেন হিমাংশুর বুকের হৃৎপিণ্ডে এসে আঘাত করে।

ক'টি তো মুহূর্ত। কিন্তু এই অল্প একটু সময়ের ব্যবধানে হিমাংশু এই ঘর, পরিবেশ, সংসার, স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে। সেখানে কিছু কি আছে ? বাতাস, আলো ? কিচ্ছু না। শুধু সাপের কুণ্ডলীর একটা হিমস্পর্শ, আর প্রতি পলকে শত সহস্র বিষাক্ত দংশন। যার বিষে এখনো সে অসাড়, যার ক্রিয়ায় এখনো সে অচেতন এবং যে-দংশনে তার স্নায়ু মৃত।

নিছক একটা মানসিক প্রাণ এখনো আশ্চর্যভাবে গিরি-গোপন শীর্ণ জলপ্রবাহের মতো ক্ষীণ স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। শুধু এইটুকু মাত্র অনুভূতিতেই হিমাংশু এখনো কানের কাছে যূথিকার সেই তীক্ষ্ন নির্মম নিষ্ঠুরের মতো শাণিত কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। আর শুধু শোনা নয়, যূথিকার প্রত্যেকটি অভিযোগ অদ্ভুতভাবে একটি একটি করে অসংখ্য ছবি ফুটিয়ে তুলছে। জীবন্ত করছে বহু ঘটনা, বহু মুহূর্ত, বহু অচেতন অভীপ্সা। পুতুলের বুকে মুখ গুঁজে হিমাংশু হাসছিল বটে, কিন্তু কোথায় একটা সুধার স্পর্শ যেন ছিল। ঠিক, ঠিক—পুতুলের হাঁটুর ওপর থেকে বস্ত্র সরিয়েছে ও কিন্তু চোখে পড়ছে—একটি অন্য আকাশ, কি ফুল, কি পাপড়ি। অস্বীকার করবে কি হিমাংশু, পতুলের চুল, চোখ, সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ ওর চিত্তে যে শিহরণ জাগিয়েছে তার মধ্যে কোনো আনন্দের স্বাদ ছিল না ?

কোনো কিছুই অস্বীকার করবে না হিমাংশু ; করতে চায় না আজ। এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কার কাছে কি গোপন রাখতে পারে সে ? নিজেকে ?

তারই তো অংশ পুতুল। নিজেকে গোপন করার অর্থই তো পুতুলের কাছে নিজেকে গোপন করা। হিমাংশু তা পারে না। যদি মনের সংগোপনে জট পাকিয়ে গিয়ে থাকে অজ্ঞাতে, অদ্ভুত কোনো আবর্ত সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সব আজ প্রকাশ হোক।

জানলাটা হাট করে খুলে দেয় হিমাংশু। শীতের কুয়াশায় সমস্ত আচ্ছন্ন ; পাশের বাড়িটাও হারিয়ে গেছে। হয়ত অমনিই হবে—স্নেহের আর পিতৃত্বের কুয়াশায় হিমাংশুর সত্য পরিচয় ঢাকা ছিল। আবার যেন একটা বিষাক্ত ছোবল খেয়ে ওর চিন্তাটাই অসাড় হয়ে এলো।

বাতি জ্বালবে নাকি হিমাংশু ? এত অন্ধকার ! যেন একরাশ অশরীরী প্রেতস্পর্শ ওকে ঘিরে রয়েছে। একটু আলো আসুক। হিমাংশু অস্থিরভাবে অন্ধকারে হাত বাড়ায়। হঠাৎ চমকে উঠে হাত সরিয়ে নেয়। না, না, অন্ধকারই ভাল। আলো নয়। আলো এসে হিমাংশুকে প্রকাশ করে দেবে, নিজেকেই নিজে সে দেখতে পাবে, স্পর্শ করতে পারবে। কুৎসিত একটা গলিত কুষ্ঠকে কি স্পর্শ করা যায়—না, প্রকাশ করা যায় ! ঘিনঘিন করে ওঠে হিমাংশুর গা, মন, হাত পা। থাক, অন্ধকারেই থাক। আর যেন আলো না ফোটে। হা ঈশ্বর !

পলে পলে পলাতক সময় এসে রাত চুরি করে নিয়ে যায়। কখন যেন হিমাংশুর খেয়াল হয় তার চোখ, মুখ, মাথা সব পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বালা। এক-রাশ ছুঁচ ফুটে চলেছে মাথায়। কোথায় যেন, কোথায় যেন ? হিমাংশু শক্ত মুঠিতে চুল চেপে ধরে টানে। টানে। আঃ ! কি আরাম !

জলের জন্য আকুলি বিকুলি করছে প্রত্যেকটি শিরা, প্রতিটি স্নায়ু। একটু জল।

হিমাংশু কেমন করে যেন বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসে। হুট করে ছুটে পালায় বেড়ালটা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে গায়ে মাথায় চোট দিয়ে যায়। আরো একটু সম্বিত ফিরে পায় হিমাংশু। বুক টেনে টেনে নিশ্বাস নেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার আকাশ দেখে, কয়েকটা তারা। তারপর টুক করে বাথ-রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যায়। আবার একটু মৃদু শব্দ। ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দেয় হিমাংশু।

বাথরুমে এসে দাঁড়াতেই হিমাংশুর খেয়াল হয়—কাঁচের উঁচু জানালা দিয়ে একটু ফরসা এসে ঢুকছে। পা পা করে এগিয়ে যায় ও ; জল নয়, আয়নার দিকে। আয়নায় স্পষ্ট, খুব অস্পষ্টভাবে মুখ দেখা যাচ্ছে তার। একেবারে কাছটিতে এসে দাঁড়ায় হিমাংশু। আয়নার বুকে একটা জল ধোওয়া শ্লেট-রঙের ছবি ফুটেছে। তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে হিমাংশু সেই ছবির মধ্যে কাকে বুঝি খুঁজছে।

গালে হাত তুলতেই ছবির মধ্যে থেকে সেই ছায়াকৃতি লোকটাও নড়ে ওঠে—হিমাংশু সে নয়, কারণ হিমাংশু পিতা, কিন্তু ও অন্য লোক, যে পিতা নয়, পশু। যার

দৃষ্টি সুস্থ মানুষের নয়, জানোয়ারের।

হিমাংশুরই অসম্ভব ঘৃণা হয় তার ওপর—। শুধু ঘৃণাই নয়, তাকে ধিক্কার দেয় হিমাংশু, ইচ্ছে হয় ওর টুঁটি চেপে ধরে, ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধে…।

আশ্চর্য, আরো কি ফরসা হয়েছে আকাশ—নাকি একটু আলো আসছে কোথাও থেকে। আয়নার ছবিটি আরো স্পষ্ট, আয়নার নীচের একটি সরু ব্র্যাকেটে সাজান দাড়ি কামানর সাবান, ডেটল, খুর, সেই রবারের হ্যাণ্ডেল, ব্রাশ সব ফুটে উঠেছে।

জানোয়ারটার চোখে চোখ রাখতেই আর ইচ্ছে হচ্ছে না হিমাংশুর। ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধ যেন ভেসে আসছে। বিকৃত মুখভঙ্গি করে হিমাংশু ব্র্যাকেটের ওপর থেকে খুরটা তুলে নেয়।

রক্তের স্বাদ আছে, কিন্তু গন্ধ আছে নাকি? নেই? কিন্তু ভ্যাপসা পচা ঘায়ের মতন গন্ধ আসছে কোথা থেকে? পঙ্কিল রক্তের, কলুষ নিশ্বাসেরও হতে পারে। হতে পারে ওই পশুটার)

হিমাংশু আর সহ্য করতে পারছে না। ঘিনঘিনে গন্ধটা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এমন কি বুঝি রক্ততেও মিশে গেছে।

মণিবন্ধের একটি শিরায় খুরটা জোর করে চেপে ধরল হিমাংশু। তারপর ছোট্ট একটু টান। ছত্রিশ বছরের অমিত-তাপে তপ্ত একটি যৌবনের উষ্ণ শোণিত ফিনকি দিয়ে ছুটে এলো। আঃ, কী টনটনে আরাম! কী শান্তি! যেন হুহু করে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। আরো একটু দ্রুত মুক্তি চাই, দ্রুত। এবার ডান হাতের মণিবন্ধে গভীরভাবে খুরটা টেনে দেয় হিমাংশু।

টুপ টুপ…জল কি পড়ছে? সিরসির করছে নাকি গা? ঘুম কি আসছে এতক্ষণে? হয়ত কিছুই না, সব ভুল—সব ভুল। তবু এ আশ্চর্য আরাম। যেন অনেক কলুষ রক্ত বিশুদ্ধ হাওয়ায় এসে শুদ্ধ হচ্ছে, তারই আরাম; একটা পুঁজ রক্ত ভরা ফোড়া থেকে আশ্চর্য যাদুবলে যেন সব কষ্ট কেউ শুষে নিচ্ছে, তারই স্বস্তি।

আরো একটু আলো এসেছে না ঘরে! হিমাংশু চমকে চায়। ইস্, এ যে অনেক রক্ত। কোথাও তো কালো রঙ নেই, সেই কুৎসিত কালো, যাতে পাপের বীজ লুকিয়ে থাকে। নেই, নেই—? হিমাংশু তবু খোঁজে, সতর্ক চোখে। যদিও কেমন যেন আচ্ছন্নতা আসছে। এবং কান্নাও।

তবে কি নিষ্ঠুর সত্যটাও ফাঁকি দিয়ে গেল? হিমাংশুর দুর্বল শরীরটা আর একবার যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। আর এবার খুরের আগা দিয়ে শিথিল, কম্পিত, স্খলিত হাতে গলার একটা শিরায় টান দেয়।

ধীরে ধীরে এতক্ষণে গভীর তন্দ্রা নেমেছে হিমাংশুর মনে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাও ছড়িয়ে পড়েছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তৃষ্ণাটা তালুর কাছে এসে ঠেলে ওঠে।

বেসিনের কাছ হাত বাড়াবার চেষ্টা করে হিমাংশু। পারে না। মাথা ঢুলে আসে, মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ে।

অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা পুরু ভারী লেপের মতন পা-মাথা সব ঢেকে ফেলেছে। বুক ছুঁইয়ে যেন একটি প্রশ্বাস আসে, একটি নিশ্বাস যায়। অদ্ভুত একটা আবেগ গলার কাছে পুঁটলির মতো পাকিয়ে গেছে।—আর ঘুম—গভীর, গভীরতর আচ্ছন্নতা। এই আচ্ছন্নতার মধ্যেই আকাশ যেন দেখতে পেল হিমাংশু, খানিকটা আকাশ এবং ক্রিমসন রঙের একটি মেঘ। মেঘ—মেঘ। না, মেঘ নয়; মেয়ে। হিমাংশুর মেয়ে, যার নাম পুতুল, বয়স পনেরো বছর নয়, পনেরো দিন। অসহায়, উলঙ্গ, নির্বোধ একটি রক্তপিণ্ড। কে? মেয়ে।···পনেরোটি পাপড়ি যেন আরো খুলে যায়, একে একে একটি করে—আর এক একটি পাপড়িতে একটি করে বছর বিকশিত হয়ে ওঠে। পুতুল শুধু তিলে তিলে গড়ে উঠছে—হিমাংশুর হাতে হাতে। কল্পনায়, বাস্তবে। যা শুধু শীর্ণ শাখা তাকে শাখায় শাখায় প্রসারিত করে, পত্রপল্লবে সাজিয়ে, পুষ্পসম্ভারে ছেয়ে দিতে—হিমাংশু তার জীবনের সমস্ত সুষমা, শ্রম, স্নেহ অকৃপণভাবে ব্যয় করে চলেছে। কেন? এ কে? তার মেয়ে? এ কি ভিন্ন? হ্যাঁ, দেহ থেকে ভিন্ন। কিন্তু তবু ভিন্ন নয়, রক্তের সেই আশ্চর্য লীলার কাছে ওরা এক, সেই আত্মায় ওরা অভিন্ন। ওর আত্মায় এর জন্ম, এর জীবন, এর লীলা। আর হিমাংশু জানে এই অভিন্নতাকেও একদিন ভিন্ন করতে হবে, এই আত্মাকেও। কী নিষ্ঠুর। গ্রন্থিমোচনের আশঙ্কায় হিমাংশু ভয় পায়। ভয় পায় কেন? পাবে না—? পাবে বইকি, কারণ পুতুলও শেষে একদিন যূথিকা হয়েই সংসারে ফুটে উঠবে—ষোল বছরে যার জীবন যৌবন, প্রেম, উদ্দীপনা, আনন্দ—সব অন্ধকার করে নেমে আসবে একটি চিরাচরিত অভ্যাস—যা কুটিল, জটিল, সতত সন্ত্রস্ত। আর তখন? তখন হিমাংশু শূন্য; যেমন আজ, জীবনের সেই ছেলেবেলার সুখ, স্বপ্ন, মুক্তি সমস্ত থেকে সে শূন্য—যেমন বিতাড়িত যূথিকার উত্তপ্ত অনুরাগ থেকে।···হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডে এতক্ষণে একটা সাহস এলো, ভাসমান মনে একটি আশ্রয়। না, তবে এই ত কারণ, যা পনেরো বছরের পুতুলকে ছোট দেখেছে, ছোটই ভেবেছে। প্রার্থনা করেছে নিঃশব্দে, নিত্যদিন: পুতুল, আমার পুতুল, আমার কাছে ছোটটি থাক চিরকাল—ঈশ্বর, তুমি ওকে যৌবন দিয়ো না, প্রজাপতির রঙ ছুঁড়ো না ওর মনে। ও যে আমার সেই ছেলেবেলা, আমার সেই সুখ, সেই মন আর আনন্দ। সেই আত্মা, একটি শুধু অক্ষয় স্মৃতি। পনেরো বছরের যূথিকাকে নিয়ে আমি যা হারিয়েছি, যূথিকা যা হারিয়েছে, তার স্পর্শ কেন দেবে নিষ্ঠুরের মতন ওকেও?

হিমাংশু শেষে ঘুমের ঢেউয়ে ভেসে যাবার আগে চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াবার, বাথ-রুমের দরজা ভেঙে ছুটে গিয়ে পুতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরবার। কিন্তু তাই কি

সে পারে ? পারে না— (মন দিয়ে স্মৃতিকে জীবন্ত করা যায়, আত্মাকেও, কিন্তু দেহকে ?)

হিমাংশু একবার চোখের পাতা-খুলেছিল একটু আর সেই মুহূর্তটুকু জুড়ে বাইরের ফরসার মধ্যে একটি বিনুনি ঝোলানো ক্রিমসন রঙের মুখ ছিল, একটি মুখ, যা হিমাংশুর আত্মার। যে-ছবি ও নিজেই দেখেছে আর কেউ নয়। কেউ না।

[দেশ : মার্চ ১৯৫৪]



পার্ক রোডের সেই বাড়ি

যদিও ঠিক তা নয়, তবু ও একা। বার্নপুরের পার্ক রোডের এই বাড়িতে চন্দনা নিঃসঙ্গ। এত নিরিবিলি নির্জনতা এখানে—এই পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয় যে সারাটা দিন পাখির ডাক শুনছে চন্দনা, সারাটা দিন। আর সারা সকাল এবং দুপুর চড়ুইয়ের কিচির-মিচির। খড়কুটো-ঠোঁটে চড়ুইগুলো ফুড়ুত করে ঘরে এসে ঢুকবে, চন্দনার ঘরেই—স্কাইলাইটের খুপরিতে তারা বাসা বাঁধবে। কিন্তু পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয় ফিটফাট সাজানো ঘরে বাসা বাধাঁ শক্ত। ঝুল-ঝাড়া বাঁশটা হাতে করে মালি ঘরে আসবে, বাহাদুর ফেন্নার ঝাঁট দিয়ে যাবে—যেন পালিশ ধরিয়ে দিয়ে যাবে সিমেণ্টেও। আর তারপর, তখন সকাল আটটাই হোক, কি বেলা দশটা—কাচের দরজাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে, জানলার সমস্ত শার্সি। অর্থাৎ, আলো আসবে, রোদ্দুর নয়; স্কাইলাইটের অল্প একটু ফাঁক দিয়ে পাখির ডাক, কিন্তু চড়ুই নয়। মাসি আসবেন এমন সময় একবার। তাঁর ঘাসের চটিতে শব্দ ওঠে না, উঠবে না কোনদিনই। আসবেন, দাঁড়াবেন—ঘরের চারদিকে তাকাবেন যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে নিচ্ছেন। ফ্যানের সুইচটা অন করে দিয়ে একটি চেয়ারে বসতেও পারেন, নাও পারেন।

'তোর ঘরে সাফিসিয়েণ্ট লাইট, চন্দনা! আমার ঘরটা সকালে তেমন আলোই পায় না। জিনিসপত্র বড় বেশি। আলমারিটা আর ড্রেসিং-টেবলটা যদি সরাতে পারতাম।'

'সরাবেন?' চন্দনা গ্রামার-বই থেকে চোখ তুলে হাসবার চেষ্টা করলে। যদি এই হাসি এবং কথায় মাসি অন্তত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের আচমকা প্রশ্ন করে না বসেন।

'সরাব? কোথায় সরাব। জায়গা কই, বল্? ড্রয়িং-রুম আর ডাইনিং-রুমে এসব রাখা যায় না—রাখা চলে না। আর তোর এই ঘর—তাও তো অসুবিধে। না, এই বাংলোটায় বড় জায়গা কম।'

মাসি যদি বসে থাকেন, এবার উঠে দাঁড়াবেন এবং ফ্যানের সুইচ অফ করতে ভুলবেন না। ক' পা এগিয়ে এসে সোজা বাথরুমের দরজা খুলে দেবেন। আর খুলে দিয়েই সিঁটকে উঠবেন, ওপাশের দরজা বন্ধ কেন? ড্যাম্প—উঃ, কি ড্যাম্প তোর বাথ-রুমে, চন্দনা। বেসিনে এত দাগ কিসের? বাথ-টবের জল ছাড়া নেই। ন্যাস্টি, ন্যাস্টি মেয়ে কোথাকার। য়ু মাস্ট লার্ন অল দিজ। নিটনেস শিখতে হয়। কি

তুমি ডোমেস্টিক সায়েন্স পড়েছ ? তোমাদের ম্যাট্রিকে কিছু শেখানো হয় না। কিচ্ছু না।'

চন্দনাও উঠে বাথ-রুমে এসে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি পাশের দরজাটা খুলে দিল। রোদে ভেসে গেল ঘর। গ্যারেজের সামনে ফুলগাছের তলায় জমাদার বসে বসে কলাইকরা মগে সম্ভবত চা খাচ্ছিল। তার পাশেই কুকুরটা শুয়ে।

'জমাদার !'

'জি, মা !' জমাদার ছুটে এলো। মেমসাহেব বলার রেওয়াজ নেই এ বাড়িতে। তাই।

'সাফ কিয়া থা এহি গোসলখানা ?'

'বন্ধ থা দরওয়াজা।'

'জলদি সাফ করো। আচ্ছাসে।'

মাসি নাক ঢেকে চলে গেলে চন্দনা পাশের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এখন একটুক্ষণ সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক'পা হাঁটতে পারে ঘাসে, বালিতে। যদিও পায়ে তার বাথ-শ্লিপার, তবু এই মাটির ছোঁয়া সে পেতে পারে ইচ্ছে করলেই। কারণ, কিছুক্ষণ আর মাসি তাকে ডাকবেন না, এদিকে আসবেন না। তিনি এখন স্নানে চলে গেলেন। স্নান করে যখন ফিরবেন তখন তাঁর গায়ে সাবানের মিষ্টি একটা গন্ধ ভুর ভুর করবে। চুলেও হেয়ার অয়েলের মৃদু সৌরভ। এবং তারপর পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ি ভরে সেই আশ্চর্য সৌরভ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়বে। প্যানট্রি থেকে ভেসে আসবে খুটখাট শব্দ, ঘিয়ের গন্ধ কিংবা পায়েসের। অথবা চিকেন সুপের। মাসি ডেটল-জল স্প্রে করবে ঘরে ঘরে। বাগান থেকে নিজের হাতেই রং মিলিয়ে ফুল তুলবেন মাসি। ক'টি ফুল তাঁর ঠাকুরের পটের সামনে রুপোর ছোট্ট থালাটিতে রেখে দেবেন এবং ধূপ জ্বালিয়ে দেবেন ; দামী ধূপ—যার গন্ধ মাসির ঘর থেকে ড্রয়িং-রুমে, ডাইনিং-হলেও ভেসে আসবে, ভেসে যাবে বারান্দাতেও ; তারপর বাকি ফুল ডাইনিং-টেবিলে এবং ড্রয়িং-রুমের ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখে তবে মাসি বসবেন।

বসবেন বারান্দায়, বেতের চেয়ারে—যে চেয়ারে বসে ব্রেকফাস্ট শেষ করে মেসোমশাই ফ্যাক্টরিতে চলে গেছেন। চন্দনাকেও পাশে বসতে হবে। যুগল ট্রে রেখে যাবে বেতের গোল টেবিলে। চা ঢেলে দেবে চন্দনা, রুটিতে মাখন লাগিয়ে দেবে ; নয়তো ক'টা বিস্কুট পিরিচে ধরে দেবে। মাসি দেখবেন, চন্দনার কোন খুঁত সার্ভ করার সময় ধরা পড়ে কিনা। মাসির চা—কিন্তু চন্দনার জন্যে এক পেয়ালা দুধ আর সন্দেশ।

পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয় এসে ওর চা খাওয়া বন্ধ হয়েছে। মাসি বলেন এটা মেসোমশাইয়ের নিষেধ। অত ডেলিকেট চেহারার মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে

চা খারাপ। দুধ খাও—দুধ, ডিম। প্রোটিন খেলে ফ্যাট হবে। মেয়েদের পক্ষে ফ্যাট এসেনসিয়াল। ওটা তো স্টোরেজ। বাচ্চাকাচ্চা হলে শরীর ভেঙে পড়বে না।

এই সময় সাইকেলের ঘণ্টি এবং সেই পিয়ন। সেলাম বাজিয়ে ডাক রেখে যায়। ডাকের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবার উপায় নেই চন্দনার, তা যতই কেননা দিদিদের চিঠির জন্যে মন ছটফট করুক। মাসি বলবেন, অত অধৈর্য কেন! চিঠি এলে বাড়িতেই এসেছে, পাবে ঠিক সময়মতন। এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে—যে কারণের জন্যে ডাকের দিকে তাকিয়ে থাকার উপায় নেই তার। মাসি ভাববেন, লজ্জা নেই তার ছিটেফোঁটাও।

কাজেই অন্যদিকে হয়ত বাগানের দিকে, কিংবা ক'টা কাক যেখানে ঠোঁট ঠোকাঠুকি করছে, সেইদিকে তাকিয়ে মুখ বুজে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকতে হয় চন্দনাকে। মাসি খাম ছেঁড়েন।

'সীতারা হাজারীবাগ যাচ্ছে এবার পুজোতে। মিঠুটা নাকি বড় দুষ্টু হয়েছে।' মাসি চিঠি পড়তে পড়তে আপন মনে হাসেন আর বলেন।

চন্দনা মনে মনে ছটফট করতে থাকে। আর কি লিখেছে দিদি ? আর কি আছে ওই চিঠিতে ? পাইকপাড়ায় সেই টিনের বাড়ির আর কি কি খবর ? কার কার কথা ?

মাসি তখনও চিঠি পড়ে পড়ে হেসে উঠছেন, 'মিঠু পরিমলকে 'বুবু' বলে ডাকে, চাঁদকে বলে তাঁদ। শয়তান, শয়তান হবে মেয়েটা! বুঝলি, চন্দনা মিঠুটা ভীষণ পাজি হবে! কিন্তু এ ভাল নয়। ও বাড়ি ওদের বদলান দরকার। টিনের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি। কচি মেয়ে নিয়ে ও বাড়িতে কি কেউ থাকতে পারে ? তুই লিখে দে তো, চন্দনা, সীতাকে লেখ—পরিমলকেও লেখ—আগামী মাসেই যেন বাড়ি বদলায়। আজই তুই লিখবি মনে করে—দুপুরেই। আমায় দেখিয়ে ফেলবি।' মাসি থামলেন এবং শেষ পর্যন্ত চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

চিঠিটা নিল চন্দনা। কিন্তু অভিমানে চোখে জল এসেছে। দিদির চিঠি—তাকে নয়, মাসিকে। মিঠুর কথা—কিন্তু তাকে ডেকে শোনাচ্ছে না, মাসিকে শোনাচ্ছে। আর আশ্চর্য লোক জামাইবাবু! চন্দনা বলে কাউকে যেন তিনি কোনকালেও চিনতেন না! কেউ নয় চন্দনা তার! চার মাস আগে এক কলম চিঠি দিয়েছিলেন—তারপর ভুলে গেছেন।

যদি মনে করা যায় চোখের জল লুকোতে, তবে তাই, নয়তো এ সময় মাসি একটি পান খান বলেই, চন্দনা আস্তে আস্তে উঠে ডাইনিং-হলে এসে ঢোকে। কত কম খয়ের, কত কুঁচি কুঁচি ক'রে কাটা সুপুরি এবং ক'টি পাতিজর্দা দিলে মাসির মুখের মতন পান হবে, চন্দনার তা জানা হয়ে গেছে আজকাল। পান-সাজার এই অবসরে মনটাকে একটু ছড়িয়ে দেয় চন্দনা। পাইকপাড়ার মণীন্দ্র রোডের সেই মাঠকোঠা বাড়ি। এতক্ষণ সে বাড়িতে রোদ পুরনো হয়ে গেল। কলতলায়

এঁটো কাঁটা জমতে শুরু করেছে। সুধাদি আর হিমাংশুদা অফিস বেরুচ্ছেন, উমা হাঁস-ফাঁস করছে আশাদির মেয়ে সামলাতে। উঠোনে কাক নেমে এসেছে ভাঙা ডিমের খোলা ঠুকরোতে। দিদি বোধহয় সেই এক চিলতে রান্নাঘরেই মিঠুকে কোলে নিয়ে চার দফায় চায়ের জল চড়াচ্ছে। আর, জামাইবাবু নিশ্চয়ই দোতলার ঘরে খিল বন্ধ করে লেখায় মত্ত। তবু যদি লিখত! হয়ত সারা সকালে একটি পাতাও লেখে নি। চার দফা চা, এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হয়ে গেল। এর পর নাইতে নেমে দিদির ওপর যত চোটপাট। অমনি মানুষ জামাইবাবু! বাইরে থেকে মনে হয়, বড় শান্ত, বড় নিরীহ; ঠোঁট বুঝি খুলতেই জানে না! কিন্তু চন্দনা জানে—বাড়িতে লোকটার জন্যে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়; শরীর নিয়ে সর্বক্ষণ খুঁতখুঁত—মাসির চেয়ে এক কাঠি বেশি নোংরা বাতিক। তিন পরিবারের সেই বাড়িতে অত ঝকমকে থাকা কি চলে! অত সাফসুফ! জামাইবাবু তা বোঝেন না। আভা যদি আনাজ ফেলে, তো উমা ভাতের মাড়, দিদি চায়ের পাতা। আর এতেই ওটুকু বাড়ির নর্দমা ভরে উঠবে জঞ্জালে। সেই জঞ্জালে ঠুকরোতে কাক আসবে, চড়ুই জুটবে। কখনও কখনও ছাগল অথবা কুকুরও ঢুকে পড়ে বাড়িতে। এ নিয়ে হই হই আছে। উমা, আভা, পূর্ণিমা আর দিদির হাসাহাসি আছে—দু কলি গান, দু'চারটে ঠাট্টা ইয়ার্কি। কখনও সখনও উমা-আভার হুল্লোড় কিংবা ঝগড়া! চন্দনাও সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামত; একটা বেজে যাবার পরও কয়লা ভাঙত, শাড়ি-শেমিজ কাচত কলতলায় বসে, আর উঁচু গলায় উমার সঙ্গে স্কুলের কি কোনও সিনেমার গল্প করত। ঝগড়াও।

পাইকপাড়ার মণীন্দ্র রোডের সেই তিন পরিবারের বাড়িতে ভিড় ছিল, জঞ্জাল ছিল, দুর্গন্ধ বেরুত মেথর রোজ না এলে—ঝগড়াঝাঁটি ছিল। আর সেখানে লণ্ঠন জ্বালাতে হতো কেরোসিনে, তার শিস উঠত, তেমন হাওয়া ছিল না নিচে, মশা ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে; তবু, তবু সে বাড়ি, চন্দনার মনে হয়, সেই পাইকপাড়ার বাড়িই বেশ ছিল। পার্ক রোডের এই সাত নম্বর বাংলোর চেয়ে সেখানেই যেন হাত-পা ছড়িয়ে, মন এলিয়ে বেঁচে ছিল ও, বেশ ছিল।

আর এখানে—

পান সেজে মাসির কাছে ফিরে আসতে যতটুকু সময় পেল, তার মধ্যেই ডাক দেখা শেষ হয়েছে তাঁর। এবং মাসির মুখ দেখেই চন্দনা বুঝে নিয়েছে, আজকের ডাকে আবার একখানা চিঠি এসেছে।

গত দু মাস থেকে শুরু হয়েছে; প্রথমটায় তবু কখনও-সখনও আসত, এখন প্রায় রোজই। যত আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের—কলকাতা, বর্ধমান, দিল্লী, পাটনা, লক্ষ্নৌ সব জায়গা থেকে চিঠি আসতে শুরু হয়েছে। মাসিই বাধ্য করেছেন। বিয়েটা চুকিয়ে তিনি হাত পরিষ্কার করে ফেলতে চান। কেননা তাঁর শরীর ইদানীং

খারাপ যাচ্ছে ভীষণ। একটা আশঙ্কা এবং নিরাশা ভর করছে তাঁর মনে। যত দিন আছেন, যত দায়িত্ব—এমন অনেক দায়িত্ব আছে, যা তিনি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন—সব ঠিকঠাক পালন করে যেতে চান। এখানে, এ বিষয়ে তিনি নিজের একটিমাত্র ছেলে এবং বোনঝি, ভাসুর-পো, ভাসুর-ঝি'র মধ্যে কোনও পার্থক্য রাখতে চান না। রাখেন নি কখনও।

এ বিষয়ে তাঁর গর্ব আছে! স্পষ্ট মুখে তিনি তা স্বীকার করেন। শিক্ষা এবং মনের উদারতায় এটা সম্ভব হয়! শিক্ষা—ঠিক ঠিক পেলে, কি না হয় মানুষে!

এম. এ. পাস করেছিলেন মাসি ফিলজফিতে। স্কুলের টিচারি করেছেন প্রথমে, পরে প্রফেসারি—শেষে বিয়ে। আর বিয়ে করেছেন যাঁকে—সেই স্বামীর গর্বে তিনি সতত গর্বিতা। স্বামীর মনের উদার পটে তিনি যেন ডানা মেলে উড়ছেন একটি পাখির মতন। ঘুমিয়ে আছেন প্রগাঢ় প্রশান্ত আকাশের তলায়। মেসোমশাই যদি এতটা ভাল না হতেন, মাসির ভাষায়, এত জেনারাস, জেন্টল, সেল্ফ-স্যাক্রিফাইসিং —তা হলে মাসির পক্ষেও হয়তো এমন নিঃস্বার্থ থাকা সম্ভব হত না! কাজেই মাসি সব সময় বলেন, সকলের কাছেই শিক্ষা এবং ভাল পরিবেশে মানুষ সব হতে পারে—সব। এ বাড়িতে, পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোয়, তাই, সব সময় তুমি পরিচ্ছন্নতা পাবে, পাবে শালীনতা এবং আচার, আচরণে শিষ্টতা। গোলমাল, কথা-কাটাকাটি খিলখিল হাসি কিংবা চাঞ্চল্যের নামে চপলতার এখানে প্রশ্রয়ই নেই। এখানে শান্তি, এখানে চুপ, এখানে নিরিবিলি এবং একাকিত্ব।

তা বলে তোমার মনের স্বাধীনতায়—ঠিক যেখানে স্বাধীনতার প্রয়োজন, সেখানে কেউ কখনও হাত দেবে না। মেসোমশাই লিবার্টিতে হস্তক্ষেপ একেবারেই পছন্দ করেন না। বলতে গেলে, একটা যুগই তিনি বিলেতে কাটিয়েছেন; এখনও স্নান করেন রাত্রে, শীতে, গ্রীষ্মে—সর্ব সময়। সব সময় ঠিক ঠিক বেশভূষা করে থাকেন। ডাইনিং টেবলের ম্যানার্স এখনও পালন করে চলেছেন। এগুলো যেন তাঁর জীবনের অঙ্গ, একটা লব্ধ অভ্যাস। এবং তা তিনি রক্ষা করবেন। তেমনি রক্ষা করবেন বিলাতের সেই লিবারেল আবহাওয়া! এটা তাঁর মনের আভিজাত্য এবং সুখ।

এর ফলে মাসিকেও কোনও কোনও বিষয়ে বড় বেশি উদার হতে হয়েছে। আর, ডাকের একটা চিঠি এখন তিনি অনায়াসেই চন্দনার দিকে এগিয়ে দিতে পারেন।

দিল্লি থেকে এসেছে। পড় চিঠিটা।

অতঃপর মাসি পান মুখে দিয়ে, ঘাসের চটিতে শব্দ না তুলেই সোজা তরকারির বাগানে চলে যান। চন্দনা নীল রঙের খামটা হাতে করে একেবার কেঁপে ওঠে। বুকটা ধুকধুক করে। আর কেন যেন অযথাই ক'বার চোখের পাতা পড়ে, দুটি চুল গালের কাছে উড়ে এসে সিরসিরিয়ে তোলে। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ি

দুপুরে গাছগাছালি-আড়াল-করা পুকুরের মতো ছায়াময় ! নিটোল স্তব্ধতায় ঘেরা। অনেক অন্তরাল পেরিয়ে তবে আলোর হালকা আভাটুকু ঘরে আসতে পারে। এখানে চোখের পাতা চাইতে কষ্ট নেই। কেমন একরকম ঠান্ডা ঘরের বাতাস। ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর। অতি মৃদু একটানা একটা শব্দ। যেন ঘরে একটা ভোমরা পাক দিয়ে দিয়ে উড়ছে। আর চন্দনার টেবলে টাইমপিসের টিক টিক। ভারি পর্দার অতি মৃদু খসখস। নরম বিছানায় শুয়ে এলোমেলো হয়েও এ ঘরে এমন দুপুরে মনে হবে, চন্দনা বুঝি নেই। বকের পালকের মতো সাদা দেওয়ালের গায়ে যে ছায়া, স্কাইলাইটের ঝোলানো দড়ির মধ্যে যতটুকু কাঁপন, ততটুকু অস্তিত্ব ফিরে পেতেও চন্দনাকে বুকে বালিশ টেনে অনেক—অনেকক্ষণ ছটফট করতে হয়। তারপর সে গন্ধ পায়—নিজের মাথার বালিশেরই গন্ধ-তেলের সুবাস একটু একটু করে নাকে যায়, ক্লোরোফিল দিয়ে দু দফা দাঁত মাজার স্বাদটুকুও যেন জিভের স্বাদে ফিরে আসে। আর গলা-বুক দিয়ে বুঝি ট্যালকম পাউডারের ফিকে গন্ধ ! নিজেকে ফিরে পেয়েও বালিশে মুখ গুঁজে থাকে চন্দনা ! অন্ধকারেই মনটাকে আবার ছড়িয়ে দিতে পারে—সেই মন, যা তার মাথার চুলের মতন একেবারে নিজস্ব, তার বুকের মতন সব-চোখের আড়াল-করা। চিঠিটার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই সময় ভাবা চলে। দিল্লীর সেই চিঠির কথা। সেই ছেলেটির কথা। কি যেন নাম ? বিকাশ—বিকাশ সেন। না, সেন নয় ; সরকার। আগের ছেলেটি ছিল সেন ; তার আগেরটি মজুমদার এবং তারও আগে ঘোষ, মিত্র, ধর, পাল, চৌধুরী—এমন কি এক মুখার্জিও এসে গেছে। ইন্টার-কাস্টে আপত্তি ছিল না মাসির। কিন্তু যারা এসে চলে গেছে, তাদের জন্যে আজকের এই দুপুর নয়। আজকের দুপুরটুকু বিকাশ সরকারের। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে হয়তো শুধু আজকের দিনটিতেই সে বেঁচে থাকবে—একটি ঘরে, একজনের মনে। চন্দনা আঁচ করবার চেষ্টা করে ছেলেটি দেখতে কেমন হতে পারে। কার মতন ! জামাইবাবুর মত লম্বা, রোগা, আধ-ময়লা ? বিশ্রী—বিশ্রী হবে তা হলে। কেননা, চন্দনা নিজে বেশ ফর্সা ; এবং মাসি যাই বলুন, বেশ পুরুন্ত। সে লম্বা নয় ; ঠিক বেঁটে যে তাও না—মাঝারি। গড়ন ভাল। হাত আর পা দুই-ই তো আশ্চর্য সুন্দর তার। পার্ক রোডেব সাত নম্বর বাড়িতে এসে প্রত্যহ মুখে, হাতে, পায়ে গ্লিসারিন দিতে হয়েছে। চটি পায়ে ঘুরতে হয়েছে, সারা বাড়ি—কয়লা ভাঙতে হয় নি এবং শাড়ি-শেমিজ কাচতে হয় নি কখনও। কাজেই, লুকনো সৌন্দর্যটুকু ফুটে উঠেছে—ফুটে উঠছে দিন দিন। এখন, তার হাতে এই বালা, আঙুলে এই আংটি এবং গলায় ওই সরু হার খুব সুন্দর মানায়। পাইকপাড়ার বাড়িতে তার কিছু ছিল না। কাজেই মানাবার মতন সে সাজতে পারে নি। দিদির আটপৌরে শাড়ি পরেছে, যাতে কর্কশতাটুকু গায়ে ফুটেছে—রূপ ফোটে নি। বার্নপুরের পার্ক রোডের এই

নিস্তব্ধ পুকুরে এতদিনে সব ফুটেছে। ঠিক পদ্মফুলের মতন। আর এই নির্জনতায় তার মনও পাপড়ি মেলছে। বিকাশ সরকারের খুঁটিনাটি তাই ও ভাবতে পারে; ভাবতে পারছে। মনে হয়, ছেলেটি দেখতে ভালই হবে। অন্তত তাই হওয়া উচিত; যখন, যখন সে—অর্থাৎ বিকাশ সরকার জানাচ্ছে মিলিটারিতে চাকরি তার। মিলিটারিতে চাকরি হলেও ভগবান বাঁচিয়েছেন, যুদ্ধের চাকরি নয়। যুদ্ধই বা এখন আর কোথায়! মাইনে আড়াই শ'। আড়াই শ'—এক সময়ে চন্দনার ধারণা ছিল, অনেক, অনেক টাকা। এখন আর সে ধারণা নেই। কলকাতায়—বালিগঞ্জে চন্দনার যে মাসতুতো দাদা থাকে এবং আর এক দিদি—তাদের—শুধু তাদের দুজনের জন্যেই মাসিকে মাসে নগদ দেড় শ' টাকা বাড়ি ভাড়া গুণতে হয়। তারা মাসির নিজের বলেই যে এত টাকা লাগে, তা নয়; তার কমে হয় না, হতে পারে না। বিকাশ সরকারের আড়াই শ' টাকায় কি হবে? কি ক'রে চলবে? চন্দনা একটুক্ষণ ছটফট করলে। তারপর মনে হলো, পাইকপাড়ার জামাইবাবু সওয়া শ' টাকা মাইনে পায় খবরের কাগজের বাজে চাকরিতে। তাদের তো চলছে। অবশ্য সে চলা যেন না চলাই। ধার করে মাথা বিকিয়ে, দরকারে গয়নাগাটি বিক্রি করে। তবু দেখ—দিদি হাসিমুখে চালিয়ে যাচ্ছে, জামাইবাবুও নির্বিকার। তাই, যদিও আড়াই শ' টাকা তেমন ভাল নয়, তবু ওতেই টেনেটুনে চালাতে হবে। আর বিকাশকে, চন্দনা ঠিক করে ফেলল, কখনই ও সিগারেটে টাকা উড়োতে দেবে না। তার চেয়ে তিন মাস অন্তর একটি করে পাঞ্জাবি দামী কাপড়ের, একটি করে ধুতি তাঁতের ও কিনে দেবে। মাখন খাওয়াবে রোজ; আর অন্তত এক কাপ করে খাঁটি দুধ।

বিকাশ সরকারকে পছন্দ করে—যেন দোকানে একটি শাড়ি পছন্দ করে ও কার্ডবোর্ডের বাক্সে বন্ধ করে দাম চুকিয়ে পথে নামল। খুশী-খুশী মন—কেউ দেখছে না, জানছে না, কি ঐশ্বর্য আছে তার লুকানো আজ, এই দুপুরে।

চন্দনার ইচ্ছে ছিল না; তবু উঠতে হল। বাথ-রুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিলে। ডাইনিং হলে গেল, জল খেল এক গ্লাস। চুপি চুপি ক'কুঁচি সুপুরির দিল মুখে। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে বসল। বসল টেবলের কিনারায় বুক লাগিয়ে! খাতা টেনে নিলে। টাস্কটা করতে হবে এইবার—এই নিরিবিলি দুপুরেও।

ট্রানস্লেশনের প্রথম লাইনে চোখ দিয়েই মনটা আবার পিছলে গেল—সরে গেল বই থেকে। 'দিল্লীর কুতুবমিনার একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ!' দিল্লী—দিল্লী—দিল্লী। চন্দনার মধ্যে আবার সেই সিরসির। বিকাশ সরকারই যেন একটি মিনার—চন্দনার মনে সেও যেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ। আজকের দুপুরের মতন সেই মিনারের নিচে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে, প্রত্যাশায়, স্বপ্নে সে সব ভুলে গেছে। ভুলে যেতে বসেছে। মেসোমশাই কখন যে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে চলে গেছেন ফ্যাক্টরিতে—চন্দনা জানতেও পারে নি। এ সময় তাঁকে এক গ্লাস ঘোল করে দিতে হচ্ছে

ক'দিন ! চন্দনা ভুলে গেছে ঘোল করে দিতে ; হয়তো যুগলই আজ ঘোল করে দিয়েছে এবং মাসি ঘুমিয়ে পড়েছেন—কেউ আর তাকে ডাকে নি ।
চন্দনা উঠে পড়ল । এই ছায়া-ভরা ঘরে টাইমপিসের টিকটিক আর পাখার একটানা মৃদু আওয়াজে সে কিছুতেই ট্রানস্লেশনে মন বসাতে পারবে না ! তার চেয়ে বারান্দাই ভাল । রোদে পাখির কিচিরমিচিরে তবু—তবু বা মনটা বালিশের ওয়াড়ের মতন গন্ধ ছুঁয়ে থাকবে না ।
বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে বসল চন্দনা । সকালের সেই টেবলে ট্রানস্লেশন খাতা, বই সাজিয়ে । মেঘ-মেঘ করছে বাইরেও । হাওয়া ভিজে-ভিজে । বারান্দায় পাতাবাহারের টবগুলো থেকে কেমন টাটকা গন্ধ আসছে মাটির । বাগানে জবা গাছের ডাল-পাতা কাঁপছে, অপরাজিতার ডগায় ক'টি প্রজাপতি উড়ছে একভাবেই । একটি ঘুঘু এলো, উড়ে এসে বসল শিরীষ গাছের ডালে । মাঠে চড়ুই নেমেছে । ক'টি পায়রাও । শিমগাছের মাচায় কাক । একটা তিতিরও এসে জুটেছে এই দুপুরে মেঘলা ছায়ায় ।
পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোর পেছন দিকের বাগানে ওরা এমনিভাবেই রোজ দুপুরে আসে । কিন্তু এমন সুন্দর মনে হয় না । কোনও কোনও দিন হয়, কখনও কখনও ।
জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলে, কিংবা দু পা এগিয়ে হাততালি দিলেই এক্ষুনি সব উড়ে যাবে । ফর ফর করে পাখা নেড়ে পালিয়ে যাবে। অন্যদিন হলে চন্দনা উড়িয়ে দিত ; আজ আর দিল না । বরং মাঠ থেকে বারান্দায় উঠে এলো চড়ুই দুটি । গালে হাত রেখে বসে বসে তাই দেখল চন্দনা । যেন এটা আর পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ি নয়, দিল্লীর লোদি রোডের কোনও বাড়ি—যে বাড়িতে দুপুরে নিরিবিলিতে বসে কাক, চড়ুই, তিতির সব ও দেখতে পারে ; সকলকে ও কাছে আসতে দিতে পারে ।
ভিজে হাওয়া ছিল এতক্ষণ—এবার বৃষ্টি এলো । বড় বড় ফোঁটা । কাক ডেকে ডেকে উড়ে গেল, পাখার ঝাপটানিতে পালক খসিয়ে পায়রা দুটিও পলাতক । চড়ুই ক'টি ফুলগাছের পাতার আড়ালে ঠাঁই নিলে, তিতিরটা বুঝি অনেক আগেই চলে গেছে । মাঠ ফাঁকা ।
সন্ধ্যের পর চন্দনা যখন তার নিজের ঘরে টেবলের কিনারায় বুক ছুঁইয়ে বসে, হিস্‌টরির পাতায় তার চোখ—তখন পাশের ডাইনিং-রুমে কথা হচ্ছিল । দুই ঘরের মধ্যকার ভারি পর্দাটা আধ-গোটানো । মাসিকে চন্দনা দেখতে পাচ্ছে না । মেসোমশাইকেও নয় । না দেখলেও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না । মেসোমশাই দুধের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছেন । পাশের একটি চেয়ারে মাসি । আর মাসিই বলছেন—তাঁর কথা এমন ফাঁকা ঘরে বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে । চন্দনা কান পেতে শুনছে

সেই কথা।
'মিলিটারি স্টোর্স অ্যাকাউণ্টস-এব চাকরি, তার আর প্রসপেক্ট কি?' মাসির গলা।
'ঠিক জানি না। আছে বোধহয় কিছু।' মেসোমশাইয়ের মৃদু গলায় জবাব।
'আবার "বোধহয়" কেন। কি থাকতে পারে, ভাব—ভেবে বল। আমার ধারণা, কিচ্ছু নেই। বড় জোর আড়াই শ' থেকে তিন শ'।'
'ওই রকমই হবে।'
'অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বা কি এমন! ইণ্টারমিডিয়েট পাস। আই-এ পাস ছেলে চাকরি করে উন্নতি করতে পারে—তার চান্স কোথায়?'
মেসোমশাই চুপ। খস্ করে একটা শব্দ হল। চন্দনা বুঝতে পারলে, তিনি সিগারেট ধরালেন। এবং এবার উঠে সোজা বারান্দায় গিয়ে পায়চারি শুরু করবেন।
'চন্দনার পছন্দ হয়েছে নাকি? জিজ্ঞেস করেছ?' মেসোমশাই এইবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন।
'না, করি নি এখনও। আমার নিজের এতে মত নেই।'
নেই। নেই। চন্দনা বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে দেওয়ালে তাকাল। ঘড়িতে এবং ক্যালেণ্ডারে। দেওয়ালে আর আলনায়। বিছানায়। কিছু নেই। কোথাও আর সে নেই। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়ির এই ঘরটি আবার শূন্যতায় ভরে গেছে। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি। বারান্দা ছড়িয়ে ম্লান আলো। দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে কখনও কখনও। আর মাঠের ফাঁকে—অন্ধকারে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ে চলেছে একটানা। খুব আস্তে করে মাসিই হয়ত রেডিও খুলে দিয়েছেন, ন' ভালভের রেডিও। যেন গুনগুন করে কেউ কাঁদছে—'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরান-সখা বন্ধু হে আমার'। এবং সন্ধ্যেবেলায় ধূপ জ্বলেছে। মাসি জ্বালিয়েছেন। তার গন্ধ।
চন্দনা যেন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখছে—অসাড় একটি স্টেশনে তার গাড়ি থেমে গেছে। সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। চারপাশে অপরিচয়ের ঠাসবুনন পর্দা; কেউ নেই, কেউ আসছে না, কারও পায়ের শব্দ নেই। শুধু একটানা ঝিরঝির বৃষ্টি।
রাত্রে খেতে বসে অনেক কষ্টে একটি মাছের টুকরো মুখে তুলেছিল চন্দনা। তারপর ওর প্লেটে মুরগির চার টুকরো মাংসের সঙ্গে গলার নালি এক টুকরো পড়েছে।
'আমি ভেবে দেখলুম, আই-এ পাস ছেলের অ্যাকাউণ্টসে কোনও প্রসপেক্ট নেই। হওয়া অসম্ভব। না কি, চন্দনা কি বল তুমি? তোমার কি মত?'
মুখ নিচু করেছে চন্দনা। প্লেটের চার টুকরো মাংসের মধ্যে সেই গলার অংশটুকুই ওর চোখে পড়ছে কেবল এবং মনে হচ্ছে—বেশ ভাল করে ওই গলাটুকু কাটা হয়েছে এবং তাতে মশলা, ভাল ঘি, দেড় টাকা সেরের টম্যাটো—সবই ঠিক ঠিক পড়েছে।

'না ক'রে দি, কি বল্ ?'

চন্দনা মুখ নিচু করে আস্তে—খুব আস্তে মাথা হেলাল।

বারোটা বেজে গেছে কখন। এখন বোধহয় একটা। মশারির মধ্যে নরম বিছানায় শুয়ে চন্দনা চোখ খুলে রেখেছে। এত ঘন অন্ধকারে একা একা চোখ খোলা যায়। এই নিস্তব্ধতায় নিজের বুকে, গালে, চোখে নিজের হাত দেওয়া যায়। স্পর্শ করে নিজেকেই নিজে বোঝা যায়। বোঝান যায়।

দিল্লীর কুতুব মিনার ইতিহাসের বইয়ের ছেঁড়া পাতার মতন উড়ে গেছে। বিকাশ সরকারের জন্যে তিনমাস অন্তর পাঞ্জাবি আর তাঁতের ধুতি কেনার সুখটুকু আর তার হাতে নেই। এখন তার হাতে—হাতের পাশেই বালিশের কিনারায় বেড-সুইচটা পড়ে আছে। শব্দ না করেও সে সুইচ টেপা যায় এবং মুহূর্তে এ ঘর আলো হয়ে উঠতে পারে। চন্দনা সেই আলোর মধ্যে ইচ্ছে করলেই শুয়ে থাকতে পারে। চাই কি এখন কলম টেনে সে একটা চিঠি লিখতে পারে উমাকে চুপি চুপি। —ভাই উমা, চিঠি লিখছি তোকে—দিদিকে তুই বলিস, আমায় যেন একবার নিয়ে যায় পাইকপাড়ার বাড়িতে। এখানে আমার ভাল লাগে না। কথা বলবার কেউ নেই। একা শুই—একটি ঘরে। বড় ভয় করে!

ভয় সত্যিই করছে চন্দনার। অন্ধকারের জন্য নয়। একলা শুয়ে আছে বলে যে, তাও না। তবু ভয়। এই ভয় বাইরের বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে। নির্জনতার, নিস্তব্ধতার এই ভয়; এবং আশ্চর্য কোন বেদনার। একাকিত্বের দুঃসহ মুহূর্তগুলির অবিরাম ঢেউ গুনে যাবার ক্লান্তি।

টাইমপিস টিকটিক করে বেজে চলেছে। বেজে চলবে। একটু সেণ্ট দিয়েছিল ব্লাউজের বুকে, সেই বিকেলে কাপড় ছাড়ার সময়—এখনও তার গন্ধ আছে—বালিশ তেমনি নরম, চুল তেমনি গন্ধ তেলে মাখামাখি, কানের দুলটি ফুটছে, গলার হার বুকে ব্লাউজে জড়িয়ে গেছে। ক' ফোঁটা ঘাম কপালে গলায় জমে উঠেছে।

তবু ঘুমুতেই হবে চন্দনাকে। এবং ভোরে উঠতে হবে। যখন ফরসা হবে আকাশ। দরজা খুলে দিতে হবে বারান্দার। তখন বারান্দার কোণে কুকুরটা ঘুমুবে। কাক ডাকবে, মেহেদী-বেড়ার ওপর চড়ুইগুলি এসে জুটবে সেই সকালেই। পাখির ডাক শুরু হয়ে যাবে তখন থেকেই।

পাখির ডাক শুনে শুনে বেলা বাড়বে চন্দনার—যতক্ষণ না মাসি ওঠেন। এবং তার আগেই চন্দনাকে পড়ার টেবলে বসতে হবে। খড়-কুটো ঠোঁটে চড়ুইগুলো ফুড়ুত ক'রে উড়ে এসে ঢুকবে চন্দনার ঘরে, বাসা বাঁধার আয়োজন করতে!

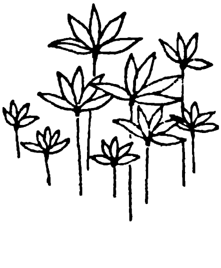
কিন্তু পার্ক রোডের সাত নম্বর বাংলোর ফিটফাট সাজান ঘরে বাসা বাঁধা সহজ নয়। ঝুল-ঝাড়া বাঁশটা হাতে করে মালি এসে ঢুকবে। বেলা আটটাই হোক, কি

দশটাই হোক, কাচের দরজা, শার্সি বন্ধ হয়ে যাবে। আলো আসবে, রোদ্দুর নয়— পাখির ডাক ভেসে আসবে স্কাই-লাইটের অল্প একটু ফাঁক দিয়ে, চড়ুই নয়। পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বাঁধার জায়গা নেই, মাঠ-ঘাটের আলো আর ধুলোর আমন্ত্রণ নেই।

তাই কালকের ডাকে কিংবা পরশুর ডাকে আর-এক কোনও দত্ত অথবা বসু কিংবা দে-র চিঠি আসবে। মাসি সেটা পড়বেন। চন্দনা পাশে বসে থাকতে থাকতে উঠে আসবে পান সাজার ছুতো করে এবং সন্ধ্যেবেলায় মাসি সারা দিনের খুঁটনো বিচারের পর রায় দেবেন।

চন্দনা জেনে ফেলেছে, অনেক গাছপাতা সরিয়ে—অনেক অন্তরাল, অনেক ফিলট্রেশনের পরও স্পেকট্রামের আভা নিয়ে যতদিন না কেউ আসছে—কোনও আলো, ততদিন পার্ক রোডের সাত নম্বর বাড়িতে এই ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতায় তাকে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে হবে। এবং আরও নরম, আরও কোমল করতে হবে মুখ, হাত, পা সাবানের ফেনা আর গ্লিসারিন মেখে। আর, পাখির ডাক শুনে শুনে তার সকাল ও দুপুর কাটবে। কুল-কাঁটা বুকে নিয়ে রাত।

[আনন্দবাজার : পূজা সংখ্যা : ১৯৫৪]



পিঙ্গলার প্রেম

ভোরের ট্রেনে এসে পেঁছিল ওরা। তখনও ভাল করে ফরসা হয় নি আকাশ, স্টেশনের বাতিগুলো পর্যন্ত কুয়াশায় ভিজে-ভিজে। ইঞ্জিন হল্টের ছাইগাদায় ক'টি কাক সবে উড়ে এসেছে।

মাথায় গলায় মাফলার জড়িয়ে, র‍্যাপারে গা হাত মুড়ে এরা সারা রাত ঠায় বসে ছিল, এরা চারজন—ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের চার ছোকরা। ঠান্ডায় বসে বসে ঝিম মেরে গিয়েছিল সকলেই। ভোরের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই জানলা দিয়ে ওদের মুখ চোখে পড়ল, কিরণশশীদের মুখ। সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে উঠল এরা। এসে গেছে, এসে গেছে। মংকি ক্যাপ, মাথায় ঢাকা মাফলার কি র‍্যাপার ঝপাঝপ মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল চারজনে।

ভুবন চৌধুরী ততক্ষণে প্লাটফর্মে নেমে পড়েছে। তার মুখে চুরুট, গায়ে অলেস্টার। কিরণশশী জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে স্টেশন দেখছে। চোখে ঘুমের রেশ লেগে আছে তার, মাথার চুল একটু উস্কোখুস্কো, ঠোঁট দুটি এখনও ফিকে লাল।

ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের মানিক ভুবন চৌধুরীকে নমস্কার করে বললে, 'যাক, এসে গেছেন। আমরা সারা রাত—!'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে ভুবন বললে, 'হ্যাঁ—দলবল নিয়ে আসা, সন্ধ্যের ট্রেন ধরতে পারলাম না।'

লবঙ্গ ততক্ষণে নেমে এসেছে। জর্জেট শাড়ির ওপর শাল চাপিয়ে কাঁপছে আর হাসছে।

'ও ভুবনদা, এই নাকি মনোহরণপুর!'

'তুমি আবার হরণ পেলে কোথায়—জায়গাটার নাম মনোহরপুর।' ভুবন চৌধুরী বললে।

'তাই নাকি!' লবঙ্গ ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের ফটিকের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে চোখ বড় করল।

ফটিক মাথা নেড়ে আপ্যায়িত করার হাসি হাসল।

ট্রেন ছেড়ে দেবে। তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি করে মালপত্র নামাচ্ছিল আর দু'জন। মানিক ফটিক ছুটে গেল।

কিরণশশী নামল। সতীশ দত্ত আগেই নেমেছে। হেনা, রাণী, চাঁপা, পরীরাও নিচে নেমে শীতে কাঁপছে হিহি করে।

জরির চুমকি তোলা চটি-সমেত পা-টা একটু এগিয়ে ভুবনের নজর টানল সেদিকে কিরণশশী। বললে, 'পায়ে যে সাড় পাই না!'

'বলেছিলুম তো মোজা পরে নাও!'

'নিলেই হত,' কিরণশশী বাঁ হাত দিয়ে খোঁপার হেয়ারপিনটা ঠিক করে নিতে নিতে স্টেশনের চারপাশে তাকাল। পরমুহূর্তেই ডান চোখের পাতা ক'বার কাঁপিয়ে বুজে নিল। বললে,'ও লবঙ্গ, দেখতো—কয়লার গুঁড়ো পড়ল বুঝি চোখে।'

আঁচলের একটি কোণ সরু করে পাকিয়ে কিরণশশীর চোখ থেকে কয়লার গুঁড়ো তুলতে তুলতে খিল খিল করে হাসল লবঙ্গ, 'পা দিতে না দিতেই মনোহরণপুর তোমার চোখ হরণ করল, কিরণদি!'

'মন তো আর হরণ করে নি!' কিরণশশীও ঠোঁট উল্টিয়ে হাসি ছড়িয়ে দিল।

'ও লবঙ্গ, নবরঙ্গ চা খাবে নাকি? ওই যে টি-স্টল।' সতীশ দত্ত ডাকছে।

ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের মানিক বললে, 'আপনাদের চা-টায়ের ব্যবস্থা করা আছে। আস্তানায় গেলেই দেখবেন সব রেডি। যদি বলেন, এখানেও এক দফা হয়ে যেতে পারে।'

'পারে যদি তবে কথায় কেন কাজে হোক, মশাই; শীতে আমি জমে গেলুম।' সতীশ দত্ত সিগারেটে টান দিতে লাগল ঘন ঘন।

ফটিক ছুটল টি-স্টলে।

'আমাদের থাকবার জায়গাটা কতদূর?' প্রশ্ন করলে কিরণশশী।

'কাছেই।'

'হেঁটে যেতে হবে তো!'

'না, না—ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে স্টেশনের বাইরেই। কোন কষ্ট হবে না আপনাদের।'

'ঘোড়ার গাড়িতে বাজনা নেই তো? লবঙ্গ আচমকা বললে। আর বলেই হেসে কুটি-কুটি।

মানিক অবাক, একটু যেন কেমন অপ্রতিভ। বোকার মতন চেয়ে লবঙ্গর হাসি দেখতে লাগল।

'হাসির তুই কি পেলি—? কিরণশশীও ধমক দিল।

'তুমি জানো না কিরণদি, সে যা হয়েছিল একবার! লালগোলা না কিষণগোলা কোথায় যেন একবার গিয়েছিলুম, বাপু। তাদেরও ঘোড়ার গাড়ি। আমাকে আর পুতুলকে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে দিয়েছে। যাচ্ছি। ওমা, দেখি ভ্যাঁপোর-পো করে বাজনা বাজছে। কোথায়? না, মাথার ওপর ঘোড়ার গাড়ির ছাদে। আর রাস্তার যত লোক ভিড় করে আসছে। ছুটছে আমাদের পিছু পিছু। কি ব্যাপার, না—কলকাতার থিয়েটারের মেয়েদের দেখছে ওরা।' লবঙ্গ কথা শেষ করে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির দমক আটকাতে লাগল।

কিরণশশী হেসে মানিককে এনে বললে, 'আপনারাও আমাদের বাজনা বাজিয়ে নিয়ে যাবেন নাকি ?'
'না, না—!' মানিক মাথা নাড়ল।

বাজনা বাজিয়ে না নিয়ে গেলেও ভুবন চৌধুরীদের আদর-আপ্যায়নে, থাকা-খাওয়ায় কোন ত্রুটি রাখে নি মনোহরপুর ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব। থাকবার জন্যে বাগান-ঘেরা বাড়ি দিয়েছে। কুয়া থেকে জল তুলে দিতে, ফাই ফরমাস খাটতে চাকর দিয়েছে রেখে। মুখ ফুটে না চাইতেই চা, খাবার, পান, সিগারেট। স্নানের জন্যে গরম জল চেয়েছিল লবঙ্গ। চোখের পলকে তিন বালতি গরম জল তৈরি হয়ে গেল। খেতে বসে সরু চালের শাদা ধবধবে ভাত, টাটকা শাক-সব্জি, পুকুরের মাছ।

ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের সেক্রেটারী কুন্দভূষণ ভুবন চৌধুরীর একটু-আধটু পরিচিত। কলকাতা থেকে ওদের আনা-টানার ব্যবস্থা কুন্দই করেছে। কুন্দকে বললে ভুবন চৌধুরী পরিহাস করেই, 'এত তোয়াজ দেখে ভয় হচ্ছে, মশাই। শেষ পর্যন্ত মার-ধোর দেবেন না তো ?'
'আজ্ঞে না, তেমন কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে দাদা, প্লে খারাপ হলে দু চারটে ইট কিন্তু স্টেজে পড়তে পারে!' সহজভাবেই হেসে জবাব দিল কুন্দ।
কথাটা সহজ হলেও স্পষ্ট। যার অর্থ হচ্ছে, কলকাতা থেকে তোমাদের টাকা দিয়ে এনেছি। তোয়াজ করছি যথাসাধ্য। হেলা-ফেলা করে পার্ট করলে চলবে না।
বলতে কি, ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক রেল ইনস্টিটিউটের দলকে টেক্কা দেবার জন্যেই এত করছে। ইনস্টিটিউটই প্রথমে কলকাতা থেকে ক'জন অভিনেতা অভিনেত্রী ভাড়া করে এনে মিলেমিশে দু রাত চুটিয়ে প্লে করেছে পুজোর সময়। অভিনয় যেমনই হোক, ভিড় হয়েছিল খুব। সেই থেকে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের রোখ চেপে আছে। ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের দলের সুনাম ছিল এদিক পানে। ইনস্টিটিউট কম্বাইণ্ড-পারফরমেন্স করে সে সুনামের মুখে যেন দুয়ো দিয়ে দিল। তখন থেকেই ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের তর্জন-গর্জন। আচ্ছা, দেখে নেব, আমরাই বা কম কিসে!
কুন্দর কলকাতায় যাওয়া-আসা আছে। তার ওপর সে হচ্ছে সেক্রেটারী। শপথ করেছিল কুন্দ, আচ্ছা আমিও দেখে নেব। গোঁফ কামিয়ে হারাধনকে আর হেলেনের পার্টে নামাচ্ছি না। কলকাতার কিরণশশীকে আনব। যেমন দেখতে আগুন, তেমনি প্লে।
কিরণশশী তিন দফায় দাম নেয়। এক দফা তার রূপের জন্যে দ্বিতীয় দফা তার অভিনয়ের জন্যে। আর তিন দফার কথাটা জানত থিয়েটার মহলের লোকেরা। কিরণ ভুবনময়। ভুবনকে বাদ দিয়ে কিরণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভুবন চৌধুরী

নামকরা অ্যাক্টর। কিরণ-ভুবনকে যদি আনতেই [illegible] টাকা খরচ করে তবে নাচ-গানের জন্যে লবঙ্গই বা বাদ যায় কেন ! সখীর দলও থাক। লবঙ্গ আর সখীর দলের হেনা, চাঁপাকে দিয়ে স্ত্রী-ভূমিকার অন্যান্য পার্টগুলোও করিয়ে নেওয়া যাবে। এদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগ হল কমিক অ্যাক্টর সতীশ দত্ত।

বিস্তর পয়সা খরচ করেছে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক কিরণশশীদের জন্যে, তোয়াজে ভিজিয়ে রেখেছে, রাখছে, রাখবেও তিন দিন—কিন্তু বাপু স্টেজে নেমে হেলাফেলা করলে চলবে না। টাকা দিয়েছি—কাজ দেখাতে হবে। কুন্দভূষণের এই কথা।

'আমাদের ব্যাপারটা কি জানেন,' ভুবন চৌধুরী পান চিবোতে চিবোতে বললে, 'লোকে নিয়ে যায় ; যাই। নিজেদের টিম হ'লে কথা ছিল না। মফস্বলের সব অ্যাক্টর, সত্যি বলব কি মশাই পার্ট-ফার্ট করতে জানে না। তাদের সঙ্গে কো-অ্যাক্টিং ! ও হয় না। কাজেই কোনরকমে কাজ চালিয়ে দি।'

'আমাদের ক্লাবের অ্যাক্টররা কিন্তু অত কাঁচা নয়, দাদা !' কুন্দ চোখ পিটপিট করে বললে, 'অন্তত একজন আছে যে ভাল রকমই পাল্লা দেবে।'

'তাই নাকি ?' ভুবন অবজ্ঞার হাসি মিশিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলে, 'কোথায় সেই নটরাজ—দেখলাম না তো !'

'এখানে আসে নি এখনো। যথাসময়ে হাজির হবে আর কি !'

সন্ধ্যের গোড়ায় মৃগাঙ্ক গ্রীনরুমে হাজির। রেল ইনস্টিটিউটের স্টেজ ভাড়া নিয়ে থিয়েটার হচ্ছে। সবই চেনা জানা মৃগাঙ্কর। সটান যথাস্থানে এসে ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ল। তখন—সে-ঘরে পুরুষরা মেকআপ নিচ্ছে। চা, সিগারেট হাসি তামাশা।

'এসেছিস ?' মৃগাঙ্ককে দেখে কুন্দভূষণ তার পিছু পিছু ছুটে এসেছে, কোথায় ছিলি সারাদিন ?'

'হীরাপুরের বাঁধে মাছ ধরছিলাম।'

'মাছ ধরছিলি, না, বাড়িতে খিল বন্ধ করে বসে পার্ট মুখস্থ করছিলি ?'

'না, মাইরি না, কুন্দদা। বিশ্বাস করো, মাছ ধরছিলাম। অবশ্য মাছ ধরতে বসে পার্টের কথাই ভেবেছি সারাক্ষণ। মৃগাঙ্ক চারদিকে তাকিয়ে গলার স্বর খাটো করে বললে, 'কলকাতা থেকে ওঁরা সবাই এসে গেছেন তো !'

'হ্যাঁ।' কুন্দ তার গলার স্বর আরো খাটো করে মৃগাঙ্কর কানে মুখ নিয়ে বললে, 'ওই ভদ্রলোক ভুবন চৌধুরী। ওঁর কাছে তোর খুব সুনাম করেছি, মৃগে। আমার প্রেস্টিজ তোর হাতে। প্রাণ দিয়ে অ্যাক্টিং করবি, ভাই। আয়—ওঁর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দি।'

'বেশ তো, চলো। আমায় কিন্তু এক কাপ চা দিতে বলো, কুন্দদা—!'

ভুবন চৌধুরীর কাছে এনে মৃগাঙ্কর সাথে আলাপ করিয়ে দিলে কুন্দ। বললে হেসে, 'আমাদের হিরো।'

ভুবন চৌধুরী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল মৃগাঙ্ককে। চেহারাখানা নায়কের মতনই। সুঠাম অঙ্গ। রঙ ফরসা। মুখখানি সুন্দর। ঈষৎ দীর্ঘ মুখের গড়ন, লম্বা নাক, চওড়া কপাল। উজ্জ্বল চোখ।

'বা, খাসা চেহারা!' সপ্রশংস কণ্ঠে বললে ভুবন চৌধুরী।

মৃগাঙ্ক যেন লজ্জা পেল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'চেহারায় কি হয়, গুণই বড়। আপনারা গুণী লোক।'

কথাটা কানে ভাল লাগল ভুবন চৌধুরীর। এমন বিনীত প্রশংসা, ঠিক এমন সুরেই আর কোথায় যেন শুনেছিল ভুবন চৌধুরী। কোথায় যেন, মনে করবার চেষ্টা করেই পরমুহূর্তে আবার অন্য কথায় মশগুল হয়ে গেল ও।

নাটকটা নিছক প্রেমের। বিরহ, ষড়যন্ত্র, মর্মান্তিক মৃত্যুর শোকে সিক্ত। জমাট কাহিনী। বরেন্দ্রী বিজয়ে এসেছে লক্ষণ সেন। পাল রাজার সভায় রাজনটী অহনা নামে গোপনে সেন রাজাদের গুপ্তচর বৃত্তি করছে সোমপ্রভা। এক শিল্পী অহনার রূপে মুগ্ধ। নাম তার ভাস্কর উপল। উপলের বন্ধু মেঘবর্ণ। মেঘবর্ণ পাল রাজকুলের এক মন্ত্রীপুত্র। মেঘবর্ণও ভালবাসে নটী অহনাকে। তাকে লাভ করতে চায়। কিন্তু অন্তরায় উপল। মেঘবর্ণ ষড়যন্ত্র করতে থাকে তলে তলে। হঠাৎ রাজাদেশ এলো, ভাস্কর উপলকে পাল রাজ্য থেকে নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছেন মহারাজ। অপরাধ, ভাস্কর নবনির্মিত মন্দিরগাত্রে রাজনটী অহনার প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ করেছে। দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষী মূর্তি, তাও নটীর! এ পাপ। কলুষিত হয়েছে মন্দির। নির্বাসিত করো শিল্পীকে।

রাজদণ্ড শিরোধার্য করে রাজ্য ত্যাগ করে প্রস্তুত হল ভাস্কর।

নটী অহনাও প্রিয়র হাত ধরে পলাতক হতে চায়। পাল রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে পলাতক হল উভয়েই। মেঘবর্ণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে। শেষ পর্যন্ত সেই মন্দিরের কাছে এসে ধরা পড়ল ওরা। অসি যুদ্ধে আহত হল মেঘবর্ণ। কিন্তু মন্দির প্রবেশের মুখে মেঘবর্ণ আহত করলে উপলকে। অন্ধকার মন্দির অভ্যন্তর। গোপন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে পালিয়ে যাবার শেষ চেষ্টা করে অহনা আর উপল। পারে না। প্রিয়ার বিষলিপ্ত অঙ্গ চুম্বন করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে উপল। অহনাও প্রিয়তমের পথ অনুসরণ করে।

কিরণশশী পার্ট করছিল রাজনটী অহনার। মৃগাঙ্ক ভাস্কর উপলের, আর ভুবন চৌধুরী মেঘবর্ণর। লবঙ্গ অহনার সখী দেবস্মিতার।

জমাট বই। অভিনয়ের সুযোগ যথেষ্ট। কিরণশশীর নাম আছে পার্টটায়। তবু

গোড়ায় গা দেয় নি কিরণশশী। ভুবন চৌধুরীও।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই কেমন যেন গোল বাধল। রাজনটী অহনার সঙ্গে ভাস্কর উপলের এই প্রথম প্রকাশ্য সাক্ষাৎ। নির্জন কানন। চরণে নূপুরের রিণিঝিনি বাজিয়ে চটুলা নটী পথ চলেছে। হঠাৎ গতি তার রুদ্ধ হল। সামনে অপরূপ এক তরুণ। গায়ে স্খলিত উত্তরীয়। পাষাণের মতো প্রাণহীন, কিন্তু বিমুগ্ধ দুটি চোখ। সেই দুটি চোখ অপলক নয়নে দেখছে একটি পার্থিব সৌন্দর্যকে। সে সৌন্দর্য এক নারীর ক্ষৌম বাস, অঙ্গের লাবণ্য থেকে ঝরে পড়ছে। স্থির হয়ে আছে তার নয়ন রাজনটীর উদ্ধত কুচযুগ, কৃশ কটি, সঘন জঘনে।

কিরণশশী অবাক। ছেলেটা কি পার্ট ভুলে গেছে! নয়ত এতক্ষণ পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে কি দেখছে তাকে! ভাবল মনে মনে কিরণশশী, রূপ দেখে না মূর্ছা যায়!

ভাস্কর দেখছিল, সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মর মতন একটি আনন। চোখে যার ঘন অঞ্জন, সুডৌল গণ্ডে চন্দন রাগ। কটি চূর্ণ কুন্তল ললাটে।

অস্বস্তি বোধ করছিল কিরণশশী। গলায় মালাটা বুকের কাছে বাঁ হাতের মুঠোয় দুমড়ে নিয়ে একটু বুঝি ভ্রূভঙ্গি করল।

'দেবী অহনা—!' অস্ফুট, সলজ্জ একটি বিস্ময় ধ্বনি শোনা গেল। এতক্ষণ পরে। বইয়েতে আছে 'নটী'। মৃগাঙ্ক বললে 'দেবী'। আর শুধু বলা নয়, এমন সুরে বললে যেন মনে হল রূপভিক্ষু এক শিল্পী ওই একটি কথায় রূপ থেকে প্রাণে নেমে এলো। প্রেমভিক্ষু হল এক নারীর। সেই আহ্বানে চমকে উঠল কিরণশশী। বুঝল—মূর্ছা নয়, মৃগাঙ্ক একটা ঘোর কাটিয়ে যেন স্তুতির অর্ঘ দিল কিরণশশীকে। না, কিরণশশীকে নয়, অহনাকে। আর ও মৃগাঙ্ক নয়, অতীত ইতিহাসের এক প্রেমিক ভাস্কর।

উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভুবন চৌধুরী। কিরণশশী স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসতেই ভুবন ওর কাঁধে হাত দিল। নীচু গলায় বললে, 'তুমি হারলে, কিরণ!'

কিরণশশীও বুঝতে পেরেছিল। মফস্বলের এক শৌখিন ছোকরা অভিনেতার কাছে প্রথম মুখেই তার হার হয়েছে।

'প্লে তো আর শেষ হয় নি!' কেমন যেন তিক্ত সুর কিরণশশীর।

'আচ্ছা দেখি!' ভুবন চৌধুরী হাসল। মুখে তার মদের গন্ধ ধরা দিয়েছে এতক্ষণে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ থেকে নাটক জমে গেল। হঠাৎ যেন তিন নটনটী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ল। কে ভাল, কে কার চেয়ে ভাল অভিনয় করতে পারে, দেখাতে পারে। দর্শককুল হর্ষরোমাঞ্চিত, ফ্রেন্ডস ড্রামাটিকের উত্তেজনা ফেটে পড়ার মতন। ভাস্কর উপলবেশী মৃগাঙ্ক কোথাও এতটুকু শিথিল অভিনয়ের সুযোগ দিচ্ছে না। ফলে কিরণশশীকে আর ভুবন চৌধুরীকে সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কলকাতার

নামকরা নটনটী তারা। বৃত্তিতে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধে।

যতক্ষণ প্রেম ছিল, ততক্ষণ মৃগাঙ্ক মাতিয়ে রাখল। আবেগে তার সুন্দর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে গেছে। ফুটলাইটের ঈষৎ নীলাভ আলোয় আশ্চর্য এক স্বপ্নময় জগতের ভাস্কর বলেই মনে হচ্ছিল তাকে, এক বিরহকাতর প্রাণ। কিরণশশীও কম যাচ্ছিল না। তার রূপ যেন একটু একটু করে প্রাণে এসে দানা বাঁধছিল— আর খুলে যাচ্ছিল প্রাণের রূপ। নটী নারীতে প্রকাশ পাচ্ছিল।

মন্দিরের দৃশ্যে অসি-যুদ্ধের সময় একটা কেমন ক্লান্তি নেমেছিল মৃগাঙ্কর। ভুবন চৌধুরী এখানে টেক্কা দিলে মৃগাঙ্ককে।

কিন্তু শেষ দৃশ্যে সবাই সুন্দর। মৃত্যু সামনে, প্রিয়াও হাতের নাগালে। আর কোন পথ নেই। জীবনের উপরই যবনিকা নেমে আসছে। তবে শেষ মুহূর্তে সেই সুখ নিয়ে যেতে দাও, তোমার স্পর্শের সুখ, তোমার অঙ্গের মধু, তোমার প্রাণের।

অহনার দুটি হাত টেনে নিল উপল। চুম্বনের জন্যে ওষ্ঠের কাছে তুলে ধরল। চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিতে যায় অহনা। সর্বাঙ্গে বিষলিপ্ত তার, 'গুপ্তচরীর বর্ম', নিষ্ঠুর হিংসা।

'সখি, যে অঙ্গের লাবণ্যে আমি সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছি, ষড় ঋতুর মনোহর ভুবন— সে অঙ্গ বিষ নয়, অমৃত।' ভাস্কর প্রিয়ার হাত দুটি টেনে নিয়ে ওষ্ঠে স্পর্শ করছে।

একটি ক্ষুধাতুর ওষ্ঠের চুম্বন। শব্দটুকুও যেন অনন্ত ক্ষুধা আর বেদনা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে কেঁপে কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্ত বুঝি বিহ্বল, পরমুহূর্তে কিরণশশী মৃগাঙ্কর মুখ দু হাতে তুলে যেন গন্ধ নিল মৃত্যুর, মৃত্যুর শীতলতার। কিরণশশী নয়, কিরণশশী যেন এই মঞ্চের মায়ালোকে মরে গেছে। রাজনটী অহনা নিঃস্বতার বেদনায় স্তব্ধ, অচেতন। তারপর দু ফোঁটা চোখের জল। চাপা একটা কান্না গুমরে গুমরে উঠে শেষ ধাপে এসে হঠাৎ যেন ছড়িয়ে পড়ল। 'প্রিয়তম, জীবনে অমৃত দিতে পারলাম না, বিষ দিলাম তোমায়। এ আমার নিয়তি।' কী করুণ, কী দুঃসহ।

ভুবন চৌধুরীও তার শেষ মুহূর্তের পৈশাচিক উল্লাস আর অন্তিম বেদনাটুকু সুন্দর করে ফুটিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিরণশশীই যেন শেষ পর্যন্ত সকলকে ছাড়িয়ে গেল।

দর্শককুল চমৎকৃত। ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ধন্য মনে করল নিজেদের। কিরণশশী আর ভুবন চৌধুরীর ঘোড়ার গাড়িতে ফুলের সঙ্গে দামী মদের বোতল উঠিয়ে দিল। যাবার সময় কুন্দভূষণ বললে ভুবন চৌধুরীকে, 'গ্র্যান্ড হয়েছে দাদা। ওয়ান্ডারফুল। এমন দেখি নি।'

কুন্দর পিঠ থাবড়ে ভুবন চৌধুরী হাসল, 'আপনাদের হিরো সত্যিই গুণী ছেলে।

ওর হবে।'

মৃগাঙ্ক তখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অলস চোখে দেখছিল ঘোড়ার গাড়ির গদিতে যে বসে রয়েছে তাকে। ও আর অহনা নয়, এখন কিরণশশীই। কিরণশশীর গলায় সেই মালাটি তখনও দুলছে।

পরের দিন সকালে দেখা। কিরণশশীদের বাড়িতে আসছিল মৃগাঙ্ক। বাগানের পথ দিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। পেয়ারা গাছের তলায় কিরণশশী আর লবঙ্গ দাঁড়িয়ে।

ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে হাসি হাসি মুখ। এমন চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওরা, যেন কথা বলার জন্যে ডাকছে মৃগাঙ্ককে।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে কাছে গিয়ে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক। বঙ্কিম চোখে কিরণশশী তাকে দেখল। আর তারপরই একটু গা এলিয়ে দিয়ে হাই তুলল।

'ধন্যি লোক মশাই আপনি, কথা বলল লবঙ্গ, 'পার্ট করতে নেমে অন্য মানুষের গা হাতের দিকে তাকালে জ্ঞান থাকে না! ইস্, কিরণদির হাতটা কি ভাবে কামড়ে দিয়েছেন—এখনো লাল টকটক করছে।'

মৃগাঙ্ক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অপ্রস্তুত সে।

'আ, লবঙ্গ—কী বলিস।' কিরণশশী কৃত্রিম ধমক দেয়।

'আমি হাত কামড়েছি?' মৃগাঙ্ক আমতা আমতা করে।

'না, না। ওই একটু—!'

'একটু কি, দাও তো তোমার হাত!' লবঙ্গ খপ্ করে কিরণশশীর হাত ধরে মৃগাঙ্কর চোখের ওপর বাড়িয়ে দিল, 'দেখুন তো, মশাই—!'

সত্যিই কিরণশশীর ডান হাতের উল্টো পিঠে এক জায়গায় লালচে হয়ে আছে। একটুক্ষণ তাকিয়েই মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল। কালকের সেই শেষ দৃশ্যের চুম্বনের চিহ্ন। কিন্তু মৃগাঙ্ক তো দাঁত বসায় নি, ঠোঁট বসিয়েছিল। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে কী গভীর এবং তীব্র ভাবে মৃগাঙ্কর ওষ্ঠ শোষণ করেছিল কিরণশশীর হাত।

লজ্জায় মৃগাঙ্ক আরক্ত। মুখ নীচু করে থাকল ও।

'তুই বড় জ্বালাস, লবঙ্গ।' কিরণশশী হাত সরিয়ে নিয়ে অবস্থাটা সহজ করবার চেষ্টা করলে।

'বেশ তো, জ্বালাই যখন, তখন তো তুমি জ্বলছোই। আমি এবার যাই!' ঠোঁট টিপে হাসে লবঙ্গ।

লবঙ্গ সত্যি সত্যিই চলে গেল।

একটু অপেক্ষা করে কিরণশশী দু পা এগিয়ে পেয়ারা গাছের ডালে গা হেলিয়ে

দাঁড়াল।

'আপনার নাম তো মৃগাঙ্ক!' কিরণশশী আলাপ শুরু করল।

মাথা নাড়ল মৃগাঙ্ক।

'এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি করেন?'

'কিচ্ছু না।' এবার মৃগাঙ্ক হাসল।

'শুধুই থিয়েটার করে বেড়ান!' কিরণশশী একটু থেমে হেসে হেসে বললে।

'কোথায় আর, ওই মাঝে-সাঝে কখনো!'

পেয়ারা গাছের ক' হাত দূরে এক রাশ মরসুমী ফুল হাওয়ায় দুলছে। চকচক করছে শীতের রোদে। প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে। সেই দিকে তাকিয়ে কিরণ-শশী যেন কি দেখল, খুঁজল, ভাববার চেষ্টা করল।

কিরণশশী হাঁটতে শুরু করলে। কালকের রাতে জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা বিনুনিটা পিঠের ওপর খুলে রয়েছে। হাঁটার তালে তালে নড়ছে। সোনালী ডোরা-কাটা সাপ যেন।

কুয়োতলার পাশেই পায়চারি করছে ভুবন চৌধুরী। কিরণশশী চোখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি হল।

'আরে মৃগাঙ্ক যে, এসো ভাই। কন্‌গ্রাচুলেশান দিতে পারি নি কাল রাত্তিরে। কোথায় উধাও হয়ে গেল হঠাৎ। এ্যাঁ—!' ভুবন চৌধুরী হাত বাড়িয়ে মৃগাঙ্ককে কাছে টেনে নিল।

কিরণশশী দাঁড়াল না। মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল। এমনি করেই কালকেও ও যেন মৃগাঙ্কর চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে।

সেদিন রাত্রে প্লে যেন আরও জমে উঠল। আজ কিরণশশী সেজেছে কপালকুণ্ডলা। পিঠময় এলো চুল ছড়ানো, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ফুলের বালা, পরনে ফিকে হলদে রঙের শাড়ি। কিরণশশীকে আশ্চর্য মানিয়েছে। চোখে তার টলমল করছে অরণ্যচারী হরিণীর রহস্য, বিস্ময়।

পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ? মৃগাঙ্কসত্যিই যেন পথ হারিয়েছিল। ডাক শুনে চমকে ওঠে। কে? কিরণশশী। না, কিরণশশী নয়, অন্য কেউ। অজানা, অচেনা। মৃগাঙ্ক নয়, নবকুমার বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়। ওর কাছে কি আশ্রয় আছে?

ভুবন চৌধুরী সেজেছে কাপালিক। ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, বীভৎস। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে তার চোখ। লোকটা আজ আকণ্ঠ মদ খেয়েছে।

গ্রীনরুমের কাছে দু'জনে দেখা। মৃগাঙ্ক আর কিরণশশীতে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিরণশশী মুচকি হাসল।

'হাসছেন যে!'

'এমনি কপালকুণ্ডলার পোড়া কপালের কথা ভাবছি—!' কিরণশশী এক দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে, গম্ভীর হল। পরমুহূর্তেই হেসে উঠে বললে, 'এমন নবকুমার জুটলে—' কথাটা শেষ না করেই কিরণশশী হঠাৎ থেমে গেল।

মৃগাঙ্ক কেমন একটু উষ্ণতা বোধ করল। মুখ নামিয়ে নিল। একটু পরে মুখ তুলে কি একটা কথা যখন বলি বলি করছে—কিরণশশী তখন সরে গেছে!

শেষ দৃশ্যটায় মৃগাঙ্ক সকলকে মোহিত করে দিল। শ্মশানে তারা দু'জন। অনন্ত বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এসেছে। সব যেন বিষাদে ভারাক্রান্ত।

হাত ধরে ফেলেছে নবকুমার কপালকুণ্ডলার। কপালকুণ্ডলা, একবার বলো তুমি অবিশ্বাসিনী নও। সন্দিগ্ধ স্বামীর প্রশ্নই শুধু নয়, একটি গভীর ভালবাসা যেন শ্মশানভূমির নিস্তব্ধতায় কেঁদে উঠল।

কিরণশশী বহুবার এই কথাটি কানের কাছে শুনেছে—বহু মুখে, একবার বলো তুমি অবিশ্বাসিনী নও। কোনবারই এমনভাবে তার বুক কেঁপে ওঠে নি। আশ্চর্য, আজ কেন বুক কেঁপে যায়। কেন?

প্লে ভেঙেছে। ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠে বসল কিরণশশী। ভুবন চৌধুরীকে আজ অনেক আগেই পেঁছে দিয়ে আসতে হয়েছে কুন্দকে! আকণ্ঠ মদ খেয়ে লোকটা গড়াগড়ি যাচ্ছিল গ্রীনরুমের মেঝেতে।

কিরণশশীই মৃগাঙ্ককে তার গাড়িতে ডেকে নিয়েছে পেঁছে দিয়ে আসতে। লবঙ্গরা অন্য গাড়িতে।

শেষ রাতের ঠাণ্ডায় শীত ধরেছিল মৃগাঙ্কর। ঘোড়ার গাড়ির দরজা খানিকটা ফাঁক করা ছিল। কিরণশশী নিজের হাতে টেনে বন্ধ করে দিল।

তারপর একটানা ঘোড়ার খুরের খট্ খট্। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। ওরাও চুপ।

'চলুন আমাদের সঙ্গে কলকাতা।' কিরণশশী বললে এক সময়।

'কলকাতা?' মৃগাঙ্ক শব্দটা কেমনভাবে যেন পুনরাবৃত্তি করে।

'কলকাতাই আপনার জায়গা।'

'সেখানে গিয়ে কি করবো?'

'যা করতে জানেন, তাই করবেন।' কিরণশশী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল। অন্ধকারে মৃগাঙ্কর মুখ দেখা গেল না। দেখা গেলে বোঝা যেত ওর মুখে বহু-

দিনের একটি লালিত স্বপ্ন যেন এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

পরের দিন সারা সকাল, দুপুর মৃগাঙ্কর কেটে গেল কিরণশশীদের কাছে। ভুবন চৌধুরী বেলায় উঠে স্নানটান সেরে কুন্দভূষণের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে। ভুবন চৌধুরীর মাছ ধরার শখ যে হঠাৎ কেন হল—কিরণশশী ভেবে পেল না। সতীশ দত্তকে নিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেরা। লবঙ্গ আজ হেনা, চাঁপাদের নাচ প্র্যাক্‌টিস করাচ্ছে। ও ঘরে নূপুরের ঝুম ঝুম আর মুখের বোল। মাঝে মাঝে লবঙ্গদের খিল খিল হাসি।

বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা দুটিতে। কিরণশশী আর মৃগাঙ্ক। গোলাপের কাঁটা কিরণশশীর আঙুলে ফুটেছিল। এক ফোঁটা রক্ত ঝরেছে। ক'টি রক্তগোলাপ তুলে ওর হাতে দিল মৃগাঙ্ক।

ঝিকমিক করছে রোদ গাছের পাতায়। প্রজাপতি উড়ছিল। বসছিল ফুলে ফুলে। কিরণশশী সেদিকে চেয়ে চেয়ে বললে এক সময়, 'কী সুন্দর প্রজাপতি!'

মৃগাঙ্ক প্রজাপতি ধরতে গেল। পারল না।

'ভীষণ চালাক ওরা।' মুচকি হাসে কিরণশশী।

'হ্যাঁ, ধরা যায় না, উড়ে পালায়।'

'কখনো কখনো ধরা পড়েও যায়,' কিরণশশী ফুল-ধরা হাতটার উল্টো পিঠের একটু লাল আভা খুঁজতে খুঁজতে বলে, 'অবশ্য তেমন করে কেউ যদি ধরতে পারে!'

মৃগাঙ্কর ইচ্ছে হল, আর একবার চেষ্টা করে। পাছে বিফলমনোরথ হয়ে লজ্জায় পড়ে, তাই আর সাহস করল না।

খানিক পরে কিরণশশীই আবার কথা বললে, 'কাল আমরা এতক্ষণে ফিরে যাচ্ছি।'

'ট্রেন তো দুপুরে!'

'ওই একই। সকালও যা, দুপুরও তাই।'

কিরণশশী বাগানের পথ ছেড়ে বাড়ির দিকে চলেছে।

'কেমন লাগল আমাদের মনোহরপুর?' মৃগাঙ্ক হেসে প্রশ্ন করল।

'বেশ!' কিরণশশী গোলাপের গন্ধ নিতে নিতে বললে, 'লবঙ্গ হলে বলত মনোহরণ-পুর।' বলে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। মনে পড়ল পরশু সকালে স্টেশনের কথা। লবঙ্গকে যা বলেছিল ও।'

সেদিন রাতে কিরণশশী করছিল মায়ের পার্ট আর মৃগাঙ্ক হারানো ছেলের। এই পার্টটি কিরণশশী খুব কম করেছে। ওর নিজেরই ভয় ছিল ভাল বুঝি হবে না। মৃগাঙ্কর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে সত্যিই এখন ভয় পায় কিরণশশী।

স্টেজে দেখা গেল, কেউ কম যায় না। মৃগাঙ্কও যত ভাল, কিরণশশীও ততটা।
শেষ দৃশ্যটা চমৎকার হয়েছিল। মৃগাঙ্কর সেই বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে 'মা' ডাক শুনে কিরণশশী যেন সত্যিই হারানো ছেলের মা হয়ে গেল। ব্যাকুল বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে মৃগাঙ্ককে তখন। আর আনন্দে, বেদনায় বিহ্বল হয়ে যেমন করে হাসি-কান্নায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল সেই স্টেজে, তার বুঝি তুলনা নেই।
সেদিনও রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরছিল ওরা দুজন। মুখোমুখি বসে। গাড়ির মধ্যে অন্ধকার। বাইরে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্।
'তুমি-ই বলছি তোমাকে।' কিরণশশী খুক্ করে একবার কেশে উঠল, 'শুনলাম তোমার বয়েস নাকি মাত্র বাইশ তেইশ।'
'কে বললে?'
'কুন্দবাবু।' কিরণশশী আর একবার কাশল, 'দেখলে কিন্তু তিরিশ-টিরিশ মনে হয়। চমৎকার বাড়ন্ত তোমার শরীর স্বাস্থ্য।'
একটু চুপ।
'আমার বয়স কত বলতে পারো?'
'না!'
'তা তোমার প্রায় ডবলই হবে। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ।'
মৃগাঙ্ক অন্ধকারেই চোখ তুলে তাকাল।
'মনে হয় না এতো, না?' কিরণশশী মৃগাঙ্ককে চুপ দেখে বললে।
'হ্যাঁ সত্যিই মনে হয় না।' নীচু গলায় জবাব দেয় মৃগাঙ্ক।
'মনে হবে কি করে! বয়েস আমাদের রাখতে হয়। বয়েস, গলা, রূপ—। যতদিন রাখা যায়, ততদিন।'
'বয়সে কি যায় আসে!' বললে মৃগাঙ্ক।
আবার একটু চুপ। ধীরে ধীরে কিরণশশী মৃগাঙ্কর হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নেয়।
'ঠিক বলেছ, বয়েসে কি যায় আসে।'
ঘোড়ার গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে। দূরে কোথায় যেন কুকুর কাঁদছে একটা। নবঙ্গ-দের গাড়িতে খিল খিল হাসি উঠেছে।
সব থেমে গেলে কিরণশশী সেই চুপের মধ্যে বললে, 'ওকে আমি বলেছি। রাজী হয়েছে ও। তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাবো। যাবে তো?'
'না যাবার কি আছে?'
'সে কি, কিছু নেই? মা, বাবা, বউ, ভাই বোন—!
'না; কেউ নেই আমার।' মৃগাঙ্কর গলার স্বরটা একটু ভারি শোনায়।

'তবে তো ভালই।' কিরণশশী বলে, 'আমরা ফিরে গিয়ে তোমার একটা ব্যবস্থা করে চিঠি লিখব।'

আবার চুপ। ঘোড়ার খুরের সেই খট্ খট্। অন্ধকার। আর শীত। দুটি হাতই শুধু উষ্ণ। আর উষ্ণমধুর কেমন এক গন্ধ। কিরণশশী মনে মনে ঘোড়ার খুরের খট্-খটের সঙ্গে জোড় বিজোড় মেলাচ্ছিল 'বয়সে কি যায় আসের।' যায়, না আসে। আসে, না যায়!

গাড়ি থামল। নামল ওরা। লবঙ্গরা বাগান দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাগান দিয়ে একটু বুঝি জড়োসড়ো হয়েই হাঁটছিল মৃগাঙ্ক।

'ওকি, এসো না!' কিরণশশী ওর পাশ ঘেঁষে গিয়ে নিজের শালের অর্ধেকটা দিলে।

ক্ষীণ আপত্তি করেও মৃগাঙ্ক সেই শাল গায়ে রাখল। শেষ রাতের কৃশ চাঁদ আকাশে। ঘন কুয়াশায় চোখের গন্ডিও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। কেমন একটা শ্বেত-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে ওরা হেঁটে চলেছে—ওরা দুজন।

কেউ ভাবে নি—আর একজনও থাকতে পারে এই মুহূর্তে। কিন্তু আর একজন ছিল। ভুবন চৌধুরী। বাড়ির বারান্দায় অলেস্টার চাপিয়ে চুপ করে বসে ছিল। পায়ের শব্দ পেয়ে জড়িত কণ্ঠে ভুবন চৌধুরী কি যেন বিড় বিড় করে বলে ওঠে। চকিতে কিরণশশীর শালের অংশটুকু গা থেকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়ায় মৃগাঙ্ক।

'তুমি এখনো বাইরে বসে?' কিরণশশী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভুবন চৌধুরী টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ায়। নেশাটা এখন ওর মনে থিতিয়ে রয়েছে। দু' চার পা এগিয়ে কিরণশশীদের মুখোমুখি দাঁড়াল ও। জড়িত কণ্ঠে পরিহাস করে বলল, 'কিরণ, আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা।' টলে পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিল। মৃগাঙ্ক ওকে ধরলে।

এবার হো হো করে হাসল ভুবন চৌধুরী, 'ব্রাদার, অদ্যই শেষ রজনী।...চমৎকার অভিনয় হয়েছে তোমাদের—গ্র্যান্ড! প্রিয়া, জায়া, জননী—তিন রাতে তিন রূপ—কিরণ তুমি অপূর্ব—ওয়ান্ডারফুল! চার্মিং!'

'কি হচ্ছে? এসো তো—!' কিরণশশী ধমক দিল মাতাল ভুবন চৌধুরীকে। ডান হাত বাড়িয়ে ওর বুক জড়িয়ে ধরল। তার দেহের ভারটা টেনে নিল নিজের দেহে। এগিয়ে চলল ঘরের দিকে।

মৃগাঙ্ক বললে, 'আমি যাই।'

'কাল একবার এসো।' কিরণশশীর মুখ দেখা গেল না।

দুই

মৃগাঙ্ক নিশ্চিত হতে পারে নি ; ওর মনে সন্দেহ ছিল, সংশয়াকুল হয়েছিল যত দিন গেছে, দিন যাচ্ছিল—কিন্তু মাস চারেক পরে সত্যি সত্যিই আবার কিরণশশীর মুখ দেখতে পেল ও।

কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন ছিল হয়তো। কিরণশশী বললে মিষ্টি হেসে, 'নতুন বই নামাচ্ছি আমরা। তোমায় দিয়েছি রাজপুত্রের পার্ট—। প্রথম দিনেই বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

পাশেই ছিল ভুবন চৌধুরী। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখল কাপ। আশ্চর্য উজ্জ্বল হাসি তার মুখে। ভুবন বললে, 'এমন চান্স কেউ পায় না, ব্রাদার। অন্য থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিলে তোমায় পাক্কা তিনটি বচ্ছর কোটালপুত্র সাজিয়ে রাখত।'

ওর কথায় এরা হাসল। হাসি থামলে কিরণশশী বললে, 'কাল থেকে রিহার্সাল শুরু। দশ দিনের মধ্যে তৈরি করে নিতে হবে সব। বুঝলে তো?'

ঘাড় নাড়ল মৃগাঙ্ক।

ভুবন চৌধুরী ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। এবার সোজা হয়ে বসে সিগারেট ধরাল।

'বইয়ের নাম, 'পিঙ্গলার প্রেম'। আমিই নাট্যকার।' একটি মুহূর্ত থামল ভুবন চৌধুরী, দেখল ওদের দুজনকে, আপন মনেই ঠোঁট বুজিয়ে হাসল একটু। বললে, 'অবাক হচ্ছো নাকি, ব্রাদার ! তা তোমার আর দোষ কি, পাবলিকই ভুলে গেছে হয়তো। বছর কুড়ি আগে আমি যখন এদিকে আসি, নাট্যকার হয়েই এসেছিলাম, না-কি কিরণ। কিরণ সব জানে। খান দুয়েক বই লিখেছিলাম, ভাল চলল না ; জমল না। নাট্যকার ভুবন চৌধুরী অ্যাক্টর ভুবন চৌধুরী হয়ে গেল। তাতেই যা নাম-যশ।' ভুবন চৌধুরী আবার থেমে, একটু চুপ করে হাসল, 'কী কাণ্ড ! চেয়েছি নাট্যকার হতে, হলাম অ্যাক্টর !'

'এখন আবার নাট্যকার হবার শখ হয়েছে !' বললে কিরণশশী ভঙ্গী করে, পানের কৌটো থেকে আতর দেওয়া পান নিতে নিতে। কৌটোটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল ভুবনের দিকে।

একসঙ্গে দু-তিন খিলি পান মুখে ফেলে ভুবন চৌধুরী ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল আবার।

'নাটকের একেবারে শেষটুকু এখনো আমার লেখা হয় নি—'

'অথচ চার মাস ধরে নাট্যকার মশাই নাটক লিখছেন, সেই তোমাদের মনোহরপুর থেকে ফিরে আসার পরই।' কিরণশশী ঠাট্টা করলে, 'আরও ক' মাস লাগত কে জানে! আমিই জোর করে রিহার্সালে নামিয়ে দিলাম। তাও যদি শেষ হয়!'
'শেষের একটাই তো দৃশ্য! আমার মনে ছকা আছে। আর একটু ভেবে লিখে ফেলব।' ভুবন চৌধুরী আবার সিগারেট ধরায়।
মৃগাঙ্ক ভুবন চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।
'গল্পটা—' ভুবন চৌধুরী বলতে শুরু করে, 'গল্পটা শোনো। কিরণ, তুমিও।'
কিরণশশী কখনো-সখনো এই নাটকের দু-চারটে পাতা দেখেছে পাণ্ডুলিপির, কিন্তু গল্পটা শোনে নি। ভুবন চৌধুরী-ই বলে নি। তন্ময় হয়ে ছিল ও নিজের নাটকে। সিন্ধুর অতল তলে ডুবুরীর মতন।
'কোপলী নামে এক রাজ্য ছিল আদ্যিকালে। সে রাজ্যের যিনি রাজা, বুড়ো বয়সে অপুত্রক অবস্থায় ভীষণ দুঃখকষ্ট মনে নিয়ে মারা যান—।' ভুবন চৌধুরী গল্প শুরু করলে, 'রাজার ছেলে ছিল না, কিন্তু একটি মেয়ে ছিল। নাম তার পিঙ্গলা। অপূর্ব সুন্দরী সে। বিলাস ব্যসনে, ছলাকলায় তার মতন পটু আর কেউ ছিল না। ওদিকে আবার পুরুষের মতন মৃগয়ায় যেত পিঙ্গলা। তার কোমল দেহ বর্ম আবৃত করে অশ্বারোহণে ঘন অরণ্যে ঘুরে বেড়াত। পিঙ্গলা বিবাহ করে নি। রাজা অনেক চেষ্টা করেছেন, অনুনয় করেছেন, রাজপুরুষরা পরামর্শ দিয়েছে, তবু পিঙ্গলা বিবাহে সম্মত হয় নি। ধীরে ধীরে একটা কথা ছড়িয়ে গিয়েছিল গোপনে গোপনে—পিঙ্গলা শুধু পশু মৃগয়াই করে না—তার অব্যর্থ শরে বহু সুপুরুষেরও অন্তর বিদ্ধ হয়েছে। তারা যে কারা, কেউ জানত না। অপুত্রক রাজা কন্যার এই অধর্ম ও স্বেচ্ছাচারিতা নীরবে সহ্য করতে করতে শেষে একদিন মারা গেলেন।' ভুবন চৌধুরী থামল।
কিরণশশী আর মৃগাঙ্ক কুতূহলী চোখে তাকিয়ে ভুবন চৌধুরীর মুখের দিকে।
আবার একটা সিগারেট ধরাল ভুবন চৌধুরী। চোখ বুজে একটুক্ষণ ভেবে নিল কি যেন। তারপর আরম্ভ করল, 'এই গেল ফার্স্ট অ্যাক্ট। সেকেন্ড অ্যাক্টের শুরু—কোপলী রাজ্যের অধিশ্বরী এখন পিঙ্গলাই। একদিন মৃগয়ায় গিয়ে, অরণ্যের এক নদীতীর থেকে অচেতন, মৃতপ্রায় এক যুবককে প্রাসাদে নিয়ে এলো পিঙ্গলা। অমন রূপবান পুরুষ খুব কমই চোখে পড়ে। রাজবৈদ্য এলেন। সযত্নে পরীক্ষা করলেন যুবককে। ঔষধাদি দিলেন। বললেন, এই তরুণ কোন বিষাক্ত সাপের দংশনে বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায় হয়েছিল। ওর আত্মীয়স্বজন সম্ভবত তাকে মৃতজ্ঞানে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় যুবক আশ্চর্যভাবে পুনরায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অতি সুলক্ষণ পুরুষ।...যুবকটি প্রাণ ফিরে পেল, কিন্তু অতীত কথা তার কিছুই মনে পড়ল না। কুল, শীল, বংশ, নাম, দেশ—

কোন কিছুই তার স্মৃতিপথে ধরা দিল না। রাজ জ্যোতিষী এলেন। গণনা করলেন প্রচুর। অবশেষে বললেন, ইনি অবশ্যই অতি সুলক্ষণ পুরুষ, সদ্‌বংশজাত, সম্ভবত কোন রাজপুত্র।...রাজ-জ্যোতিষী তার বেশি কিছু বলতে পারলেন না।... পিঙ্গলা তার নতুন করে নামকরণ করলে, মৃত্যুঞ্জয়। আর নামকরণ করেই ও ক্ষান্ত হল না। ক্রমশই মৃত্যুঞ্জয়কে আকৃষ্ট করতে লাগল নিজের প্রতি। নিজেও আকৃষ্ট হল তার প্রতি।' ভুবন চৌধুরী আবার চুপ করলে।

'দ্বিতীয় অংক বুঝি এখানেই শেষ?' মৃগাংক প্রশ্ন করলে।

'হ্যাঁ, এখানেই। এরপর আর একটা অংক মাত্র আছে। তাতে তিনটি দৃশ্য। তার মধ্যে দুটি দৃশ্য লেখা হয়ে গেছে আমার।' ভুবন চৌধুরী উঠে পড়ল। বললে, 'একটু বসো, আমি আসছি।'

ভুবন চৌধুরী চলে যেতে ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। মৃগাংক একটু পরে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'তুমি হয়তো ভাবছিলে, তোমার কথা আমি ভুলেই গেছি, না?' কিরণশশী নীচু গলায় প্রথমে বললে।

'তাই মনে হচ্ছিল।' মৃগাংক কিরণশশীর হাতের দিকে চাইল। সেই লাল দাগটা কি বেশি দিন থাকা সম্ভব, ও ভাবল।

'তা বইকি! ভুলে যাওয়া অত সহজ!' কিরণশশীর গলায় অভিমান।

মৃগাংক অভিমানটুকু বুঝতে পারলে। হাসল মধুর করে। বললে, 'আমি যা-ই ভাবি, আপনি তো আর সত্যি ভুলে যান নি।'

কিরণশশী উঠল। স্টেজে এইটেই তার সাজগোজ করবার, কাপড় ছাড়বার নিজস্ব ঘর। ওদিকের আয়নায় গিয়ে দাঁড়াল একটু। নিজের মুখ নিজেই দেখল। হাত দিয়ে কপালের চুলগুলো সরাল। গলার হারটা আঙুল দিয়ে নাড়া চাড়া করলে। তারপর ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে গলা বাড়াল।

ফিরে এসে মৃগাংকর মাথায় কাছে বুক ছুঁইয়ে দাঁড়াল। কি একটা খড়কুটো বুঝি পড়েছিল মৃগাংকর চুলে—সেটা ফেলে দিল।

'কোথায় এসে উঠেছ?'

'কুন্দদার এক বন্ধুর মেসে।'

'মেস—! অনেক লোক তো? ডাল-চচ্চড়ি খাওয়াচ্ছে?'

'হ্যাঁ।' মৃগাংক হাসল।

'ও মেস তুমি কালই ছেড়ে দিয়ে টাউন হোটেলে উঠবে! বুঝলে? একটা ঘর নেবে নিজের। আচ্ছা, আমি-ই বলে দেবো মাধববাবুকে। টাউন হোটেলের ম্যানেজার উনি।'

কিরণশশী আলগা হাতে মৃগাংকর মাথার চুলে ইলিবিলি কেটে দিল।

'ভালভাবে না থাকলে শরীর রাখা যায় না। মেসের ছাই ভস্ম খেলে ও রূপ কি থাকবে নাকি তোমার ? তখন—?'

'আমার টাকা কই অতো ?'

'টা-কা !' কিরণশশী আশ্চর্য চোখে তাকাল মৃগাঙ্কর দিকে। সেই চোখ ক্রমেই নরম, কোমল, কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, বিষণ্ণ হয়ে এলো। অস্পষ্ট—মৃদু অতি মৃদু সুরে বললে, 'তোমার টা-কা—।'

কিরণশশী আর কিছু বললে না মুখে। কিন্তু তার না-বলা মুখই যেন বাকি কথাটুকু বুঝিয়ে দিল : আমি কেন আছি তবে !

ভুবন চৌধুরী কোথায় যেন ছিল—এই সময় ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গন্ধ উঠল বাতাসে। কিরণশশী একটু সরে গেল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ভুবন চৌধুরী ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'থার্ড অ্যাক্টের শুরুতেই আমি দেখাচ্ছি এক ভিলেনকে। এই ভিলেন হচ্ছে পিঙ্গলার রাজ-পরিষদের মন্ত্রী। লোকটা বিচক্ষণ, চতুর, কঠিন হৃদয়, নিষ্ঠুর। তার দুর্বলতা শুধু এক জায়গায়। আর তা হচ্ছে, পিঙ্গলার ওপর। পিঙ্গলার নিষ্কণ্টক জীবনের অনেকখানি কৃতিত্ব তার প্রাপ্য। এক সময়ে পিঙ্গলাও বুঝি তাকে ভালবাসত। কিন্তু…। কিন্তুটা বুঝতেই পারছো। মৃত্যুঞ্জয় আসার পর সে কিন্তু আরও দূরে সরে গেল। এদিকে পিঙ্গলা দিনে দিনে হৃদয় জয় করে নিল মৃত্যুঞ্জয়ের। শেষ পর্যন্ত পিঙ্গলা তার মনোভাব প্রকাশ করলে প্রকাশ্যেই—মৃত্যুঞ্জয়কে সে বিবাহ করবে। প্রথমেই বাধা দিল সেই মন্ত্রী। বললে, অজ্ঞাত কুলশীল পরিচয়হীন এক তরুণ, বয়সের পার্থক্য প্রচুর—এ বিবাহ হয় না। প্রজারা অসন্তুষ্ট হবে, বিদ্রোহ করবে। পিঙ্গলা হাসে। কোন বিপদের আশঙ্কাই তাকে সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। মৃত্যুঞ্জয় অপ্রাজ্ঞ—নিরীহ তরুণ। সে ভাবল, অন্তর্বিপ্লবে প্রয়োজন কি—ও পালিয়ে যাবে। পিঙ্গলা বুঝতে পারল। ওর চাতুরী বাড়ল আরও, আরও ছলা-কলা। সুরা, সঙ্গীত, বিলাস, ব্যসন মৃত্যুঞ্জয়কে লোভের নাগপাশ দিয়ে বেঁধে রাখল পিঙ্গলা। মৃত্যুঞ্জয় ভেসে যাচ্ছিল তার স্রোতে। মাঝে মাঝে তার ভয় হয়, কি যেন একটা আশঙ্কা জাগে, কিন্তু পরক্ষণেই পিঙ্গলার বরতনুর আশ্রয়ে সব ভুলে যায় ও। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল বিবাহের দিন।'

ভুবন চৌধুরী থামল একটু। তারপর হেসে বললে, 'বিবাহের দিনটাই নাটকের শেষ দৃশ্য। ওটাই লেখা হয় নি—মনে মনে ছকা আছে। লিখে ফেলবো শিগগির।'

'বিয়ে কি হবে না ?' কিরণশশী থমথমে গলায় শুধালো।

'কেন, বিয়ে না হলে কি তুমি পিঙ্গলার পার্ট করতে রাজী নও ?' ভুবন চৌধুরী অদ্ভুত একটা অট্টহাসি হাসল। যার শব্দ সেই ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাতাসে বাতাসে কাঁপতে থাকল।

দশ দিনের রিহার্সাল—কিন্তু বাহাদুর বলতে হবে ভুবন চৌধুরীকে। আশ্চর্য কৃতিত্বে দশদিনেই শিখিয়ে পড়িয়ে নাটকটা ঝলমলিয়ে তুলল ও। কিরণশশী পিঙ্গলা। পিঙ্গলাই বটে। রূপে, রহস্যে, ছলনায়, নিষ্ঠুরতায়, প্রেমে কিরণশশী যেন পিঙ্গলাকে অতীতের কোন অন্ধকার থেকে তুলে এনে মঞ্চের পাদপ্রদীপে জীবন্ত করে তুলল। তেমনি মৃগাঙ্ক। অজ্ঞাত কুলশীল তরুণ, জীবনদাত্রীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, পিঙ্গলার প্রেম তাকে বসন্তের আশ্চর্য শিহরণ দিয়ে গেছে, উন্মনা সে। অথচ নিষ্ঠুর অতীতের সামান্য কটি অভিজ্ঞানের অভাবে এ সুখ তার করতলগত হয়েও হয় না। অন্তর্বিপ্লবকে ভয় পায় মৃত্যুঞ্জয়। সে বিপ্লব যদি জাগে, তবে? মৃত্যুঞ্জয় চায় না—তবু পিঙ্গলার উষ্ণ প্রলোভনের মায়ায়, সুরায়, নারীতে, আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে বন্দী, পরমুহূর্তে পিঙ্গলার বাহুলতায় সত্যই সে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে থাকে।

আজই প্রথম রজনীর অভিনয়। গ্রীন রুমের চঞ্চলতায়, কলরবে, আলোয়, মৃগাংকর কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। ও কি পারবে আজ। কলকাতার স্টেজ। অসংখ্য দর্শক। এখানে মঞ্চ ঘুরে যাবে, কত রঙের আলো রামধনুর মতন নেমে আসবে—একটা ঐক্যতান গুঞ্জন করে উঠবে। ও কি পারবে? গলা দিয়ে স্বর বেরুবে কি কিরণশশীর সেই পিঙ্গলার রূপমূর্তির দিকে তাকিয়ে।

কিরণশশীও সেজেছে আজ। প্রতি নতুন দৃশ্যে তার নব নব বেশ। কখনো স্তোক-নম্রা, কখনো মৃগয়া বিহারিণী, কখনো লাস্যময়ী, ছলনাময়ী নারী; আবার কখনো মমতাময়ী নারী, প্রেমিকা, সুচতুরা রাজকন্যা।

যবনিকা উঠল। আবার নামল।...একটি অংক শেষ হল।

ভালই হয়েছে। কথাটা অভিনয় করতে করতেই বোঝা গিয়েছিল দর্শকদের উচ্ছ্বাসের করতালি থেকে।

দ্বিতীয় অংকের যবনিকা উঠল। ভয় করছিল মৃগাংকর। মনে হল, ওর হৃৎপিণ্ড বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু না, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হল না। বরং কিসের একটি যাদুস্পর্শে যেন সত্যিই মৃত্যুঞ্জয় জেগে উঠল। চোখ মেলে দেখল, পিঙ্গলা। পিঙ্গলা, পিঙ্গলা, পিঙ্গলা।

দ্বিতীয় অংকের যবনিকা নেমে এলো।

'মার্ভেলাস!' ভুবন চৌধুরী ওর গলা জড়িয়ে ধরল। মুখে তার মদের গন্ধ, 'ফার্স্ট নাইটেই তুমি ফেমাস হয়ে গেলে, ব্রাদার। কিন্তু, শোনো, ওই শেষ দৃশ্যটা আমি বদলেছি। তোমার কথাবার্তা একেবারে শেষে তো কিছু ছিল না—কাজেই কিছু যাবে আসবে না। শুধু পোজটা বদলে যাবে তোমার। এই নাও—এই ক'টা কাগজ—শেষটুকু নতুন করে লিখেছি—দেখে নাও একলা দাঁড়িয়ে। যাই, কিরণকে

আবার দেখিয়ে দি। ওর পার্টটাই বদলেছে—নিউ ডায়লগ।'

ভুবন চৌধুরী ছুটল কিরণশশীর সাজঘরে।

মৃগাঙ্ক অবাক। লোকটা মাতাল ছিল—এবার পাগলা হয়ে গেল নাকি! শেষ মুহূর্তে শেষ দৃশ্য বদলাচ্ছে!

চমকে উঠেছে কিরণশশী ভুবন চৌধুরীর দৃশ্য-পাল্টানো কাগজের টুকরো ক'টা হাতে নিয়ে। প্রথমটায় ও কথাই বলতে পারল না। তারপর বললে, 'তুমি কি পাগল হলে নাকি?'

'পাগল হবো কেন! এই ঠিক। এই ঠিক নাটক। এমন ট্র্যাজিডি আর হয় না কিরণ। দিস্ ইজ্ নেমিসিস—নিষ্ঠুরা নিয়তি!'

'না, না, এ আমি পারবো না।' কিরণ কাগজ ক'টা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ভুবন চৌধুরী হাসিমুখেই কাগজ ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে কিরণের হাত ধরে।

'আমি নাট্যকার কিরণ। এই বই আমার জীবনের একটি কীর্তি। ভাল মন্দর আমি কি কিছু বুঝিনে?'

'তা বলে এমন নিষ্ঠুর হবে তোমার নাটক, এমন অসম্ভব?'

'কোন্‌টা অসম্ভব কিরণ? কি অসম্ভব? তুমি যদি ইংরিজী জানতে, শেক্সপীয়ারের একটা কথা শুনিয়ে দিতাম। সে কথা যাক। আমার পিঙ্গলার দুঃখটা তুমি বুঝছো না কেন?'

'কিসের দুঃখ—! বিরক্ত হল কিরণশশী।

'দুঃখ নয়, বোকা!—তুমি অসম্ভব বোকা, কিরণ! ভেবে দেখো—পিঙ্গলা জীবনে বহু বঞ্চনার মৃগয়া করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়কে ভালবাসল। শত বাধা সত্ত্বেও সে ওর গলায় মালা দুলিয়ে বরণ করতে যাচ্ছে। ঠিক যে মুহূর্তে ধর্ম সাক্ষী করে গলায় বরমাল্য দিতে যাবে মৃত্যুঞ্জয়ের—ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বজ্র কঠিন আদেশ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সেই মন্ত্রী—এককালে যে তার সহচর ছিল। অনেক পরিশ্রমে গোপন অনুসন্ধানের পর সেই মন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় সূত্র জেনে এসেছে। সামনের ওই বরবেশী সূর্যকান্তি তরুণ পিঙ্গলার সন্তান। বহু-কাল আগে বিলাসিনী পিঙ্গলা হৃদয়-মৃগয়ায় গিয়ে ওকে লাভ করেছিল—কিন্তু গ্রহণ করে নি—ফেলে দিয়ে এসেছিল।' ভুবন চৌধুরী পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিল।

কিরণশশী যেন পাথর। ভুবন চৌধুরী ওর চুল, চোখ, গালে নিবিড় সোহাগে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'তুমি পিশাচ!' কিরণশশী দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

'আমি নাট্যকার।' ভুবন করুণ মুখে হাসল, 'কিন্তু তাতে কি—এই বইয়ে তুমি

অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন সুযোগ আর পাবে না কখনো!'

'সুযোগ?'

'সুযোগ নয়। তোমার শেষ অভিনয়—সত্যকার অভিনয়।'

'অভিনয়?' কিরণশশী পুনরাবৃত্তি করে কথাটার।

'হ্যাঁ, অভিনয়। পারবে না ফুটোতে একটি নারীর সেই তিনটি রূপ—তার ভালবাসার সেই আশ্চর্য রহস্য। হলেই বা মৃত্যুঞ্জয় পিঙ্গলার পুত্র। কিন্তু নারী-প্রেমের তিনটি-ই যে একরূপ—শুধু সাজ বদলে যায়—প্রিয়া হয় জায়া, জায়া হয় জননী। শেষ দৃশ্যে তোমার নির্বাক অভিনয়—শুধু এই তিন প্রেমের বেদনাকে একটি বেদনায়—'

ম্যানেজার ঘরে মুখ বাড়াল্ল এই সময়। তৃতীয় অংক শুরু হয়ে গেছে। ও চলে যেতে ভুবন পকেট থেকে বোতলটা বের করে কিরণশশীর হাতে দিল।

'অভিনয়, অভিনয়; তার জন্যে এতো। ওঠো। যদি শেষ দৃশ্য খারাপ হয় আমি কথা দিচ্ছি তোমায়, কাল বদলে দেবো। যা ছিল আগে—তাই থাকবে।'

কিরণশশীর স্নায়ু শিথিল হয়ে এসেছিল—একটু উত্তেজিত করে নিল।

সময়টা এসে গেছে। উইংসের পাশে কিরণশশী পিঙ্গলার বেশে অপেক্ষা করছে বরমাল্য হাতে—তার পাশে মন্ত্রীর বেশে ভুবন চৌধুরী।

কিরণশশী যেন কাঁপছিল। নিশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। বুকটা ধুক ধুক করছে।

'অতো ভয় কেন তোমার—এত বছর ধরে অভিনয় করছো!' ভুবন বললে চাপা গলায়।

'আমি পারবো না। সত্যিই পারবো না।'

'পারবে, পারবে। না পারার কি আছে?'

'কি করে তাকাবো আমি; অমন কথা শোনার পর।'

'যেমন করে তাকাতে হয়—তুমি-ই জানো।'

আর দু মিনিট। স্টেজের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়—বরবেশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজপুরোহিত স্বস্তিবচন করছেন।

'আমি পারবো না গো, আমার বুক কাঁপছে।'

'কাঁপুক; ভয়ে নয়—আনন্দে কাঁপছে তোমার বুক।' ভুবন চৌধুরীর গলার সুরটা কেমন যেন বদলে যায়, হয়ত একটা হিংস্রতা আছে কিন্তু নরম সুরে ঢাকা—শাণিত ভঙ্গি আছে কিন্তু শোভনতা দিয়ে মোড়া। স্পষ্ট, মৃদু সুরে কিরণশশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ও বললে, 'আমি জানি—আজ তোমার অভিনয় জীবনের সমস্ত অভিনয়কে ছাপিয়ে যাবে নয়নতারা। হ্যাঁ—ভাবো না সেই কথা, মনে কর না ঠিক এই সময়েই—সে দিনের কথা—যখন তোমার নাম ছিল নয়নতারা। ভদ্র কিন্তু মূর্খ দরিদ্র স্বামী ফেলে—কোলের এক বছরের ছেলেটিকে কোল থেকে

সরিয়ে ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে পালিয়ে এলে। এতকাল পরে সেই ছেলেকেই না হয় ফিরে পেয়েছ…। ফিরে পেলে। তোমারই ছেলে ও। অই মৃগাঙ্ক, কিন্তু—তুমি জানো, তোমার মন, তোমার চোখ—মৃগাঙ্ককে—'কথাটা আর শেষ করলে না ভুবন চৌধুরী। পিঙ্গলার মঞ্চপ্রবেশ-মুহূর্তে অপেক্ষা করছে।

'—যাও—' ভুবন আস্তে ওকে ঠেলে দিল।

কিছু বোঝবার, ভাববার, জানবার আগেই কিরণশশী দেখে ও শতচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে, উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। সামনে মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্ক না মৃত্যুঞ্জয়।

ভুবন চৌধুরী উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টেজের দিকে। কথা বলেছে নয়নতারা। না, কিরণশশী। না, না, কিরণশশীও নয় পিঙ্গলা।

দু চোখ ভরে জল আসছিল ভুবন চৌধুরীর। সুন্দর নাটক লেখায় এত বেদনা আছে আজ জানল ও।

তখন বুঝি মাঝ রাত। মৃগাঙ্ক থাকতে পারে নি। চলে এসেছে কিরণশশীর বাড়ি! ছটফট করছিল ওর মন। অতুলনীয় অভিনয় করেছিল কিরণশশী। কিন্তু তারপর, আশ্চর্য, কি যে হল তার, স্টেজের বাইরে এসে কারুর সঙ্গে কথা বললে না, কোথাও দাঁড়াল না, মৃগাঙ্ক সামনে গিয়েছিল তার দিকে ফিরেও তাকাল না—চলে গেল। ওরা বলছিল—ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ।

মৃগাঙ্ক ভুবন চৌধুরীকেও আর খুঁজে পায় নি। অনেক—অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মৃগাঙ্ক। একাই বসেছিল গ্রীন রুমে। অসুস্থ—হঠাৎ কী এমন অসুস্থ হল কিরণশশী।

ছটফট করেছে মৃগাঙ্ক পুরো দু'ঘণ্টা। তারপর সটান কিরণশশীর বাড়ি।

কিরণশশীর বাড়িতে আসতে ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। অন্ধকার বারান্দায়—বেতের চেয়ারে বসেছিল ভুবন।

'মৃগাঙ্ক!' ভুবন চৌধুরী চমকে উঠল।

'উনি কোথায়, কি হয়েছে?'

ভুবন চৌধুরী ভাবল একটুক্ষণ। তারপর বললে—'এসো'।

ভেজানো দরজা খুলে সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে গেল ঘর। মৃগাঙ্ক ঘরের মধ্যে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। বিছানায় পড়ে আছে কিরণশশী—বেঁকিয়ে, এলিয়ে, অবশ অঙ্গ ছড়িয়ে-ছাড়িয়ে। গায়ের ব্লাউজ খোলা, শাড়িটা সবই প্রায় তালগোল পাকিয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে—পাশ বালিশ আর মাথার বালিশ এদিক ওদিক ছড়ানো—মদের বোতল আর কাঁচের পাত্র, ভাঙা প্লেট মেঝেয়। পিঙ্গলার সেই মালাখানি কার্পেটের ওপর পড়ে। মদের গন্ধ ভর ভর করছিল ঘরে।

ভুবন শাড়িটা দিয়ে কিরণশশীর গা ঢেকে দিল। ডাকল, 'কিরণ, দেখো কে এসেছে!'
কথাটা যেন কানেই যায় নি কিরণশশীর। দুবার ডাকার পর কোন রকমে মাথাটা উঁচু করে ও চাইল। চোখের পাতা আধবোজা। কি দেখল সে কে জানে। যেন মনোহরপুরের প্রথম রাত্রির অভিনয়ে রাজনটীর পার্ট করছে। মৃত্যুর সেই দৃশ্য। বিড় বিড় করে জড়ানো গলায় বললে, 'জীবনে অমৃত দিতে পারলাম না. বিষ দিলাম তোমায়। প্রিয়তম—এ আমার নিয়তি।' একটা হিক্কা উঠল। চোখ মুখ কুঞ্চিত করল কিরণশশী। তারপরই খিল খিল করে হেসে বালিশে লুটিয়ে পড়ল।
ভুবন কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। মৃগাঙ্ক পাথর। একটু অপেক্ষা করে কিরণের গায়ে ঠেলা দিল ভুবন। ডাকলে, 'কিরণ—মৃগাঙ্ক এসেছে, মৃগাঙ্ক!'
বালিশে লুটোপুটি খেয়ে মাথাটা এবার আর একটু উঁচু করল কিরণশশী। চোখ চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। হঠাৎ কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'আমি অবিশ্বাসিনী নই—নবকুমার! আমি!' কান্নাটা হাসিতে জড়িয়ে গেল। মুখের মধ্যে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে আবার লুটিয়ে পড়ল কিরণশশী বিছানায়।
ভুবন ওর কপালে একটু জল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল। মাথাটা কোলে তুলে বলল, 'কিরণ, কি হচ্ছে তোমার—মৃগাঙ্ক তোমায় দেখতে এসেছে!'
এবার কিরণশশী দু হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসল। চোখ তুলে তাকাল। মৃগাঙ্ককে দেখতে পেল কি না—কে জানে। ভাঙা গলায় বললে, 'খোকা, তুই ফিরে এসেছিস। খোকা—!'
কথা শেষ হবার আগেই সর্বাঙ্গ পাকিয়ে বমির ওয়াক তুলল কিরণশশী। খানিকটা বমি ছিটকে এসে পড়ল মৃগাঙ্কর পায়।
গা ঘিন ঘিন করছিল মৃগাঙ্কর। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক চাপা দিল।
এই কুৎসিত পরিবেশ, ঘৃণ্য, নগ্ন আবহাওয়ায়—মৃগাঙ্করও বমি বমি লাগছিল। বীভৎস মনে হচ্ছিল কিরণশশীকে।
বাইরে বেরিয়ে এলো মৃগাঙ্ক। রি রি করছে সারা গা, ঘিন ঘিন করছে। বমি আসছে তার নিজেরই।
নাক মুখ ঘৃণায় সিঁটকে থু করে খানিকটা থুতু ফেলল মৃগাঙ্ক। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'বেশ্যা!'
অন্ধকার বারান্দা দিয়ে নীচে নামতে লাগল মৃগাঙ্ক দ্রুত পায়ে।

আঙুরলতা

মনে হল না এইমাত্র অতিবড় একটা সর্বনাশ ঘটে গেল আঙুরের—আঙুরলতার ঘরে।

হাউমাউ করে কেঁদে নন্দর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আঙুর। দুটো ঠান্ডা পা নিজের বুকের মধ্যে দু-হাতে জাপটে ধরে মাথা ঠুকতে শুরু করল না; আধভেজান দরজাটা হাট করে দিয়ে ছুটে যে বাইরে যাবে, চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকবে, তাও না। নন্দর চৌকির পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে-বিনিয়ে একটু কাঁদল না পর্যন্ত।

মধুর সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ মেড়েছিল আঙুর। আঙুল দিয়ে নন্দর জিভে আস্তে আস্তে সেটা মাখিয়ে দিতে মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু আগে। নন্দর যখন সাড়া পাওয়া গেল না, দশ ডাকেও ঠোঁট ফাঁক করল না, জিভ বার করল না একটুও—আঙুর তখন তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটার বোজা চোখের পাতা দেখল সন্দেহভরে। একটা কাল পিঁপড়ে উঠেছিল পলকের তলায়। ঘাড়টা একটু কাত হয়ে রয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। সমস্ত মুখখানা সেদ্ধকরা বাসী ডিমের মতন শুকনো, শক্ত শক্ত, ফ্যাকাশে। যে আঙুলে মধু-চ্যবনপ্রাশ মাখিয়ে নিয়েছিল আঙুর নন্দর জিভে ছুঁয়ে দেবে বলে, সেই আঙুলটাই নন্দর নাকের তলায় ধরল। না, নিশ্বাস পড়ছে না নন্দর। আঙুলটা সরাতে গিয়ে নন্দর নাকের ডগার সঙ্গে ছুঁয়ে গেল। ঠান্ডা। নন্দর বুকে হাত রাখল, কান পাতল। কোন শব্দ নেই। যাই যাই করছিল মানুষটা! আজ যাই কি কাল যাই! যাক শেষ পর্যন্ত চলেই গেছে।

মধু মাড়া খলনুড়িটা কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিতে এসে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিল আঙুর। হিমুদের পুরনো টিনের চালার ওপর এখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাটির দেওয়ালগুলো ভিজে সপসপ। ডোবাটার নীল জলে শ্যাওলা থিকথিক করছে। আশ-শ্যাওড়া আর কচুর জঙ্গলে ক'টা কাক ভিজছে আর ডাকছে।

জানলার কাছ থেকেই ঘুরে দাঁড়াল আঙুর। নন্দর দিকে আর একবার চাইল। নড়বড়ে সরু চৌকিটার ওপর কতকগুলো এলোমেলো হাড় যেন কেউ চিট ছেঁড়া কাঁথার তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। দুটো মাছি এসে বসেছে নন্দর মুখে।

নন্দ তো মরে জুড়োল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল! আঙুর ভাবছিল: এখন কী করি! কাকে ডাকি, কার পায়ে ধরি, কার কাছে হাত পাতি?

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আঙুরের। পাজী নচ্ছারটা যেন বুঝেসুঝেই এসেছিল এখানে।

যেন ঠিক করেই এসেছিল, এঁটো পাতটা আঙুরকে দিয়েই তুলিয়ে নেবে। সেই জেদ ও রাখল।

এখন কী করে আঙুর? এ-ভাবে তো ঘরের মধ্যে মড়া ফেলে রাখা যায় না। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার, পোড়াবার কী হবে?

খানিকটা ভেবে আঙুর ঘরের পূর্বদিকের দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। তোবড়ানো রঙচটা বাক্সটার ওপর ক'টা পোঁটলা-পুঁটলি গুটানো মাদুর চাপানো ছিল। তারই ওপর কালো ছিটকাটা বেড়ালটা মুখ গঁজড়ে ঘুমোচ্ছিল।

চোখ পড়তেই আঙুর যেন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। খপ্ করে ধরে বেড়ালটাকে আধভেজানো চৌকাটের দিকে ছুঁড়ে মারল। ধপ্ করে একটা শব্দ, বেড়ালটার সামান্য একটু ককিয়ে ওঠা। দরজার ফাঁক দিয়ে পালাল জন্তুটা।

যেমন করে বেড়ালটার টুঁটি চেপে ধরেছিল আঙুর তেমন করেই মাদুর পোঁটলা-পুঁটলি, একটা উদোম বালিশ—মেঝের ওপর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ও। 'যত আপদ সব! আমার কপালেই জোটে গো—এও আশ্চয্যি। কেন, তোদের আর জায়গা হয় না! হারামজাদা, নচ্ছারের দল। অন্য ঠাঁই নেই? শুতে পারিস না, মরতে পারিস না সেখানে। না থাকে রাস্তায় যা, ভাগাড়ে যা!'

আঙুরের গলা চড়ল। যখন বেশ চড়ায় উঠল—তখন আঙুর যেন থেমে গিয়ে প্রত্যাশা করছিল এইবার অন্য কেউ কথা বলবে। ম্লান বিষণ্ণ ভাঙা-ভাঙা, চাপা গলায়। কিন্তু কোন জবাব আসছে না দেখে মুখ ফিরিয়ে নন্দর দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, লোকটা মরে গেছে।

রঙচটা, তোবড়ানো বাক্সটা খুলে বসল আঙুর। হাঁটকাল, হাতড়াল। একটা পাটের ফাঁস-খাওয়া বাহারী শাড়ি বের করল, দুটো তাঁতের—ছেঁড়া পেঁজা। সায়াও একটা, সার্টিনের একটা বডিজ—। কাঠের কৌটো, প্রসাদী ফুল বাঁধা ন্যাকড়া, রোল্‌ড্‌গোল্ডের ম্যাড়মেড়ে কানপাশা, ঝুটো কাঁচের মালাও একটা। আর বেরুল একপাতা সিঁদুর। ক'টা মাথার কাঁটা।

আঙুর সিঁদুর আর মাথার কাঁটা ক'টা হাতে করে একটু চুপ করে বসে থাকল। নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল না, কিন্তু চোখ দুটো ওর মনে-মনে নন্দকেই দেখছিল। বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে। তখন নন্দর গায়ে মাংস ছিল, হাড়টা চোখে পড়ত না। মুখটা ছিল চোখ-টানা। ভরাট গাল, বড়-বড় চুল।

আঙুরের বুকের মধ্যে এতক্ষণে টনটন করে উঠল। গলার কাছে নিশ্বাসটা একটু সময় চাপ হয়ে থাকল। চোখের সাদা জমি ব্যথা ব্যথা করে জল জমছিল। এক ফোঁটা জল একটা গাল ভিজিয়ে পড়ল টপ্ করে—হাতের ওপর। ঠিক কব্জির কাছটায়। আর আঙুর সে-দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বাক্সের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিল।

না, নেই। সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাঁখা তো নয়, শখের শাঁখা ; স্বামীর সিঁদুর তো নয়, যে-লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়েমানুষ করে তার একচেটিয়া জবরদস্তির সীলমোহর ও সিঁদুর। আঙুর শাঁখা ফেলে দিয়েছিল, সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। সে অনেকদিন হল।

চোখটা মুছে নিল আঙুর। এই যে তার মনটা খারাপ লাগছে, কান্না আসছে— এরজন্যে নিজের ওপরই তার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এবার সে ন্যাকামি শুরু করেছে। যেন এই ন্যাকামিটুকু করা উচিত, করলে পাঁচজনে দেখবে, অন্তত নন্দ।

ঘাড় ঘোরাল আঙুর। না নন্দ আর দেখবে না। ও মরেছে।

বাক্স হাতড়ে খুঁটে-খুঁটে সবসুদ্ধ সাড়ে এগার আনা জুটল। একটা অচল টাকা আছে। এমনই অচল যে, কোন রকমে চালাবার উপায় নেই। যে হারামজাদা ফাঁকি দিয়ে এটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সে আর কোনদিন এলো না। এলে আঙুর তার কাছে থেকে টাকাটা ঠিক আদায় করে নিত। ঠাকুরের বাড়িতে মানুষ অচল চালায় আর চালাবার চেষ্টা করে তাদের এই পটিতে।

সাড়ে এগারো আনা—আর আঙুর মনে মনে খুঁজে-পেতে দেখল, কুলুঙ্গিতে গেলাস চাপা দেওয়া একটা আধুলি আছে, দোক্তার কৌটার মধ্যে একটা দুয়ানি। ও, হ্যাঁ—আর আনা ছয় পয়সা আছে চালের হাঁড়িটার মধ্যে। কত হল সবসুদ্ধ তা হলে! সেই এক টাকা সাড়ে এগার আনা।

এক টাকা সাড়ে এগার আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান-টোড়ান সম্ভব! আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে আগে পড়ে নি তবু জানা কথাই গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান-খরচ চলে না।

কী করবে, কী করা যায়—আঙুর ভাবছিল। কূল পাচ্ছিল না। বিক্রি করবে, বাঁধা রাখবে—এমন কোন জিনিসই আর তার কাছে নেই। কী আছে আর তার এখন? এক রতি সোনা না, রুপো না, এমন কি কাঁসাও নেই। সোনা কোনকালেই ছিল না। সোনার পাত পরানো হালকা চুড়ি চারগাছি ছিল এককালে, নন্দই করিয়ে দিয়েছিল তখন, সে চুড়ি কবেই গেছে। কানে দু-তিন আনা সোনা ছিল—এটা অবশ্য আঙুর তার রোজগারে গড়িয়েছিল—সেটাও গেছে মাসদেড়েক আগে নন্দ আসার পর।

নন্দ এলো, আর যেন মস্ত বড় হাঁ নিয়েই হারামজাদা এসেছিল, আঙুরের কানের তিন আনা সোনা গেল, খাঁটি সোনা ; নাকের দেড় আনা— মাথায় গোঁজা রুপোর চিরুনিটা, দু'খানা রেশমী শাড়ি, কাঁসার থালা, বাটি-গেলাস টুকিটাকি আরও কত কি!

কী করবে আঙুর ! আহা, সে কী সেধে এনে ঘরে ঢুকিয়ে চৌকি পেতে দিয়েছিল ! অত পিরিতের কেষ্ট ছিল না নন্দ তার। বরং ওই ছ্যাঁচড়া, শয়তান, ইতর, স্বার্থপর লোকটা যখন ধুঁকতে-ধুঁকতে এসে উঠল, আঙুর তো তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়েছিল।

মুখপোড়া মাগীচাটা তখন আঙুরের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষের মতো কেঁদেছে। আঙুরের নিজেরই তখন ঘেন্না করছিল। নন্দর সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজরক্তে ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা দাগ ধরে কড়কড় করছে ; বিকট গন্ধ—দাঁতে পোকা, চুলে উকুন, এক-মুখ দাড়ি, হলুদ চোখ। আর বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মতন গরম গা। 'দুটো রাত, আমায় থাকতে দাও, আঙুর ; গায়ের তাপটা একটু কমুক আমি চলে যাব।' নন্দ বলেছিল আঙুরের পা সত্যি-সত্যি জড়িয়ে ধরে।

'না, না, না। যেখানে কাটালে এতদিন—সেখানে যাও।' আঙুর রোদজলে পোড়-খাওয়া কাঠের মত শক্ত। 'তোমার পয়সার সুখ যারা লুটেছে, যাদের পায়রা করে পুষেছ এতদিন, শোয়াশুয়ি রঙ্গ করেছ, তাদের কাছে যাও। কেন, তারা এখন রাখল না, লাথি মেরে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল !'

নন্দ জবাব দিতে পারছিল না। তার জবাব দেবার কিছু ছিল না। শুধু জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণার বিকারে একটা মারাত্মক জখম-হওয়া-কুকুরের মতন ছটফট করছিল. মাথা খুঁড়ছিল।

আঙুর থাকতে দেবে না। নন্দও উঠবে না। ওঠার মতন ক্ষমতাটুকুও তার নেই যেন।

অগত্যা।

'থাকছ, থাক—; কিন্তু জ্বর ছাড়লেই চলে যেতে হবে।' আঙুর সাফসুফ বলে দিয়েছিল, শাসিয়ে দিয়েছিল। সেই গোড়াতেই।

নন্দ তো জ্বর ছাড়াতে আসে নি, এসেছিল আঙুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করতে। কী ঝামেলা, কী ঝকমারি নন্দকে থাকতে দিয়ে। জ্বর তো যায়ই না, উপরন্তু বাড়ে। মাঝে মাঝেই নন্দ বেহুঁশ। হুঁশ থাকে যতক্ষণ, কাটা ছাগলের মতো ছটফট করে।

চোখের সামনে জবাই আর কতক্ষণ দেখতে পারে মানুষ। আঙুর বিরক্ত হয়ে, কোন উপায় নেই দেখে, নন্দকে গালাগাল দিতে দিতে ডাক্তার ডেকে আনল। অম্বিকা ডাক্তারকে। এ-পাড়ার ডাক্তার। যার কাছে আঙুরদের লুকানো-চোরানো রোগগুলো জলের মতন পরিষ্কার। ও জ্বালা-টালা, ঘা-টা আপাতত সে চাপাচুপি দিয়ে দিতে পারে।

অম্বিকা ডাক্তার দেখল নন্দকে। আঙুরকে বলল, 'ও আঙুর—খারাপ ঘা-টাগুলো না হয় একটু সারিয়ে-সুরিয়ে দিলাম আমি ; কিন্তু ওর লিভার যে পচে গেছে

মদ খেয়ে খেয়ে। বড় কাহিল অবস্থা। সহজে মেরামত হবে না। হবে কি না তাও সন্দেহ! ওকে বরং কলকাতার হাসপাতালে দাও, যদি কিছু হয়—এখানে তো সুবিধে দেখছি না।

আঙুরকে যেন কেউ উনুনের আঁচ থেকে টেনে চুল্লিতে ফেলল। জ্বলে যেতে লাগল আঙুর। কোথায় আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে তা না নাড়িভুঁড়ি পচিয়ে ফিচিল রোগে সমস্ত রক্তটাকে দুষিয়ে হারামজাদা তার কাছে আরাম করতে এসেছে।

মর, মর। অরুচি আমার। খেলাম, শুলাম, সুখ করলাম পাটে; ছাই ঝাড়তে ওরে পচি, এলাম তোমার হাটে। বেইমান মিনসে কোথাকার! হবে না, শরীর তো পচে পচে গলে গলে ঝরবে। প্রায়শ্চিত্য এমনি করেই হয়। কেন, যখন আঙুরকে ছেড়ে পথে বসিয়ে পালিয়েছিলে মনে ছিল না। আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো সাত ভাতার করে বেড়াই নি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কত রস-আদিখ্যেতা, মধুমিছরির কথা—।

আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস টুসটুসে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত! শাঁখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ; স্বামী-স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়াল ছাদের বন্ধন—এরা সাক্ষী।

বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে, ঘর দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে। তারপর চার বচ্ছর আর এ-পথ মাড়াল না। আজ এসেছে—মরতে বসে যখন আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না দেহটা রাখে।

আঙুর চিৎকার করে করে শুনিয়ে শুনিয়ে এ সব কথা দশবার করে বলে। দূর দূর করেই আছে। জিভের রাখঢাক নেই। সারাদিন বিরাগ আর বিরক্তি, রাগ-ঘেন্না উগরে যাচ্ছে।

অথচ নেহাতই যেন এমন এক কলে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধার নেই তার লোকটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত—তাই ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাপ বিদায়ের গুণাগার দেবার জন্যেই ডাক্তার আর ওষুধ আর এ-পথ্য সে-পথ্য।

অম্বিকা ডাক্তার ক'টা ছুঁচ ফুঁড়ল, দু-চার শিশি ওষুধ। ঘা ফোড়ার দগদগানি কমলো একটু। আর কিছু না। চটকলের সেই বড় ডাক্তার—তাকেও একদিন দেখিয়ে আনল আঙুর। তার লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়াল। যে কে সেই। এই ডাক্তারও বলল, কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এস।

বিশ মাইল কলকাতা। যেতে আসতে চল্লিশ মাইলের রগড়ানি। রেল-ভাড়া, বাস-ভাড়া। নন্দর ওঠার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু আঙুর একটা পচাগলা মাছের চেঙারির মতন নন্দকে কাঁখে-কোমরে ধরে তাও কলকাতার দু-দুটো হাসপাতালে

ধরনা দিল। কিসের কি, কানে কথাই তুলল না কেউ। দেখল না পর্যন্ত। এক নজর চেয়েই বলল, এখানে কেন এসেছ গো, নিমতলায় নিয়ে যাও। আর যদি আঁচলে নোট বেঁধে এনে থাক—টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে যাও।

ফেরার পথে নন্দর সঙ্গে হাসপাতালেরও বাপান্ত করতে-করতে ফিরল আঙুর। আর সেই যে এসে পড়ল নন্দ তারপর আর পাশ ফেরবার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকল না। হোমিওপ্যাথি চলছিল শেষটায়। তবু দু'আনা পুরিয়া পাওয়া যায় কালীকেষ্টর ডাক্তারখানায়। গত পরশু থেকে সত্য কবিরাজের কথা মতন মধু-চ্যবনপ্রাশ।

তারও শেষ হল। নন্দ মরল।

আঙুর রঙচটা তোবড়ানো খোলা বাক্সর অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়েছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না, মনেই হচ্ছিল না ও আছে, ও কিছু ভাবছে, কিছু ওর করার আছে।

হুঁশ হল মেঘের ডাকে! খুব জোরে একটা মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। আঙুর মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানলার বাইরেটায় অনেকটা অন্ধকার জমে এসেছে।

বাক্সটা থেকে পাটের বাহারী শাড়িটা বের করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল বাইরে। খানিকটা কালো মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু বিকেলও হয়ে গেছে। বৃষ্টি অবশ্য আর পড়ছে না।

আঙুর শুনতে পাচ্ছিল তার ঘরের বাইরে চাঁপা, আতা, লাবণ্য, চামেলি, গোলাপ—দুপুরের গা-গড়ানো ঘুম শেষ করে, কেউ জল ভরতে, কেউ হাই তুলতে, উড়ের দোকান থেকে চার পয়সার চা আনতে—উঠোন দিয়ে আসছে যাচ্ছে, কথা বলছে। আতরের কিরকিরে গলা আর গোলাপের ভাঙা গলার বিশ্রী হাসিটা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল আঙুর।

আতা ছুঁড়িটার কপাল ভাল। পাটকলের একটা ছোঁড়া খুব যাচ্ছে আসছে। আগেরটা ভাগতে না ভাগতেই নতুনটা জুটে গেছে। আঙুর ভাবছিল: আতা কি এই পাটের বাহারী শাড়িটা নেবে? ওর তো এই সব রঙ, বাহার ভালই লাগে। যদি নেয় আতা, হোক না একটু ফাঁস খাওয়া—তবু এখনও ছ'টা মাস নিশ্চিন্তে পরতে পারবে। আহা, এই শাড়ি পরে তো আর বিছানায় ধামসাচ্ছে না!

যদি নেয়, আঙুর চার টাকাতেই দিয়ে দেবে। আর যদি না নিতে চায়? আঙুরের মনের মধ্যে আতা, পাটের শাড়ি, নন্দ সব এলোমেলো হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আঙুর যেন সব ভেবে নিল, পর-পর। কি করবে, কার কাছ থেকে কার কাছে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার। বিকেল তো হয়েই গেল। আর কতক্ষণ ঘরে মড়া ফেলে রাখবে।

যাবার সময় নন্দর মুখের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত গাল আওড়াল আঙুর। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

আতা তার ঘরের কাছটিতে পিঁড়ি পেতে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। নিশ্চয় ওর বাবু কাল যাবার সময় ফেলে গেছে। কিংবা আতা সরিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেই। সেই সিগারেটের ভাগ পাবার আশায় মানদা আতার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে, চিনু পায়ের কাছটিতে উবু হয়ে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে।

পাটের শাড়িটা আঁচলের তলায় আড়াল করে দিয়েছিল আঙুর আগেই। আতার আশেপাশে অত ভিড় দেখে এখন আর যেতে ইচ্ছে হল না। মানদা যতক্ষণ কাছে থাকবে, শত খুঁত বের করবে, আতার ইচ্ছে থাকলেও মানদা কিনতে দেবে না। দর-দাম তো পরের কথা।

তার চেয়ে আগে হিমুর কাছে যাওয়া যাক। বলতে গেলে হিমুই একমাত্র লোক যার সঙ্গে আঙুরের ভাবসাব আছে ভাল মতন। সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গেই যা হয়। এত বড় বিপদের কথাটা তাকেই আগে জানানো দরকার।

আঙুর উঠোন পেরিয়ে তর তর করে সদর দিয়ে বাইরে চলে গেল। হিমুদের চালাটা পাশে।

চুল বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল হিমু। আঙুর এসে কাছে দাঁড়াল।

বিপদের কথাটা বললে আঙুর। হিমুর হাত থেমে গিয়েছিল। 'কখন মল?'

'দুপুরে।'

'ঘণ্টা তিন চার হল তবে! আজ আবার শনিবার। দোষ না পায়!'

'পাবে পাক, আমি কি করব! আমার কাছে তো চিতেয় ওঠার খরচ জমা রেখে যায় নি!'

'কী করবি?' হিমু চুলের খোঁপাটা আবার গুছোতে শুরু করল।

'ক'টা টাকা জোগাড় করতে পারলে হারামজাদাকে চিতেয় উঠিয়ে আসব।' আঙুর দাঁতে দাঁত পিষে বলল।

'বিশুদের কাছে যা। ওদের বল। তবে মাগনায় মড়া কাঁধে করে পোড়াতে যাবে না ওরা।'

'তা জানি।'

'দেখ তবু হাতে-পায়ে ধরে—যদি যায়।'

আঙুর তাকিয়ে তাকিয়ে হিমুর মুখ দেখল। হিমুকে দেখে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তার কোন গা নেই।

'তুই আমায় ক'টা টাকা দিবি হিমু?'

'টা—কা!' একটুক্ষণ আঙুরের দিকে চেয়ে থেকে হিমু হতাশ, বিষাদ-বিষাদ মুখ করল, 'তোকে বলছিলাম না সে-দিন! স্যাকরার জন্যে বারোটা টাকা রেখেছি অনেক কষ্টে আর চারটে হলে—জিনিসটা হয়। তা পোড়া কপাল এমন চারটে টাকাও জুটোতে পারছি না।'

আঙুর হিমুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

কী ভেবে হিমু বললে আবার, 'সিকি, আধুলি, বড় জোর টাকাটা হয়, পারি আঙুর। তার বেশী আমাদের ক্ষমতা কী! তা তুই দুটো টাকা নে বরং আমার কাছ থেকে। পরে শুধে দিস।' বলেই হিমু একটু অন্য রকম হাসল, 'তুই আর শুধবি কি—!'

হাত পেতে আঙুর দুটো টাকাই নিল। অন্য সময় হলে নিত না, কিছুতেই না।

হিমুর কাছে থেকে বেদানামাসির ঘরে।

মাসি শুনে খেঁকিয়ে উঠল, 'তখন বলেছিলাম ও আপদ ঝেড়ে ফেল গা থেকে। শুনলি না। দরদে একেবারে উথলে উঠলি। যা এবার নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যা। ছেনাল মাগী কোথাকার।'

আঙুর কিছু বলল না। মনে-মনে ভাবল শুধু, দরদে ও উথলে ওঠে নি, বিছানা পেতেও শুতে দেয় নি। নন্দর আমি বিয়ে করা মাগ নয় যে, খেয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেছি ওই পচা মর-মর লোকটার। নেহাত ছিল, একই ঘর, চৌকিতে, আমি মেঝেতে ; তাই জল চাইলে দিয়েছি ওষুধটা ঢেলেছি মুখে। পথ্যটা দিয়েছি দায়ে পড়ে।

বেদানামাসি বললে, 'আমি কী করব!'

'মড়াটা ঘরে পড়ে থাকবে?' আঙুরের গলা যেন আর উঠছিল না।

'তা থাকবে বৈকি—আমার এখানে মড়া-ধরা না থাকলে, না পচলে তোদের চলবে কেন! যা—যা মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা—হাতে আধুলিটা টাকাটা গুঁজে দিস—না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছানায়—ওরাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।'

আঙুরের বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল। মেথর, মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কিভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নন্দর উপাধিটা। ও চক্রবর্তী। বামুন।

কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর। বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে থাকল।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যে হয় হয়।

আঙুর তাড়াতাড়ি এলো আতার ঘরে। আতা তখন সাজছে। ছেঁড়া সায়ার ওপর আর একটা নতুন লাল সায়া চড়িয়েছে। তা কোমর-টোমর ফুলেছে খুব। বডিজ এঁটে শাড়িটা সবে পরেছে, ঘরে কেউ নেই।

কথাটা সরাসরি পাড়ল আঙুর। পাটের শাড়িটা একেবারে বের করে।

আতা দেখল হাতে নিয়ে, খুলে ফেলে, কোমরে পাক দিয়ে, গায়ে ফেলে। 'শাড়িটা তোমার বড্ড সেকেলে, আঙুরদি ! পাড় ভাল না।'

আঙুর কি বলবে ! তিন বছর আগের শাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে ! আঙুর শুধু বিড়বিড় করল, 'তোকে মানাবে। বেশ মানাবে।'

আতা হাসল। 'চারুবাবু সে দিন আমায় একটা ছাপাই এনে দিয়েছে। এ-নিয়ে আর কী করব ! বড্ড পুরনো ছেঁড়া ফাটা।'

'নে না—!' আঙুর নিজের অজান্তেই কখন যেন মিনতি করে বসল 'আমি বলছি আতা, নিয়ে নে। তোকে সুন্দর দেখাচ্ছে শাড়িটা গায়ে ফেলে। আর যদি শুনিস বাপু তবেবলছি,—এ-শাড়ি পরে তো আর ধামসাচ্ছিস না। রেখে রেখে পরিস—বছর খানেক চলে যাবে।'

আতা ভাবল। 'আমার কাছে তিনটে টাকা আছে—আড়াইটে টাকা দিতে পারি। না হলে তুমি নিয়ে যাও, আমার তেমন দরকার নেই।'

আড়াইটে টাকাই নিল আঙুর। ঘরের বাইরে এলো। লণ্ঠন আর কুপি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সব তৈরি। সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলেছে চামেলি,লাবণ্যরা। আকাশ লালচে লালচে, বৃষ্টি হয়ত আরও জোরে আসবে। টিপ্‌টিপ্ পড়তে শুরু করেছে আবার। সেই বৃষ্টিতেই চামেলিদের কেউ মাথার ওপর আঁচল তুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি ছাতায় দু-তিনটে মাথাও জড়।

সরু গলিটা দিয়ে রাস্তায় চলে এলো আঙুর। গলির আবছা আলো-অন্ধকারে তখন গোলাপদের জটলা, বিড়ি ফোঁকা, গা-ঢলাঢলি, হাসি। ঘুর ঘুর শুরু হয়েছে সবে খদ্দেরের।

রাস্তায় এসে মনে মনে টাকার পুরো হিসেবটা সেরে ফেলল আঙুর। এক টাকা সাড়ে এগারো আনা, হিমুর দুই আর আতার আড়াই—তা ক'টা টাকা হয়ে গেছে। বিশুরা যদি এখন এই ছ'টাকায় রাজী হয়। মনে হয় না হবে—। কততে যে হবে তাই বা কে জানে ! হনহন করে এগিয়ে গেল আঙুর।

এখান-ওখান খোঁজ নিয়ে বিশুকে পাওয়া গেল সাইকেল সারাবার দোকানটায়। টিনের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দোকানের দরজার পাল্লায় পা তুলে কাঁচের গেলাসে চা খাচ্ছিল। কার্বাইডের আলো তার পাজামা আর মুখে পড়েছে।

আঙুর কাছে গিয়ে ডাকল। ইশারা করল কাছে আসবার।

চা শেষ করে, বিড়ি ধরিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে বিশু এলো; মিটমিট চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে। 'কি রে পট্‌লি, কী খবর ?' বিশুর কাছে আঙুররা সবাই পট্‌লি। কিন্তু আঙুর কিছু বলবার আগেই বিশু সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়া, আগে মাইরি একটা পান খেয়ে নি। শালা চা নয় তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিভটাই বেসাদ হয়ে গেল।' বিশু কথাটা শেষ করেই হাত বাড়াল। অর্থাৎ পান সিগারেটের.

পয়সাটা আগে ফেল। পরে বাতচিত।

আঙুর এ-সব দস্তুর জানে। গরজ তার। আঁচলের খুঁট থেকে আধুলিটা দিল —আতার দেওয়া আধুলিটা। বললে, এক খিলি পান ; একটা সিগারেট—তার বেশি নয়, কালীর দিব্যি থাকল।'

বিশু হাসল। 'খুব টাইট যাচ্ছে না কিরে পটলি! দিনকাল শালা যা যাচ্ছে—যেন সত্যযুগ। আয়—আয়, শালা আঙুরের রস চাটবে তাও মাছি আসে না।' বিশু হাসতে হাসতে চলে গেল।

এলো খানিক পরে, জোড়া খিলি পানে গাল ভরতি করে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। পয়সা কিন্তু ফেরত দিল না। 'বল পটলি কি বলছিলি ?'

আঙুর বলল সব। গলায় উদ্বেগ আর মিনতি।

বিশু রাস্তার ছিটে-ফোঁটা আলোতে আঙুরের মুখটা ভাল করে দেখল। একটু ভাবল, 'ক'টাকা আছে তোর কাছে ?'

'ছ'টাকা।'

'ছ'টাকা। ছ'টাকায় কি হবে রে, একটা ঠ্যাং-ও তো পুড়বে না নন্দর' হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

'কত লাগবে তবে ?' আঙুর বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে বিশুর অট্টহাসি শুনতে শুনতে শুধল।

'দেড় টাকা মণ আম কাঠ। তা মণ সাতেক লাগবে! দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে ; তারপর হাঁড়ি কড়ি ধুনো—ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্ত্র পরাতে চাষ তো—'

'না।' আঙুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ওর বুক শুকিয়ে আসছিল। নতুন বস্ত্রে আর দরকার নেই।

'এইত আর কি ; আর আমরা চারজন খাবো চারটে পাঁইট দিবি। তা দু'নম্বরই দিস—দু টাকা ছ'আনা করে ধরে নে—গোটা দশেক টাকা আর কি!'

আঙুরের পায়ের সাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও। বিশুর মুখটা পর্যন্ত শুয়োরের মতন ছুঁচলো ঘিনঘিনে দেখাচ্ছিল।

খানিকটা সময় লাগল আঙুরের সইয়ে নিতে। বললে, 'অত টাকা আমি কোথায় পাব ? আমার বাপ না ভাতার যে তাকে পোড়াতে বিশ টাকা খরচা চাইছিস ?'

'বাপ না, ভাতার না,—তো সেরেফ চেপে যা। থানায় গিয়ে খবর দিয়ে দে—ধাঙড় পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার সেই ধাঙড়! বুকটা ধক্ করে উঠল। আঙুর নিরুপায় হয়ে বলল, 'আমার খেমতা থাকলে বিশই দিতাম। চামারগিরি করিস না বিশু!'

'তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস্, পটলি! এই বৃষ্টি বাদলার দিন—এখন শালা

শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো—তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে। মুফতি কেউ যেতে চাইবে না। অন্তত গায়ের পায়ের ব্যথাটা মারবার খরচা দিবি তো। আচ্ছা যা, দুটো পাঁইটই দিস—তোর বাপ ভাতার যখন নয়—এক রকম মাগনাতেই চিতেয় উঠিয়ে দেবো। আর কিছু বলিস না মাইরি, তোর পায়ে পড়ি।'

আঙুর হাঁ হুঁ কিছু বললে না। মাথা নাড়ল না। সায় দিল না। রাস্তার আলো শোষা অন্ধকার, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর বিক্ষিপ্ত লোক-জন, দোকানপাটের দিকে নির্জীবের মতন চেয়ে থাকল।

বিশু বললে, 'যা শালা, কাঠ না হয় পাঁচ মণের মধ্যেই সেরে দেবো। বাপ, ভাতার কিছুই নয় যখন তোর—আধাপোড়া হলেও ক্ষতি নেই। টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলে হবে। আরও গোটা ছ'সাত টাকা জোগাড় করে ঝপ্ করে আয় দেখি, পট্‌লি। হাঁদুর দোকানে আছি।'

বিশু চলে গেল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। আরও সাত টাকা সে কোথায় পাবে, কার কাছে হাত পাতবে!

ফিরতে লাগল আঙুর। যেন ভীষণ জ্বরে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অচেতন। কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

যাক, মেথর মুদ্দোফরাসেই টেনে নিয়ে যাক নন্দকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিক গে। কী করবে আঙুর, কী আর করতে পারে! নন্দর ওপর তার এত বেশি রাগ হচ্ছিল যে লোকটাকে যদি বাঁচা অবস্থায় পেত, আঁচড়ে কামড়ে মেরে-ধরে কুরুক্ষেত্র করত আজ। মরেও আমার হাড়মাস জ্বালাচ্ছে গো! আর এ কী অসহ্য জ্বলন! আঙুরের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

বড় রাস্তা ধরে আবার তাদের পটির কাছে এসে পড়ল প্রায় আঙুর। আসবার সময় চোখ রেখে আসছিল, যদি তেমন কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার কাছে একটা দুটো টাকা হাত পেতে চাওয়া চলে।

লোক তো অনেক যাচেছ আসছে। কিন্তু ওরা কেউ আঙুরের আঁচলে টাকা ছুঁড়ে দেবে না মুফতিতে। না, নন্দর ভাগ্যে আর চিতেয় ওঠা হল না। হবে কোথা থেকে? অমন ঠগ, জোচ্চোর, শয়তান মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে। একে বলে প্রায়শ্চিত্য। বামুনের ছেলে—এবার মেথর ধাঙড়ের হাতে যা, যেমন করে কুকুর বেড়াল যায় তাও আবার কোন্ ভাগাড়ে যাবি কে জানে!

আঙুরের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছে, শিরদাঁড়াটা যেন মাঝখানে মচকে যাবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা—অদ্ভুত!

হল না। আর হল না। একটা মানুষ মরল; তার দাহ হল না। কেউ সে-দায় নিল না! কেন নেবে? নন্দ তাদের বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই—কেউ না।

হঠাৎ মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা। হনহনিয়ে ছাতা মাথায় চলেছে। আঙুরের কি

যে হলো, প্রায় ছুটে গিয়ে মানিকবাবুর পথ আগলে ফেলল।

মানিকবাবু চিনতে পারলে না। 'কে ? কী চাও ?' আঙুরকে দুহাত তফাতে রেখে মানিক মুন্সী যেন এ-পটির মেয়ের ছোঁয়া বাঁচাচ্ছিল।

আঙুরের অত আর দেখবার সময় নেই। গড়গড় করে বলে গেল আঙুর 'আপনি বাবু, একদিন এসে আমাদের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাড়িবাবুর জন্যে। বলেছিলেন, আপদ-বিপদ সুখ-সুবিধে দেখবেন। আজ আমার বড় বিপদ। ঘরে মড়া পড়ে পচছে, পুড়োতে পারছি না। একটা ব্যবস্থা করে দিন বাবু। অন্তত দাড়িবাবুর থেকে চেয়ে সাতটা টাকা দিন।'

মানিক মুন্সী খিঁচিয়ে উঠল, 'আহা কী আমার আব্দার রে মাগীর, টাকা দিন। কেন, দাড়িবাবু তোমায় টাকা দেবেন কেন ? তোমার ঘরে লোক মরবে আর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারবাবু তাকে খরচা করে পোড়াবে। যাও, যাও,—ওসব আব্দার রাখ। দাড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কিছু বলতে হয়, কাল বেলা দশটার পর অফিসে যেও।'

মানিক মুন্সী চলে গেল। আঙুর থ। কাল বেলা দশটা ! মানুষ মরল আজ দুপুরে, তার দাহের জন্যে পা ধরতে যেতে হবে কাল বেলা দশটায় ! আর সারা রাত ভরে তার ঘরে মড়াটা পচুক !

আঙুর বুঝতে পারছিল, দায়টা আর কারুর নয়—তারই। যে দায়ে তাদের বেশ্যাপট্টির ঘরে ঘরে ঘুরছে, পান মিষ্টি খেতে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল আঙুরের।

কিন্তু কাঁদল না আঙুর। চোখ পড়ল সামনের দোকানটায়। পানের দোকানের মতো একফালি দোকান। রাস্তার সঙ্গে মেশান নীচের দোকানটায় বসে মুড়ি, ছাতু-টাতু বিক্রয় করে একজন। ওপরটায় অন্য জনের দোকান।

আয়না দিয়ে সাজানো। হরেক রকম শিশির থাক। আতর, জর্দা, সুর্তি আর সুর্মার সঙ্গে মোদকও বিক্রি হয় ও-দোকানে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে দেখতে আঙুরের দু'টো চোখ হঠাৎ কিসের আঁচে যেন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, লোকটাকে ভাল করেই চেনে আঙুর। ওর নাম প্রভুলাল। আর এও জানে আঙুর, ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়। দাঁত মুখ, চোখ, গা—সব যেন কসকস করে, কাঁপে ভেতর ভেতর ; টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চক-চক করে, ভীষণ চক-চক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা, সবুজ—সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন

ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিভ দিয়ে লাল পড়ে।

আঙুরের দিকে প্রভুলালের নজরটা বরাবরই এইরকম। কেন, কে জানে! আঙুর বুঝতে পারে না। এক-একটা লোকের এক-একজনের ওপর এ-রকম হয়। দাঁত উঁচু, টোপা-কপাল ঝুমুরের ওপর তা না হলে এমন সুন্দর মানুষটার চোখ পড়ে মণ্টুবাবুর। মণ্টুবাবু তো ঝুমুরকে এখান থেকে উঠিয়েই নিয়ে গেল।

আঙুর জানে, তার রূপ গেছে। অমন ব্যাধি থাকলে না ঝরে উপায় নেই। আর ব্যাধির কি ঠাঁই বিচার আছে। এমন জায়গায় গুছিয়ে বসল যে, আঙুরের আসল-টাই গেল। অম্বিকা ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, খুব সামলে সুমলে থাকবে। বেশি অত্যাচার করো না। ছেড়ে দিতে পারলেই ভাল। নয়ত একদিন এতেই মরবে।

সেই থেকে আঙুরের অবস্থা পড়ে গেল। নয়ত আতা, চিনু, চামেলির বড় মুখ ওকে সইতে হত না। ঈশ্বর যাকে মারেন—তার আর উপায় কী! তাও একটা বছর আঙুর কত সাবধানে থেকেছে। নেহাত যখন পেট ভরাবার চালডালটুকুই বাড়ন্ত হত—তখনই আঙুরকে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে হত সেজেগুজে।

রোগটা ভেতরের—তাই ওপরটায় আজও আঙুরের কিছু কিছু আছে। মুখখানাই শুধু যে ভাল তা নয়; বুক কোমর চলন-টলনগুলোও এখন পর্যন্ত ভাল আছে। বিশেষ করে সামনাসামনি দেখল—আঙুরের এই আশ্চর্য ভরাট গলা-ঘাড়-বুকের দিকে চেয়ে পারা যায় না।

প্রভুলালের দোকানের দিকে পা পা করে এগিয়ে যেতে লাগল আঙুর। লোকটাকে কী ঘেন্নাই করত ও; প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদড়ের মতো শরীর—আর ওই কুচ্ছিত মুখ, গাছের পিত্তির মতন গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় লাগত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে। নয়ত প্রভুলাল কতবারই তো ঘুর ঘুর করছে—আঙুর এগুতে দেয় নি। মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।

আজ আর অত কথা ভাল করে ভাবতে পারল না আঙুর। বরং ভাবছিল, প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে। না বলে।

ধুক ধুক বুকে প্রভুলালের দোকানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল আঙুর।

'সুর্মা আছে?' মুচকি হাসল আঙুর। একটু হেসে দাঁড়াল।

প্রভুলাল প্রথমটায় অবাক। তারপরে যেন কোথাও একটা পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে সারাটা গা-মুখ বেঁকিয়ে বুঁকিয়ে ফুলিয়ে হাসল। গলার মধ্যে সর্দি-জড়ানো আওয়াজের মতন ভাঙা ভাঙা আবেগ-স্বর উঠছিল।

সুর্মার দিকে হাত বাড়াল না প্রভুলাল। আঙুরের দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'কী খবর? আঁ—তুমি কাঁহা ভাগ গিয়েছিলে! শালা সারা পটি আনধার হয়ে

গেল।'
হাসি আসছিল না। তবু আঙুর হাসল। যেন একটা ঝাপ্টা খেয়ে প্রভুলালের কোলের ওপর পড়তে পড়তে সোজা হল। এলোমেলো আঁচলটা তো হাতে লুটোচ্ছিল, বুকের কাপড়টাও কখন সরিয়ে একপাশে গুটিয়ে দিয়েছে আঙুর। 'মস্‌করা থাক। সুর্মা আছে কিনা বল। না থাকে তো যাই।' আঙুর মাঝ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার টেনে নিল। ঠিক যেমন লাটু ঘুরোতে লেত্তিকে ছেড়ে দিয়ে টানতে হয়। গলা বেঁকিয়ে চোখের পাশ দিয়ে বিভ্রম ছুঁড়ল।
'আছে, আলবৎ আছে।' প্রভুলালের চোখ চকচক করছে, 'তোমাদের আঁখে সুর্মা লাগাতেই তো বসে আছি।'
'থাক, তোমায় আর লাগিয়ে দিতে হবে না। হাতে পেঁপড়ে ধরে যাবে।' আঙুর আর এক দফা হেসে—প্রভুলালের বসবার জায়গাটার কাছে বেঁকে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। গালে হাত রাখল। ঘাড় হেলিয়ে মুখ-চোখ তুলে ধরল।
ঠেলে বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়-ছিল। আঙুর চোখ বুজল।
'কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙুরী! শালা কী চোট্ যে আছে তুমার বাস্তে।' প্রভুলাল কখন তার গরম হাতটা দিয়ে আঙুরের কনুইয়ের ওপরটা ধরে ফেলেছে।
আঙুর সেই অবস্থায় জোরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টেনে টেনে একবার নিশ্বাস নিল, আস্তে আস্তে ছাড়ল। বুক উঠল, নামল। ঠোঁট কামড়ে, বাঁ-চোখ টিপে হাসল আঙুর।
'তোমার পচা আতরের গন্ধ ক'দিন থাকবে গো!' আঙুর ঠোঁট উল্টাল।
'পচা নেই, আসলি আতর দেবো। যে ক'দিন রাখতে চাও।' প্রভুলাল আঙুরের গালে টোকা মারল।
আঙুর ভাবল। 'দশটা টাকা আজ দাও তবে।
'দশ্—?' প্রভুলাল থতমত খেয়ে গেল, 'দ-শ কি রে?'
'দরকার আছে, দশ দাও। আগাম দাও—।'
'আগ্‌লি?'
'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল আঙুর, 'দশ না পার—সাত আটটা টাকা দাও।'
মনে মনে হিসাব করে নিল প্রভুলাল। নিচু গলায় বললে, 'বহুত আচ্ছা, আট টাকা দেবো। মাগর—' প্রভুলাল কুচকুচে কালো মুখে, গোঁফের ডগায় হিসেবী একটা হাসি তুলল। আঙুল দিয়ে দেখাল দিনের হিসেবটা। প্রায় সপ্তাহভর আর কি!
ও-সবের দিকে চোখ ছিল না আঙুরের। হাত পাতল আঙুর। 'টাকা।'
প্রভুলাল আঙুরের গালটা টিপে দিল। 'তু যা পাগলি, ঘর যা সুরতটুরত থোড়া

ঠিক করে লিগে যা ; একদম্ কল্‌কত্তাবালী হয়ে যা। দোকান বন্ধ্ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।'

আঙুর ভীষণভাবে চমকে উঠল। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেছে। পা পাথর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল আঙুর প্রভুলালের দিকে।

'কি-রে ?'· প্রভুলাল আতরের শিশিটিশি, জর্দার নিক্তি ওজন গোছাতে লাগল।

আঙুর তার সদ্য নিবন্ত চোখ তুলে আস্তে গলায় বলল, 'আমার ঘর না, তুমি অন্য কোথাও বল।'

এ-রকম কথা প্রভুলাল জীবনে আর শোনে নি যেন। 'বাঃ—! টাকা তুমি লেবে আঙুর গুরী—আর ঘর ঢুঁড়ব আমি। তব তো দুসরা আঁওরাত ভি—।'

আঙুরের চোখের ওপর প্রভুলালের মুখও আর ভাসছিল না। আলো, আয়না, হরেক-রকম শিশি—আর ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা সব কী যেন ! প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে হলুদ বিকারের চোখে মানুষ যেমন কী দেখছে জানে না, বোঝে না, চেতনায় চিনতে পারে না, তেমনি।

একটু পরে আঙুর মাথা নাড়ল। 'বেশ, তবে তাই, আমার ঘরেই এস তুমি। তাড়াতাড়ি।'

প্রভুলালের দোকানের সামনে থেকে একটা অন্য রকম শরীর আর পা যেন জলো হাওয়া আর অন্ধকার আর পচ্‌পচে রাস্তা গলি দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে মিশিয়ে গেল।

আঙুরের বুকের মধ্যে শব্দগুলো এলোমেলো। সমস্ত মাথাটা ঠাসা ; কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, চোখে ঠাওর করতে পারছে না। হাত-পা সাড় পাচ্ছে না। একটা দম দেওয়া পুতুলের মতন যা হবার হয়ে যাচ্ছে, আপনা থেকেই।

কুপি জ্বেলেছে আঙুর। ধুনো পুড়িয়ে দিয়েছে ঘরে। ক'টা ধূপও। বাক্স থেকে শাড়ি বের করতে গিয়ে পাটের শাড়ি খুঁজেছে প্রথমে—তারপরেই মনে হয়েছে আতাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা খানিক আগেই। তাঁতের ঘোর লাল রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিয়েছে, সেই সাটিনের পুরনো বডিজটা পর্যন্ত। চুল বেঁধেছে। আলতা দিয়েছে পায়। টিপ আর কাজল।

প্রভুলাল এলো। ঘরটা বড় অন্ধকার। 'লণ্ঠন কি হল ? টুট্ গিয়া—' আতরের গন্ধ প্রভুলালের জামায়। হাতে পানের ঠোঙা। মুখে একগাল পান, জর্দা।

প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিসহিস শব্দ। লাল দাঁতগুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।

আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে—সাড় হারিয়ে। কী হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে—রাত কত হল ! বিশু কি

থাকবে হাঁদুর দোকানে ? যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে আবার ! তবে কি হবে ? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে ! দোষ ধরল না তো ! শনির দৃপুরের মড়া ।

নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না আঙুর। কুপির আড়াল পড়েছে। একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে ।

মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে । বাড়ুক । কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট—এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি ।

আবার কি বৃষ্টি এলো ? না, বৃষ্টি নয় । বৃষ্টি যেন আর না আসে, হে মা কালী ! কোনোগতিকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে দাও । চরণে পড়ি তোমার ।

প্রভুলাল খুশী। আঙুর হাত পাতলো। চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ—তেমনি, ঠিক তেমনি আরও দু খিলি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রুপোর দাঁত-খোঁটা কাঠিটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে-হেসে । আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল ।

টাকা আটটা আঁচলে বেঁধে নিল। আগের টাকাগুলোও। তারপর বাইরে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল । আঁট করে ।

আতা চামেলিদের ঘরে তখন আলো, হাসি, হুড়োহুড়ি, ঝুম্‌ঝম্‌ তালি, বেসুরো গান আর দিশী মদের গন্ধ ।

আঙুর তর তর করে দাওয়ায় নেমে গেল । তারপর বাইরে । সদর রাস্তায় । হাঁদুর দোকানে বিশু কি আছে এখনও !

বিশুদের নিয়ে ফিরল আঙুর । দরজা খুলে ঢুকল ।

পিছু পিছু বিশু ।

'কই মড়া কই ! আ, খুব বাহারে ধূপ্ জ্বালিয়েছিস তো, পট্‌লি ।' বিশু নাক টেনে গন্ধ নিল ধূপের ।

আঙুর লণ্ঠন জ্বালাল ।

বিশু তাকাল এদিকে, ওদিকে । 'মড়া কই ?'

আঙুর আঙুল দিয়ে চৌকির তলাটা দেখিয়ে দিল ।

বিশু মুখ নীচু করে দেখল । অবাক ও, চোখের পাতা পড়ল না ।

'ওর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কি করে ?'

আঙুর সে-কথার কোন জবাব দিল না ।

বিশু একটু অপেক্ষা করে সঙ্গীদের ডাকল । ডাকবার আগেই পেঁচো, বীরে, ঢুকে পড়েছে ।

বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ ।'

মড়া নিয়ে বিশুদের বেরুতে খুব একটা সময় লাগল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর

দাওয়ায় নামল।

আঙুর বলল, 'হরিবোল দিবি না?'

বিশু জবাব দিল, 'চল্, রাস্তায় গিয়ে দেবো। এখানে রসের হাটে হরিবোল দিলে শালাদের মেজাজ গণ্ডগোল হয়ে যাবে।'

বিশু, কেলো সামনে—পেঁচো আর বীরে পেছনে। মাদুরে জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁধা নন্দর ধড় বাঁশের ওপর চাপিয়ে চারটে লোক দাওয়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে ছায়া। আর আঙুর পিছন পিছন।

আতার ঘরে তখন বস্ত্রহরণ পালার হাসি-উল্লাসের ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানে এসে পৌঁছাতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল। কেলো গেল কাঠ আনতে, পেঁচো পাঁইট আনতে। কাছাকাছি সে-ব্যবস্থা আছে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য কেনা হাঁড়িটার পেছনে বোল তুলে।

আঙুর চুপ করে বসে থাকল এক পাশে।

বিশুর দলের বাহাদুরি বলতে হবে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলল। গঙ্গার জলে ধোয়ান হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ান হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।

পাঁকাটিতে আগুন ধরিয়ে বিশু আঙুরের দিকে এগিয়ে দিল। বললে, 'নে পট্‌লি, মুখে আগুনটা দিয়ে দে।'

আঙুর চমকে উঠল। নন্দর মুখে আগুন দেবে ও? কেন? নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? কিচ্ছু না। কেউ না নন্দ ওর।

আঙুর মাথা নাড়ল। 'আমি কেন দেবো। না—না, তোমরা কেউ দিয়ে দাও।'

'দিবি না তুই? নে কেলো, তুই-ই তবে দিয়ে দে শালার মুখে আগুন।'

কিন্তু কেলো ততক্ষণে একটু পাশে গিয়ে পাঁইটে মুখ দিয়েছে। পেঁচো বলল আঙুরকে, 'আহা দাও না তুমি। তোমার সঙ্গে তবু তো জানাশোনা ভাবসাব ছিল খানিকটা, আমরা তো সব-রাস্তার লোক।'

জানাশোনা, খানিকটা ভাবসাব? তা হ্যাঁ, তা ছিল বই কি? আঙুর সেটা অস্বীকার করতে পারে না। এত লোকের মধ্যে একমাত্র আঙুরই তবু নন্দকে চিনত, জানত। ওর সঙ্গে এক ঘরে থেকেছে, খেয়েছে, শুয়েছে। শখের স্বামী-স্ত্রী খেলা—তাও খেলেছে: শাঁখা-সিঁদুরও পরেছে।

পাঁকাটিটা জ্বলছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে পাঁকাটিগুলো। সেই আলোয় নন্দর শুকনো তোবড়ান, বাসী

ডিমের মতো সিদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন সব যন্ত্রণার শেষ ঘা খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সামলে রে পটলি, শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।' বিশু হাঁকল।

আঁচলটা সামলাতে গেল আঙুর। এক্ষুনি পাঁকাটির আগুন লেগে যেত।

কিন্তু শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে পাঁকাটির আগুনে যেন হঠাৎ কী দেখল আঙুর। দেখে নিথর হয়ে গেল! মনের মধ্যে কী যে অস্বস্তি জাগল! গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

নিজেকে বড় অশুচি অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সঙ্গে সে শুয়েছে। এখনো সেই ভাগাড়ে কুকুরটার—?—না, এইবস্ত্রে কারুর মুখে আগুন দেওয়া যায় না। নন্দ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে—কে জানে, তবে এই সংসার তো ছেড়ে চললই। এ-সময়ে আর খুঁত থাকে কেন?

পাঁকাটি কটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঙুর হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস আবার?' বিশু অবাক।

'আসছি। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।' আঙুর তরতরিয়ে ডাইনে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধাপ ভেঙে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়াল আঙুর। আকাশটা লাল। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু হু। গঙ্গার জল কালো। একটা শব্দ উঠছে স্রোতের। ঘাটে আছড়ে পড়ার।

জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ এই জল এই নিস্তব্ধতা যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল আঙুর। কেমন একটা পচা গন্ধ এসে নাকে লাগল আচমকা। নিশ্চয় কোনো গলা-পচা গোরু ছাগল কি মোষটোষ হবে, জলে ভেসে এসেছে। আধপোড়ান মানুষ-টানুষও হতে পারে।

বড় বিশ্রী গন্ধ। এদিক ওদিক চাইল আঙুর। নাক বন্ধ করল। একটু পরে আবার খুলল। আর ধক্ করে যে-বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগল সেই গন্ধটা বড় চেনা ঠেকল। হ্যাঁ, বিশুর গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আতা, বেদানামাসি, প্রভুলালের গায়ে। সর্বত্র।

আঙুরের চোখের সামনে সত্যিকারের গঙ্গা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে—?

মাথার মধ্যে একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল। জ্বলে উঠল সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো। অশুচি, কিসের অশুচি? গঙ্গাজল তার কোন্টা ধোবে—বস্ত্র না দেহ না মন! বেদানামাসি হিমুর গা অনেক ধুয়েছে গঙ্গা। কি দিয়েছে?

গঙ্গার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জ্বলন্ত পাঁকাটি ক'টা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।

আগুন ধরল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। এখানে আগুন, ওখানে আগুন। আ সাজিয়েছে বটে বিশুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে বেছে এনেছিল। চোখের পলকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আঙুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশুরা একটা পাইট শেষ করে আর একটা খুলল।

আকাশটা লাল। খুব লাল। বৃষ্টি না এসে পড়ে।

নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বীরে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।

আঙুর অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দাহ দেখছে।

আগুনের হল্‌কাটা হঠাৎ ধক করে বেড়ে উঠল। সমস্ত চিতাখানা টকটকে লাল। সে-দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। যেন মাতাল হয়ে গেছে।

বীরে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে—মট্ মট্। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!

আর আঙুরের কানে সেই শব্দগুলো লাগছে ভয়ানক ভাবে। ছটফট করছে আঙুর। যেন তার বুকের হাড়গুলো কেউ মট্ মট্ করে ভেঙে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে এক খাবলা কিছু নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই আগুনে।

আঙুর আর পারছিল না। অস্থির হয়ে উঠেছিল। কী যে অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। মোচড় দিয়ে উঠছে সারাটা বুক। কণ্ঠার কাছে টনটনে ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে।

আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদানামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল—সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নক্‌শা।

আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ আর ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।

আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতায় আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।

আঙুর ডুকরে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে। এই প্রথম। হঠাৎ, হঠাৎই। বর্শায়

খোঁচা খাওয়া একটা পশুর মতো সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে, থরথরিয়ে। তারপর গুমরে গুমরে। কাত্‌রে কাত্‌রে।

আঙুরের ইচ্ছে হচ্ছিল, ওই চিতার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দর আধপোড়া ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরে। মাথা খোঁড়ে।

আঙুর সত্যিই ছুটে যাচ্ছিল। বিশু খপ্‌ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'কি রে পট্‌লি মরবি নাকি ?'

না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।

বাসনা করতে নয়, আগেভাগে একটা আঁচ নিতে এসেছিল ওরা। খুব একটা ভরসা নিয়ে আসে নি। পাঁচজনের মুখে যা শোনা গিয়েছিল, তাতে ভরসা পাবার কথা নয়। এই বয়সে বউ মরলে এমনিই হয়; সব ব্যাপারেই ছাড়ো-ছাড়ো আড়াল-আড়াল ভাব। মন বসে না আর—সে সংসারেই হোক কি কাজকর্মে। নেশন, শখটখ আমোদ-আহ্লাদ তো পরের কথা।

ফটিক আঘোরী দু-দশটা কথার পর খুব সাবধানে, সসংকোচে আসল কথাটা তুললে। 'বাসনা তো খুবই ছিল গো ঠাকুরমশাই—ই বারে মায়ের থানে আসরটা দি।' ফটিক এমন একটা হতাশার সুর টানল যেন অত সাধ-বাসনার সবটাই বিফলে গেল।'

ফটিক আঘোরী আর তার দলবলের দিকে তাকিয়ে নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বললে, 'বাঁধছে কিসে তুমাদের?'

বাধছে আসল জায়গায়। মূর্তি না থাকলে যেমন পুজোয় বাধে, পিঁড়িতে বর না বসলে যেমন বিয়েতে—তেমনি। আসরটা তো ফটিক অঘোরীরা বসাবে, কিন্তু সে মরা-আসর জমাবে কে ছাই, যদি না নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য একটা যাত্রার পালা গায়। ফটিক আঘোরী বেশ গুছিয়ে কথাটা পুরোপুরি বলে ফেললে।

নীলকণ্ঠ মনে মনে অবাক হচ্ছিল। এই কথা, এর জন্যে আঘোরীর অত ইজল-বিজল কেন?

নীলকণ্ঠর গোল, ভরাট, তামাটে মুখের গোড়ায় বেশ একটু কৌতুক আর হাসির ছোঁয়া লাগল। ঈষৎ লালচে চোখ আর ধূসর মণি দুটো ফটিক আঘোরীর রোগা-সোগা মুখের উপর রেখে নীলকণ্ঠ বললে, 'আমি পালা গাইব না, এটা তুমি ঠাও-রালে কী করে হে আঘোরী?'

'আমি কিছু ঠাওরাই নাই ঠাকুরমশায়।' ফঠিক মাথা নেড়ে দু-হাত প্রায় করজোড়ের ভঙ্গিতে বুকের উপর তুলে ধরে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'ই ছোঁড়াদের বিশ্বাস আসছিল না।' সঙ্গীদের দেখিয়ে দিল ইশারায়, 'দোষ নাই উদেরও, যা শোকতাপ গেল আপনার, পালাটালা ফিরে আবার গাইবেন বিশ্বাস লাগে না। হ্যাঁ, তবে কি-না—'

নীলকণ্ঠ বাধা দিল ফটিকের কথায়। বললে, 'যতদিন গলা আছে, বুঝলে আঘোরী, পালা আমি গাইব; আর হাতে খাগের কলমটা যতদিন আছে, পালাও আমি লিখব

জেনে রাখ তুমি।'

ফটিক তাড়াতাড়ি আসল কথাটা শুধল, 'নতুন পালা কিছু লিখলেন নাকি ঠাকুরমশায় ?'

নীলকণ্ঠ মাথা নাড়লে। না লেখে নি।

ফটিক সুযোগটা হারাতে চায় না। মুখের হাসিটা আরও বিনীত করে বলল, 'যদি অন্তরের কথাটা শোনেন ঠাকুরমশায়, তবে বলি, আমাদের ইচ্ছাই ছিল এবার মার থানে একটা নতুন পালা জমাই, তাই ভে। এলাম আপনার কাছে।' অল্প একটু থামল ফটিক, নীলকণ্ঠের মনোভাবটা বোঝবার চেষ্টা করল ; তারপর বলল, 'তা বাসনাটা আমাদের পূর্ণ করেই দেন না হয় !'

নীলকণ্ঠ আধশোওয়া ভঙ্গিতে বসে ছিল। ফটিক আঘোরীর দেওয়া সিগারেটে টান দিতে দিতে চোখ দুটি একটুক্ষণের জন্যে বুজল। চোখ খুলে বলল, 'হবে গো আঘোরী, তোমাদের আসরের জন্যে নতুন পালা একটা লিখব। কাজকর্ম তো আজকাল ছেড়েই দিচ্ছি। বেটার ঘাড়ে চাপাইছি সব। সময় আছে হাতে। হবেখন।'

'তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই ?' ফটিক কথার জন্যে নীলকণ্ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, ফটিক নিশ্চিন্ত হতে পারে।

সঙ্গের দলবলের দিকে কৃতিত্বের একটা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে ফটিক উঠে দাঁড়াল, 'বায়নাটা তবে চটপট করেই যাব ঠাকুরমশায়।'

নীলকণ্ঠ ঘাড় নাড়ল। করে যেও বায়না ; যবে খুশি, যখন খুশি।'

ফটিক চলে যাওয়ার পর নীলকণ্ঠ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, তেমনি আধশোওয়ার ভঙ্গিতেই। পশ্চিমের জানলাটা খোলা। ঢেঁড়স আর কলাগাছের ঝোপটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। যদিও ডোবাটা দেখতে পাচ্ছিল না নীলকণ্ঠ, তবু ডোবার ওপারে ধুঁধুল গাছের একটু যেন চোখে পড়ছিল। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজে লতাপাতার একটা গন্ধ ঢুকছিল ঘরে। আর ময়না, চড়ুই, কাকের কিচিরমিচির।

নতুন একটা পালা লিখতে হবে। এবার কী পালা লেখা যায়, নীলকণ্ঠ শূন্যচোখে তাকিয়ে সেটা যেন ভাবছিল। এর আগে অন্তত আট-দশটা পালা লিখেছে। রামলক্ষ্মণের পালা থেকে শুরু করে সিংহল বিজয়ের পালা পর্যন্ত। দু-চারটে বেশ ভালই উতরে গেছে। সেইসব পালা শুধু ধুনুরি গ্রামে নীলকণ্ঠর কালী অপেরাই নয়, আশেপাশের অনেক গাঁয়ে অন্য দলও গেয়েছে। যেগুলো উৎরায়নি, নীলকণ্ঠ নিজেও আর সেগুলোর নামোচ্চারণ করে না। করতে লজ্জা পায় যত না, তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হয়। কেমন একটা আক্রোশে গরগর করে। নিজের উপরেই।

নিজের অক্ষমতা এবং ব্যর্থতার উপরেই যেন এই বিরক্তি, ঘৃণা।

নীলকণ্ঠ ভাবছিল, নতুন পালা কী নিয়ে লেখা যায়। একবার আচমকাই মনে হল, দক্ষযজ্ঞের ঘটনা নিয়ে লেখা যেতে পারে। সতীর দেহত্যাগ। বিষয়টা ভাল। নীলকণ্ঠ নিজেই মহাদেবের পাটটা করতে পারবে। আর এই সময়—সদ্য সদ্য নারায়ণীর মৃত্যুর পর—নীলকণ্ঠ বোধহয় দু-চারটে জায়গায় বেশ লিখতে পারবে, চুটিয়ে পাট করতেও হটবে না। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের অবস্থাটা মনে মনে কিছুক্ষণ কল্পনা করে নিল নীলকণ্ঠ। একটা দৃশ্যই যেন ছকে ফেলল। সতীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহাদেবের বিচলিত অবস্থা ; শোকের স্বগতোক্তি আর রোষ। দুটি ছত্র মুখেই এসে গিয়েছিল।

নীলকণ্ঠের মনের সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। অন্দরমহল থেকে সন্ধ্যে দেবার শাঁখ বেজে উঠেছে। বেজে বেজে থামল। নীলকণ্ঠ খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকল। দাওয়ার অন্ধকারে এখুনি একটু আলোর ছিটে পড়বে।

কুসুম তবে এসে গেছে। না হলে শাঁখ বাজাবে কে ? ললিত বাইরে। গাঁয়ে দু-ঘর আর ক্যাশিয়ারবাবুর বাসা, তিন ঘরে সত্যনারায়ণ পুজো সারতে হবে তাকে। বিকেল থাকতেই বেরিয়ে গেছে বৃষ্টিতেই। মাধু শ্বশুরবাড়ি। সেই যে তার মা-র শ্রাদ্ধর পর গেছে, দেড় মাসের মধ্যে আর এ-বাড়ি আসে নি। বলাইটা বাচ্চা, বছর আষ্টেক বয়েস ; এখনো হয়ত চট্টরাজের বাসায় খেলছে। তাছাড়া সে তো আর শাঁখ বাজাতে পারে না। কুসুমই এসেছে তাহলে। মাসখানেক ধরে ঘরে সন্ধ্যে দেওয়ার কাজটা সেই সেরে দিচ্ছে।

নীলকণ্ঠ দাওয়ার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। আলোর ছিটের আসায়। একটু আলো পড়ল। দাওয়া দিয়ে কুসুম হাত আড়াল দিয়ে প্রদীপ ধরে সদরে গেল, সদর থেকে রান্নাঘরে, এদিক-ওদিক। আবার অন্ধকার। অল্পক্ষণ পরে টিমটিমে একটা কুপি এনে কোথায় বুঝি ঝুলিয়ে দিল। দাওয়ার একটা এবড়ো-খেবড়ো জায়গা এক খাবলা ম্লান আলোয় টিমটিম করতে লাগল। নীলকণ্ঠের মনে হচ্ছিল, পিঠের কুঁজের মতো দাওয়ার ওখানটায় যেন কুঁজ গজিয়েছে।

গলায় কাশির শব্দ তুলে সাড়া দিল নীলকণ্ঠ। সাড়া না দিয়ে পারছিল না। ছোট লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে কুসুম এলো। চৌকাঠের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ শুধল, 'বলাইটা ফিরেছে নাকি ?'

মৃদু গলায় জবাব দিল কুসুম, 'হ্যাঁ ফিরেছে।' সরে যাবার মতন একটু নড়ে চড়ে উঠলেও কুসুম সরে গেল না। নীলকণ্ঠ আর কী বলে, যেন তা শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'পাক ঘরে আগুন-টাগুন আছে নাকি ? টুকুন চা খেতাম।'

কুসুম মাথা-ঘাড় আস্তে একটু নোয়াল। আগুন থাক না থাক, চা সে তৈরি করে দিচ্ছে।

কুসুম চলে গেল। নীলকণ্ঠ জ্বলন্ত লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে থাকল ক'পলক। কুসুমের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছিল। বেশ ডাগর-ডোগর মেয়েটা। সুশ্রী। খুঁত আছে একটু, অন্ধকারে ধরা পড়ে না। চিবুকের নীচ থেকে গলা বেয়ে কণ্ঠার কাছাকাছি পর্যন্ত মস্তবড় একটা দাগ। ডান দিকে। গলার মধ্যে ঘা হয়ে নাকি বিষিয়ে গিয়েছিল, কাটাকুটি সেলাই-ফোঁড়াই করতে হয়েছিল। তারই দাগ। কুসুম গায়ের কাপড়টা সব সময়ে গলার উপর দিয়ে টেনে দাগটা চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। পারে না। এই খুঁতের জন্যে বিয়েও হচ্ছে না মেয়েটার।

নীলকণ্ঠ বেশ ঠাওর করে দাগটা দেখাবার চেষ্টা করেছিল আজ, একটু আগেই; দেখতে পায় নি। অতটা দূরে আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই ভাল করে দেখা যায় না।

নীলকণ্ঠ খানিকটা চুপচাপ বসে থেকে একটা বিড়ি ধরাল। বলাইটা ফিরেছে খানিক আগেই, তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কুসুমের কাছে দাপাদাপি করছে ছোঁড়াটা।

পালা লেখার কথাটা আবার মনে এলো। কী যে লেখা যায়। দক্ষযজ্ঞের পালাটাই কি লিখবে নাকি?

চা নিয়ে এলো কুসুম। নীলকণ্ঠ আঠার বছরের এই সু-গড়ন মেয়েটাকে আরও একবার ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে।

'বুঝলে কুসুম, কাঁড়গাঁ থেকে ফটিক আঘোরীরা এসেছিল।' কুসুম চলে যেতে যেতে দাঁড়াল নীলকণ্ঠর কথায়। ফিরে তাকাল। নীলকণ্ঠ হাসি হাসি মুখে বললে, 'পালা গাইতে চায়। বলে একটা নতুন পালা লেখেন ঠাকুরমশায়।' নীলকণ্ঠ কথাটা যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল। ঈষৎ গর্বভরে।

কুসুম চৌকাঠের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এই দিকেই তাকিয়ে ছিল, নীচু মুখে। চুপচাপ। গালের আর গলার একটা পাশে খানিকটা অন্ধকার ভরাট হয়ে ছিল।

নীলকণ্ঠ আর কোন কথা বলছে না দেখে কুসুম আস্তে আস্তে চলে গেল।

চা খেতে খেতে নীলকণ্ঠ কুসুমের সরে যাওয়া লক্ষ করলে। পালা লেখার কথাটাও ভাবতে লাগল। দক্ষযজ্ঞের বিষয়টা একবার মনে হয়েছিল মাত্র, কিন্তু বিষয়টায় তেমন কোনো আকর্ষণ পাচ্ছিল না। বড় পুরনো, আর সেই এক সতী, সতী। কোন রস নেই। বউ মরল তো খ্যাপামি। না, নীলকণ্ঠর এ-সব ভাল লাগে না। মরণ—মরণ; তার জন্যে এত হই হই করার কী আছে! ধুলোয় গড়াগড়ি দেবার লুটোপুটি খাবার কী মানে!

না, নীলকণ্ঠর এ-সব পছন্দ নয়। এ-পৃথিবীতে যে-কদিন আছ, আনন্দ করে থাক। যার যেমন সামর্থ্য, তেমনি। সুখ পাওয়াটাই বড় কথা, শোকতাপ পাওয়াটা নয়।

তা যদি পেতে চাও, তবে ভিখিরি হও, ভদ্রলোক হওয়া কেন ? কেন এই জমিদারী আগলানো, সংসার পাতা, বাড়ি-বাড়ি চাল-কলা গামছার জন্যে হাঁটাহাঁটি !

নীলকণ্ঠ বোধহয় ব্যাপারটা ভাল করে বুঝেসুঝে সব ছেড়ে দিয়েছে। বৃত্তিটা পর্যন্ত। এই গাঁয়ের একমাত্র যাজক বলতে গেলে, পুজো-পার্বণ তো লেগেই ছিল। আজ শনি, কাল সত্যনারায়ণ, পরশু দুর্গা, তরশু কালী, বার মাসে তেরো কেন, তেইশ পার্বণ। উপবাসের পর উপবাস কর, দিন নেই রাত্রি নেই, বর্ষা-বাদল নেই। আজ এর উপনয়ন তো কাল ওর শ্রাদ্ধ, শুভ দিনের নির্ঘণ্ট খুঁজতে খুঁজতে চোখে ছানি পড়ার জোগাড়, পুজোর মন্ত্র পড়তে পড়তে ফুসফুসটা ফুটো হয়ে যাবার অবস্থা। ভাল লাগে নি আর। ভাল লাগত না মেটেই নীলকণ্ঠর। ছেলেটাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এখন তার হাতেই আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দিয়েছে। তা বছর বাইশ বয়েস হতে চলল ললিতের। বেশ কাজের ছেলে। ধর্মেকর্মে মতি আছে, হিসেবপত্তরেও। যজমানদের বাড়ি যায় যেমন, তেমনি জমি-জায়গা ফলন-টলনের সবটাই দেখাশোনা করে। নীলকণ্ঠ এ-সব ব্যাপার থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই।

বয়সটা যে যথেষ্ট, নীলকণ্ঠ নিজের দিকে তাকিয়ে তা কোনোদিনই মেনে নেয় না। বেঁচে থাকতে নারায়ণী যদি কখনো বয়সের কথা তুলে খোঁটা দিয়েছে, নীলকণ্ঠ ভীষণ চটে উঠত। বলত, 'বয়স আবার কী ? যতদিন শরীরে ক্ষুধা আছে, কাম আছে, ভোগের ক্ষমতা আছে, ততদিন মানুষ জোয়ান। যখন থাকবে না, তখন সে জরাগ্রস্ত, অক্ষম, অচল। আমার আবার বয়স কী ! নেহাত বামুনের ছেলে, গাঁয়ে গ্রামে মানুষ, তাই ফচকে বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বাইশ বছর বয়সে তো বেটার বাপ। শহর-টহরে আজকাল তিরিশ পঁয়ত্রিশের আগে বিয়ের কথাই কেউ ভাবে না। তবু তো ওই খড়কে-কাঠি স্বাস্থ্য ! আর আমার—?'

নীলকণ্ঠ স্ত্রীকে তার স্বাস্থ্যটা দেখাত। তা স্বাস্থ্যটা ওর বেশ ভালই। না বেঁটে, না লম্বা। মাঝারি। জলফুলো চেহারা নয়; গড়ন-পেটন মজবুত। মুখটা গোল, ছোট কপাল, লম্বা নাক, পাটি-সাজান দাঁত। শরীরের কোথাও এখনো টোল পড়ে নি।

শরীরকে নীলকণ্ঠ ভালবাসত, শরীরকে সে রাখবার চেষ্টা করত। কলা-আতপচালের ভক্ত ছিল না নীলকণ্ঠ ; মাংস মদটাও খেত, দিশী মদ। ধর্ম-পুজোর মাঠটার এক কোণে যে ইঁট-বার-করা ভাঙা নাটমন্দিরটা রয়েছে, সেখানে কালী অপেরার মহড়া হতো বছরে তিন কি চার মাস, কিন্তু বারমাসই নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্জি, মদন চট্টরাজ, কেষ্ট চক্রবর্তী আর দু-একজন মিলে আসরটা জমাত। ইঁটের ঠেকা দেওয়া তক্ত-পোশের উপর ধুলো-ভর্তি সতরঞ্চি বিছিয়ে দাবার সঙ্গে দিশী-টিশী চলত।

নীলকণ্ঠ পঁয়তাল্লিশে পোঁছেও পরিশ্রান্ত হয় নি কেন, এর জবাব সে দিতে

পারত। বলত, 'আমি তো গঙ্গাজল ঠোঁটে ঠেকানো বামুন নই, সোমরস পান করা বামুন। বুঝলে হে চট্টরাজ, এখনো বসলে একসের চালের ভাত খেতে পারি—একটা ছোটখাটো পাঁঠা। আর যদি বল বিয়ে-থা, কিরে কেটে বলছি রে চট্টরাজ, দুটো বউ তো হেসেখেলে সামলাতে পারি।'

নীলকণ্ঠ পারলেও নারায়ণী পারে নি। পনর বছর বয়স থেকে ছেলে বিয়োতে শুরু করেছিল। প্রথমটা বেঁচে গিয়েছিল কী ভাগ্যে। তারপর তো বছরে বছরে বিয়োন আর সেগুলো মরে। এরই মধ্যে মাধুটা রক্ষে পেল, এবং শেষ বলতে বলাইটা। বলাইয়ের পর নারায়ণীর আরও তিনটে মরেছে। নিজেও সে মরল বাচ্চা বিয়োতে গিয়েই। সেপ্টিক, তারপর ধনুষ্টঙ্কার।

নীলকণ্ঠ চা-টুকু অনেকক্ষণ আগেই শেষ করে কখন যেন বিড়ি ধরিয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। বলাইয়ের বিশ্রী একটা চিৎকারে চমকে উঠে নিজেকে ফিরে পেল। আ—ছাই, বাইরে যে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখন মুখ হাত ধুয়ে জামাটা চড়িয়ে ধর্মপুজোর মাঠে গিয়ে পৌঁছতে তো রাতই হয়ে যাবে।

নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যেতে তাকে হবেই। চট্টরাজদের কাছে আজ ফটিক আঘোরীদের কথাটা বলতে হবে। নতুন পালা লেখার কথা।

নীলকণ্ঠ এলোমেলো ভাবছিল, কী পালা লেখা যায়, কোন্ পালা। ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে এলো। গামছাটা তুলে নিল দড়ি থেকে। দাওয়ায় নেমে যাচ্ছিল হাত-মুখ ধুতে। হঠাৎ রান্নাঘরের কাছাকাছি আসতেই থমকে দাঁড়াল। উনুনটা কাঠ দিয়ে দিয়ে গনগনে করে জ্বালিয়ে নিয়েছে কুসুম। সেই আঁচের মুখোমুখি পিঁড়ি পেতে বসে রয়েছে। গায়ের কাপড়টা একটু আলগা। ওই তাপ যেন সহ্য করতে না পেরে শাড়ি-জামা সামান্য ঢিলেঢালা করেছে।

গামছাটা বুকের কাছে অন্যমনস্কভাবে চেপে ধরে নীলকণ্ঠ তাকিয়ে থাকল।

এমনি হয় মাঝে মাঝে। সব থাকে, তবু হয় না। নীলকণ্ঠর তেমনিই হচ্ছিল। পালা লেখার জন্যে গল্পের কি অভাব আছে! কাশীরাম আর কৃত্তিবাসের বড় ভক্ত নীলকণ্ঠ। উপাখ্যান তার মুখস্থ। ঋতুপর্ণ, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, যে-কোনো একটা আখ্যান নিলেই হয়। শুধু কাঠামোটা। প্রাণটা তো নীলকণ্ঠের হাতে। লাল খেরো-বাঁধানো খাতায় শরের অথবা পালকের কলমের টানে টানে নীলকণ্ঠ তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। সে ক্ষমতা তার আছে।

কিন্তু আশ্চর্য, কোনোটাই নীলকণ্ঠর মনোমত হয় না। কোনো উপাখ্যানই নয়। আজ হয়ত মনে মনে একটা পছন্দ করে, কাল ভাবতে বসে সেটা বাতিল করে দেয়। বিদুরকে নিয়ে একটা পালা প্রায় ছকে ফেলেছিল নীলকণ্ঠ, কিন্তু কি মনে করে আর লিখল না। না, অত ধর্মটর্ম-করা মানুষ নিয়ে তার চলবে না। মানুষটার কোনো তেজ নেই, বীর্য নেই, ক্রোধ নেই। যেন গাছ কিংবা পাথর। নীলকণ্ঠর

আবার এ-সব পছন্দ হয় না। কটা পালা লিখেছে আগে, এদের মতন মানুষ নিয়ে কিন্তু দেখাই গেছে, ভাল জমাতে পারে নি। তেমন কোনো প্রাণের টানই পায় না নীলকণ্ঠ এইসব সরল সাদামাটা মানুষের কথা লিখতে বসে।

নীলকণ্ঠ পছন্দর ধরনটা অন্যরকম। 'মন্দ যদি না থাকল তবে মানুষ কী হে' চট্টরাজ, রায়—এদের বোঝাত নীলকণ্ঠ, 'আমরা স্বর্গে থাকি না হে, মর্তে থাকি। এখানে মায়ে-মেয়েতে সতীন-মতন হয়, বাপে ছেলেতে লাঠালাঠি করে, ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা লড়ে—বুঝলে! উ সব যুধিষ্ঠির-টুধিষ্ঠির নয়, উরা কি মানুষ নাকি! হ্যাঁ লেখ দিকি একটা পালা দুর্যোধনকে লিয়ে, কি দুঃশাসনকে—জমে যাবে। কেনে, আমি যে কৈকেয়ী পালাটা লিখেছিলাম গো, দেখলে তো কতবার গাইলাম পালাটা।'

মুশকিল এই যে, নীলকণ্ঠর পছন্দমতন চরিত্র কি আখ্যান যা ছিল আগেই ফুরিয়েছে। এখন আব নতুন করে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ ফটিক আঘোরীরা সময় মতন বায়না করে গেছে। নীলকণ্ঠ টাকাটা নিয়েছে কাগজে সইও দিয়েছে। ফটিক আঘোরীকে এ-কথাটা বলতে পারে নি নীলকণ্ঠ যে, তার মাথায় আর নতুন পালা আসছে না। বলা মানে তো নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া। আঘোরীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, নীলকণ্ঠর ক্ষমতা সত্যিই গেছে।

নীলকণ্ঠ তা পাবে না। ভাবতেও তার আপত্তি। এটা নিছকই ভাগ্য যে, বামুনের ঘবে জন্ম নিয়েছিল নীলকণ্ঠ, তার সাত পুরুষের বৃত্তিটাই ছিল যাজকের, গামছায় শালগ্রাম বেঁধে ঘরে ঘরে ঘণ্টা নাড়াতে আর চাল কলার সিধে আনতে যাওয়া। নয়ত আসলে ও অন্য মানুষ। স্বভাবে খানিকটা নাস্তিক, খানিকটা অবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী, সুখ আর ভোগের প্রত্যাশী। আর মনে মনে মানুষটা শিল্পী। শিল্পী ছাড়া কী-ই বা হতে পারে। কৈশোর থেকে যাত্রাগানে তার মন মজে গিয়েছিল। তখন থেকেই গাঁয়ের যাত্রায় পার্টটার্ট করত। তারপর দিনে দিনে এটা তাব নেশা হয়ে দাঁড়াল। সাংঘাতিক নেশা। নিজের একটা দলই গড়ে ফেলল নীলকণ্ঠ—'কালী অপেরা'। এ কালী মা-কালী নয়, কালীপদ ঘাঁটি। টাকা দিয়েছিল প্রথমটায় যাত্রার দল গড়তে, তাই তার নামে নাম।

নীলকণ্ঠ দল গড়েছে, দল বজায় রেখেছে ; কাছাকাছি শুধু নয়, দূর দূব গ্রামে পাল্লা দিয়ে সুনাম লুঠে নিয়ে এসেছে। পালাও লিখেছে নতুন নতুন। একটা পালা তো চিৎপুরের তরুণ অপেবা কিনে নিল। সেটার ছাপা বই পাওয়া যায় কলকাতায়। পাঁজিতে তার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

এ-হেন নীলকণ্ঠ আজ আর নতুন পালা লেখার বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না। মনে মনে যাও বা একটা বাছে, কিছুক্ষণ পরেই সেটা মনে হয় পুরনো, অচল। খুঁত-খুঁত করে মন। নীলকণ্ঠ বাতিল করে দেয়।

ফটিক আঘোরীর কাছ থেকে বায়না নেবার পর বিশটা দিন কেটে গেল, নীলকণ্ঠ কিছু ঠিক করতে পারল না, একটা লাইনও লিখতে পারল না।

ছটফট করছিল নীলকণ্ঠ। মনে মনে ভীষণ একটা অস্বস্তি আর অক্ষমতার রোষে পুড়ছিল। সময় তো আর বেশী নেই। পালা লিখতে হবে, মহড়া বসাতে হবে, দরকার হলে নাচের মাস্টারকে দিয়ে ছোঁড়াগুলোকে আরও নতুন নতুন নাচ শিখাতে হবে। নীলকণ্ঠ তার ঘরে সারাদিন বসে বসে কাশীরাম দাসের মহাভারতটার পাতা উল্টে যায়। মাঝে মাঝে কোনো একটা পাতায় চোখ রেখে অনেকক্ষণ বসে থাকে। তারপর বইটা বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, জানলা দিয়ে ঢেঁড়স আব কলাগাছের ঝোপটার দিকে চেয়ে থাকে।

চট্টরাজ সেদিন শুধল, 'কী হে, ভট্চায্যি লিখলে নাকি কিছু ?'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠর মুখেব দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে চট্টরাজ বললে, 'হল কী তুমার, অ্যাঁ—!' একটু থেমে আবাব বললে, 'পরিবারটা মরে তুমাব মাথাটাই গণ্ড-গোল হয়ে গেল যে হে ! এটা ছাড়লে, সেটা ছাড়লে—পালা লেখাটাও ছাড়লে তুমি !'

নীলকণ্ঠ কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বন্ধুর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থেকে শেষে অবশিষ্ট তাড়িটুকু এক চুমুকে গলায় ঢেলে নিল।

পবের দিন নীলকণ্ঠ ভীষণ একটা গোঁ নিয়ে সকাল থেকেই নতুন একটা খাতা খুলে বসেছিল। সস্তা একটা কাঠের ডেস্ক। শবের আর পালকেব কলম। এক দোয়াত কালি, কাশীরাম দাসের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের রামায়ণটা পাশে। এক বাণ্ডিল বিড়ি। দেশলাই।

সকালটা কেটে গেল। একটা অক্ষরও লিখতে পারল না নীলকণ্ঠ। দুপুরে স্নান-খাওয়া করে আবার বসল। নতুন এক বাণ্ডিল বিড়ি আব এক কৌটো পান নিয়ে। পানের সঙ্গে বিড়ির ধোঁয়া এমন একটা আচ্ছন্ন তন্দ্রা আনল যে, নীলকণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল শেষ হতে চলেছে। ডোবার ওপারেব ধুঁধুল-ঝোপে ফুরনো বিকেলের ম্লান একটু আলো। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে নীলকণ্ঠ ডেস্কের দিকে তাকাল। খেরোয় বাঁধানো খাতাটাও তেমনি পড়ে আছে। রামায়ণ মহাভারতটাও পাশাপাশি সাজানো।

মুখেচোখে জল দেবার জন্য খড়মটা পায়ে লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো নীলকণ্ঠ। পুবদিকেব দাওয়ায় দড়ির খাটিয়াটায় ললিত বসে আছে। খুব অন্যমনস্ক। খেয়াল নেই কিছু। নয়ত নীলকণ্ঠর খড়মের শব্দে চোখ ফিরিয়ে তাকাত অন্তত একবার। বলাইটা এক বাটি মুড়ি নিয়ে সদরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে ছড়া

কাটছে।

নীলকণ্ঠের খড়মের শব্দ তুলে মুখ-হাত ধোবার জায়গাটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। মুখ-চোখে জল দিতে গিয়ে যেন চোখে পড়ল হঠাৎ। তাকাল নীলকণ্ঠ। গোয়ালঘরের পাশটায় দোপাটি আর মোরগফুলের ঝোপটার কাছে কুসুম। এই অসময়ে কেন? মুখটাও দেখা যাচ্ছিল না কুসুমের। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে শশাগাছের মাচাটা যেন ঠিক করছে। অথচ ও-মাচা ঠিক করার কিছুই নেই।

নীলকণ্ঠ উঠে পড়ল। ঘরের দিকে এগুতে গিয়ে একবার একটু দাঁড়িয়ে ললিতের দিকে তাকাল। না, এখন আর বেঘোরে নেই ছেলেটা। বাপের দিকেই তাকিয়ে আছে।

কী ভেবে নীলকণ্ঠ ছেলেকে কাছে ডাকল। সামনে এসে দাঁড়াল ললিত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলের মুখটা দেখল নীলকণ্ঠ। কেমন যেন বোকা-বোকা নিরীহ ভাল-মানুষ গোছের মুখ। গোলগাল। নীলকণ্ঠের হাসি পায়। পুরুত-বংশের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর মুখই বটে। অর্থহীন, দুর্বোধ্য কতকগুলো মন্ত্র আউড়ে যেতে ওর কোথাও বাধবে না। ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতন একটু যেন রসিকতা করে বসল নীলকণ্ঠ, 'কী হে বাপ, আজ ঘণ্টা নাড়াতে যাবে নাই কুথাও?'

মাথা নাড়ল ললিত। হ্যাঁ, যাবে। লক্ষ্মীপুজো আছে সিংহীদের বাড়িতে।

ঠিক, ঠিক। আজ লক্ষ্মীবার। নীলকণ্ঠ ভুলেই গিয়েছিল।

'আর উটার কী হল? আলটার? হারু গোমস্তার কাছে গিয়েছিলে নাকি?'

ললিত এবার মাথা নাড়ল। গিয়েছিল গোমস্তার কাছে। মিটমাট হয়ে গেছে সব।

'বেশ, বেশ।' ছেলেকে বাহবা দেবার মতো ক'রে শব্দটা উচ্চারণ করলে নীলকণ্ঠ। একটু থেমে বললে, 'রাতে একবার আমার কাছে এস হে, কথা আছে কটা।'

নীলকণ্ঠ আর দাঁড়াল না। খড়মের শব্দ তুলে নিজের ঘর চলে গেল।

ঘরে এসে আবার চুপচাপ। কটা বিড়ি পর পর শেষ করল নীলকণ্ঠ। খেরোয় বাঁধান খাতার সাদা পাতাগুলো অনর্থক উল্টে গেল। নামল তক্তপোশ থেকে। পায়চারি করল ক'বার। জানলায় এসে দাঁড়াল। ডোবার কালো জলের একপাশে একটা হাঁস এখনো খাবার খুঁটছে। ডাবগাছের লম্বা ছায়া ডোবা ডিঙিয়ে কোথায় যেন অন্ধকারে মিশে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল। শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নীলকণ্ঠ নিজের অস্থিরতা নিজেই বুঝতে পারছিল। মনের মধ্যে অনেককাল পরে সেই বিশ্রী চাঞ্চল্য আবার এসেছে। আবার সেই তুষের জ্বলন। একটা কথা যেন ভয়ংকর অন্ধকার থেকে খানিকটা মুখ বার করে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছে। ছটফট করছিল নীলকণ্ঠ। কপালে একটু একটু ঘাম জমছিল। নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিল মাঝে মাঝে।

সন্ধ্যা দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে রোজকার মতন আজও লণ্ঠন রাখতে কুসুম ঘরে

এলো।

নীলকণ্ঠ বললে, 'একটু জল খাওয়াও তো।'

জল দিয়ে গেল কুসুম। নীলকণ্ঠ যে কী ভীষণ তৃষ্ণার্ত ছিল, জলের ঘটিটা শেষ করে তা যেন বুঝতে পারল।

লণ্ঠনটা ডেস্কের উপর চাপিয়ে হঠাৎ খেরোয়-বাঁধানো খাতাটা খুলে ফেলল নীলকণ্ঠ। সাদা পাতাগুলো যদিও সাদা—নীরব ছিল, তবু নীলকণ্ঠ এখন যেন ওই সাদা পাতার মধ্যে অনেক অনেক কালো রেখা দেখতে পাচ্ছিল। অজস্র কথা।

চমকে উঠল নীলকণ্ঠ। হাতটা সরিয়ে নিল খাতা থেকে। ঘরের চারপাশে তাকাল। না, কেউ নেই। লণ্ঠনের শিষটা আরও খানিক বাড়িয়ে দিল।

নীলকণ্ঠ মনে মনে সত্যিই তবে নতুন একটা পালা তৈরি করে ফেলেছে, এতদিন চুপচাপ থাকে নি। অবশ্য পালাটা শেষ হয় নি, অর্ধেকও নয়, তবু অনেকটাই হয়েছে।

নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছিল না নীলকণ্ঠ। কিন্তু অনুভব করতে পারছিল, পঁয়তাল্লিশ বছরের কঠিন তামাটে মুখটা এখন আঁচে ঝলসে যাচ্ছে। নিশ্বাস তপ্ত। চোখের মধ্যে সাংঘাতিক জ্বালা, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। অসহ্য। নীলকণ্ঠ ঘামছিল দরদর করে।

সাড়াশব্দ নয়, কিন্তু নীলকণ্ঠ বুঝতে পারল। পাথরের গেলাসে চা নিয়ে কুসুম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দৃষ্টিটা স্বচ্ছ নয়, একটু ঘোলাটে, খানিকটা হয়ত বিকারের রোগীর মতন। লণ্ঠনের শিষটা আচমকা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ কুসুমকে দেখতে লাগল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কুসুম। ভয় না, শুধু অবাক চোখেই সে তাকিয়ে ছিল। চায়ের গেলাসটা হাতে ধরেই।

লণ্ঠনের বাড়ান পলতের শিষ উঠে কাঁচটা কালো হয়ে এলো। ঝাপসা আব অন্ধকার দেখাচ্ছিল কুসুমের গোটা শরীরটাই। নীলকণ্ঠ চোখের দৃষ্টিকে হয়ত আরও তীক্ষ্ন, আরও উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করল। পারল না। তার আগেই শিষের কালোয়-কালোয় লণ্ঠনের সমস্ত কাঁচটা ভরে গেছে। চিড় খাওয়ার শব্দ করে কাঁচটা ফেটে গেল।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ফিরে পেল নীলকণ্ঠ। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের শিষটা কমাতে গেল। বেকায়দায় হাত লেগে লণ্ঠন ডেস্ক থেকে উল্টে তক্তপোশে পড়ল। নিভে গেল কয়েকটা লিকলিকে বাঁকা বাঁকা ফণা তুলে।

অন্ধকারে কুসুমকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

নতুন করে বাতি জ্বালিয়ে সত্যি সত্যি নীলকণ্ঠ এতদিন পরে আজ আবার লিখতে

বসে গেল। কী সহজে এবং অক্লেশে এখন কথাগুলো মনে হল। এতদিন কোথায় ছিল এই কথা, কোন্ অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল।

আবার ছত্র করে লেখে নীলকণ্ঠ আর থেমে গিয়ে আবেগ-কাঁপা গলায় জোরে জোরে পড়ে। যেন অভিনয় করছে। গলার পর্দা কোথাও জোরে কোথাও আস্তে করে; কোথাও ব্যাকুলতা, কোথাও মিনতির সুর ফুটিয়ে পড়ে যায়।

খেয়াল ছিল না নীলকণ্ঠর, রাত হয়ে গেছে। ললিত এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে, বাবার মুখোমুখি। নীলকণ্ঠ তন্ময়। কিছু দেখে নি, কাউকে নয়। দীর্ঘ একটা অংশ লিখে মুখ তুলল। সেই তন্ময়তার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে পড়ে যেতে লাগল সদ্য-লেখা অংশটা।

নীলকণ্ঠর স্বরে অদ্ভুত এক বেদনা এবং বিষণ্ণতা আর ব্যাকুলতা। কী কাতর কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছিল না, এটা নাটকের অভিনয়। বুক থেকে প্রত্যেকটি কথা যেন স্বাভাবিক-ভাবেই বেরিয়ে আসছিল। শাপগ্রস্ত জরাভীত, ভোগী এক পুরুষ কাতরকণ্ঠে যৌবন ভিক্ষা করছে। আমি সুখের অভিলাষী, আমি ভোগের ভিক্ষুক, আমি বিলাসে ক্লান্ত হই নি, আমার দেহ এই অকালে শ্লথচর্ম, লোল হয়ে যাবে—; না, না—এ আমি সহ্য করতে পারব না। এখনো যে আমার ভোগ্য ধেনু আছে, সুরা আছে, ফল আছে, পুষ্প আছে, নারী আছে, শত সহস্র মুখ আছে এই বসুন্ধরায়। তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করো না। 'তৃপ্ত নহি, ক্লান্ত নহি—; আসঙ্গ জ্বালায় জ্বলে এ-দেহ নিয়ত। প্রার্থনা আমার পুত্র পূর্ণ কর তুমি। আমি যে তোমার পিতা, নৃপতি যযাতি— !'

নীলকণ্ঠ নয়, রাজা যযাতি যেন পুত্র পুরুর কাছে করজোড়ে ভিক্ষুকের মতন অশ্রু-সজল কণ্ঠে ভীষণ একটা আবেদন জানিয়ে কাতর প্রত্যাশী চোখে চেয়ে থাকল।

ললিত কথা বলতে পারছিল না। বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল তার। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় যযাতিকে সে চিনতে পারল সহজেই।

'বাবা—' ললিত আচমকা ডাকল।

চমকে উঠল নীলকণ্ঠ। ললিত সামনে দাঁড়িয়ে। একেবারে মুখের কাছটিতে। আর কেউ নেই। লণ্ঠনের একটু আলো—আর পিতা পুত্র।

নীলকণ্ঠ যেন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিল। পারছিল না।

ললিত খুব মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বললে, 'মেয়েছেলে বাসায় না থাকায় বড় অসুবিধা ঘটছে। একটা বিয়া করুন আপনি। কুসুমকেই করুন। ভাল মেয়ে।'

ললিত আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নীলকণ্ঠ চুপ। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে ললিতকে একবার ডাকে। ডাকতে পারছিল না। লণ্ঠনের শিখাটা যযাতির চোখের মতন জ্বলছে।।

শূন্য

কার কথা দিয়ে শুরু করব বুঝে উঠতে পারছি না। মৈত্রসাহেবের কথা দিয়ে আরম্ভ করতে পারলে ভাল হত কিন্তু তাতে অনেকখানি পথ পিছু ফেলে যেতে হয়। ঘুরেফিরে এই পথটুকুর কথা আসবেই। মৈত্রসাহেবের কাছে আমি কেন গিয়েছিলাম, আমি কি চেয়েছিলাম তাঁর কাছে, কিসের যন্ত্রণা আমায় কলকাতা থেকে তাঁর কাছে মধ্যপ্রদেশের সেই পাহাড়ী শহরে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এ-সব কথা তো উঠবেই। কাজেই নিজের কথা দিয়ে শুরু করাই ভাল।

আমার নাম নিশীথ। এখন বয়স পঁয়ত্রিশ। কলকাতায় থাকি। বাড়িতে মা আছেন। বাবা মারা গেছেন অনেককাল। সহোদর এক বোন ছিল। বিয়ে হয়েছিল; ঠিক জানি না কি কারণে স্বামীর সঙ্গে তার বনে নি। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কটা সে ত্যাগ করেছিল। তারপর আমাদেরও। আত্মীয় স্বজন বলতে আর আছেন আমার কাকা। তিনি আলাদাভাবে থাকেন, অন্য বাড়িতে। আমাদের কাছে আসেন যান। আমাদের জন্যে তাঁর স্নেহ আছে কিন্তু কোন আতিশয্য নেই। মৈত্রসাহেব কাকার বন্ধু। কাকার কথা মতনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

মৈত্রসাহেবের কাছে আমি কেন গিয়েছিলাম তা বলতে হলে আগের ক'টা কথা বলা দরকার। অবশ্য এ-কথা বলে রাখা ভাল, মৈত্রসাহেব ডাক্তার আর আমি রুগী, আমি গিয়েছিলাম নিজেকে দেখাতে, আমার রোগের কথা বলতে।

আমার মনে হয় না, যে-ব্যাধিতে আমি ভুগেছি সেটা নতুন কিছু। এমন নয় যে এ-রোগ আর কারুর হয় না। বরং আমার মনে হয়েছে, মানুষ মাত্রেরই, বিশেষ করে আমার মতন যাদের কপাল তাদের পক্ষে এ-রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই।

ত্রিশ বছর যখন বয়স তখন থেকেই রোগটা দেখা দেয়। তার আগে মাঝে মাঝে উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সে সব আমি তেমন বুঝি নি, বোঝার মতন আগ্রহও হয়ত ছিল না। ত্রিশ বছর বয়সে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, জীবনে এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে যা ভুলে যাওয়া দরকার। এই ঘটনাগুলো এক-একটা স্পর্শনীয় বস্তু নয়, এগুলো এমন নয় যে, নোঙরা বিশ্রী কিছু তোমার চোখের সামনে পড়ে আছে, হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে বা ফেলে দিলে—আর তারপর তোমার চোখের সামনে অস্বস্তিকর কিছু থাকবে না। জীবনের ধরনটা আলাদা, মনটাও অন্য-রকম কিছু। আমরা তো অনেক কিছু ভুলে যাই, ত্রিশ বছরের এই জীবনের সব

কথা, সমস্ত কথা, প্রতিদিনের কথাই কি আমার মনে আছে ? না, নেই। তার কোটি কথার বড় জোর দশটা কি বিশটা কথা আমার মনে আছে, বাকি সব কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে। আমি জানি না, হাজার চেষ্টা করেও মনে করতে পারব না। হ্যাঁ, আমরা ভুলি—জীবনের অজস্র কথা ভুলে যাই। কিন্তু সেই সব অজস্র কথা তেমন নয় যেগুলো মনে রাখার মতন। এরা মনে আঁচড় কাটতে পারে না, পারলেও তা এত সামান্য, এত ক্ষণিক যে একটি কি দুটি দিনের বেশি তার আয়ু নেই। অথচ যে-সব কথা, যে-সব ঘটনা মনে আঁচড় কেটে গেছে গভীরভাবে তা ভোলা যায় না ; কিছুতেই না। (যদি ভোলা যেত !)

ত্রিশ বছর বয়সে আমার মনে হয়েছিল, জয়ন্তীর কথা আমায় ভুলে যেতেই হবে। না ভোলার কি আছে, জয়ন্তী সুন্দরী নয়, সে অসাধারণ কোন মেয়ে নয়, তার এমন কোন গুণ নেই যা আর কোথাও আর কখনো দেখা যাবে না। জয়ন্তীকে আমি ভোলবার চেষ্টা করেছি। আশ্চর্য, যত ভোলবার জন্যে ছটফট করেছি তত বেশি করে তাকে মনে পড়েছে। এক এক সময় মনে হত ও আমার মনের মধ্যে ভূতের মতন সারাদিন সারারাত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কত সুন্দর সকাল, দুপুর আর নিরিবিলি ঘুমের রাত—আমি সুখী মনে নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারতাম কত আরাম আর আয়েশ করে—কিন্তু পারি নি। পারি নি জয়ন্তীর জন্যে। তার কথা কোন্ সূত্রে কি ভাবে যে মনে এসে গেছে ! আর জয়ন্তীর কথা মনে পড়ার অর্থই হল—নিজের জীবনের পাঁচটা বছরকে তন্ন তন্ন করে দেখা। অসংখ্য টুকরো টুকরো দৃশ্যকে নতুন করে চোখের সামনে টেনে আনা, অজস্র কথাকে কানের কাছে আবার করে বলানো, নিজের মনে বলা কথাগুলো আবার করে বলা। আর শেষ পর্যন্ত এটা জেনে নেওয়া, মানুষ সৎ নয়, ভালবাসা কিছু না। হৃদয় এমন বস্তু যেখানে শিকড় গেড়ে কিছু বসে না। খুব সুন্দর নক্‌শা করা আয়না বৈ হৃদয় আর কি !

এ-কথা বলার দরকার করে না, জয়ন্তীর কথা ভাবতে আমার কষ্ট হত ! কষ্ট হত বলেই তাকে আমি ভুলতে চাইতুম—কিন্তু পারতুম না।

মা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন, পুরুষ মানুষের পক্ষে এ-সব ছোটখাটো ব্যাপারে ভেঙে পড়া ভাল নয়। ও-সব কিছু না, যত প্রশ্রয় দেবে তত বাড়বে। একটা সামান্য জিনিস ভুলে যাওয়া এমন কি কঠিন ! বিশেষ করে যখন সেই কথাটা ভেবে ভেবে শরীর মন খারাপ হতে বসেছে।

ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ, ছোটখাটো কি না আমি জানি না। হয়ত মা যা বলেছিলেন তাই ঠিক। কোন মেয়েকে পাঁচ বছর ধরে ভালবাসাটা এমন কিছু নয়, খুবই সামান্য জিনিস। একটা মনোহারী কুকুর কি বেড়াল পোষা। তুলোট গায়ে হাত বুলনো। আর সেই আরামে খুশী হওয়া। আমি এই তুচ্ছ বিষয়টাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। বড় করে তুলছি। হয়ত সবই ঠিক—কিন্তু তবু আমি জয়ন্তীকে ভুলতে পারি নি,

পারতুম না।

বছরখানেক পরে আমি বিয়ে করলাম। মা-র তাগিদ ছিল, কাকারও সেই রকম ইচ্ছে ছিল। আর আমার তরফ থেকে জয়ন্তীকে আমি বোধহয় এইভাবেই ভুলতে চেয়েছিলাম। (মানুষ ভালবাসাও ভুলতে চায় !)

লতিকা সুন্দরী ছিল। নিজের স্ত্রী বলে অতিশয়োক্তি করছি না, বাস্তবিকই অসাধারণ সুন্দরী ছিল লতিকা। তার রূপে আগুনের আঁচ ছিল। হয়ত তাই শেষ পর্যন্ত আগুনও জ্বলেছিল। কিন্তু সে-কথা পরে। লতিকাকে বিয়ে করে আনার পর আমার মনে হয়েছিল জয়ন্তীকে আমি ভুলতে পারব। জলজ্যান্ত স্ত্রীর এত রূপ, এই দাহ, এই তীব্র উত্তেজনার কাছে—পাঁচ বছরের হাতধরাধরি ভালবাসার ছবিটা নিশ্চয়ই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের পর মাসখানেক আমি লতিকার ছায়াকে আমার ছায়া থেকে সরে থাকতে দিই নি।

তবু জয়ন্তীকে ভুলতে পারলুম না। বরং লতিকার পাশে শুয়ে জয়ন্তীকে আরো বেশী করে মনে পড়ত। কেন পড়ত জানি না। লতিকার কিছু অগোচরে ছিল না। সে জানত। আমার সব কথা লতিকা জেনেছিল, কিন্ত আমিই তার কথা জানতুম না। পরে জানলুম।

পাঁজি পুঁথিতে আমার বিশ্বাস কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সটা আমার যে-ভাবে গেছে তাতে মনে হয়, সবরকম দুষ্টগ্রহ এই সময়টায় আমার দিকে শকুনিচোখে তাকিয়েছিল। যেন দেখছিল আমার কি হয়, আমি কি করি। আমি কিছুই করি নি। চুপচাপ শুধু দেখছিলুম। নীরব দর্শকের ভূমিকা। জীবনের আর একটা ভূমিকা। সকলকেই এ-ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। না করে উপায় কি ! মাত্র পাঁচটা মাস বেঁচে থেকে ছেলেটা মরে গেল। খুব সুন্দর দেখতে হয়েছিল খোকা। লতিকার মতন গায়ের রঙ পেয়েছিল, তারই মতন ঠোঁট গাল, আর আমার মতন চোখ নাক চুল। খোকা এক শীতের সকালে মরে গেল। আশ্চর্য ! কি সহজেই মানুষ মরে যায় ! আর তারপর এক বর্ষার শুরুতে লতিকা পালিয়ে গেল। লতিকার কথা আমি জানতুম না, আমার কথা লতিকা জানত। আমি জানতুম না লতিকার পছন্দকরা এক মানুষ আছে, যে মানুষ চমৎকার 'রাইড' করতে পারে, রাইফেল চালাতে পারে। এই মানুষটি আগে থাকতেই ছিল। মাঝে পড়ে বিয়েটা আমাব সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল। এটা একটা ভুল। অনেক মারাত্মক ভুল জীবনে হয়, বুঝে না-বুঝে। লতিকা তার মামাব ভুলটা এইবার শুধরে নিল বোধহয়। লতিকা পালিয়ে যাবার পর আমার মনে হয়েছে ছেলেটা কার ছিল ? অ মারই তো ! যারই হোক, সে-কথার আজ আর দরকার নেই। সেই শিশু তো কবেই নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে খুব ভালবেসেছিলুম, পাঁচ মাসের ওই শিশুকে। খোকাকে আমার খুব ভাল লাগত।

কিন্তু তাতে কি ! জয়ন্তী তার বাইশ বছরের জীবন আর মন দিয়ে বুঝতে পারে নি আমি তাকে কত ভালবাসতুম, পাঁচ মাসের শিশু কি করে বুঝবে ! ওরা সব একে একে সরে যাচ্ছিল—জয়ন্তী, খোকা, লতিকা । শেষ পর্যন্ত আভা—আমার বোন আভা সেও । আভা আত্মহত্যা করল । কেন করল আমি জানি না । স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনা না হলেও আমাদের বাড়িতে অন্তত কোন কষ্ট হয় নি ; কোন অসুবিধে ছিল না । তবু সে আত্মহত্যা করল । তার মনের কথা আমি জানি না, তার দুঃখ আমার বোঝার বাইরে । আত্মহত্যা কী ভীষণ ! আভার আফিং খেয়ে মরার সেই চেহারা আমি ভুলতে পারি না ।

অথচ এ সবই আমি ভুলতে চাইছিলুম—। ভুলতে চাইছিলুম জয়ন্তীকে, খোকাকে, লতিকাকে, আভাকে । ভুলতে পারছিলুম না । আমার মন যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিল । শরীরও । মা প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছিলেন । তছনছ হয়ে যাওয়া এই সংসারটা আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না । বিশেষ করে আমার জন্যে, যখন আর কেউ নেই তাঁর এক আমি—তখন আমার জন্যে, তাঁর ছেলের জন্যে মা যে কী অসহ উদ্বেগ আর আশংকায় এবং দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন তা অনুমান করা কঠিন নয় ।

আমি চেষ্টা করেছিলুম এ-সব ভুলে যেতে । জানতুম না কি করে ভুলে যাওয়া যায় ! বন্ধু যোগাড় করে মদ খেয়েছি, রেসের মাঠে গিয়েছি, কখনো সখনো বেশ্যা-বাড়িতে । এ-সব জিনিস এমন কিছু নয় যাতে ভালবাসার কথা ভোলা যায়, পালিয়ে যাওয়া সুন্দরী বউয়ের কথা ভোলা যায়, ভোলা যায় একটি সুন্দর সন্তানেব কথা, বেচারী আভার সেই আফিং খেয়ে মরা মুখটা । আমি অন্তত ভুলতে পারি নি । আমার কোনো লাভ হয় নি । বরং লোকসানই হয়েছে । মদে, রেসে, বেশ্যা-বাড়িতে—কিছু টাকা গেছে, পৈত্রিক অর্থ । আর শেষে এই সূত্রে আলাপ হওয়া এক বন্ধু নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে যে হাজার আস্টেক টাকা দিয়েছিলুম ফাটকাবাজি করতে—তাও জলে গেল । ও আমার সঙ্গে জোচ্চুরী করল ।

সব ছেড়ে দিয়ে এবার ঘরকে আশ্রয় করলুম । কিন্তু কই, এই ঘরও তো আমার জীবনের ক'টা বছরকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে পারল না । মা-র ইচ্ছে ছিল আমি পুজো আর্চা করি । এতে নাকি মন ভাল হয়, মানুষ দুঃখ কষ্টকে ভুলতে পারে । কিছুদিন আমি সে চেষ্টাও করেছি । পট সামনে রেখে মূর্তি ধ্যান কববার জন্যে চোখ বন্ধ করে বসেছি—ঘরে অনেক সুগন্ধি ধূপ জেবলেছি, ধুনো দিয়েছি । কিন্তু পটের আড়াল থেকে জয়ন্তী আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত, ধুনোর ধোঁয়ায় রেখাগুলো উড়ে উড়ে খোকার অস্পষ্ট একটি অবয়ব তৈরি করত, লতিকা আমার মনের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াত, দেখতে পেতাম আভাকে, তার কথা শুনতে পেতাম ।

ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস ছিল না, মঠে মাঠে আস্থা ছিল না—তবু ক'টা দিন মা-র কথায় একটা অর্থহীন ক্রিয়া করা গেল। শেষে ছেড়ে দিলাম।

শরীর আমার আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। খুব খারাপ। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলেই সেটা বুঝতে পারতাম। মন আমার ভীষণ অন্যমনস্ক থাকত, কোনো কথা ভাল বুঝতাম না, কারুর কথা শোনার মতন ধৈর্য'ও থাকত না। আমার ঘুম ছিল না। সারা রাত ভরে ভাঙা ভাঙা তন্দ্রা ছিল। আর সেই তন্দ্রার গায়ে দুঃসপ্ন। সেই জয়ন্তী, লতিকা, খোকা, আভা।

বাড়িতে ডাক্তার আসত। মা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। কাকাও উদ্বেগ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। প্রায়ই তাই নতুন নতুন ডাক্তার আসত। তারা নাড়ি দেখত, বুক দেখত। টাকা নিত, ওষুধ দিত।

মা বলতেন, নিশীথ তুই যে পাগল হয়ে যাবি। মনটা একটু শক্ত কর। কত লোকের কত কিছু যায়, তা বলে কি তারা এমনভাবে ভেঙে পড়ে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ—স্বামী গেছে, মেয়ে গেল, ছেলের বউ নাতি। তবু তো আমি দাঁড়িয়ে আছি!

সত্যি মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কি করে কেমন করে তিনি শক্ত হয়ে আছেন আমি বুঝতে পারতুম না। তবু মাকে আমি বলেছি, 'লতিকাকে কি তুমি ভুলতে পেরেছ মা? ঠিক করে বল!'

আমি জানতুম মা জবাব দেবেন না। লতিকা যদি মরে যেত, আত্মহত্যা করত—স্বামী এবং মেয়ের মতন মা তাকে ভুলতে পারতেন। মৃতকে ভোলা সহজ। মৃতের সঙ্গে আমি জড়িয়ে থাকি না। কিন্তু লতিকার সঙ্গে এ-সংসারের সম্ভ্রম, মর্যাদা, গৌরব—অনেক কিছুই জড়িয়েছিল, মা যার অংশীদার। নিজের অংশের এই নিলাম মার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। লতিকাকে মা তাই কিছুতেই ভুলতে পারতেন না।

আমি কাউকেই ভুলতে পারতাম না। জয়ন্তী, লতিকা, আভা, খোকা—এদের সবার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছু জড়িয়ে ছিল। বিশ্বাস, ভালবাসা, সততা, মর্যাদা, স্নেহ—এ সবই যে জড়িয়ে ছিল। কি করে আমি ভুলব!

আমার কথা কাউকে বোঝাবার নয়। নিজের কথা নিজেকেই ভাবতে হত। নিজেকেই শুধোতে হত। আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি ছেলেবেলা থেকে, ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি—দেখতাম তার সবই প্রায় আতসবাজির ফুলের মতন। ওরা এক একটি চোখ ভোলানো স্বপ্ন। মুহূর্তের মোহ। সত্য নয়, চিরকালের জন্য নয়, সুন্দর নয়।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। কাকা এক ডাকসাইটে ডাক্তার এনে হাজির করেছিলেন। ভদ্রলোক আমায় প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার অসুবিধে কি? মানে কমপ্লেনটা কিসের?'

জবাবে আমি আমার কপাল দেখিয়ে বলেছিলাম, 'মাথায়।'

'কি কষ্ট হয়।'

'তা বলতে পারব না।'

'স্ট্রেঞ্জ…কি না হলে আপনার মনে হবে আপনার আর কষ্ট নেই?'

'শুধু যদি পাঁচ ছ' বছরের কথা আমি ভুলতে পারি—যদি এই ক'বছরের স্মৃতি বলে আমার কিছু না থাকে…!'

আমার কথায় ভদ্রলোক বোধহয় খুবই অবাক হয়েছিলেন। একটু সময় আর কথা বলতে পারেন নি। তারপর আস্তে আস্তে কাকাকে বলেছিলেন, 'দিস ম্যান্‌ ওয়াণ্টস টু ড্রপ এ পোরশান অফ হিজ মেমারি!' তার পর আমার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলেছিলেন, 'আপনি যদি একটা হাত কি পা কেটে বাদ দেবার কথা বলতেন বুঝতাম, বোঝা সম্ভব ছিল—এবং সেটা কবাও অসাধ্য ছিল না। কিন্তু ডোণ্ট মাইণ্ড, আমি জানি না—আমি শুনি নি, স্মৃতিকে কি ভাবে চাকলা করে কেটে সরিয়ে ফেলা যায়!'

এব পরই, খুব সম্ভব সেই ডাক্তার ভদ্রলোকের কথায় কাকা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন আমার আর পাগল হতে বেশি দেরি নেই। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা দরকার। আমাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা আর কি।

পুরনো বন্ধু মৈত্রসাহেবকে কাকার মনে পড়ল। প্রায় বছর বিশ আর্মিতে সাজনাগার করে এখন স্বদেশে ফিরে এসে নির্জনে এবং নিভৃতে জীবন কাটাচ্ছেন। কাকা তার বন্ধুর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা থেকে বুঝতে পারলুম—মৈত্রসাহেব বিচক্ষণ লোক। সারভিসে থাকার সময় কয়েক শ' 'হেড ইনজিউরি' কেস হাতে-কলমে ঘেঁটেছেন। তারপর সারভিস থেকে সরে এসে ও-দেশেব বড় বড় হাসপাতালে মানুষের মাথা নিয়ে নিজের মাথা ঘাঁটিয়েছেন কয়েক বছর। অবশেষে কী খেয়াল হল—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এলেন স্বদেশে। 'বাংলা দেশে স্বাস্থ্য পোষাবে না, কলকাতা ভাল লাগে না—। সিটি লাইফ আর নয়; একটু ঠাণ্ডা নিরিবিলি নির্জন জায়গায় থাকতে চাই, বুঝলে কুমুদশংকর। সি পি-র এই জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। একটা বাংলো বাড়ি কিনেছি। খাসা আছি।'—মৈত্রসাহেব কাকাকে লিখেছিলেন।

মৈত্রসাহেবের সঙ্গে কাকার চিঠি লেখালেখি শেষ হল। মার সঙ্গে আলোচনা। শেষে কাকা বললেন আমাকে, 'তুমি একবার ওঁর কাছে যাও। অভিজ্ঞ লোক, খুব সুন্দর মানুষ। উনি তোমার কিছু করতে পারবেন। জায়গাটাও ভাল—, কিছুদিন বেড়িয়ে আসতে পারবে। ভাল লাগবে তোমার।'

আপত্তি করার, অরাজী হবার কিছু ছিল না। আমি পাগল হয়ে যাই, কি মরে যাই—এ আমি চাই নি। বাঁচতেই চেয়েছি আমি। খালি বুঝতে পারছিলাম না,

কি করে বাঁচব—জীবনের কতকগুলো অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক দিনের কথা ভুলে গিয়ে কি করে আবার বাঁচতে পারি !

মৈত্রসাহেবের কথা

কুমুদশংকরের ভাইপো নিশীথ দিনকয়েক হল এখানে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমি শুনেছি। ছেলেটির বয়স অল্প। এই বয়সেই বেচারীকে পরপর কয়েকটা বড় রকম দুঃখের আঘাত পেতে হয়েছে। খুব নরম ধাতের মানুষ হলে যা হয়—নিশীথেরও দেখছি তাই—দুঃখ আঘাতগুলো মনে বড় বেশি করে বেজেছে। ছেলেটি মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছে।

এক ধরনের মানুষ আছে যাদের কতকগুলো শব্দের ওপর অস্বাভাবিক একটা টান আছে। আমি যদিও 'শব্দ' কথাটা ব্যবহার করছি—কিন্তু আসলে এ-গুলো শব্দ নয়—শব্দের মধ্যেকার আইডিয়া। যেমন ধরা যাক 'পেট্রিয়টিজম্' শব্দটা। বাঙলায় বলে স্বদেশপ্রীতি। এই শব্দ তা ইংরিজী হোক, কি বাঙলা, কি অন্য কিছু—এর মধ্যে এমন একটা আইডিয়া আছে যা বেশির ভাগ মানুষই যতটা না বোঝে—তার চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসে। এরকম কিছু কিছু শব্দ আছে—যার অর্থ আমরা বুঝি না—বুঝি, তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম থাক বেশি থাক—যায় আসে না, সব সময় তার একটা বড়রকম মূল্য দিয়ে থাকি—ভালবাসা, বন্ধুত্ব, পবিত্রতা—এ-সব হচ্ছে তেমন শব্দ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই কথাগুলো এক একটি সম্পদ।'

নিশীথ, আমার দৃঢ় ধারণা—এইরকম কতকগুলো শব্দকে খুবই মূল্য দিয়েছিল। ভালবাসা, সততা, স্নেহ, দাম্পত্য জীবন—এইসব ছোট ছোট চার কি পাঁচ অক্ষরের শব্দগুলোর মধ্যে যে-ধারণাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ছোট নয়। এরা প্রত্যেকেই এক একটা জগৎ। এবং বিভিন্ন মানুষের মনে এ-জগৎ বিভিন্ন আকারের। কারুর ছোট, কারুর বড়। নিশীথের মনে এরা বড় জীবন্ত, বড় মোহময়। অল্পদিনের মধ্যে পরপর কয়েকটা ভীষণ রকমের আঘাত পেয়ে তার সেইসব বহুদিনের গড়া জগতগুলো ছত্রাকার হয়ে ভেঙে পড়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া তার কষ্ট দুঃখ হতাশা অনুভব করার উপায় নেই। অনুমান করা চলে মাত্র।

নিশীথ তার জীবনের এই পাঁচ সাতটা বছরের কথা ভুলতে চায়। স্মৃতির একটা অংশ।

নিশীথকে আমি 'মেমারি' নামের আশ্চর্য বিষয়টার কথা বার কয়েকই বোঝাবার চেষ্ঠা করেছি। 'মেমারি'র ফিজিয়লজি ওর পক্ষে বোঝা সহজ নয়। তবু সহজ করে একটা ধারণা মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছি। স্টিমুলাম, সেন্স অর্গান,

নার্ভাস ইম্‌পাল্‌সেস্‌, ব্রেন, নিউরোনস—এ-সব কঠিন কঠিন কথার আড়ালে সরল যে ব্যাখ্যা হতে পারে নিশীথকে বোঝাতে হয়েছে। তারপর ওকে বুঝিয়েছি কি অবস্থায় ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে, আর কখন থাকে না। এ-বিষয়টা কঠিন নয়। নিশীথ বুঝতে পারল।

এই বিষয়টা বোঝাতে গিয়ে আমি ইচ্ছে করেই আমার খুব প্রিয় একটা প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। নিশীথকে আমি বলেছিলাম, বুঝলে নিশীথ, ভবিষ্যতটা সব সময় বর্তমানের ওপর নির্ভর করে—আর বর্তমান অতীতের ওপর। এরা বিচ্ছিন্ন নয়, বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না। তোমাকে আমি রিটেনটিভনেসের কথা বলেছি। জীবনের এটা হচ্ছে আদিসত্য। সব রকম প্রাণের বৃদ্ধির প্রথম কথাই হচ্ছে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। অতীতের অনেক জিনিস তুমি বর্তমান পর্যন্ত টেনে আন। বর্তমানে এসে এই অতীত নষ্ট হয়ে যায় না, বর্তমানে রূপান্তর নেয়। তেমনি অতীতও এই বর্তমানেরই রূপান্তর। একটা নদীর সঙ্গে এর তুলনা করতে পার। এক এক জায়গায় এক এক নাম—কিন্তু সেই একই জলস্রোত। তেমনি হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতির মধ্যে প্রথম আছে সঞ্চয়ের কথা, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়—। সব সঞ্চয় নয়—তেমন সঞ্চয় যা ভালভাবে ছাপ ফেলে গেছে। ছাপ যত গভীর হবে তত বেশি তার আয়ু। তারপর হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের শক্তি। আমার ঠাকুমাকে আমার মনে নেই, খুব বাচ্চা তখন, কিন্তু সেই রাতটার কথা আমার এখনো মনে আছে। দেশের বাড়ি, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি—এক একটা বাজ পড়ছিল যেন আমাদের বাড়ি বাগান সমস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আর সে কি ঝড়ের শব্দ! তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। ভয়ে আমরা তিনটি ভাই-বোন জড়াজড়ি করে চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম। ঠাকুমাকে মনে নেই, মুখও মনে পড়ে না—কিন্তু ঠাকুমার কথা মনে পড়লে সেই রাতটার কথা মনে পড়ে। আর খুব দুর্যোগের রাতে সেই দিনটার, সেই সঙ্গে ঠাকুমার কথা মনে পড়ে।…কিন্তু ও-সব কথা থাক্‌—যা বলছিলাম। তুমি কোন মেয়ের শঠতা, কারুর অসততা, আঘাত, স্ত্রীর ছলনা, অপরাধ—অর্থাৎ মানুষের এই নোংরামিগুলো ভুলতে চাও। কিন্তু তা তো হবার নয়। এ পৃথিবী এই রকম। আমার এক বিদেশী বন্ধু বলত, মানুষ যদি যুগ থেকে যুগে—বংশ থেকে বংশ-পরাক্রমে তাদের পাপগুলো সন্তান-সন্ততির ঘাড়ে—এক রক্ত থেকে অন্য রক্তে চালান করে না দিয়ে যেত তা হলে আমরা অন্যরকম হতুম। এ পৃথিবীর অন্য রূপ হত। কথাটা খুব বাজে কথা নয়, আমি যদি না জানতুম হিংসে কি, না জানতুম কি করে ছোরা মারতে হয়, বন্দুক চালাতে হয়—যদি আমায় না শেখান হত, জোচ্চুরী কর, মিথ্যে কথা বল, পরস্ত্রী সম্ভোগ কর, অন্যকে ঘৃণা কর—তবে, নিশীথ ভেবে দেখ আমি কেমন হতুম। মানুষ কেমন হত—এ পৃথিবী কেমন হত। পাপ আকাশ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে নি। এরও চাষ করতে হয়েছে।

এখন আর কোনো উপায় নেই। মানুষকে আর তুমি শোধরাতে পারবে না, সে আশা কম। (Mneme…এ হচ্ছে রক্তে গচ্ছিত রাখা পৈত্রিক মূলধন) তুমি আমি তার অভিশাপ থেকে পালিয়ে যেতে পারব না।…মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয়—এত মাথা ঘাঁটলুম—এত দেখলুম, যদি জানতুম, যদি কোনোভাবে ধরতে পারতুম স্মৃতিকেন্দ্রের কোথায় এই পাপ যুগ থেকে যুগে জমা থাকে—তবে সেই জায়গাটুকু অসাড় করে কেটে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখতুম মানুষ কি, সে কেমন, সে কি করে!

আমি বেশ একটু ভাবালু হয়ে উঠেছিলাম। নিশীথ তার শ্রান্ত, ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়েছিল। আস্তে আস্তে তার চোখের দৃষ্টি বদলে যাচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে সে খুব চঞ্চল আর বিচলিত হয়েছে। উত্তেজনা বাড়ছিল ওর।

হঠাৎ নিশীথ আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। বললে, 'কাকাবাবু আমার ওপর একবার চেষ্টা করে দেখুন।'

'তোমার ওপর?'

'হ্যাঁ। ক্ষতি কি। আমি তো মরব না। অন্যভাবে বাঁচব। অন্য মামুষ হয়ে।'

'পাগল নাকি তুমি নিশীথ?'

নিশীথ খুব হতাশ হয়ে পড়ল। খানিক পরে বললে, 'আমি জানি এ-ভাবে, এই মন নিয়ে, লতিকাদের স্মৃতি নিয়ে আমি সুস্থ মানুষের মতন বেঁচে থাকতে পারব না। হয়ত পাগল হয়ে যাব, না হয় আত্মহত্যা করব। আপনি চেষ্টা করলে আমায় হয়ত বাঁচাতে পারতেন। আপনি তা করবেন না।' নিশীথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

নিশীথকে আমি সব কথা কি করে বোঝাই। আমি কি করতে পারি না-পারি তা ওকে আমি কেমন করে বিশ্বাস করবো। আমি নিশীথের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলুম।

হঠাৎ…হঠাৎ মনে হল…

'তুমি তোমার মাকে ভালবাস নিশীথ?'

'বাসি।' নিশীথ মাথা নাড়ল।

'তোমার কাকাবাবুকে?'

'শ্রদ্ধা করি খুব।'

'আর কি কি ভালবাস তুমি, মানে কি কি তোমার ভাল লাগে?'

'সে তো অনেক কিছুই আছে।'

'তবু বল দু-চারটে, শুনি।'

'আমি পাখি ভালবাসি, ফুল, গান, ছবি, কোনো কোনো বই, ছেলেবেলার কোনো

কোনো বন্ধুকে…

'থাক, বুঝতে পারছি।' আমি চুপ করলাম।

খানিকটা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ নিশীথের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'একটা কাজ আমি পারি নিশীথ, আমার ক্ষমতায় কুলোবে। আমি তোমার গোটা স্মৃতি-কেই নষ্ট করে দিতে পারি—ফর সাম আওয়ার্স—কয়েক ঘণ্টার জন্য—আট দশ বার—বড় জোর চব্বিশ ঘণ্টা। তুমি যদি সে-অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাও—'

'আমি রাজী।'

'ভেবে দেখ ভাল করে।'

'ভাববার কিছু নেই, কাকাবাবু আমি রাজী, এখুনি।'

'তোমার ভয় হচ্ছে না—?'

'ভয়, কেন—?'

কথাটা বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম আর একটু হলেই। তাড়াতাড়ি সামলে নিলুম। হেসে বললুম, 'বেশ, আজ রাত্রে শোবার আগে একটা ওষুধ দেবো খেয়ে নিও তারপর যা করার আমি করব।'

নিশীথ মাথা নাড়ল।

আমার কথা

সকালে ঘুম থেকে উঠলুম যখন, অনেক বেলা হয়েছে। মাথাটা কেমন ধরা ধরা লাগছিল। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি বলেই হয়ত। মনে পড়ল মৈত্রসাহেবের ওষুধ খেয়ে কাল ঘুমিয়েছিলুম। আজ তিনি আরও সব কি কি করবেন। কখন করবেন জানি না। কি ভাবে করবেন তাও জানি না। মাথাটা বড় ধরা ধরা লাগছে। খুব খিদে পেয়েছে। স্নান করতে ইচ্ছে করছে। জল তেষ্টাও পেয়েছে। আমি কি স্নান করব ?

দরজা খুলে বাইরে এলুম। মৈত্রসাহেব বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

'ঘুম ভাঙলো ?' মৈত্রসাহেব হাসিমুখে বললেন।

'হ্যাঁ। মাথাটা কেমন ধরা ধরা লাগছে। স্নান করে আসব ?'

'নিশ্চয়। যাও, স্নান সেরে এসো। আমি খাওয়ার ঘরে থাকব।'

স্নান করার পর শরীরটা খুব ভাল লাগছিল। মাথাটা খুব হাল্কা মনে হচ্ছিল। এত-ক্ষণ আমার চোখে ঘুমের মতো কিছু জড়িয়ে ছিল, সবই কেমন আবছা অস্পষ্ট—। স্নানের পর দৃষ্টিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাইরের রোদ, সবুজ কাঁচের জানলা, হালকা নীল পর্দাগুলো এবার খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মৈত্রসাহেব ডাইনিং টেবিলের সামনে বসে ছিলেন। সামনে কতকগুলো লেখা

কাগজ ক্লিপ দিয়ে গাঁথা।

আমি টেবিলে এসে বসতে মৈত্রসাহেব চা ঢালতে শুরু করলেন। ইশারায় রুটি মাখন ডিম কলার প্লেটটা তুলে নিয়ে খেতে বললেন।

খিদে পেয়েছিল খুব। কোনো কথা না বলে আমি খেতে লাগলাম। আর মাঝে মাঝে মৈত্রসাহেবের দিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করছিলাম, কখন উনি আমার ওষুধ-পত্র ইনজেকশনের সেই ঘরটাতে ডেকে নিয়ে যাবেন, কি হবে তারপর, কি হওয়া সম্ভব।

কয়েক চুমুক চা খেয়ে মৈত্রসাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। তাকালেন আমাব দিকে। আমি তখন ডিমটা শেষ করে সবে চায়ে ঠোঁট ঠেকিয়েছি। মৈত্রসাহেব একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বড় সুন্দর শান্ত হাসি হেসে বললেন, 'তারপর —বলো কেমন আছ ?'

'ভালো।' আমি মৈত্রসাহেবের কথাটা বুঝলাম। 'মাথা ধরার ভাবটা আর নেই।'

'না থাকারই কথা।' মৈত্রসাহেব আর এক চুমুক চা খেলেন।

চায়ের পেয়ালা থেকে মুখ তুলে আমি বললাম, 'কখন শুরু করবেন ?'

'কিসের শুরু ?'

আমি অবাক। মৈত্রসাহেব কি কালকের কথা ভুলে গেলেন না কি মন বদলে ফেলেছেন। বললাম, আমার স্মৃতিকে কিছুক্ষণের জন্যে—কয়েক ঘণ্টার মতো নষ্ট'—

'সে তো হয়ে গেছে। আই ডিড্ ইট্।' মৈত্রসাহেব আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

হয়ে গেছে ? কখন হল ? কেমন করে হল ? কই আমি তো কিছুই জানতে পারলাম না।

আমার বিস্ময়, অবিশ্বাস, এত ভাল করে চোখে মুখে ফুটে উঠল যে মৈত্রসাহেবকে সেটা আর মুখে বলার দরকার করল না, তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন।

দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন মৈত্রসাহেব, তারপর পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে সীল-মোহরের ছাপটা আমায় দেখতে দিলেন।

'আজ ১৬ তারিখ। ১৪ই রাত্রে তুমি ঘুমোতে গিয়েছিলে। মাঝের একটা দিন তুমি কোথায় ফেলে এলে নিশীথ ?'

আমি চমকে উঠলাম এরকম ভাবে জীবনে বোধহয় আর কখনও চমকে উঠি নি। কোথা থেকে একটা দুরন্ত ভয় লাফিয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। আর সে-ভয় কী ভীষণ, কী চঞ্চল ! বুক থেকে লাফিয়ে আমার হৃদপিণ্ড চেপে ধরল, তারপর গলা। নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম আমার সমস্ত শরীর যেন বরফের জলে ডুবনো রয়েছে। এত ঠাণ্ডা, এত অসাড়।

মৈত্রসাহেব নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করছিলেন। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, 'কি হল ? অসুস্থ বোধ করছ ? গরম দুধ খাবে খানিকটা ?'

ধীরে ধীরে চেষ্টা করে ভয়টা আমি কাটিয়ে উঠলাম, তাকালাম মৈত্রসাহেবের দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। কি দেখছিলাম তাঁর মুখে জানি না। যেন নিজেকে দেখছিলাম। আমি বেঁচে আছি—এই বোধ আর বিশ্বাসটা যেন নতুন করে অনুভব করছিলাম।

'কাকাবাবু !'

'বলো।'

'আমি কি কাল বেঁচে ছিলাম ?'

'তার মানে !—বেঁচে ছিলে বৈকি !'

'আমার কি জ্ঞান ছিল ?'

'অফকোর্স।'

'তাহলে এ কি হল। একটা পুরো দিন আমি কি করলুম, কোন্ কথা বললুম, কাকে দেখলুম—কিছুই জানলাম না। মরার চেয়ে এই বাঁচার তফাৎ কি ?'

মৈত্রসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে তেমনি সুন্দর শান্ত চোখে আবার হাসলেন। ক্লিপ দিয়ে আঁটা কাগজগুলো তুলে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'এই কাগজগুলো পড়। এর মধ্যে সব লেখা আছে। যে-দিনটির কথা তুমি মনে করতে পারছ না—এই কাগজে সে-দিনের সমস্ত কথা লেখা আছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তুমি কি করেছ কোথায় গেছ।'

মৈত্রসাহেব লিখে রেখেছেন—কলমের আঁচড়ে। প্রথম পাতাটা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। আমার বুকের মধ্যে আবার সেই ভয়টা ছুটে এলো। নিশ্বাস ভারি হয়ে আসছিল। দ্বিতীয় পাতাটা কেমন একটু অন্যমনস্ক ভয় ভয় ভাবে পড়তে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার মধ্যে বিশ্রী এক অস্বস্তি জমে উঠেছে, খুব বিচলিত হয়ে পড়ছি এবং বিহ্বলতা আমায় শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার হাত ঘামছিল, কপাল, গলা, বুক। আঙুলগুলো যেন নীল হয়ে আসছিল।…দ্বিতীয় পাতাটা শেষ করার পর তৃতীয় পাতায় এলাম। দু-চারটে লাইন হয়ত পড়েছি—আমার সমস্ত শরীরটা যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল…কি মনে হচ্ছিল বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না। শুধু হাতের কাগজগুলোকে তাল করে পাকিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে দিলাম যেন হাতের ওপর এতক্ষণ আমার অজান্তে একটা নোঙরা, বিষাক্ত, কিলবিলে, কুৎসিত সাপ জটলা পাকিয়ে পড়েছিল। চমকে উঠে, ভয়ে, ভীষণভাবে একটা ভীতার্ত চিৎকার করে ছুঁড়ে দিয়েছি।

তারপর আমি কেঁদেছি। হয়ত অনেকক্ষণ ধরে। মৈত্রসাহেব কখন উঠে বাইরে চলে গেছেন। একটিও কথা না বলে।

আমার কান্নাও থামল। ঘরটা নিস্তব্ধ। ওয়াল-ক্লকটা টিক্‌টিক্ করে বেজে চলেছে। আমি ঘড়িটা দেখলাম। মনে হল, ওই ঘড়িটার টিক্‌টিক্ এখন বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হবে—আমার তেমনি হয়েছিল কাল। আমি ছিলাম, কিন্তু সে-থাকা একটা বন্ধ ঘড়ির মতন।

ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। মৈত্রসাহেব বাগানের রোদে ফুলগাছের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ওই বাগান আমায় টানছিল, ওই সুন্দর রোদ, মৈত্রসাহেবের সুঠাম দেহ, তাঁর পোশাক। একটা কাক ডাকছিল, ক'টি চড়ুই উড়ছিল, দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে নীল আকাশটা উঁকি দিচ্ছিল। একটি মেয়ে বাইসিকল চেপে রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

আমি জানি না, পা পা করে কখন বাগানে মৈত্রসাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

মৈত্রসাহেব একটা হলুদ গোলাপ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এটা কি ফুল বলতে পার?' বলে হাসলেন।

'গোলাপ।' আমিও হাসলুম।

'আজ পারলে, কাল কিন্তু পার নি।'

সত্যিই পারি নি। কাল আমি কিছুই চিনতে পারি নি! ঘাস, পাখি, ফুল, নদী, মানুষ, রাস্তাঘাট, আকাশ, মাটি—কিছুই না। এ-জগতের কোনো জিনিস আমার চেনা ছিল না। আমার মুখে কথা ছিল না, কারণ ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম না, আগুন কি, আগুন কেমন? আমি বুঝতে পারি নি…না, কিছুই পারি নি। আমার এতো চেনা জগৎ একেবারেই অজানা, অচেনা হয়ে গিয়েছিল। কী সাংঘাতিক!

মৈত্রসাহেব গোলাপ ফুলটা ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। বললেন, 'নিশীথ, তুমি কি স্মৃতিকে সত্যিই নষ্ট করতে চাও? মেমারি অ্যান্ড ইমেজ…'

'আমি আর কিছু চাই না, কাকাবাবু। এই কষ্ট অনেক ভাল।'

'ইয়েস। এ-কষ্ট অনেক ভাল। তবু আবার করে শিশু হওয়া যায় না।'

মরশুমী ফুলের ঝোপটা পেরুতে পেরুতে মৈত্রসাহেব আবার বললেন, 'তুমি যেন সত্যিই ভেব না—আমি তোমার স্মৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছিলাম একটা দিনের জন্যে! না, সে-ক্ষমতা আমার নেই। হয়ত কারুরই নেই এখন পর্যন্ত। আমি শুধু তোমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম গোটা একটা দিন। তবে কাগজে আমি যা লিখেছিলাম সেটা কল্পনা নয়। ইফ্ ইউ হ্যাভ্ নো মেমারি—এমনটিই হবে। এ-জগৎ শূন্য হয়ে যাবে তোমার কাছে। একেবারেই শূন্য। তোমার মা থাকবেন না, ফুল, বই, পাখি, গান—ছেলেবেলা, তোমার বাবার স্মৃতি—শত শত ছোট ছোট সুখের অভিজ্ঞতা, আনন্দ। এটাই কি তুমি চাও?'

'না।'

'কেউ চাইবে না। আফ্‌টার অল শূন্য থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। এখন এক দুই ক'রে নয় পর্যন্ত এসেছি। আমরা শুধু আশা করব—পরের শূন্য আসুক, —কিন্তু শুরুর শূন্য নয়, শেষের শূন্য। লেট আস মেক টেন, টুয়েন্টি…'

একটা সাদা বক আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম।



পলাশ

ওখানে পলাশ ফুটেছে। ফাল্গুনের এই গোড়াতেই গাছগুলোর গা-মাথা লাল টুক-টুক করছে। সকালের রোদে—শুধু সকাল কেন, একটু চড়া বেলার রোদে—দুপুরে, শেষ বিকেলেও যে কী সুন্দর দেখায়! তাকালে চোখ ফেরান যায় না। তবু তো ওখানটা পলাশ বন নয়; মাঠের মধ্যে এদিক-ওদিক দু-দশটা গাছ, এই যা। তা বলে ধু ধু মাঠ নয়। ধান কাটার পর ফাঁকা ক্ষেত। কেমন যেন করুণ-করুণ চেহারা। আলের পর আল; আঁকাবাঁকা। তারই মধ্যে কোথাও একটা আমলকী গাছ দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও হরীতকী। পড়ো-জমিতে জাম-জামরুল! রেল-লাইনের পাশে টেলিগ্রাফ পোস্ট। তারের ওপর ফিঙে। জল জমে জমে ডোবার মতন হয়েছে কোথাও, শেওলা-জমা সবুজ মতন জল, তার ওপর তিরতিরে পাতা, জলশাক। ধবধবে বকগুলো এই এসে বসে, আবার উড়ে যায়। কোথায় যে যায়! আল ধরে ধরে খানিকটা গেলে ঝোপঝাড় কিছু আছে দূরে। ছায়াভরা গ্রাম-ট্রাম হবে। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। উমা কৌতুকের সুরে হেসে উঠে রতিকান্তর বর্ণনায় ছেদ টেনে দেয়। বলে, 'আপনি কাজকর্ম কিছু করেন, না বসে বসে পলাশ গাছ আর মাঠ-বন দেখেন, সত্যি করে বলুন তো জামাইবাবু?'

রতিকান্তর পোশাক পরা শেষ হয়েছিল। শাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট। মোজা সমেত পা-টা চটির মধ্যে গলিয়ে ডেক-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেটটা শেষ করে নিচ্ছিল। এখন সবে সাড়ে-আটটা। এরই মধ্যে নাওয়া, খাওয়া, পোশাক পরা সব শেষ। বিনু একটা বড় মতন টিফিন-কৌটো ঝাড়নে বেঁধে এনে দেবে, আর চায়ের ফ্লাস্কটা; কাঠের ফ্রেমে আঁটা জলের কুঁজোও। চাপরাসী এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কৌটো, ফ্লাস্ক, কুঁজো নিয়ে চলে যাবে। তারপরই রতিকান্ত উঠে পড়ল। টেবিল থেকে সেই এক-বিঘতটাক চওড়া নোট বই আর পেন্সিল পকেটে ফেলে, স্কেলটা বুকপকেটে গুঁজে, জুতো বদলে, চশমার ওপর অ্যাটাচিটা এঁটে নিয়ে চলে যাবে রতিকান্ত।

'কাজকর্ম না করে কি উপায় আছে?' উমার কথার জবাবটা দিল রতিকান্ত। বিনু ফ্লাস্ক আর টিফিন-কৌটো হাতে ঘরে এসে পড়েছে ততক্ষণে। রতিকান্ত আবার বললে, 'তবে ফাঁকি মারতে ইচ্ছে হলে কেউ কি আর ঠেকাতে পারে!'

বিনু স্বামীর জন্যে কাচা পাটকরা রুমাল, ভাজা মসলা, এটা-সেটা গোছ করে দিতে

দিতে বলল, 'রোজ রোজ তো শোনাচ্ছ কী সুন্দর জায়গা, কী সুন্দর জায়গা—পলাশ ফুল ফুটছে, হাতিঘোড়া নাচছে—তা একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওনা বেড়াতে।'

প্রস্তাবটা আগেও উঠেছে। উমা নিজেই বলেছে। আজ আবার। উমা ঠোঁট উল্টে বলল, 'ও-কথা আর বলিস না দিদি। জামাইবাবুর মাথা কাটা যাবে।'

'মাথা কাটা যাবে বলি নি তো।' রতিকান্ত সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। হাসিমুখ। বলল, 'চাকরিটা যাবে বলেছি।'

'ওই একই হল।' উমা দিদির ব্লাউজের হাতার ফুল তুলছিল সুতো দিয়ে। দাঁত দিয়ে সুতো কাটল। নীচু মুখ। চোখ দুটো শুধু ভুরুছোঁয়া হয়ে রতিকান্তকে নজর করল।

বিনু বোনের হয়ে বলল, 'আর কারুর চাকরি যায় না, তোমার বেলাতেই যত অমুক সাহেব তমুক সাহেব দেখে ফেলবে।' কথাটা শেষ করতে করতে বিনু বাইরে চলে গেল টিফিন, জলের কুঁজো চাপরাসীকে গছিয়ে দিতে।

রতিকান্ত ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠল। সামনেই ড্রয়ার দেওয়া টেবিল। তারই উপরে কাঠের টুকরো এঁটে আয়না বসান। কাঁচটার রঙ কেমন একটু হলুদ-হলুদ। দু-চারটে চিড়ও আছে। রতিকান্তর নিজের হাতের মিস্ত্রীগিরি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ওপর চিরুনির কয়েকটা দ্রুত এবং অভ্যস্ত টান দিল রতিকান্ত। কাঁচের মধ্যে দিয়েই উমার গোলগাল ফরসা মুখটা দেখা যাচ্ছিল।

'রেলের ট্রলির নিয়মকানুনটা আলাদা, বুঝলে উমা। এ তো আর তোমার দিদির কুড়িয়ে পাওয়া ঠেলাগাড়ি নয়!'—বলে রতিকান্ত হেসে নিজের বুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। 'এ ঠেলাগাড়িতে তোমার দিদি যা খুশি চাপাতে পারে। কিন্তু রেলের ট্রলিতে ওয়াইফকেও চাপান যায় না।' রতিকান্ত হাসতে লাগল। সেই সঙ্গে নোট-খাতা, পেন্সিল, রুমাল পকেটে পুরে নিচ্ছিল।

'আ—হা, কী কথা!' উমা জামাইবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসল। 'ওয়াইফের চেয়ে ওয়াইফ-সিস্টারের দাম বেশি মশাই। আপনার সাহেবকে সেটা বুঝিয়ে দেবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমিও তাই বলি। আমার যখন হারাধনের দশটি গিয়ে বিপেষ একটিতে ঠেকার মতন, সবেধন নীলমণি একটি মাত্র ওয়াইফ-সিস্টার।' রতিকান্ত মাথা নেড়ে বলল। তারপর দুজনের একসঙ্গে হাসি।

হাসি থামলে উমা বলল, 'আপনার সেই গোকুলবাবুর ওয়াইফ-সিস্টারের গল্পটা কাল রাত্রে যতবার মনে পড়েছে—ততবার হেসেছি জামাইবাবু।'

বিনু এলো। রতিকান্ত তৈরি। শুধু জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ার বাকী। ঘরের মধ্যে জানলার কাছে কাঠের দোলনায় রতিকান্তর মেয়ে ঘুমুচ্ছে। দেড়

বছরের মেয়ে। মেয়ের গালে আস্তে করে একটু আঙুল দিয়ে হাসিহাসি চোখে বললে রতিকান্ত, 'এ বেটি মাসীর মতনই তেজী হবে। এক ফোঁটা মেয়ের মুখের চেহারাটা দেখ। গাল ফোলানো কপাল কোঁচকানো।'

বিনু স্বামীর সোলার হ্যাটটা পেরেক থেকে নামিয়ে এনেছে। জুতো পরা হয়ে গেলে এই টুপিটা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার যা বাকী। তারপর আর রতিকান্তর জন্যে করণীয় কিছু নেই।

'মাসীর মুখটা এমন কিছু ফেলনা নয়; বোনঝির তাতে জাত যাবে না। উমা কৃত্রিম একটা ঝাঁজ দেখাল।

'তা ঠিক; তলে ফলাফলটাও খুব ভালো হবে মনে হয় না—', রতিকান্ত খুব প্রচ্ছন্নভাবে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসিমুখে বাইরে চলে গেল।

বাইরে ঠিক নয়। ঘরের চৌকাঠের সামনে হেঁট হয়ে জুতো পরতে লাগল।

বিনুর সঙ্গে উমাও চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জুতোর ফিতে বেঁধে রতিকান্ত মুখ তুলল। বিনু টুপিটা দিল। উমা বলল,—খুব যে মাসীর নিন্দে করে পালাচ্ছেন। আর আসছি না বাপু এখানে। এই প্রথম, এই শেষ।'

'ছি ছি—', রতিকান্ত জিভ কাটল, কানে আঙুল দিয়ে বলল, 'অমন কথা শুনতে নেই।'

'কেন বলবে না! সারাদিন তো নিজে ঘুরে বেড়াও, কিন্তু ওকে কবে একটু সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে গেছ?' বিনু বোনের হয়ে বলল, 'এসে পর্যন্ত তো মেয়েটার ঘরে বসে বসেই কাটছে।'

কথাটা রতিকান্তের কানে গেছে কি যায় নি বোঝা গেল না। জুতোর শব্দ তুলে ততক্ষণে সে এগিয়ে গেছে।

দুই বোনে একটুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। উমা দিদির কাঁধ থেকে খসে পড়া আঁচলটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'জামাইবাবু যেন কেমন হয়ে গেছে দিদি দেখছিস?'

'কেমন?' অন্যমনস্কভাবে শুধল বিনু।

জবাবটা চট করে ঠোঁটে এলো না উমার। কথাটা কেন বলল কী দেখে, কী ভেবে—উমাও তার হদিস পেল না। একটু থেমে যেন কিছু একটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বয়সেই কেমন যেন একটু বুড়ো বুড়ো।'

বিনু মুখ ঘুরিয়ে বোনকে দেখল। তারপর কিছু না বলেই হাসল একটু।

দিন দুই যেতে না যেতেই এক সকালে উমার হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। রতি-কান্ত কথা দিয়েছে আজ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। না, না—চাঁদমারি কিংবা

তিন-পাথরের গুহা থেকে চুইয়ে পড়া জল দেখতে নয়, নিয়ে যাবে ট্রলি করে পাঁচ মাইল দূরের সেই পলাশফোটা রোদ-ঝলমল মাঠে। রতিকান্তর মুখে শুনে শুনে, সেই তেপান্তর সম্পর্কে উমার কেমন একটা কৌতূহল জেগেছিল। আর যদি সে-কৌতূহল খুবই সাধারণ হয়, তাতেই বা কী! ট্রলির উপর বসে পাঁচ মাইল পথ, হাওয়ার দমকা খেতে হু হু করে এগিয়ে যাওয়া, ভাবতেই যে ভালো লাগে। ট্রলিতে কখনো চড়ে নি উমা। দেখেছে। এইত সেদিনও দেখল লাইনের উপর দিয়ে যখন চলে যায়, এমন সুন্দর একটা গনগন আওয়াজ হয়। যেন একদল ভোমরা গুনগুন করছে। লাইন ধরে, রাস্তাটাও—জামাইবাবু যেখানে কাজে যায়—নাকি চমৎকার। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ, ছোট ছোট দুটো নদী। উমার তো উৎসাহ খুব। কলকাতার অন্ধগলির বাসিন্দে সে। ট্রেনেই চড়েছে জীবনে হয়ত দু-চারবার। ফাঁকা মাঠঘাট বন এসব এক সিনেমার ছবিতে ছাড়া দেখেছেই বা কোথায়! আর দেখবেই বা কবে!

আসলে হয়ত এসব কিছুই না। শুধু একটা চঞ্চলতা, ঘর থেকে বাইরে বেরুবার, দু-পাঁচ ঘণ্টা কোথাও কোনো নতুন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসার।

অত সকালে কি স্নান সারা যায়, ভাতই কি খাওয়া যায়! তবু উমা স্নান সারল। ভিজে চুল শুকবে কি শুকবে না, বিনুনি দিলে নির্ঘাত জট, দরকার কি, এলোই থাক। ভাত দু-গরাস পেটে গেল। ওতেই হবে। 'বুঝলেন জামাইবাবু, লুচি আলুরদম সব বাপু বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সেই বেহালার মাঠে বেড়াতে যাওয়ার মতন। আমার আবার বাইরে বেরুলে খিদেটা বেশি পায়। দিদি, ক'টা পান দিবি? ও জামাইবাবু, যদি বলেন তো আমার সঞ্চয়িতাটা নিই; গাছের ছায়ায় বসে বসে পড়া যাবে।'

বিনু বোনের ছটফটানি দেখে বলে, 'তুই যেন হরিদ্বারে গঙ্গা চান করতে যাচ্ছিস উমি, এমনি করছিস। যা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিগে যা। ছাপা শাড়িটাই পরে যাস, ভালোটালো পরে দরকার নেই, জলে-কাদায়, কাঁটার খোঁচায় তো একশা করে আনবি।'

যাবার মুখে কিছু না হোক, উমা একমুঠো এলাচ-দারুচিনি নিয়ে বেরুল। রতিকান্ত হেসে বলল, 'তা ভালো, সারাটা পথ তোমার মুখ থেকে সুগন্ধ বাক্য শোনা যাবে।' উমা ভ্রূভঙ্গ করে জামাইবাবুর হাতে চিমটি কেটে দিল। এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে জিভ ভেঙিয়ে বলল মৃদু সুরে, 'দয়া হলে এমনিতেই অনেক কিছু শোনাতে পারি মশাই।'

ট্রলিতে উঠে উমার মুখ যেন আর বন্ধ হয় না। একটার জবাব পেতে না পেতে আর একটা। 'ও জামাইবাবু, মাথার ওপর এ আবার কী? এ যে রাজছত্র! রঙটা

শাদা কেন? পিছনের লোক দুটো যে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটছে—ওমা পা পিছলে পড়ে যাবে না! আপনি ছুটতে পারেন লাইন দিয়ে? পারেন না?'

রতিকান্তর পাশে কাঠের বেঞ্চটায় বসে উমার যেন শান্তি হচ্ছিল না। একবার ডান-দিকে, পরক্ষণেই বাঁদিকে মুখ ফেরাচ্ছে। সামনের জিনিসটা কখন যে হুস করে পিছনে পড়ে যাচ্ছে ভালো করে ঠাওর করতেই পারছে না। তখন আবার ঘাড় ঘোরাও। দাঁড়িয়ে যেতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত উমা। কিন্তু সেখানে তার ভয় আছে।

একটা পুরো এলাচ মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগল উমা। 'ওটা কী জামাইবাবু? দেখুন, দেখুন, একপাল গরু কিভাবে নামছে ঢালু দিয়ে। যদি পা পিছলে পড়ে—!'

রতিকান্ত প্রথম প্রথম জবাব দিয়েছিল ; এখন আর সব কথার জবাব দিচ্ছে না। বুঝতে পেরেছে রতিকান্ত, উমার প্রশ্নগুলোর জবাব না দিলেও চলে।

খানিকটা এগিয়ে আসতে আশ-পাশের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। মাঠের পর মাঠ। উঁচুনীচু। ছোট ছোট শালঝোপ। জল-শুকনো বালি-কিচকিচ নালা। সামান্য দূরেই একটা পাহাড়ের ঢল নেমে এসেছে। গাছ আর ঝোপ সেই ঢালুর মুখে যেন কেউ গেঁথে বসিয়ে দিয়েছে। ছোট বড়ো পাথর। কালচে রঙ। একটা নীল মেঘ পাহাড়টার মাথার উপর চাঁদোয়ার মতন বসান। দু-একটা লোক দেখা যায় কি যায় না।

পাহাড়টার নাম কী? কত দূরে? ওখানে মন্দির আছে কি নেই? উমার বকবকানি শেষ পর্যন্ত থেমে এলো।

পরিবেশটা আবার বদলাল। এবার দু-পাশে একটু তফাত থেকে বুনো ঝোপ-জঙ্গলের একটানা ছায়া-ছমছম চেহারা। ঝাঁকড়া মাথা গাছ, গাছের গা বেয়ে বেয়ে বুনো লতা। কতক পাখি। কাঠবেড়ালি।

উমা হঠাৎ কান খাড়া করে কী যেন শুনতে লাগল। 'ওটা কী ডাকছে জামাই-বাবু?'

'ঘুঘু'। রতিকান্ত একটু অবাক হয়ে উমার দিকে চাইল।

'ইস্ ; আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল।' উমা আঁচল দিয়ে কপালটা চট করে মুছে নিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপটাও বেড়েছে।

রতিকান্ত রসিকতা করে বলল, 'ঘুঘুও কি কলকাতায় নেই নাকি উমা?'

'কী যে বলেন! তা নয়। কলকাতার ঘুঘুগুলো এমন সুন্দর করে ডাকতে পারে না। ওদের দম নেই।' উমা নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল।

রতিকান্তও হো হা করে হেসে ফেলল।

হাসি থামল। উমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে এবার ঝুঁকে বসল। জানুরে

উপর কনুই, হাতের তালুতে মুখের ভার দিয়ে।

'আমরা কতটা এলাম জামাইবাবু?'

'অর্ধেকটা চলে এসেছি।' রতিকান্ত জবাব দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনার জলতেষ্টা পাচ্ছে না? আমার তো গলা শুকিয়ে এলো।' সামনের রোদের দিকে চেয়ে চেয়ে উমা বলল। তাতটা সত্যিই বেশ বেড়েছে। ফাল্গুনের গোড়াতেই এত ঝকঝকে রোদ এখন। লাইনগুলোতে যেন আঁচ লেগেছে, পাথরের টুকরো-গুলোও বোধ হয় গরম।

'জলতেষ্টা পেয়েছে তো জল খাও।' রতিকান্ত কুঁজোটার জন্যে পিছন দিকে চাইল।

'থাক; এখন খাব না। বরং একটা পান খাই।' সত্যিসত্যিই কাগজে মুড়ে গোটা চার-পাঁচ খিলি পান এনেছে উমা। রতিকান্ত পান খায় না। উমা জোর করে গুঁজে দিল মুখে। তারপর নিজে একটা খিলি মুখে পুরে বলল, 'আপনাকে বড়ো সাধ্যসাধনা করতে হয়। স্বভাবটা আজও তেমনি আছে। বদলাল না।'

ঠিক কী সূত্রে যে কথাটা, রতিকান্ত বুঝে উঠতে পারল না। অনুমান করতে পারল, কোনো একটা পুরনো প্রসঙ্গ আছে। বলল রহস্যভরেই, 'সাধ্যসাধনা আর করল কে? বলতে না বলতেই চাকরির মায়া ছেড়ে এখানে বেড়াতে নিয়ে এলাম তোমায়।'

'যান, যান—' উমা মুখ না তুলে শুধু একটু ঘাড় ফেরাল, 'তাও যদি না সব কথা আমার মনে থাকত।' উমা চুপ করে গেল। ট্রলিটা লাইনের উপর সুন্দর একটানা শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে ঝলসানো রোদ। পাশের লাইন দিয়ে একটা মাল-গাড়ি আসছে এই মুখে। তার ইঞ্জিনের ধোঁয়া।

রতিকান্ত উমাকে দেখছিল। ফরসা মুখটা রোদের ঝাঁজে লালচে হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটি পানের রসে লাল। কাঁধে জড়ান এলো চুল শুকিয়ে গেছে। হাওয়ায় উড়ছে কতকগুলো। কানের পাশে, কপালে। একটু যেন ঘাম জমেছে উমার কপালে।

নীরবতা কাটিয়ে উমা হঠাৎ বলল, 'আপনার বিয়ের পর এই আবার আপনার সঙ্গে দেখা। মধ্যে অবশ্য কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল—ঘণ্টাখানেকের জন্যে।'

কথাটা ঠিক। বিনুকে আনতে গিয়ে একবার দেখা হয়েছিল উমার সঙ্গে বিনুদের বাড়িতে। উমাই এসেছিল দেখা করতে শাঁখারীটোলার বাড়ি থেকে। বিনু তার মাসতুতো বোন। আলাদা আলাদা বাড়ি মা মাসীর।

বাড়ি আলাদা হলেও মেয়েদের বিয়ের সময় একসঙ্গে পাত্র খোঁজা শুরু করেছিল মেয়ের মায়েরা। বিনুতে উমাতে এমন কিছু বয়সের তফাত নয়; বছর আড়াই তিন বড়জোর। পাত্র হিসেবে রতিকান্তর সংবাদটা যোগাড় করেছিল উমার মা। বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল বিনুর সঙ্গে। তারপরে চারটে বছর কেটে গেছে, উমার বিয়ে হয়

নি আজও। এই ক' বছরের মধ্যে উমাদের সংসারে ছোট বড়ো অনেক কাণ্ডই ঘটে গেছে। উমার মা মারা গেছে। নানা কারণে ওর বিয়ের কথাটা চাপাই পড়ে আছে এখনো। আবার উঠবে। হয়ত উঠেছেও এর মধ্যে। নয়ত চার বছর পরে হঠাৎ এই শাল-পলাশের দেশে হাওয়া বদলাতে পাঠাবে কেন উমার বাবা এবং মাসী—বিনুর মা।

এসব পুরনো কথা আজ এখন উমা কিংবা রতিকান্তর মনে পড়ছিল কিনা বলা মুশকিল। দেখা হবার কথায় হয়ত কিছু মনে পড়ে থাকতেও পারে।

'তুমি তো অনেক দিন থেকে এখানে আসব আসব করছিলে, এলেই পারতে।' রতিকান্তর গলার স্বর এমনিতেই একটু মৃদু, এখন আরো মৃদু এবং কোমল হল।

'আমার ইচ্ছাতেই যদি কাজ হত—!' উমা সামনে-এসে-পড়া মালগাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

মালগাড়ির শব্দটা এতক্ষণ কথা ছাপিয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। এবার রীতিমত কর্কশ হয়ে উঠেছে। ঘটাং ঘটাং বিশ্রী একটা শব্দকে খাদে বেঁধে চাকা ঘষে যাওয়ার একটানা একটা আর্তনাদ। লাইনে, পাথরে এই ফাঁকায় সেই শব্দটা যেন প্রতি মুহূর্তে আরো তীব্র হচ্ছিল।

উমার মনে হলো রতিকান্ত যেন কিছু একটা বলল। কী বলল, উমা শুনতে পেল না। শুধু একটা 'তুমি' ছাড়া।

দুজনেই চুপ। মালগাড়িটা পেরিয়ে গেল। শব্দটাও ডুবে আসতে লাগল।

একসময় আবার সব শান্ত। সেই ট্রলির চাকার শব্দ, সামনে ঝলসে-ওঠা রোদ, মাঠ-ঘাট, টেলিগ্রাফ পোস্ট।

উমা মুখ তুলে রতিকান্তর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটু হাসল। 'আপনাকে আমি যত চিঠি দিয়েছি তার সিকির সিকিরও জবাব আপনি দেন নি।'

রতিকান্ত কথাটায় যেন লজ্জা পেল। বলল, 'আমি ভালো চিঠি লিখতে পারি না, উমা। আর সেই একঘেয়ে আমরা ভালো আছি, তোমরা কেমন আছ—এ লিখতেও ইচ্ছে করে না।' একটু থামল রতিকান্ত। যেন আরো কিছু বলার আছে এমন ধরনের একটা ভঙ্গী করে। শেষে বলল, 'তা বলে ভেব না, তোমার কথা মনে পড়ত না।'

উমা রতিকান্তর চোখের দিকে এক পলক চেয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল। নিজের পরনের ছাপা শাড়িটার একটা ফিকে হয়ে যাওয়া ফুল দেখতে দেখতে বলল, 'চোখের সামনে কেউ থাকলে তাকে এসব কথা বলতে হয়, না জামাইবাবু?' কথার শেষে ম্লান একটু হাসি।

রতিকান্ত জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকল।

জায়গাটায় পেঁছে খুশি। রতিকান্ত যা বলেছে তার সঙ্গে যদি ফর্দ মেলান যায়, কোথাও কমতি হবে না। সত্যিই সুন্দর এই জায়গাটা।

ট্রলি থেকে নেমে কিছুক্ষণ তো উমা চোখ ভরে সব দেখল। লাইনের এপাশটায় আল-তোলা ফাঁকা ক্ষেত। দৃষ্টির সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়, সবুজ একটা বনের মাথায় আকাশ যেখানে ছুঁয়ে যাচ্ছে, ততদূর। মাঝে মধ্যে একটি করে যেন কুঞ্জবন, অনেকগুলো গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশটায় পলাশ। ছাড়া ছাড়া, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় ঘেঁষাঘেঁষি। লাল টুকটুক করছে। সামনে কনস্ট্রাকশানের লাল ইঁট-গাঁথা কেবিনের অসম্পূর্ণ চেহারাটা। চুনসুরকির একটা ডাঁইও চোখে পড়ে। সামান্য কিছু মজুর, হল পাইপ, তারের বাণ্ডিল, রেললাইনও চোখে পড়ে।

রতিকান্ত বলল, 'তুমি ওখানটায় ছায়ায় বসে বসে জিরও, আমি একটু কাজকর্ম দেখে আসি।'

উমা মাথা নেড়ে সায় জানাল। তারপর আস্তে আস্তে সামনের ছায়াটায় এসে বসল।

কী রোদ! আকাশটা যেন তার গা থেকে সমস্ত রোদের ঢেউ এই মাঠ আর ক্ষেত আর নিরিবিলি ফাঁকায় ছড়িয়ে দিয়েছে। অকৃপণ ভাবে। ফাল্গুনের হাওয়া। একটু তবু তপ্ত। কতকগুলো ফড়িং সামনের ঘাসে উড়ে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। দু-একটা পাখি সামনে দূরে ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে আশেপাশে।

উমা মুখটা মুছে নিল। ট্রলিটা একপাশে ছায়ার নীচে রাখা রয়েছে। কাছেই। জলতেষ্টা পাচ্ছিল খুব। কুঁজোটা আনতে এগিয়ে গেল উমা।

জল খেয়ে ছায়ার তলায়, ঘাসে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে থাকল উমা, আশেপাশে কেউ নেই। পাখিদের খুব মৃদু একটা কিচির-মিচির ছাড়া কোনো শব্দ কানে আসে না। তাও এর মধ্যে ছেদ আছে, দীর্ঘ ছেদ। একটা ফড়িং উমার হাঁটুর উপর এসে বসল, ছাপা শাড়ির ফুলের উপর। আবার উড়ে গেল। মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কখন যেন ঘোর লেগে যায় উমার।

রতিকান্ত কখন এসে পাশে বসেছে, উমার হুঁশ ছিল না। কিংবা হয়ত হুঁশ ছিল, তবু অন্যমনস্কতা কাটাতে পারে নি। রতিকান্ত জলের কুঁজো তুলে আলগোছে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

'কেমন লাগছে?' রতিকান্ত বেশ করে গা এলিয়ে বসল ঘাসের উপর।

'খুব সুন্দর।' উমা কোলের উপর জড় করা আঁচলটা পাশে ফেলে দিয়ে সুন্দর করে হাসল।

একটু চুপচাপ। উমাই বলল আবার, 'আমার যদি আপনার মতন কাজ হত, এখানে বসে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতুম।'

'একা একা ?' রতিকান্ত পরিহাস করে শুধোল হাসিমুখে।

উমা রতিকান্তর দিকে আড়চোখে চাইল হাসিমুখেই। মাথা কাত করে জবাব দিল, 'দোকা যখন নেই তখন একা একাই।'

রতিকান্ত সিগারেট ধরাল। আরো একটু আরাম করে বসল। বলল, 'তুমি কি কবিতা-টবিতা লেখ নাকি ?'

'না। আপনার বিয়েতেই একটা যা লিখেছিলুম।' উমা রতিকান্তর মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে থাকল।

'সেটা তো চুরি।' রতিকান্তর জবাব।

'কী—?' একটা কৃত্রিম তিরস্কার কিংবা প্রতিবাদ, 'আর একবার বলুন তো কী বললেন।'

'চমৎকার হয়েছিল কবিতাটা।' রতিকান্ত তাড়াতাড়ি তারিফ করার একটা ভঙ্গী করল, 'ফাস্ট' ক্লাস। কী ভাষা, কী ছন্দ ! পড়লেই রবিঠাকুরের সেই—আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে—মনে পড়ে যায়।' হাসতে লাগল রতিকান্ত।

উমা চুপ। অন্যদিকে চেয়ে থাকল। বলল তারপর, খুব মৃদু গলায় 'মিথ্যেই বা কী—বড় মাসীর বাড়ি তো আনন্দেই ছেয়ে গিয়েছিল।'

'আমি বোধহয় আনন্দময়ী—সরি, আনন্দময় ছিলাম ?' রতিকান্ত ধোঁয়া ছাড়ল। উমা মাথা হেলাল।

রতিকান্ত হঠাৎ বলল, 'আর তুমি বেচারী বোধহয় সেই দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে ?' রতিকান্ত হাসছিল। উমার মুখে হাসি ছিল না। এবার যেন একটু হাসি এলো, রতিকান্তর কথা শোনার পর। বলল, 'আপনি যা ভাবেন।' উমা ঘাসের উপর থেকে আঁচলটা তুলে মুঠোর মধ্যে দুমড়তে লাগল। আর বলব-না বলব-না করেও শেষে বলে ফেলল, 'আমার কবিতাটাই শুধু চুরি, আরো'—কথাটা শেষ করল না উমা।

ইঙ্গিতটা কিন্তু রতিকান্ত ধরতে পারল। উমার মার খোঁজ নেওয়া, দেখা পাত্র বিনুর মা চুরিই করেছে বলা যায়। পুরনো এই প্রসঙ্গটার জের না টেনে ব্যাপার-টাকে লঘু করার চেষ্টা করল রতিকান্ত। 'আমিও বোধহয় কিছু চুরিটুরি করে-ছিলাম, কী বল ? নেহাত বেঁধে আনতে পারলাম না—!'

একটু থেমে রতিকান্ত শালীর মুখের দিকে চাইল, 'সে কী আমার কম দুঃখ।' মুখেই হাসিঠাট্টার একটা হায় হায় বেদনার ভাব ফোটাল রতিকান্ত।

উমার মুখে কোনো জবাব নেই। বেশ খানিকটা নীরবতার পর উমা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানে বসে বসেই কি দিন কাটাবেন নাকি ? কই উঠুন, বলেছিলেন না যেদিকে দু-চোখ যায়—বেড়াব।' বলতে বলতে উমা উঠে দাঁড়াল।

রতিকান্ত খানিকটা উঠে বসে রোদের দিকে চাইল। 'এই রোদে ঘুরবে ? তারপর

যদি মাথা ধরে ?'

'আপনি টিপে দেবেন না হয় একটু।' উমা হেসে উঠল। একটু আগের সেই গম্ভীর মুখের রেশ সবটুকু এখনো কাটে নি। তবু এই হাসি সুন্দর। রতিকান্তর ভাল লাগল।

উমা আবার তাগাদা দিল।

উঠল রতিকান্ত। শুধু ওঠা নয়। উমার কথামত টিফিনের কৌটোটা পর্যন্ত হাতে ঝুলিয়ে নিল, চায়ের ফ্লাস্কটা কাঁধে। উমার ইচ্ছে দূরের ওই ছায়াঘন কোনো কুঞ্জে বসে চা খাবে। বিকেলের আগে এদিক আর মাড়াচ্ছে না।

হয়ত এমনিই হয়। একটা বাঁধা সীমানা ছাড়িয়ে চলে আসতে পারলে অনেক কিছু ভুলে যাওয়া যায়। শাঁখারিটোলার অন্ধ গলির মেয়ে অনেক কিছু ভুলল। ভুলে গেল যে, জুতো হাতে ঝুলিয়ে আল দিয়ে খালি পায়ে ছোটা দৃষ্টিকটু ; ভুলে গেল যে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে বলে চোরকাঁটার ভয়ে গোড়ালির অনেকটা উঁচু পর্যন্ত কাপড় তুলে নেওয়া অসভ্যতা। শাড়ির তলায় খানিকটা সায়া যে বেরিয়ে রয়েছে পায়ের কাছে এটা অভব্যতা এবং হোক রতিকান্ত জামাইবাবু, তবু যখন-তখন তার হাত ধরে টানা—উঠতে পড়তে তাকে জড়িয়ে ধরা, তার সঙ্গে অজস্র কথা বলা এবং ওর সঙ্গে অট্টরোলে সারাক্ষণ হাসাহাসিটা তার উচিত নয়। এসবই অনুচিত।

রতিকান্ত ভুলে যাচ্ছিল। বিনুর স্বামী হিসেবে তার যেসব কর্তব্য, সেই কর্তব্য-গুলো কি বজায় থাকছিল এখানে—এই রোদভরা মাঠে আর ফাঁকায় আর ফাল্গুনের হঠাৎ মধুর দুপুরে বোধহয় থাকছিল না। উমার ফরসা রোদের ঝাঁঝলাগা মুখ-খানা এত মুগ্ধ হয়ে তবে কেন সে দেখবে ? মাথার উপরকার তাতটুকু বাঁচাবার জন্যে, উমা আলগা করে যে-ঘোমটাটুকু তুলে দিয়েছিল, সেই ঘোমটাটুকু বা রতি-কান্তর এত ভাল লাগবে কেন ? কেন মনে হবে তার পাশে-পাশে মাথায় কাপড় তুলে দেওয়া যে মেয়েটি চলেছে এর সঙ্গে বিনুকে অনায়াসেই কল্পনা করা যায়।

উমার চঞ্চলতা, তার উচ্ছ্বাস, খোলামেলা রঙ্গরসিকতা রতিকান্তকে মুগ্ধ করছিল। শাঁখারীটোলার মেয়ে এত জীবন্ত—রতিকান্ত যেন জানত না। বুঝতে পাবে নি, উমার মধ্যে এত সুন্দর এক আকর্ষণ এবং মাধুর্য লুকিয়ে আছে। এখন বুঝছে রতিকান্ত। উমার ছায়ায় নিজের ছায়াকে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে এই নির্জনে হাঁটতে হাঁটতে।

ওরা ফুল পাড়ল। একরাশ ফুল। 'ইস্, কী লাল। ইচ্ছে হচ্ছে সব নিয়ে যাই। দিন তো একটা ছোট্ট মতন ফুল জামাইবাবু। মাথায় দি। দূর ছাই, এলো চুলে কি আর ফুল থাকে!'

'কই দাও, আমায় দাও। আহা, অত ছটফট করো না। ফার্স্ট ক্লাস।' রতিকান্ত সুতোর মতো দুটি চুলের গুচ্ছে ফাঁস দিয়ে পলাশ ফুলটা গুঁজে দেয়।

'আমি কী রকম ঘেমেছি দেখছেন জামাইবাবু? কপাল গলা বুক ভিজে টসটস করছে।'

রতিকান্ত উমার ঘামের বিন্দু তোলা মুখ-গলা দেখল। উমার রঙটা রোদের তাতে আরো লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি বড় সুন্দর উমার। বেশ টলটলে। গলায় একটা তিল। আলতা-লাল ব্লাউজটা যেন জ্বলজ্বল করছে। রতিকান্তর ঘোর লাগে।

উমার আঁচল ভর্তি পলাশ, ছাপা বাসন্তী রঙ শাড়িটায় কেমন একটা স্নিগ্ধতা।

'চলুন, এবার ওই পুকুরটার কাছে গিয়ে বসি। খুব ছায়া আছে।।'

পুকুরের পাড়ে এসে বসল দুজন। ছায়া এখানে ঘন। গাছ, লতাপাতা, বুনো মিষ্টি গন্ধ। জলটা কালো। ঘুঘু ডাকছে মাথার উপর। ক'টা শালিক ঘাস খুঁটছে। টিফিন, চা শেষ করে ক্লান্ত দুটি মানুষ বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝে মাঝে উমা মাটির ছোট ছোট ঢেলা ছুঁড়ছে পুকুরের জলে।

'কটা বাজল জামাইবাবু?'

'তিনটে প্রায়।' রতিকান্ত ঘড়ি দেখে বলল।

'আর ঘণ্টাখানেক, তারপরেই ফিরব, কেমন?'

'না ফিরলেই বা কী।' রতিকান্ত হাসে। কিন্তু এ-হাসি যেন শুধুই তরল তরল পরিহাস নয়।

'ও বাবা, খুব যে আটখানা প্রাণ দেখি।' উমা দাঁতে করে ঘাসের শিষ কাটছিল। আড়চোখে চেয়ে বলল।

'আটখানা নয়, তবে দুখানা।' রতিকান্ত আমগাছের ডালপাতায় চোখ রেখে জবাব দিল।

উমা পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে আরাম পেল। 'আমি কলকাতায় ফিরে গেলে—টুকরো দুটো আবার জুড়ে যাবে, না জামাইবাবু?' সরলভাবে হাসছিল উমা।

রতিকান্ত জবাব দিল না। ভাবছিল কিছু।

মধ্যাহ্নের খর উজ্জ্বলতা এবার ম্লান হয়ে আসছিল। অন্তত এখানে। পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে যে-অংশটুকু পুকুরপাড়ের সবুজের উপর এসে পড়েছে তার তীব্রতা এখন আর তত নেই। এ যেন মরা আলো। যে-পাশে রতিকান্তরা বসে আছে সে-পাশটায় ছায়া আরো গাঢ় ঘন হয়ে আসছে। আবহাওয়াটা কেমন ক্লান্ত, অলস, তন্দ্রাজড়ান। টুপটাপ দু-একটা পাতা খসে পড়ছিল পুকুরের জলে। একটা কাঠ-বেড়ালি আমগাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে। ঘুঘুর ডাকও আর

শোনা যায় না। বোধহয় উড়ে গেছে।

চুপচাপ দুটি মানুষ। কেউ কারুর দিকে চাইছে না। তবু দুজনেই অনুভব করতে পারছে, এখন একের মনে অন্যজন এই নিস্তব্ধ পরিবেশটির মতন ছড়ান, মাখান। উমা আঁচলে জড় করা পলাশ ফুল মাঝে মাঝে তুলছিল আর রাখছিল। কখনো ফুলের নরম পাপড়ি গালে গলায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে কোমল অথচ অন্যরকম এক স্পর্শ নিচ্ছিল।

তারপর একসময় উমা নিজের তন্ময়তার মধ্যে গুনগুন শুরু করল। সুরটা যখন কথায় ফুটল, তখন দিন আর মধ্য নেই, তবু তার কথাগুলো বাতাসে যেন শব্দ ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যেতে লাগল। ঘরোয়া মেয়ের ঘরোয়া গলায় গান। হয়ত সুরের হেরফের আছে। তবু, এ-গান, এখন—এই পরিবেশে নিজের মতন করে জগৎ গড়ে নিতে পারে। 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি—হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী।'

পাখিরা গান বন্ধ করেছিল, কিন্তু কোনো রাখাল বেণু বাজাল না। না বাজাক, রতিকান্তর মন দূরবাঁশির সুর শোনার মতন আনমনা। উমার মনও।

গান থামল। ছায়া যেন আরো বিষণ্ণ হল এখানে। একটা দমকা হাওয়া এলো। গাছ-পাতা নড়ল। হাওয়ার শব্দটা অবুঝ দীর্ঘনিশ্বাসের মতন খানিকক্ষণ ছটফট করে মিলিয়ে গেল।

রতিকান্তর চোখ নাকি সব সময়ে হাসি দিয়ে মাখান। এখন মনে হচ্ছিল, কথাটা ভুল ; ভীষণ এক অন্যমনস্কতা এবং বিষণ্ণতা মাখান। সেই চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে উমাকে মাঝে মাঝে দেখছিল রতিকান্ত। উমার ঠোঁটে পানের লাল দাগ শুকিয়ে গেছে। চোখের তারার তলায় তেমনি একটা শুষ্কতা।

চারটে বেজে গেছে কখন। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। রতিকান্তর যেন হুঁশ হল। বলল, 'চল উমা, ওঠা যাক।'

উমা উঠে দাঁড়াল। পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মাঝে মাঝেই একটা পুকুর দেখি। জল টলটল। এটা বোধহয় সেই পুকুর, না জামাইবাবু ?'

'বোধহয়।' রতিকান্ত হাঁটতে শুরু করে বলল, 'এবার থেকে আমিও বোধহয় দেখব।'

পুকুরের উঁচুটুকু পার হয়ে আসতেই একটা গাছে উমার আঁচল জড়িয়ে গেল। আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে গাছটা একটু দেখল উমা। হঠাৎ বলল, 'এটা কী গাছ, জানেন ?'

গাছটা চিনত রতিকান্ত। বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলল না। মাথা নাড়ল, জানি না।'

অথচ মাঠে নেমে রতিকান্ত কিছুতেই বুঝতে পারল না, কামরাঙা নামটা কেন

তার ঠোঁটে আটকে গেল ? কেন ? আর কেনই বা এখন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে তার।

পড়ে আসা বিকেলের আলো দিয়ে ফিরে চলল রতিকান্ত আর উমা।

পাঁচটা নাগাদ ট্রলি ফেরার কথা। ফিরল না। মাঝখানে কোথায় প্যাসেঞ্জার-ট্রেনটা আটকে গেছে লাইনের গোলমাল হয়ে, খানিক দেরি হবে।

দেরি বলে দেরি। প্রায় একটা ঘণ্টা আটকে থাকতে হল। প্যাসেঞ্জার-ট্রেনটা চলে গেল রতিকান্তরা যখন ট্রলিতে উঠল—তখন সামনের মাঠে গোধূলি সবটুকু আলো ঢেলে দিয়ে মাটির তলায় চলে গেছে।

এবার ফেরার পালা। ট্রলিম্যানরা জোর কদমে ছুটেছে। ট্রলিটাও যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। উমা পায়ের কাপড় হাঁটু দিয়ে চেপে বসল। আঁচলে জড়ানো একরাশ পলাশ।

'দিনটা বেশ কাটল, না জামাইবাবু ?' উমা বলল।

'হ্যাঁ। বেশ।'

'আমি তো ভুলতেই পারব না।' উমার এলো চুলের একটা গুচ্ছ হাওয়ায় তার চোখের উপর এসে পড়ল। চুল সরাতে লাগল উমা।

রতিকান্ত কোনো কথা বলল না।

চাঁদ উঠল। শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ। কেউ জানত না, খেয়ালও করে নি। হঠাৎ যেন চোখে পড়ল। পূর্ব আকাশ ধবধব করছে। গোল চাঁদটা ওদের মুখোমুখি।

আর সেই চাঁদের আলো রেল-লাইনের দুপাশে, সামনে মাঠে, গাছে, জঙ্গলে ছড়িয়ে গেছে। ডুবে গেছে বলা যায়। সবই স্পষ্ট, লাইন দেখা যাচ্ছে, পাথর, সিগন্যালের তার পর্যন্ত। পাশের মাঠঘাটও যেন সকালের ফরসায় স্পষ্ট। একটা ছুঁচ পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া সহজ।

উমা দু-চারটে কথা বলছিল এতক্ষণ, এবার চুপ করে গেল। রতিকান্ত একেবারেই অন্য মানুষ। কথা তো বলছেই না, উমার দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না। ট্রলির চাকায় সেই সুন্দর একটানা শব্দ। ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়াটা দিচ্ছে। কী যে সুন্দর গন্ধ !

রতিকান্ত কথা বলছিল না। কিন্তু ভাবছিল। ভাবছিল, হঠাৎ, এ কী হয়ে গেল তার ? কেন হল ! এমনিই হয় নাকি।

বিনুকে বার বার জোর করে মনের সামনে টেনে আনছে রতিকান্ত। এ যেন ঝুটো কি আসলের বিচার। এতকাল—চারটে বছর বিনু কি ঝুটো ছিল ? আবিষ্কার করার কারণটা আজই ঘটল রতিকান্তর। আজকের সকাল, দুপুর-বিকেলের অভিজ্ঞতার

পর।

বিনু যে ঝুটো—এ-কথাটা রতিকান্ত নানাভাবে ভেবেও স্থির করতে পারছে না। প্রথমত তাকে স্ত্রী হিসেবে না ধরে একটি মেয়ে হিসেবেই ধরা যাক। পুরুষের চোখে খারাপ লাগবে এমন মেয়ে বিনু নয়। এ-কথা ঠিক, বিনু ডানা-কাটা পরী নয়। কিন্তু এও তো ঠিক, বিনু কুৎসিত নয়। বিনুর রঙ ফরসা, উমার মতনই প্রায়। বিনুর মুখের গড়ন ভাল ; উমার চেয়েও ভাল। বিনুর ঠোঁট দুটি সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। তার চুল আরো কালো। দেহের গড়নে খুঁত যেসব আছে—সেসব খুঁত সকলের থাকে, লক্ষতে একটি দুটি বাদে। উমার চেয়ে বিনু রূপের বিচারে হীন নয়, বরং ভাল। আর তাই তো রতিকান্তর বিয়েটা বিনুর সঙ্গেই হল। দিদি দেখে, বিনুকেই সেরা ভেবেছিল।

রতিকান্ত এরপর বিনুকে স্ত্রী হিসেবে যাচাই করতে লাগল। ভাল লাগে না, এমন স্ত্রী তো বিনু নয়। যা চায় মানুষ, স্ত্রীর কাছে—যেসব সহজ, সাধারণ প্রত্যাশা—বিনু তার কোনোটাই মেটাতে পারে না—এমন নয়। বিনু ভাল ঘরণী। স্বামীর জন্যে, সংসারের জন্যে তার দিনরাত্তির এক হয়ে গেছে। যদি বল সেবা, বিনু আর দশটা বাঙালী ঘরের মেয়ের মতন সেবাময়ী। তার মন নরম, কোমলতায় স্নিগ্ধ। স্বামীর পান-চুন হাতে হাতে যোগায়। রুমাল, গেঞ্জি, মোজা কাচে! আবার সর্দি হলে তেল মালিশ করে দেয়।

বিনু আমায় ভালবাসে। আমি বিনুকে ভালবাসি। আমার মেয়েকে। আমার সংসারকে। রতিকান্ত মনে মনে কথাটা বলে ফেলে অনেকটা স্বস্তি পেল।

কিন্তু? রতিকান্ত এতক্ষণ পরে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে উমাকে দেখল। উমা ভাবুকের মতন গালে হাত দিয়ে দিগন্ত-ধোয়া জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছে। ফাল্গুনের হাওয়ায় তার এলোমেলো চুল আরো আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

উমাকেও যেন বড়ো ভাল লাগছে! রতিকান্ত পুরনো কথাটা আবার মনে টেনে আনল। মনে হচ্ছে, এইভাবে যদি ট্রলিটা রাতের পর রাত জ্যোৎস্না-ডোবা মাঠ-ঘাটের মধ্যে লাইন দিয়ে ছুটে যায়—রতিকান্তর ইচ্ছে হবে না, ও থামুক ; রাত শেষ হোক।

কিন্তু এ-কল্পনার অর্থ হয় না। রাত ফুরবে। চাঁদ ডুববে। ট্রলিও থামবে। তার চেয়ে বাস্তব একটা কল্পনা করা যাক। উমা যদি এখানে থেকে যায়, তার কাছে। যদি এমনি মাঝে মাঝে ওরা দুটিতে ফাঁকায় বেড়াতে বেরোয়। সেটা তো অসম্ভব নয়। তখন কি ভাল লাগবে না উমাকে? লাগবে, লাগবে, লাগবে।

রতিকান্তর মনে এক ধরনের অনুভূতি জুড়ে বসছিল। বেশ বুঝতে পারল রতিকান্ত, উমাকে তার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। একটা পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ বাইশ বছরের এক মেয়েকে যেমন করে ভালবাসতে চায়, তেমনভাবে।

…আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে—এদের ভালবাসার পরও আমি কী করে উমাকে ভালবাসতে পারি ? এটা সম্ভব নয় ।…

সম্ভব যে কেন নয় রতিকান্ত ভেবে ভেবেও তার কোনো সুসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না । যেসব কারণ সকলেই জানে, রতিকান্তও—তারও, বাস্তবিক তার কোনো কিছুরই মাথামুণ্ডু রতিকান্ত বুঝতে পারছে না এখন ।

ইচ্ছে করাটা এক, আর ইচ্ছে করতে নিষেধ করাটা অন্য জিনিস । ইচ্ছেটা মনের নিষেধটা অন্যের ।

ভালবাসার এক ইচ্ছের সঙ্গে কি আর কিছু নেই । কিচ্ছু না ? রতিকান্ত মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে টেনে টেনে স্নায়ুগুলোকে একটু পরিষ্কার করতে লাগল । কিন্তু কিছুই হল না । রতিকান্ত অনুভব করতে পারল, তার আবার নতুন করে ত্রিশের আগে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে । যখন তাঁর বিয়ে হয় নি, যখন যে-কোনো মেয়েকে ভালবাসা যেতে পারত, অন্তত সেটুকু নিষ্কলুষ স্বাধীনতা তার ছিল ।

…এখন আমার আর সে-স্বাধীনতা নেই । ইচ্ছে থাকলেও । মন চাইলেও । ভালবাসার জন্যে মন কাঁদলেও ।…

কেন ?

কেনর জবাবটা রতিকান্ত জানে না । অথচ বিনুকে জানে এবং কেনর কথায় বিনু, বিনুর মেয়ে আসে । তারা আসবেই । রতিকান্ত তাদের সরাতেও চায় না ।

ট্রলিটা প্রায় রতিকান্তদের স্টেশনটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে । তেমনি খই-ছড়ানো জ্যোৎস্না, দক্ষিণের হাওয়া, উমার লাবণ্যভরা মুখ ।

রতিকান্তর মনে হঠাৎ অন্য একটা কথা কিভাবে যেন এসে যায় । ঢেউয়ের একটা ধাক্কার মতন । আর কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজেকেই তার পাগল মনে হয় ।

তবু কথাটা না ভেবেও পারে না রতিকান্ত । আর তার মনে হয়, (ভালবাসাটা একটা গুণ । গুণ । কোয়ালিটি ।) নিজের মনের কাছে নিজের মুখ রেখেই রতিকান্ত তার এই সহসা-আবেগ প্রকাশ করে ফেলে । যেমন দয়া, যেমন সততা—রতিকান্ত বলছিল এবং বেদনা অনুভব করছিল, তেমনি, আমার, আমাদের এ-ভালবাসা, এই ভালবাসার ইচ্ছাটা একটা গুণ । আমাকে আমাদের এই ভালবাসাকে সংখ্যায় বেঁধে ফেলতে বলছ । বেশ তো বাঁধছি । আমার স্ত্রীকেই আমি ভালবাসব ; শুধু একটি মেয়েকে । কিন্তু ভালবাসতে ইচ্ছে করছে উমাকে—এই ইচ্ছেকে তুমি নষ্ট করে দিতে চাও । পারবে ? পারবে না ।

একটা শব্দ উঠছিল । ট্রলি ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে । স্টেশন এসে গেল ।

ট্রলি থেকে নামবার সময় উমা হঠাৎ বলল ; 'ও জামাইবাবু, আমি কি এমনি ভাবে পুঁটলি বেঁধে রাস্তা দিয়ে যাব নাকি ? ফুলগুলো আপনি নিন ।' উমা আঁচল খুলে ধরল ।

রতিকান্ত থমকে চেয়ে থাকল একটু। টকটকে রোদে পলাশগুলো কত লাল ছিল, আর এখন চাঁদের এমন আলোতেও যেন সেই লাল মরে ক্ষয়ে কেমন পাংশু রঙের হয়ে গেছে।

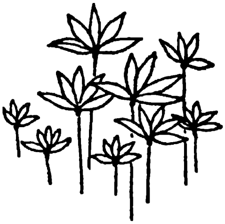
'তাই দাও।' রতিকান্ত ম্লান হাসি হেসে বলল, 'ওগুলো এখন আমার হাতেই ভাল মানাবে।' ফুলগুলো তুলে রুমালে বাঁধতে লাগল ও।

'মানে?' উমা তাকাল।

'মানে আর কি, ওদের অবস্থা এখন আমারই মতন।'

উমা জামাইবাবুর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে তারপর বলল, 'ছি ও-কথা বলবেন না। বলতে নেই।'

উমার চোখে বড়ো সুন্দর একটু হাসি ছিল।



সুধাময়

আমার বন্ধু সুধাময় আমায় শেষ চিঠি দিয়েছিল মাস পাঁচেক আগে। তখন ওর মন খুব অস্থির ; নিজের সঙ্গে অদ্ভুত রকমের এক বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করছিল। আমি তা জানতাম। চিঠিতেও খাপছাড়াভাবে সে-সব কথা কিছু কিছু ছিল। কিন্তু এমন কোনো কথা ছিল না, যা থেকে মনে করা সম্ভব, মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম ছেড়ে সুধাময় হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে।

ওর শেষ চিঠির জবাব দিয়ে আমি মাস খানেক পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। সচরাচর দিন পনেরো অপেক্ষা করলেই ফিরতি জবাব আসত। উত্তর পাই নি। উদ্বিগ্ন হয়ে আবার চিঠি দিয়েছি, অপেক্ষা করেছি। তারপর আবার। শেষে টেলিগ্রাম। ডাক্তার মুখার্জির চিঠি থেকে শেষে জানতে পারি, সুধাময় মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, ফিরবে কি ফিরবে না—কেউ জানে না।

পাঁচ মাস পরে কাল সুধাময়ের দু-ছত্রের এক চিঠি পেলাম। ঠিকানা নেই কোনো। কোথায় আছে তাও লেখে নি। পোস্ট অফিসের সিলের ছাপ থেকেও স্পষ্ট কিছু বোঝবার উপায় নেই। রেলের মেল-সার্ভিসে ফেলা চিঠি। খুব সম্ভব দিন তিনেক আগে নাগপুরে এই চিঠি ফেলা হয়েছে।

সুধাময় লিখেছে : তোমার লেখা একটা গল্প হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। ওয়েটিংরুমে বসে মাঝরাত্রে সেই লেখা পড়লাম। মালা-বদলের রূপকথা কি প্রেম? না চোখে বান ডাকলেই প্রেম হয়? প্রেম কি তুমি জান না বা সঠিকভাবে বোঝো না। তবু, কেন লেখ? প্রেমের উপলব্ধি যদি কোনো দিন হয় তোমার, তবে লিখো, নচেৎ নয়। আশা করছি, তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। ইতি সুধাময়।

সুধাময়ের চিঠি অপ্রত্যাশিত। এবং বলা বাহুল্য, নাটকীয়। আমার পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত আমি আহত হয়েছি। তবু, একটু যে খুশী বা নিশ্চিন্ত না হয়েছি এমন নয়। সুধাময় বেঁচে আছে—আমাকে মনে রেখেছে—এটুকু জানাও কিছু কম নয়।

কিন্তু সুধাময়কেও একটা বিষয় আমার জানানো দরকার। তার ঠিকানা জানলে কাজটা চিঠি দিয়ে সারতে পারতাম। গর-ঠিকানার সেই বন্ধুর জন্যে আমায় আর একটা গল্পই লিখতে হচ্ছে। তার চোখে পড়বে এ-আশা আমার অল্প। তবু, বলা যায় না, যে-নাটক নাগপুরের কাছাকাছি কোনো রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে মাঝ-

রাত্রে একবার ঘটেছে—হয়ত আবার কোনো এক সকালে বা দুপুরে মন্থরগতি কোনো ট্রেনের কামরায় সেই নাট্যদৃশ্যের পুনরভিনয় হতে পারে। চোখে পড়লে, আমি জানি, সুধাময় আমার লেখা পড়বে, সমস্ত মন দিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিংবা এমন যদি কখনও হয়—আপনাদের কেউ যদি এ-গল্প পড়েন, অন্তত ভাসা-ভাসা ভাবেও মনে থাকে এই গল্প, এবং এমন কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—যার নাম সুধাময়, প্রায় চল্লিশ বয়স, টকটকে ফরসা, একটু রোগা চেহারা, ভীষণ ধারালো নাক, মেয়েদের মতন টলটলে গভীর চোখ, অথচ নিবিড় দৃষ্টি, জোড়া ভুরু, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, কপালের ডান পাশে একটা বড় মতন আঁচিল—অনেক চুল মাথায় আর মুখে সব সময় শান্ত হাসি লেগে আছে—না, একটু ভুল হল, এক সময় এই হাসি অবশ্য লেগে থাকত, এখন হয়ত তা নিভে গেছে—হ্যাঁ, এ-রকম কাউকে দেখতে পেলে সময়মতন একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তার নাম কি সুধাময় বিশ্বাস, মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ামে থাকত ?

আমার বন্ধু সুধাময় তার পরিচয় গোপন রাখবে না। আমি জানি। মিথ্যে কথা সে বলে না, কপটতা অপছন্দ করে। তা ছাড়া এমন কোনো কারণ নেই, নিজের নাম কিংবা পরিচয়ের মতন তুচ্ছ একটা ব্যাপারের জন্য সে রহস্যের আশ্রয় নেবে।

'আপনার কথা আমি শুনেছি।' সুধাময়কে বিস্মিত করে আপনি বলতে পারেন তখন, 'আপনার বন্ধুর কাছ থেকে। তিনি একটা গল্প লিখেছিলেন আপনাকে নিয়ে। গল্পটা কিছু নয়, কিন্তু আপনি মশাই ভীষণ ইণ্টারেস্টিং ক্যারেকটার। আপনি নাকি জীবনে···। দেখছেন প্রথমেই একেবারে জীবনে চলে যাচ্ছি আপনার। না, সেটা উচিত নয়। তার আগে মোটামুটি আপনার পরিচয় যা পেয়েছি তা বলা দরকার। কে জানে, আপনার লেখক বন্ধু কতটা রঙ চড়িয়েছে বা আলকাতরা মাখিয়েছে গায়ে। তেমন হলে সবটাই বাজে, মনগড়া ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।'

'যতদূর মনে পড়ছে আপনি, সুধাময়বাবু, খুব সুন্দর এক দিনে জন্মেছিলেন। কোজাগরী পূর্ণিমায়। বাংলা দেশের কোজাগরী পূর্ণিমা যে কী আমার পক্ষে তা বর্ণনা দিয়ে বলা অসম্ভব। আপনাদের দেশের বাড়ির গা ছুঁয়ে নদী বয়ে গিয়েছিল। এ পাশে তিনমহলা বাড়ি; ও-পাশে ধু-ধু চর আর সবুজ গাছপালা। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে, সেই ফিনকি-ছোটা জ্যোৎস্নায় নদীর জল যখন রুপোর পাতের মতন ঝকঝক করছে, কলকল একটা শব্দ উঠে বাতাসে মিশ খেয়ে গেছে, ঝিঁঝি ডাকছে, জোনাকি উড়ছে, কেমন এক আশ্চর্য গন্ধ, চর আর বুনো লতা-পাতা ফুটফুটে আলোয় ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নের ঘোরে ফিসফিস করে উঠছে—বিশ্ব-চরাচর শান্ত, স্তব্ধ, সমাহিত—তখন দোতলার পূব-দক্ষিণের সবচেয়ে বড় ঘরটিতে কচি গলার একটা কান্না ককিয়ে উঠল। নদীর দিকের খোলা জানলা দিয়ে কোজাগরীর বাঁধা-ভাঙা আলো চামর দোলাচ্ছে ঘরে; উত্তরের দিকে 'জন্মসুখী' প্রদীপ। আপনার

মার গায়ে তখনও লক্ষ্মীপুজোর শাড়ি। কোরা গন্ধ উঠছে।
আপনার পিসি ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার ভাইকে বলল, দাদা—খোকা হয়েছে।
আপনার বাবা তখন তেতলার শোবার ঘরের সামনে নদীর-দিকে-মুখ-করা টানা বারান্দায় একা চুপচাপ বসে। সুন্দর, শান্ত, স্তব্ধ এক বিশ্বের লীলা দেখছিলেন তন্ময় হয়ে।
'তোর বৌদি ভাল আছে ?'
'হ্যাঁ।'
'খোকা ?'
'বলো না ; পেট থেকে পড়তে না পড়তেই কী কান্না! গলা চিরে ফেলল।'আপনার পিসি শুভসংবাদের ফুলঝুরিটি জ্বালিয়ে দিয়ে ধড়ফড় করে ফিরে যাচ্ছিল।
'শোন, সুবর্ণ—!' আপনার বাবা ডাকলেন পিসিকে, হাত দিয়ে জ্যোৎস্না-আকুল নদী চর বন আকাশ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এরই কোথাও থেকে ও এসেছে কি না—তাই বড় লেগেছে। অত কান্না। ভাবছে বুঝি অত আনন্দ অত সুধা থেকে কেউ ওকে কেড়ে নিয়ে এসেছে। বড় হলে বুঝতে পারবে এ-সবের সঙ্গেই সে আছে। তখন আর কাঁদবে না।'
আপনার ঊনিশ বছরের পিসি তার দাদার এত তত্ত্বকথা বুঝল না। বোঝার গরজও ছিল না তার। চলেই যাচ্ছিল আবার, আপনার বাবা বললেন, 'সুবর্ণ, তোর ভাই-পোর নাম থাক সুধাময়।'
'বা! বেশ নাম ; কী সুন্দর নাম হয়েছে দাদা।' পিসি যেন নামটা আঁতুড়ঘরের দরজায় পৌঁছে দিতে ছুটে চলল।

জন্ম থেকেই আপনি সুধাময়।
মা বাড়িতে আদর করে কখনো কখনো ডাকত, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকান্ত। নামটা আপনার পছন্দ ছিল না, বাবারও নয়, পিসির তবু বা একটু ছিল। ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীর যে পট ছিল, তাতে লক্ষ্মীর চেহারাটা ছিল বামুন দিদিমণির মতন। তেমনি মোটা-সোটা, ভারিক্কী। পানের বাটা আর ভাঁড়ারের চাবির গোছা সব সময় হাতের কাছে রেখে সে বসে থাকত। এই বামুন দিদিমণিকে আপনার ছেলেবেলা থেকেই তেমন পছন্দ হত না। পটের লক্ষ্মীর সঙ্গে দিদিমণির চেহারার মিল যদিও বা ভুলতে পারতেন, কিন্তু পায়ের তলার বিরাট প্যাঁচাটি কিছুতেই সহ্য হত না।
'প্যাঁচায় চড়ে লক্ষ্মীঠাকুর কেন ঘুরে বেড়ায়, মা ?' আপনি শুধোতেন মাকে।
মা বলত, 'ওমা ও যে বাহন-রে!'
বাহন কি কে জানে! তবে এই বাহনটি যে বিশ্রী তাতে আর কথা ছিল না। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, এক বোনকে ভীষণ অপছন্দ হলেও অন্য বোনকে আপনার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। সরস্বতী। সরস্বতী ধবধবে সাদা, সুন্দর ; পায়ের তলায়

কী চমৎকার হাঁস, পদ্মফুল ; হাতে বই, বীণা।
'সরস্বতীকে বিয়ে করব' বলে একদিন কী ভীষণ আব্দার যে জুড়েছিলেন আপনি সে-কথা আপনার মা কিংবা বাবা বোধহয় শেষ বয়সেও ভুলতে পারেন নি।
'তোমার ছেলের পয়সাকড়ির ওপর টান থাকবে না, দেখছ তো পুণ্য। আমার মতনই হবে শেষ পর্যন্ত।' আপনার বাবা বলতেন।
'তাতে আর ভালটা কি হবে ; এই সর্বস্বই তো যাবে।' মা জবাব দিতেন। 'সব বিলিয়ে টিলিয়ে বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'
'তা কেন, আমি কি বৈরাগী হয়েছি?'
'কমটাই বা কি! নেহাত শ্বশুরঠাকুর থাকতে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই। নয়ত বিয়েটাও কি করতে নাকি।' আপনার মা, পুণ্যময়ী বলতেন ঈষৎ যেন ক্ষুব্ধ হয়ে। তারপর ভবিষ্যতের ভাবনা তুলে দিতেন কথার কটা টুকরো দিয়ে। 'যে-বয়সে ছেলে হল সেটা এমন কোনো কাঁচ বয়েস নয় আমাদের। খানিকটা মানুষ করে যেতে না পারলে কি যে হবে বুঝতে পারছ তো!'
'মানুষই তো করছি। দেখছ না, রোজ নিজে দু-বেলা পড়াই ওকে।'
'দেখছি। পাঁচ বছরের ছেলে—সকাল-সন্ধ্যে ছাদে দাঁড়িয়ে বাপের সঙ্গে হাত জোড় করে গান গেয়ে প্রার্থনা করছে, 'তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে, নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে।' পুণ্যময়ী একটু হাসেন।
'এর চেয়ে তোমার লক্ষ্মীর পাঁচালী বা সত্যনারায়ণের ছড়া শেখালে কোন্ ভাল শিক্ষা হত?' আপনার বাবা শুধোন স্মিত হাসি হেসে।
'জানি না। ঠাকুর-দেবতায় অন্তত ভক্তি হত।'
'ভক্তি শিখতে হয় না, ওটা এমনিতেই আসে, সংস্কারের সঙ্গে। এই যে আমায় তুমি অত ভক্তি করো, এ কি কেউ শিখিয়েছিল?' আপনার বাবা একটু হাসি-হাসি মুখ করে মায়ের দিকে চেয়ে থাকেন ; তারপর বলেন, 'ভক্তিতে দরকার নেই ; ও ভালকে ভালবাসতে শিখুক। ওটা শিখতে হয়।'
'আমাকেও শিখতে হবে নাকি?' পুণ্যময়ী হাসেন, আড়চোখে স্বামীকে লক্ষ করে। বাবাও হেসে ফেলেন।
আপনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মা বলেন, 'তোর বাবা কাকে বেশি ভালবাসতে শেখাচ্ছে রে সুধা ; আমাকে, না তোর বাবা নিজেকেই?'
'তোমাকে। পিসিকেও আমি অনেক ভালবাসি। টুনটুনিকেও।' টুনটুনি বেড়াল ছানা।
পুণ্যময়ী হাসতে গিয়েও হাসতে পারেন না। চোখ্ দুটো ছলছল করে ওঠে।
আপনার ছেলেবেলার কথা আরও যেন কি আছে সুধাময়বাবু। হরি বাউল, মধু মাস্টার, অমৃত পণ্ডিত…সব আমার মনে পড়ছে না। মোটামুটি এই বাল্যশিক্ষাটা হয়েছে বাড়িতে। মনের বাইরের দিকটা তৈরি করছিলেন বাবা, ভেতরটা মা। এক-

জনের শিক্ষায় কৌতূহল এবং বিস্ময় দিন-দিন বাড়ছিল ; অন্য জনের প্রভাবে এমন একটা নরম স্বভাব গড়ে উঠছিল যা পুরুষ-চরিত্রে অল্পই দেখা যায়। বাবা আপনাকে এক ধরনের সুন্দর নিঃসঙ্গতা শিখিয়েছিলেন—মা আত্মমগ্ন মাধুর্য। এখানে বড় একটা বিরোধ ছিল না। বরং বলা যায়, আপনি যদি সেতু হন, তবে এঁরা ছিলেন দু দিকের দুই ভূমি। সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণতা।

বিরোধ ঘটল অন্য জায়গায়। মা চাইতেন, ছেলে তাঁর রক্তমাংসের মানুষ হোক, সংসারের আর পাঁচজনের মতন—তবে মাথায় উঁচু। ডাক্তার হতে চায় তো তাই হোক, জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায় তো তাই হোক ; বিয়ে-থা ঘর-সংসার করুক। কিন্তু এ কি সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করছে সুধা ? আজ কলকাতায় পড়তে গেল তো কাল ছেড়েছুড়ে চলে গেল বেনারস। বেনারসে মাস তিনেক কাটতে-না-কাটতে আবার কলকাতা।

'একটা কিছু তো তাকে করতে হবে।' মা বলেন অনুযোগের গলায় স্বামীকে।

'না করলেই বা কি! আমাদের যা আছে তাতে ওর একার জীবন বেশ কেটে যাবে।' বাবা জবাব দেন।

'জীবন কাটাটাই কি বড় কথা ?'

'কখনোই নয়। তবে জজ ব্যারিস্টার হওয়াটাও হাতে স্বর্গ পাওয়া নয়।'

'সুধা ছন্নছাড়া হয়ে থাক, এই কি তুমি চাও ?'

'সুধা সুধার মতন হোক এইটুকু শুধু আমি চাই। সে বড় হয়েছে। আমার মর্জি-মতে, আমার ভালমন্দ বোঝার ওপর তাকে আমি চালাতে চাই না। সে হবে জবর-দস্তি। পিতৃত্বের ছোট বেড়া থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছি, পুণ্য। আমাদের সম্পর্ক রাজা প্রজার নয়। আমি আধিপত্য করব না, তার ফসলের ভাগ চাইব না।'

পুণ্যময়ী স্বামীর এই মুক্তিতত্ত্ব বুঝতেন না। কিছুতেই মাথায় ঢুকত না।

এই সময় ছেলেকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখলেন পুণ্যময়ী। তাতে অনেক কথা ; নানা উপদেশ অনুরোধ। শেষে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও থাকল : সুধা, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। তোমার পিতৃপুরুষের ভিটের সন্ধ্যেপ্রদীপ দিতে তোমার পর আরও একজনের যে থাকা দরকার। সব দিক বিবেচনা করা কি তোমার কর্তব্য নয় ? বাবা সুধা, আত্ম-সুখী হয়ো না, তাতে কষ্টই পাবে।

পুণ্যময়ীর চিঠির জবাব দিল সুধাময় তিন গুণ দীর্ঘ করে। তাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা। স্বামীর নানারকম হেঁয়ালি যেমন পুণ্যময়ীর দুর্বোধ্য লাগত এবং সে-সব তত্ত্বকথার সঙ্গে সংসারের কোনো কিছুকে খাপ খাওয়ানো অসম্ভব ছিল, সুধা-ময়ের চিঠিরও প্রায় নিরানব্বইটা কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। সুধা এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে না এই খবরটা ছাড়া বাকি যা বুঝলেন তাতে পুণ্যময়ী নিঃসন্দেহ হলেন, সুধা বিয়ে করবে না।

'আমি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছি, মা। আমার মনে শান্তি নেই। কী ভীষণ অতৃপ্তি যে ! আমার সুখ কিসে, কেমন করে তা পাব, কে জানে। বাবার কাছে

শিখেছি, যা ভাল তাকে ভালবাসতে পারলে আনন্দ। আমার মনে আনন্দ কই! কত ভাল জিনিস দেখছি, ভালও লাগছে, কিন্তু কই তেমন আনন্দ তো হয় না। আমি পারছি না…ভালবাসতে পারছি না।…তুমি বুঝতে পারবে কি মা, আমি কত নিঃসঙ্গ আর একা-একা রয়েছি। আমায় এখন একাই থাকতে হবে।…"

চিঠি থেকে বোঝা গেল ছেলে পাগল হয়েছে। তার বাবার চেয়ে বেশি। উনি তবু সংসার বাদ দেন নি, ছেলে সবকিছুই বাতিল করছে।

ছেলের চিঠি স্বামীর সামনে ফেলে দিয়ে পুণ্যময়ী বললেন, 'সুধাকে একবার এখানে আসতে লেখ; অনেকদিন দেখি নি।'

সুধাময়কে বাড়ি আসতে লেখা হল। তখন প্রচন্ড বর্ষা। নদীর জল তট ছাপিয়ে অনেকখানি উঠেছে। দেশের বাড়ির ভিত অনেক আগেই জলে ডুবেছে। তার ওপর চার দিন ধরে সমানে একটানা বৃষ্টি। জল বেড়েই চলেছে। নদীর-দিকে-মুখ-করা লম্বা টানা বারান্দার উত্তর কোণের খানিকটা কেমন করে যেন ধসে গেল। সেই সঙ্গে বাবাও। ঘোলা জলের তোড়ের সঙ্গে ভাসা দেহটা অনেকখানি চলে গিয়েছিল। গিয়ে আটকে ছিল জামরুল গাছের গায়ে।

সুধাময় বাড়ি এসে পৌঁছিল যখন, বাবার দেহটা ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িতে যেন সেই ছাই উড়ছিল। বাবার সেই বসার ঘরটা কী অদ্ভুত ফাঁকা, আলমারির বইগুলো যেন বাবার সঙ্গে শেষ কথা বলে চিরকালের মতন চুপ করে গেছে, শোবার বিছানাটি পর্যন্ত নিঃসঙ্গ করুণ!

সুধাময় অনুভব করতে পারছিল, কোন্ জিনিস তার খোওয়া গেল, কিন্তু বলতে পারছিল না। এ-সংসারে তার সবচেয়ে নিকট বন্ধু, একান্ত শ্রদ্ধার মানুষ এবং সেই মহৎ শিক্ষকটিকে সুধাময় হারিয়েছে—যাঁকে কোনোদিন হারাতে হবে এ যেন তার চিন্তায় আসে নি। নিজেকে ভীষণ অসহায়, সম্বলহীন মনে হচ্ছিল সুধাময়ের। অদ্ভুত রকম শূন্য, নিঃসঙ্গ।

'আমরা যে-জগতে বাস করি সে-জগতে অনিত্যতার একটি নিষ্ঠুর নিয়ম আছে। আমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। যে-ঘরে আমরা রাত কাটাতে এসেছি, যদি সে-ঘরের দীপশিখা সব সময় বাতাসে কাঁপে, নিভু-নিভু হয়—তবে আর আশ্বাস কোথায়? যে-কোনো সময় অন্ধকার আসতে পারে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যে ক' মুহূর্ত আছি—আমরা কি মানুষের মতন বাঁচতে পারি? না ভাই, পরিমল—তা সম্ভব নয়। আমরা হুড়োহুড়ি করে, দাপাদাপি করে সুখ অর্থ সম্মান ঘর বাড়ি আধিপত্য যা পাই যতটা পারি লুঠে নিতে চাইছি। কী শোচনীয় অবস্থা! মর্মান্তিক স্থিতি!' সুধাময় দেশের বাড়ি থেকে কলকাতার বন্ধু পরিমলকে এক চিঠিতে লিখল।

জবাবে বন্ধু লিখেছিল: 'ভাই সুধা, দিনে দিনে তুমি বড়ই দার্শনিক হয়ে উঠছ। আমি জানি, তোমার মনের ছাঁচই অমন। তবু একটা কথা তোমার বোঝা দরকার,

ছটফট করার চেয়ে শান্ত হয়ে সবদিক ভেবে দেখা ভাল। আমি যতদূর জানি, তুমি মনের শান্তি, নিরুদ্বিগ্ন স্থৈর্যের পথচারী। যারা এত বিচলিত-হৃদয় তারা কি গভীরতম কোনো সত্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে? অত হতাশ হয়ো না, চঞ্চল হয়ো না —নিজেরই ক্ষতি হবে।'

দীর্ঘ দু বছর সুধাময় দেশের বাড়ি ছেড়ে নড়ল না। পুণ্যময়ীর অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যেন একপাশের ডানাকাটা এক অসহায় পাখির মতন পড়েছিলেন। করুণ, শোকাবহ, হৃতশক্তি। হয়ত এতোটা হত না যদি তাঁর অন্য ডানাটিও সবল থাকত। কিন্তু সুধাময় তাকেও আড়ষ্ট, অনড় করে রেখেছে। পুণ্যময়ীর বার বার মনে হত, স্বামীর মৃত্যু ঠিক স্বাভাবিক নয়। যেন নিজের এবং স্ত্রী এবং সন্তানের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, সম্ভবত সেই বিচ্ছেদের দায়ভাগ থেকে সরে দাঁড়াবার জন্যে তিনি ওই জলের মধ্যে সরে দাঁড়ালেন। স্বামী তাঁর মৃত্যুবিলাসী ছিলেন না, পুণ্যময়ী জানতেন, কিন্তু যে বিশ্বচরাচরকে তিনি ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন– হয়ত সেই অখণ্ড জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াকে তিনি মৃত্যু বলে ভাবেন নি।

পুণ্যময়ী দেখতেন, সুধার নিঃসঙ্গতা কী গভীর। ওর কাছে এই সংসার যেন ইঁট-কাঠ ছাড়া কিছু নয়। ও অস্থির, ও চঞ্চল; ওর চোখে অনবরত শুধু প্রশ্ন আর ব্যাকুলতা। বই আর কাগজ কলম থেকে তার মাথা যখন ওঠে—তখন মনে হয় একটা ক্লান্ত অসুস্থ শিশু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ উঠে বসেছে, চোখ তুলে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে।

এই সময় সুধাময়ের একটা রোগ দেখা দিল। থাকে থাকে, হঠাৎ ছুটে আসে। পুণ্যময়ীর কাছে। মুখে ভীষণ এক উদ্বেগ আর ভয়। 'মা, দেখ তো আমার জ্বর এসেছে কি না! মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

পুণ্যময়ী তাড়াতাড়ি গা কপাল দেখেন ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। পরীক্ষকের হাত নয় তা সান্ত্বনার হাত। কী অপূর্ব কোমলতা মাখানো। 'জ্বর কই; গা বেশ ঠাণ্ডা! তোর এই জ্বর জ্বর ছাড় তো! শরীর যে ভেঙে যাচ্ছে এমনি করে।'

'উঁহু, কী একটা হয়েছে মা।' সুধাময়ের মুখে দুশ্চিন্তা, গলার স্বরে এক ধরনের হতাশা, 'শরীরটা সেইজন্যেই খারাপ হয়েছে। রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারি না ভাল করে।'

'সারাদিন ঘাড় গুঁজে বসে থাকবি, না হয় হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবি —এতে কি আর ঘুম হয়?'

পুণ্যময়ীর কথা যেন কানেই তোলে না সুধাময়। বলে, 'ঘাড়ে চোখে সব সময় ব্যথা, মাথার মধ্যে যেন কিচ্ছু নেই বলে মনে হয়—ফাঁকা। আমার কি ব্রেন প্যারালেসিস হবে মা?'

'কি বলিস তুই—?' পুণ্যময়ী ভয় পেয়ে যান যেন।

প্রায় সাত আট মাস একটানা সুধাময় মৃত্যু ভয় ভোগ করল। চোখ আর মাথা মাথা করে যেত। প্রতিদিন বিছানায় শুতে গিয়ে ভাবত এই ঘুমই হয়ত শেষ। এমন সময় পুণ্যময়ী অসুখে পড়লেন। সুখ তাঁর কি-ই বা ছিল! তবু, শরীরটা বিছানা নেয় নি এতদিন। আসলে, অনেক আগেই তাঁর শয্যা নেওয়া উচিত ছিল, সেই তখন থেকে, যখন সকালে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করত না, উঠলে মনে হত কী অবসাদ, কী ক্লান্তি, গায়ে ঘাম-গন্ধ—সারা রাত যেন ঘেমেছেন, দুপুর থেকে চোখ জ্বালা মাথা টিপ্-টিপ, ঘুসঘুসে জ্বরভাব, রাত্রের দিকে আস্তে আস্তে আরও তাপ আরও ঘোর। রাত্রে ঘুমের মধ্যে ঘাম হয়ে জ্বরটা যেত। অতটা বোঝেন নি পুণ্যময়ী হয়ত, কিংবা বুঝলেও নিজের জন্যে—এই তুচ্ছ জ্বর-ভাব আর দুর্বলতার জন্যে কাউকে উদ্ব্যস্ত উদ্বিগ্ন করতে চান নি। এই জ্বর বাড়ল। কাশি নিত্যকার হল; বুকে ব্যথা দেখা দিল; এবং ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরল কাশিতে। শয্যা নিতে হল তখন।

কলকাতায় যাবার আগেই বোঝা গেল, এ যক্ষ্মাব্যাধি।

সুধাময় ভয় পেল। ভীষণ ভয়। পুণ্যময়ী যেন ভয়ংকর এক আতংক। সুধাময়ের মনে হত এ-বাড়ির প্রতিটি কক্ষে যক্ষ্মার বীজাণু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, সর্বত্র একটা কাশির ধাক্কা-খাওয়া-বাতাস নিঃশব্দে তাকে শাসাচ্ছে। দেওয়ালে, দরজায়, চৌকাটে, থালায়, বাসনে, খাবারে যক্ষ্মার অদৃশ্য নোংরা বীজাণু ওৎ পেতে আছে সুধাময়ের জন্যে। ফুটন্ত জল ছাড়া সুধাময় জল খেত না, আগুনের মতন গরম দুধ, প্রথমে ক্লোরিন তারপর পটাশপারমাঙ্গানেটের জলে তার বাসনপত্র খাবারদাবার ঘণ্টাখানেক ডোবান থাকত। তবু মনের খুঁত খুঁত যেত না সুধাময়ের। খেতে বসে হঠাৎ থালা ছেড়ে উঠে যেত, শুতে গিয়ে আচমকা মাথার বালিশ চাদর সব টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিত বাইরে। 'আমারও হবে—আমি বাঁচবো না।' সুধাময় ঘরের মধ্যে ক্ষোভে যন্ত্রণায় ভয়ে চিৎকার করে উঠত। যেন মৃত্যু তাকে চিঠি পাঠিয়েছে আসছি বলে। আর যার আসা অবধারিত।

পুণ্যময়ীর ঘরের মধ্যে ঢুকত না সুধাময়। তার সাহস হত না; চৌকাঠের কাছে দাঁড়াত দিনান্তে এক-আধবার, হাতে অ্যাণ্টিসেপটিক লোশন মাখানো রুমাল। মার সামনে মুখ চেপে থাকতে সংকোচ হত, তবু সুযোগ পেলেই মুখ চাপত। নিশ্বাস যতক্ষণ পারে বন্ধ করে রাখত, যেন মার ঘরের হাওয়ার বীজাণু না বুকে চলে যায়।

সুধাময়ের ইচ্ছে হত এ-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

রোগের হাত থেকে শুধু নয়, মনের হাত থেকেও সুধাময় বাঁচতে চাইছিল। এ-বাড়ি তার অসহ্য লাগত, অসহ্য লাগত নিজেকেই, নিজের স্বার্থপরতাকে। সুধা-

ময় সব সময়ই ভাবত, নিজের আয়ুর ওপর তার এই মোহ পশুর মতন। দুঃখ ভোগের ভয়ে, কিংবা মৃত্যুর আশংকায় তার ব্যবহার দিন দিন হীনতর হয়ে উঠছে। ইতরের মতন ; অমানুষিক। আমার আয়ু কি আমার মার চেয়ে মূল্যবান ? সুধাময় ভাবত। আর এই চিন্তা তাকে কুরে কুরে খেত যে, সাতাশ বছর ধরে যে-মার নিরঙ্কুশ স্নেহ সে একা ভোগ করেছে— ; এবং অসীম ভালবাসা, আজ সেই অসহায় মুমূর্ষু বেচারী মার কাছ থেকে ছুটে পালাতে চাইছে। যেন এই মা আর মৃত্যুর মধ্যে কোনো তফাত নেই। কী সাংঘাতিক ! আমি কি মানুষ ? সুধাময় বিছানায় উঠে বসে মাঝরাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। ছেলেমানুষের মতন।

'আমি আমার মাকে ভালবাসতাম। আমি তাকে ভালবাসি। মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি ছাড়া মার আর কেউ, কেউ নেই। আমাকে আমার মার পাশে নিয়ে চল, মার মাথার কাছে, কোলের পাশে।' সুধাময় আকুল হয়ে কাকে যেন বলত। বাবাকে কি !

তারপর এক সকালে পুণ্যময়ীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সুধাময়। প্রথম শীতের হিম-কুয়াশা ধোয়া রোদ এসে পড়েছে পুণ্যময়ীয় পায়ের কাছে।

'মা, কালই আমরা কলকাতা যাব ! এখানে আর নয়। এ-সব ডাক্তার দিয়ে কিছু হবে না।'

পুণ্যময়ীর যে যাওয়ার ক্ষমতা আর নেই সুধাময় তা বুঝল না।

'কা—ল ? কালই যেতে হবে ?' পুণ্যময়ী যেন অদ্ভুতভাবে হাসলেন, 'দেখি !'

সুধাময় মার পাশটিতে বসল।

'এখানে বসলি ! ওঠ্ ওঠ্…!' পুণ্যময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন।

মাথা নাড়ল সুধাময়, সে উঠবে না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সাতাশ বছরের দার্শনিক ছেলে। মার হাত টেনে নিল, মার পায়ে মাথা রাখল, মার গায়ে মুখ ঘষল, শিশুর মতন।

সুধাময় জিতে গেল। জেতা তার উচিত ছিল। শৈশব থেকে যে-ছেলে শিখেছে আনন্দই একমাত্র সত্য, ভালবাসাই সব—সে-ছেলে আনন্দ আর ভালবাসার রাজ-পথ খুঁজতে গিয়ে গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আত্মসুখ আর আনন্দ যে এক নয় এ-কথা বোঝে নি, ধরতে পারে নি নিজেকে পশুর মতন রক্ষা করা ভালবাসা নয়। মৃত্যু একটা নিয়ম, আঘাত যে অভিজ্ঞতা এ-সব তার জানা ছিল না। ধীরে ধীরে সব জানা হল। সুধাময় বুঝতে পারল, নিজেকে দুর্গের মধ্যে রক্ষা করায় আনন্দ নেই, তাতে আত্মা বাঁচে না—চিতায় ওঠা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। নিজেকে ভাঙতে হবে, যেমন করে ফলফুলের এক একটি বীজ নিজেকে

ভাঙে, টুকরো হয়ে যায়—অথচ তাতে সে শেষ হয় না, একটি অংকুর হয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে সবুজ চারা, তারপর শত প্রশাখা-পল্লব-ঘন বৃক্ষ।

সুধাময় ভয়কে জয় করল। মৃত্যুকে উপেক্ষা।

সকালে গোছগাছ শেষ হয়েছিল। দুয়ারে দাঁড়ায়ে গাড়ি। বাড়ির ডাক্তার সঙ্গে যাবে কলকাতা। বামুন দিদিমণির ভাইঝি লতিকা যাবে পুণ্যময়ীর সেবাশুশ্রূষার জন্যে। সব তৈরি। নদীর চরে রোদ টকটক করছে। ঝাঁক বেঁধে পাখি উড়ছে আকাশে। নীল একটা মেঘ মাথার ওপর শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুধাময়ও তৈরি। কিন্তু পুণ্যময়ী তৈরি হতে পারলেন না। হয়ত হতে চাইছিলেন না। রক্ত উঠল অনেকটা ; মাথা টলে পড়ল।

তারপর পাঁচটা দিন কাটল। ছ'দিনের দিন সকাল। সুধাময় মার ঘরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত জানলা খোলা, রোদে রোদে ঘর ভেসে যাচ্ছে। বিছানার ধবধবে চাদরের ওপর মা শুয়ে। চোখের পাতা বন্ধ। বালিশের একপাশে মাথা একটু হেলে রয়েছে। সাদা সিঁথির ওপর এক ফোঁটা জল।

কা—লকেই যেতে হবে ? পাঁচ দিন আগে মা বলেছিলেন—সুধাময়ের মনে পড়ল। ঠিক এই সময় বোধহয়।

সুধাময় আস্তে পায়ে মার পাশে এসে বসল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেক-ক্ষণ। বুকের হাড়গুলো কুঁচো কুঁচো হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল, পিষে পিষে যেন জল হয়ে যাচ্ছিল, আর সেই জল গলার কাছে এসে থর-থর করে কাঁপছিল। চোখ ঝাপসা-ঝাপসা। সুধাময় দু হাত দিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরল। বুকে মাথা মুখ চেপে ধরল। চুমু খেল। গালে গাল দিয়ে কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

এতক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ ছিল—এইবার কান্নার একটা দুঃসহ রোল স্তব্ধতাকে সিক্ত করে দিল।

কখনো কখনো এ-রকম কোনো বাড়ি চোখে পড়ে—ফাঁকা ধু-ধু মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, নির্জন নিস্তব্ধ, গায়ে শ্যাওলা, সুপুরি আর নারকেল গাছের ঝাঁকড়া মাথা অন্ধকারে আড়াল দিয়ে। এমন শূন্য স্তব্ধ বাড়ির নিজস্ব একটি সৌন্দর্য আছে। পুণ্যময়ীর মৃত্যুর পর সুধাময়ের অবস্থাটা ওই রকম দেখাচ্ছিল। ও একা—নিঃসঙ্গ, শান্ত অথচ যেন সমাহিত। মায়ের মৃত্যুর পর সে ভীত অধীর অস্থির হল না, আগে বাবার মৃত্যুর পর যেমন হয়েছিল। একটা গভীর অনু-শোচনা এবং দুঃখ তাকে কিছুকাল খুবই উন্মনা করে রেখেছিল, আস্তে আস্তে যা কেটে গেল একসময়।

অন্তরে সুধাময় এবার পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছিল। মনের তরঙ্গ ক্রমশই শান্ত থেকে আরও শান্ত হয়ে আসছিল। একটি প্রাচীন অথচ নিরিবিলি সুন্দর ঘরে চন্দনের মিষ্টিগন্ধ ধূপ জেবলে দিয়ে কোনো তন্ময় শিল্পী যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের মাধুর্য উপভোগ করতে চাইছিল।

কিছু দিন এইভাবে কাটল। সুধাময় এই সময় কিছু কিছু 'আত্মচিন্তা' লিখতে শুরু করেছিল। এতে তার নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি মোচন হত, মনের অনেক জটিল-গ্রন্থি চিন্তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত। আর কলকাতার বন্ধু পরিমলকে সেই সব চিন্তার টুকরো পাঠাত চিঠিতে।

সুধাময় যে জীবনকে ভালবাসত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সে-ভালবাসা ওই বয়সেই, এত ব্যাকরণসম্মত হয়ে উঠেছিল যে, তার মধ্যে চঞ্চল আবেগময় একটি স্বাভাবিক ছন্দ একেবারেই বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আনন্দের প্রকারভেদ সম্পর্কে সুধাময়ের নিজস্ব মতামত হয়ত দীন ছিল না কিন্তু তা ওর নিজস্ব উপলব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত নয় বলে, প্রায়ই কৃত্রিম মনে হত।

এমন সময় কিছু দিন চোখ নিয়ে ভীষণ ভুগতে হল সুধাময়কে। দিনের বেলাতেও তার কাছে সব ঝাপসা দেখাত চোখে অসহ্য ব্যথা হত, মাথা ধরে থাকত। কিন্তু এমন পাগল ও, কলকাতায় এসে চোখ দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করত না। তখন ওর মাথায় এই ভূত চেপেছে যে, নিজের মন ও ইচ্ছার কাঠিন্য এবং একাগ্রতা দিয়ে শারীরিক যন্ত্রণাকে সে অগ্রাহ্য উপেক্ষা এবং পরাস্ত করবে।

এর ফলে লাভ হল এই চোখের গোলমালে এক ব্যাধি যখন পাকা হল, প্রায়-অন্ধ অবস্থা তখন তাকে কলকাতায় আসতে হল। সাড়ম্বর চিকিৎসা শুরু হল তারপর। কিছু দিন এর কাছে ওর কাছে ছুটোছুটি। শেষে এক বিলিতি কায়দার নার্সিংহোমে—টানা এক মাস চোখে ঠুলি এঁটে শুয়ে থাকতে হল।

চোখ সারল। চশমা নিতে হল বেশি পাওয়ারের। কিন্তু সুধাময় আর দেশের বাড়িতে ফিরে গেল না। ভবানীপুরের দিকে ছোটখাট নিরিবিলি সুন্দর এক ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে শুরু করল।

এক একটা সময় আসে যখন মন কি করছে কেন করছে কিছুর জন্যে তৈরি থাকে না। যা ভাল লাগে করে এবং করে আরাম পায়। সুধাময়ের বোধহয় তখন মনের তেমন একটা অবস্থা। অনেকদিন ধরে ভেতরে ভেতরে, ওর অজ্ঞাতেই এক রকমের ক্লান্তি জমে উঠছিল! যদি বা ক্লান্তি নাও হয়, তবে গুমোট তো নিশ্চয়ই। তার ওপর সম্প্রতি অসুস্থতার একটা একঘেয়েমি বিরক্তি গেছে। একটু হাঁপ ছাড়তে চাইছিল সুধাময়, হয়ত বা দীর্ঘ দিনের বাঁধা ছক থেকে বেরিয়ে এসে কিছু নতুনত্ব খুঁজেছিল, খানিক বৈচিত্র্য। আমরা যাকে বলি 'ফুর্তি'—তেমন কোনো ফুর্তির ওপর তার ঝোঁক ছিল না। সিনেমা-থিয়েটার, মদ, হোটেল-কাফে, রেসের মাঠ—এ-সব তাকে টানে নি। অন্য রকম এক লঘুতা দিয়ে মনের গভীর রঙে সে চুমকি বসাতে শুরু করেছিল। কলকাতায় তার পরিচিত যে ক'জন মানুষ ছিল, এতোদিন পরে খোঁজ নিয়ে নিয়ে তাদের বাড়ি যাওয়া শুরু করল। তাদের নিজের বাড়িতে গল্পগুজব করতে ডাকতে লাগল। সুন্দর চায়ের সঙ্গে রমণীয় খাদ্য পরিবেশনে আপ্যায়িত করতে লাগল সকলকে। সুধাময়ের ফ্ল্যাটে বেশ একটা আড্ডা জমে উঠল।

এই ঘরের মধ্যে কেমন করে যে একদিন উড়ে এলো এক অপরূপ পাখি ! কি করে এলো, কে আনল—কিংবা সুধাময় নিজেই তাকে গিয়ে কোথায় আবিষ্কার করল—পরে সে-কথা সুধাময়ের মনে থাকল না। এইটুকু শুধু সে জানত, বিভূতি মজুমদারের কোন্ সম্পর্কের বোন হয়। নাম, রাজেশ্বরী।

রাজেশ্বরী যেন অগ্নিশিখা। রূপের এত দীপ্তি সুধাময় আগে দেখে নি। ওর মা সুন্দরী ছিলেন—অসাধারণ সুন্দরী—তাঁর রূপ ফেটে পড়ত, কিন্তু রাজেশ্বরীর রূপ নিশ্চল হয়ে আছে। মনে হয় কোনো, কী যেন এক সৌন্দর্য ওর শরীরের মধ্যে জ্বলছে, ভীষণ উজ্জ্বল। স্ফুলিঙ্গের মতন দীপ্ত, দাহ্য। চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর দিকে তাকালে। বোধের স্নায়ুগুলো ঘোলাটে হয়ে যায়।

সুধাময় সেই রূপের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত, বিভ্রান্ত হয়েছিল। মনে মনে এই সৌন্দর্যের রহস্য আবিষ্কার করবারও বুঝি চেষ্টা করত। পারত না। ব্যর্থ হয়ে নিজেকে বলত, আকস্মিকতা ছাড়া এ সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না।

মেয়েটি ছিল দীর্ঘাঙ্গী। সাগর ঢেউয়ের মাথায় যেমন দীর্ঘ বক্র সুছন্দ একটি গতিশীল ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে রাজেশ্বরীর দীর্ঘ অঙ্গে তেমনই এক জীবন্ত ভঙ্গিমা। নিখুঁত অবয়ব। অশ্বত্থপল্লবের ডৌলে গড়া মুখ। সুসম কপাল। কাজলের বাঁকা টান দিয়ে ঘন ভুরু দুটি যেন কেউ এঁকে দিয়েছে। দীর্ঘপদ্ম চোখ। শ্বেত-পাথরের মতন সাদা অক্ষিপট। মেঘ-কালো চোখের তারা। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল : যেন দুটি অন্ধকারের বিন্দু জ্বলছে। চোখের তলায় কিসের এক উষ্ণতা। অবোধ্য ভাষায় হাসছে। টিকলো নাক, স্ফুরিত ওষ্ঠ। বাঁকা রেখা কোথাও যদি এতটুকু কেঁপেছে। চিবুকটি নিটোল এবং এক ধরনের ঘন আভার রঙ লেগে আছে।

রাজেশ্বরীর অজস্র কালো ঘন নরম চুলের মধ্যে মুখের সম্পূর্ণ ছবিটি বসন্তের মোহিনী মায়ার মতন। তীব্র অথচ আত্মবিভোর। কুহকী মৃগীর মতন। রাজেশ্বরীর অঙ্গে তার যৌবন যে লীলা করছে—সুধাময় তার দুর্বল চোখ দিয়েও তো দেখতে পেয়েছিল। এবং সেই দুধমাখা জবাফুলের মতন রঙ, ননী-কোমল তনু, কৃশ কটি, অপরূপ বাহুবল্লরী ভাল লেগেছিল সুধাময়ের। মুগ্ধ হয়েছিল বেচারী যুবক দার্শনিক।

রাজেশ্বরী আসত যেন রাজহংস। গর্বিত, সতর্ক, সচেতন। পোশাকে তার ইচ্ছা-কৃত পরিপাটি চোখে পড়ত। কখনো আসত সোনালী কিংবা গভীর নীল সরু পাড়ের সাদা ধবধবে শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে কখনো উজ্জ্বল গভীর রঙে অঙ্গকে শিখার মতন জ্বালিয়ে। গলায় দুলত সরু হার, বুকের ভাঁজে মুক্তো বসানো সুন্দর একটি লকেট হৃদপিণ্ডের ওপর যেন কাঁপত সামান্য। পঞ্চমীর চন্দ্রকলার মতন বঙ্কিম উরোজ। মকরবালা পরা দুটি হাত। একটি আঙটি অনামিকায় ; বেদানার দানার মতন রঙ তার পাথরটির।

রাজেশ্বরীর কোথাও পাথরের জড়তা ছিল না। না মুখে না মনে। অহেতুক নম্রতা

তাকে লজ্জাবতী লতা করে নি যেমন, তেমন ফোয়ারার জলের মতন অনর্গল বাহারী জলধারা হয়ে সে উছলে পড়ত না। সংযত, সভ্য, শালীন। কথা বলত একটু মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায়। হাসত ততটুকু ধ্বনি তুলে যতটুকুতে মাধুর্য আছে অথচ চপলতা নেই। ওর মধ্যে এক ধরনের সহানুভূতি এবং কোমলতা ছিল যা মানুষকে তৃপ্ত করে। ভাল গাইতে পারত; বুদ্ধির ধার মুড়ে কথা বলতে জানত, আর জানত নিজেকে মনোরম করে রাখতে।

সুধাময়ের সঙ্গে রাজেশ্বরীর পরিচয়ের পর, খুব দ্রুত না হলেও একটু তাড়াতাড়ি ওদের দুজনের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। রাজেশ্বরী প্রায়ই আসত, সুধাময়কে নিজের হাতে চা তৈরি করে খাওয়াত, গান শোনাত, সদালাপে খুশী করত।

সুধাময়ও যে খুশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

একদিন, তখন সবে বিকেল শেষ হচ্ছে, সুধাময়ের লেখক বন্ধু পরিমল সবে সুধাময়ের ফ্ল্যাটে পা দিয়েছে—দেখতে পেল ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

'বেরুচ্ছো ?' শেষ ধাপে নেমে এলে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে পরিমল বলল।

'হ্যাঁ ; তুমিও চলো।'

'আমি, কোথায়—?'

'আমিও তা জানি না ; ও জানে—।' সুধাময় রাজেশ্বরীকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল।

'যাবেন, চলুন না'—রাজেশ্বরী বলল, 'বেড়াতে যাচ্ছি একটু।'

পরিমল মাথা নাড়ল। বলল, 'না ; আমি আজ বড় ক্লান্ত ; মন-মেজাজও ভাল নেই। সুধাময়, আমি বরং ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করি গে, যদি কেউ আসে, গল্পগুজব করব।'

'মৃণাল আসতে পারে। তুমি যাও ওপরে, চা-টা খেয়ে বিশ্রাম করগে। আমাদেরও খুব দেরি হবে না।'

দেরি বাস্তবিকই হয় নি। ঘণ্টা দেড়েক পরে সুধাময় একা ফিরে এলো।

'ওরা কেউ আসে নি ?'

'না। একা বসে বসে তোমার কথাই ভাবছি।'

'আমার কথা—?' সুধাময় একটা সিগারেট তুলে নিল পরিমলের প্যাকেট থেকে। সোফায় বসল। অনভ্যস্ত আঙুলে সিগারেট ধরিয়ে হাস্যকর ভাবে টানতে লাগল।

'রাজেশ্বরীকে তুমি ভালবেসে ফেলছ যেন ?' পরিমল বলল, বলে বন্ধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

সুধাময় কথাটা শুনল। পরিমলের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ক মুহূর্ত। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল। তারপর বলল, 'জানি না।'

পরিমল একটু কি ভাবল। সুধাময়ের 'জানি না' যে গোপনতা বা এড়িয়ে যাওয়া নয় এ-সত্য তার জানা ছিল। বললে, 'রাজেশ্বরী তোমায় মুগ্ধ করেছে।'

'তাতে কি ! খুব ভাল ম্যাজিক দেখেও তো মানুষ মুগ্ধ হয় ।'

পরিমল পালটা জবাব দিতে পারল না । আবার খানিক ভাবল । বলল, 'ও তোমায় খুব আকর্ষণ করেছে, আমি ভেবেছিলাম ।'

'ঠিকই ভেবেছ । কিন্তু সেটা রাজেশ্বরীর আকর্ষণ ক্ষমতা, আমার তাতে কোন্ গুণ আছে ?' সুধাময় এবার একটু হাসল ।

'তুমি তর্ক জুড়লে আবার ?' পরিমল হতাশ হল ।

'সঠিকভাবে কিছু জানতে হলে কোথাও রহস্য রেখে লাভ নেই পরিমল । বহু পুরুষ মানুষ আছে তারা পতিতালয়ে যায় । কেউ কেউ ধরাবাঁধা একটি মেয়ের কাছে । তারা আকর্ষণ বোধ করে ব'লেই যায় । সেটা কি ভালবাসা ?' সুধাময় সোফার ওপর আরাম করে বসল । যেন এবার তর্কটা জমবার সময় হয়েছে । পরিমল অসহায় বোধ করছিল এবং বিব্রত । ঠিক এ-ভাবে প্রেম নিয়ে তর্ক করতে সে অস্বস্তি এবং অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে । তবু খানিকটা ভেবে একবার শেষ চেষ্টা করল পরিমল, শুধলো, 'তোমার কি কখনো মনে হয় না রাজেশ্বরীর সঙ্গে মিলন হলে তুমি খুশী হবে ।'

'হয় আজও হয়েছে । তেষ্টা পেলে আমি এক গ্লাস জল খাই । তাতে তেষ্টার অস্বস্তি মেটে, ভাল লাগে । তাতে বোঝা যায়, জল তেষ্টা মেটায় । কিন্তু জল কি, তা কি বোঝা যায় পরিমল ? মিলনের ইচ্ছাটা তেমনি । ওটা ভালবাসার লক্ষণ, কিন্তু সার কথা নয় ।'

রাজেশ্বরী সুধাময়কে মুগ্ধ করেছে, আকর্ষণ করছে ; সুধাময়ের মনে মিলন কামনাও আছে—তবু যদি এই মুগ্ধতা, আকর্ষণ, মিলন-কামনা ভালবাসা না হয়—তবে ভালবাসা কি ?

সুধাময় বলেছিল, প্রেম আনন্দ । 'যা আমার আনন্দ, যাতে আমি আনন্দিত, অন্তত যার আবির্ভাবে আমার আনন্দ জেগে ওঠে—আমি তাকেই ভালবাসা বলি ।'

পরিমলের একটা ভুল ভাঙল । কিংবা বলা যায় পরিমলের মনে একটা খট্‌কা এবার লাগল । ও ভেবেছিল সুধাময় রাজেশ্বরীর প্রেমে পড়েছে । এই প্রথম প্রেম এসেছে সুধাময়ের জীবনে । তাকে অবহেলা করতে ও পারবে না । এবার ওই আকাশমুখী বন্ধু মাটিতে নেমে দাঁড়াবে । এতে ভাল হবে । কিন্তু সুধাময়ের সঙ্গে কথা বলার পর বুঝলো, রাজেশ্বরী সম্পর্কে সুধাময়ের অনুভূতি এখনও স্পষ্ট নয় ।

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে পরিমল বললে, 'তুমি সোনা বলতে সোনার তাল বোঝো । ওটা মূল্যবান, সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে অবশ্য হিসেবীপনা আছে, কিন্তু ব্যবহারে ওটা অচল । সোনার তাল গলিয়ে তাকে অলংকার করতে হয় । রাজেশ্বরীর মকরবালা দুটো, গলার হারটি ক' ভরি সোনার ডেলা হয়ে বাক্সে বন্দী থাকলে তাতে কি তার গলার হাতের সৌন্দর্য বাড়ত না তোমার চোখ জুড়তো ? আনন্দ, প্রেম—এ-সব আইডিয়ার নিরেট তাল নিয়ে মানুষের চলে না । তোমাকে তা ভেঙে গলিয়ে

কাজে লাগাতে হবে।'

সুধাময় খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল। তারপর হেসে বলল, 'আচ্ছা পরিমল, তুমি কি নিঃসন্দেহ যে, রাজেশ্বরীকে বিয়ে করলে আমার সব অভাব মিটে যাবে?'

'কোনো স্ত্রীই স্বামীর সব অভাব মেটাতে পারে না। শুধু স্বর্গফলের চিন্তায় তুমি কিছু পাবে না, সুধা। রাজেশ্বরী অসংখ্য মানুষ নয়, অসংখ্য গুণেব সমষ্টিও নয়—একটিমাত্র মানুষ—কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারলে, তার ভালবাসা পেলে—তুমি সাংসারিক জীবনে সুখী হবে, শান্তি পাবে। আমার তো তাই মনে হয়।'

সুধাময় কোনো জবাব দিল না।

সুধাময়ের স্বভাব ছিল পরীক্ষকের। সে হৃদয়-তুফান বিশ্বাস করত না। রাজেশ্বরীকে ভালবেসেছে কি না—মনে মনে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আরও কয়েক মাস কাটল। তারপর একদিন……

সেই একদিনে কি ঘটেছিল সেটা সুধাময়ের মুখের কথায় বলা ভাল। সুধাময় নিজেই পরিমলকে বলেছিল: 'পরশু বিকেলে রাজেশ্বরী এসেছিল। টকটকে লাল গোলাপের মতন শাড়ি পরে, ধবধবে সাদা জামা, গলায় হাতে জরির কাজ। ওর চুল এলোমেলো, রুক্ষ, ফাঁপানো ফোলান। যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তখন শেষ গোধূলি। ঘরের বাতি আমি জ্বাললাম না। রাজেশ্বরী জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। খানিকটা আলো, আঁচের মতন রঙ—রাজেশ্বরীর গালে এসে পড়ছিল। অল্প একটু সেই আলো থাকল, তারপর সরে গেল। অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। সব ঝাপ্সা।…আমি উঠে রাজেশ্বরীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর একটু অন্ধকার হল। রাজেশ্বরীর নিশ্বাসের শব্দ আমার কানে আসছিল, গালে লাগছিল। আমার হাত, আমার শরীর, আমার চোখ রাজেশ্বরীকে দেখছিল না; দেখতে পাচ্ছিল না; একটা গোটা মানুষের বদলে আমি তার কতক টুকরো টুকরো অংশকে দেখছিলুম, যা আমায় লুব্ধ করছিল, আমাকে আর সবকিছু ভুলিয়ে দিচ্ছিল। ওর গায়ের একরকম ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম—তীব্র—শরীরের কোথায় যে তা লুকিয়ে ছিল। আমার শরীর ওকে পীড়ন করবার জন্যে পাগল হচ্ছিল। আমি কেমন এক ধরনের বন্য-প্রবৃত্তি বোধ করছিলুম। রাজেশ্বরী…। যাক, শেষ পর্যন্ত আমি রক্ষা পেলাম। কে যেন আসছিল—তার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে আমি সরে গেলাম। বাতি জ্বাললাম ঘরের। রাজেশ্বরী যেন আগুনের শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আবার সম্পূর্ণ করে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু পরে রাজেশ্বরীকে আমি বললাম, তুমি বাড়ি যাও। আমায় ক্ষমা কোরো।…রাজেশ্বরী হয়ত কিছু বলত, কিন্তু ততক্ষণে তোমার গলার সাড়া পাওয়া গেছে। এদিকের দরজা দিয়ে রাজেশ্বরী চলে গেল। ও আর আসবে না।

পরিমল, রাজেশ্বরীর রূপ, তার অমন দেহ আমি উপভোগ করতে পারতাম। বিয়ে করেই। কিন্তু, কে বলতে পারে—রাজেশ্বরীর রূপ, তার দেহই এতোদিন আমার আনন্দের উৎস ছিল না! এবং ভোগ দখলের পর একদিন আমি ক্লান্ত হব না, আমার আনন্দ উবে যাবে না! ওকে ভোগ করার জন্য যখন পাগল হয়েছিলাম—তখন রাজেশ্বরী কেন হারিয়ে গেল, তার বদলে ওর শরীরের কতকগুলো অংশই কেন আমার চোখ মন বোধ আবেগকে আচ্ছন্ন করল। যতই বলো, দেহের কোনো কোনো অংশ একটা পরিপূর্ণ মানুষ নয়। আমি কি পরিপূর্ণ মানুষকে ভালবাসতে চাইছি না পরিমল! তবে—?' সুধাময়ের অন্তর হাহাকার করে উঠছিল।

রাজেশ্বরী পর্ব শেষ হল। সুধাময়ের মনে সেই যে সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সে দ্বন্দ্ব আর সহজে নিরসন হল না।

বছর দুই কাটল। সুধাময় ঘুরে বেড়াল বাইরে বাইরে। তারপর আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে এলো, মন শান্ত হল, আবার ফিরল সে কলকাতায়। তখন ওর অবস্থা বানের জল সরে যাওয়া নদীর চরের মতন। পলিমাটি পড়ে গেছে। ফসল বুনলে সোনা ফলবে হয়ত।

এই সময় সুধাময়ের প্লুরিসি মতন হল। খুব যে একটা ভুগেছিল তা নয়, তবু বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। সেরে উঠে বাইরে গেল জলবায়ু বদলাতে। আর তারপর একদিন কি করে যে মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ামের হাতছানি তাকে টেনে নিল কে জানে! না, হয়ত ভুল হল এ-কথা বলা, মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম না টানলেও ওই ধরনের একটা কিছু তাকে টানতোই। কেননা সুধাময় তখন বৃহৎ সংসারে, বৃহৎ মায়ায় ভালবাসায় এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চাইছিল।

মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম থেকে সুধাময় প্রথম যে চিঠিটি লিখেছিল পরিমলকে তা বড় সুন্দর। তার প্রথমেই ছিল এই কথা: 'ভাই পরিমল, আমি এখানে আতুরজনের শারীরিক সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করছি না; আমি ওদের হতাশ ক্লান্ত অসুস্থ মনের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছি। মৃত্যুভয় ওদের মনের রক্ত শুষে নিয়েছে; ওরা কী অসহায়, ভগবানকে ভাবে পরমগতি, ভাগ্য ছাড়া আর কোথাও আস্থা রাখে না। ওদের মন শূন্য, সেখানে কিছু সম্বল চাই, বাঁচার তীব্র বাসনা শুধু নয়, বিশ্বাস। আমি ওদের সেই বিশ্বাস যোগাব। আমি এতদিন পরে নীড় ছেড়ে আকাশে ঝাঁপ দিতে পারলাম। আমি কি আজ সুখী নয়!'

সুধাময় সুখী হয়েছিল। যে কর্তব্য ও দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নিয়েছিল তার মধ্যে কোথাও খাদ রাখে নি। দেশের বাড়িঘর জমিজমা সব বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা প্রায় সবই দিয়ে দিয়েছিল স্যানেটোরিয়ামে। পুণ্যময়ীর নামে কোনো বেড হয় নি—

তবে পুণ্যময়ীর নামে তার সন্তান টাকাটা দিচ্ছে এ-ভাবে ওটা স্যানেটোরিয়ামের তহবিলে জমা পড়েছিল। বাকি সামান্য কিছু টাকা যা ছিল তাই দিয়ে স্যানেটোরিয়ামের চৌহদ্দির পাশেই দুটো ছোট ছোট মাটি আর পাথর মেশান ঘর করে নিয়েছিল সুধাময় নিজের জন্যে। মাথার ওপর কাঠের তক্তার ছাদ। স্যানেটোরিয়ামের কিছু খুচরো অফিস-কাজ করে দিত—তার বদলে ওর খাওয়ার চাল ডাল দুধ শাকসব্জিটা পেত স্যানেটোরিয়ামের ভাঁড়ার থেকে। কুকারে রান্না করে নিত সুধাময় নিজেই। এবং তৃপ্ত হয়ে খেত।
পরিমলকে বার বার ডাকছিল সুধাময়। 'এসো একবার এখানে, দেখে যাও—কী সুন্দর জায়গায় কেমন সংসার পেতে বসেছি। কত আনন্দে আছি।'

পরিমল একবার নয় বার দুই গেছে সেখানে। সত্যি, চমৎকার জায়গা। পাহাড়ী ঢলের ওপর ছোট্ট স্যানেটোরিয়াম। ওপরের চেহারায় দারিদ্র্য আছে, ভেতরে তাব ধনের অভাব নেই। দুটি মাত্র ডাক্তার—কয়েকজন নার্স, জনা বিশেক পেশেন্ট, দু একজন অন্য কর্মচারী—কিন্তু কী সদয়, সহানুভূতিশীল, যত্নময় ব্যবহার। পরিবেশটিও চমৎকার—উত্তরে শালবন, দক্ষিণে ঢালু জমি ঢেউ ভেঙে ভেঙে নেমে গেছে—সবুজ মখমলের মতো নরম যেন; পশ্চিমে আকাশপটে হেলান দিয়ে পাহাড়চূড়া দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল মেঘের মতন। পূবে অনেকটা দূরে ক্ষেতখামাব। সূর্য উঠত সোনার জল ছড়িয়ে, আমলকি বন থেকে হিমের গন্ধ ভেসে আসত। বুনো পাখি ডাকত। শালবনের কাঠ কেটে বয়েল গাড়ি যেত দুপুর আর বিকেলে, চাকায় শব্দ উঠত করুণ, অথচ সুন্দর, বয়েলের গলার ঘণ্টা বাজত ঠুন ঠুন করে। গোধূলিতে পাহাড়ছোঁয়া আকাশে সূর্য অস্ত যেত। কী যে রঙ—যেন কোনো অনন্ত পুরুষ প্রতিদিন তার বুক থেকে এক সমুদ্র রক্ত এখানের রক্তহীন পাংশু কাতব রুগীদের বুকে ঢেলে দিয়ে যেত।
পরিমল যে কবার মিহিরপুর স্যানেটোরিয়ামে গেছে—দেখেছে, সরল শান্ত জীবন এবং আপন আদর্শ নিয়ে সুধাময় প্রতিবারেই যেন আরও শুদ্ধ, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়ে উঠছে আত্মায়। স্যানেটোরিয়ামের রুগীরা সকলেই তার যেন পরিজন, সকলেই সুধাময়কে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে, সুধাময়ের ব্যক্তিত্বের আভা নিজেদের মনে মেখে নেয়। ছোট বড়, ছেলে মেয়ে—কারুর কাছেই সুধাময় অনাত্মীয় নয়।
সকালে সূর্য উঠে গেলে সুধাময় স্যানেটোরিয়ামের অফিসে যেত। কোনোদিন দু একটা কাজ থাকত কি থাকত না—দ্বারোয়ান চিঠি নিয়ে এলে সব চিঠি বাছত, সাজাত—তারপর হাতে করে চলে যেত ওয়ার্ডে চিঠি বিলি করতে। সকালে প্রতিজনের সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ শেষ হত। ফিরে এসে অফিসে হিসেবের খাতা খুলে আঁকজোক—কিংবা চিঠিপত্র লেখা। তারপর বাড়ি। দুপুরে আবার ওয়ার্ডে ঘুরত। কারুর চিঠির জবাব লিখে দিত, কাউকে বই পড়ে শোনাত, কাউকে বা তার সরু

মেঠোসুর গলায় থেমে থেমে বাউল গান শুনিয়ে দিত, নানান গল্প হাসি। একবার একটি ছেলে বছরখানেক ছিল এখানে।—মাত্র বারো বছর বয়স—সুধাময় তার সঙ্গে লুডো পর্যন্ত খেলেছে—দুপুর ভোর। কত যে বকবক করে গল্প করেছে। সে বাড়ি যাবার সময় তাকে একটা ক্যারাম বোর্ডও কিনে দিয়েছিল সুধাময়।

বিকেলে মোটামুটি সুস্থ রোগীরা বেড়াত—স্যানেটোরিয়ামের সামনে কিংবা বাইরেও। তাদের কারোর সঙ্গে আজ, কারোর সঙ্গে কাল সুধাময়কে দেখা যেত। বিকেল পড়ে এলে সুধাময় নিজের ঘরে গিয়ে বসত। বসার ঘরটি ছোট। তক্তপোশ আর মাদুর পাতা, হ্যারিকেন লণ্ঠন, মাটির ফুলদানিতে বুনো ফুল, এক ধরনের গাছের শক্ত শক্ত আঠা ধুনোর মতন পুড়ত। চমৎকার গন্ধ। দু একজন করে ধীরে ধীরে একটি ছোট দল এসে বসত তক্তপোশের ওপর। বীরেনবাবু, পশুপতি, অমল, কমলা, শোভনাদি, সুধীন···এমনি সব। সুধাময় তাদের মুখোমুখি বসে এ-কথা সে-কথার পর আস্তে আস্তে জীবনের গল্পে চলে যেত :

জীবন কোনোদিন শূন্যে গিয়ে থামে না। তবে দুঃখ? হ্যাঁ, দুঃখ আছে। আছে বলেই আশা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে তার সঙ্গে যুঝতে হবে। কর্মফল ভাগ্য ঠাকুর-দেবতা—এ-সব কোনো কাজের কথা নয়, সত্যও নয়। আমাদের জীবনটা একটা ছাঁট রঙীন কাগজ নয়, আর তাতে সরু কাঠি আঁটা নেই—যে আমরা নিছক ঘুড়ি—সুতো দিয়ে বাঁধা। অন্য কারও হাতে লাটাই আছে—তার খেয়াল খুশিতে আমরা উড়ছি, নামছি, গোঁত্তা খাচ্ছি—তারপর একবার সুতো-কাটা হয়ে ভেসে যাচ্ছি! না, জীবন ঘুড়ি নয়। অথবা গালে হাত তুলে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে, আকাশের দিকে মুখ করে ভগবান ভগবান করে কেঁদে ককিয়ে ছটফট করে শেষ করে দেবার জন্যে নয়।

তবে জীবন কি?

আয়ুকে রক্ষা করার ইচ্ছা, আত্মাকে রক্ষা করার ইচ্ছা, মুক্তির পিপাসা, প্রেম আর আনন্দ। সৎকে রক্ষা করো, সত্তাকে রক্ষা করো—জীবন পূর্ণ হবে।

জীবনের সব অঙ্ক সব সময় মেলে না। হয়ত কখনোই মেলে না, কদাচিৎ কিংবা ব্যতিক্রম ছাড়া। সুধাময় ভেবেছিল, তার অঙ্ক মিলে গেছে, সে অনেক পথ হাতড়ে ঠিক জায়গায় পেঁাছে গেছে।

মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়ামের বছর ছয় মনের ভরা আনন্দে এবং শান্তিতে কাটাবার পর হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল—; সুধাময়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ সুন্দর জীবনে যেন কিসের এক জোয়ার এসে লাগল। সাধ্য ছিল না তার একে প্রতিরোধ করে।

ফিমেল ওয়ার্ডের সি ব্লকে একটি রুগী এলো, নাম হৈমন্তী। মাত্র বছর বিশ বয়স।

রোগা, মাথায় ছোট, রঙ শ্যামল। হৈমন্তীর মুখ ছোট, গালের হাড় ফুটে উঠেছে, চোখ দুটি কেমন যেন—ক্লান্ত বিষণ্ণ গভীর অথচ কিসের এক ছায়ায় স্নিগ্ধ। নাকের ডগাটি একটু টোল খাওয়া, পাতলা পাতলা দুটি ঠোঁট, মুখের পাশে গোল হয়ে আশ্চর্য এক হাসি ফুটে আছে। মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল।

সুধাময় মাঘ মাসের এক সকালে চিঠি বিলি করতে এসে এই নতুন-আসা রুগীটিকে দেখেছিল। এবং কয়েক মুহূর্ত আর চোখ ফেরাতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল, ও যেন এক হিমভেজা ছোট্ট পাখির দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর অনুভব করল —একটি আশ্চর্য নিস্তব্ধতা তার এবং হৈমন্তীর ব্যবধানটুকুর মধ্যে কিসের এক বুনন গাঁথছে। সুধাময়ের কেমন একটু ভয় ভয় লাগল, নিশ্বাস তার থেমে গিয়েছিল তা মনে হল এবং কপালে যেন সূর্যের তাপ এসে লাগছে অনুভব করল।

সুধাময় সরে গেল। কিন্তু অল্প কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। সুধাময় অজ্ঞাত এক বেদনা বোধ করতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন কিছু সে হারিয়ে ফেলেছে—এমন কিছু যা খুঁজে না পেলে আর সে যেতে পারবে না।

বিকেলে হৈমন্তীকে আবার দেখল সুধাময়। তখন বিকেল পড়ে গেছে। স্যানাটোরিয়ামের বাগানে মোরগফুল ঝুঁটি নাড়ছিল, মালি জল দিচ্ছিল গাছে, ঘন বাসন্তী রঙের গাঁদার ঝোপে একটা বাতাসের ঘূর্ণি পাক খাচ্ছিল।

সুধাময় অফিসঘরের দিকে চলে গেল—আস্তে আস্তে। ফিরল খানিক পরে। সি ব্লকের পশ্চিমের জানলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। সুধাময় কেমন যেন আচ্ছন্নের মতন তাকিয়ে থাকল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশ-পটে সূর্যডোবার শেষ আভাটুকু নিভু নিভু। পাখির কাকলি হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ যেন। সুধাময়ের মনে হল, বিহঙ্গহীন আকাশের দিকে সে তাকিয়ে আছে—সমুদ্রের ধূসরতা নেমেছে সামনে একটি নিঃসঙ্গ ম্লান নক্ষত্র পশ্চিমের আকাশে। এ যেন এক অনন্ত বিচ্ছেদের অথচ কী এক আনন্দের মিলনমুহূর্ত। ও কত দূর, কত অস্পষ্ট তবু যেমন করে অন্ধকার বাতাসে ঝরে পড়ছে, তেমনি হৈমন্তী তার নরম দৃষ্টি, ক্লান্ত কালো ভুরু চুলের গন্ধ নিয়ে এই নির্জনতার মধ্যে সুধাময়ের সত্তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

সুধাময় নিজেও প্রথমে বিস্ময় এবং বিচলিত বোধ করেছিল। ভেবেছিল, এ-এক গভীরতম করুণা, অস্বাভাবিক মমতা মায়া, কিংবা ভ্রম। জীবনের এতটা পথ দক্ষ নাবিকের মতন সে অতিক্রম করে এসেছে—ঝড়ে ঝাপটায় আকর্ষণে মোহে তার আত্মা লক্ষ্যহারা হয় নি। হঠাৎ তবে কেন একটি ক্লান্ত নিভু নিভু নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আজ মনে হচ্ছে, হালের মুখ ফেরাতে হবে—ওই নক্ষত্রের তলায় কোনো

অপূর্ব আলো আছে, কোনো মাটি—ফলফুল ভরা কোনো আশ্চর্য শান্তির দেশ। ...ভুল, এ আমার ভুল ; আমি ভুল করছি—সুধাময় ভাবছিল, নিজেকে নিজে সহস্রবার বলছিল আর নিজেকে নিয়ে অসংখ্যবার অঙ্ক কষে দেখছিল।

ওর অঙ্কের ফল বার বার মিলে যাচ্ছিল। কোনো ভৌতিক রহস্যে কিছুই ঝাপসা দেখাচ্ছিল না। এ ভালবাসা ; আমি ভাল বেসেছি হৈমন্তীকে—সুধাময় স্পষ্ট অনুভব করছিল ; সমগ্র চেতনায় এই বোধ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

সুধাময় অনুভব করত, হৈমন্তীকে সে ভালবাসে এই চিন্তাতেই আশ্চর্য এক আনন্দ আছে। হৈমন্তীর কাছে গেলে তার সঙ্গে কথা বললে, ওর পাশে দাঁড়ালে তাকে ভাবলে এক আনন্দের আস্বাদে সমস্ত মন অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরে ওঠে। তুমি আমায় তোমার কোন্ শিখা দিয়ে যে জ্বালিয়ে দাও হৈমন্তী, আমি জানি না। আমি শুধু আমার আলোকে দেখি। সুধাময় মনে মনে বলত। হৈমন্তীকে উদ্দেশ করে।

আর সুধাময় বুঝেছিল, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে রূপে যে হৈমন্তী অত্যন্ত সীমিত—সেই হৈমন্তীই অন্য এক অদৃশ্য অথচ অখণ্ড অস্তিত্ব নিয়ে সমগ্রভাবে অরণ্যের মতন তাকে অধিকার করে রয়েছে। প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখাটুকু চোখে পড়ে, পড়ে না তার আলোর ভুবন—অথচ এর চেয়ে সত্য আর কি ! যাকে ভালবাসি সে তো অমনই, সে তার দেহ নিয়ে যতটুকু আছে তার চারপাশের অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে যে তারও বেশি আছে। হৈমন্তীর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কীটক্ষত ফুসফুসের নিশ্বাস —তার সমগ্র অস্তিত্ব নয়, সামান্য অস্তিত্ব—ওর সত্তা চাঁদের আলোর মতন। খণ্ড দৃশ্য রূপের মধ্যে যতটুকু অখণ্ড বিভায় তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক পূর্ণ।

পরিমলকে সুধাময় তার জীবনের এই নব অনুভূতি এবং আনন্দের কথা জানিয়েছিল। সগৌরবে। লিখেছিল : 'মানুষকে পূর্ণতার পথে যেতে হয় এক একটা পথ দিয়ে। এই রকম পথকেই গুণীজনে বলেছেন আনন্দ। সত্তার পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমি—আমার এই প্রেম সেই পূর্ণতাকে অনুভব করা—আনন্দ তাকে পথ চিনিয়ে দিচ্ছে। আমার সব দ্বন্দ্ব মিটেছে। আর কোনো সংশয় নেই।'

এ এক মর্মান্তিক এবং নিষ্ঠুর পরিহাস যে, নিঃসংশয় মন মাত্র চার মাস পরে আবার সংশয়ে পীড়িত হয়ে উঠবে। এবার আরও তীব্র, আরও দুঃসহ, আরও করুণতম।

হৈমন্তী প্রথম যখন এসেছিল—মনে হত ওর আয়ুর প্রদীপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মিহিরপুর স্যানেটোরিয়ামের মুখার্জি ডাক্তারের হাতযশ বলতে হবে, অল্প দিনেই এই নিভন্ত অবস্থাটা আশ্চর্যভাবে সামলে নিয়ে হৈমন্তী ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। ও যে বাঁচবে, এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে—এ-আশা প্রায়

সত্য বলেই মনে হয়েছিল।
হৈমন্তী সুধাময়কে বলত, 'আমার এত ভীষণ বাঁচার ইচ্ছে—এ আমি নিজেই জানতুম না।'
'ছিল ; তবে ঝিমধরা পাখির মতন পাখা গুটিয়ে।' সুধাময় স্নিগ্ধ হেসে বলত, 'তোমার সে-জড়তা এখন কেটে গেছে।'
হৈমন্তীর চোখে নরম হাসির আভা উঠত। তাকাত, যেন সুধাময়কে বলছে, কি করে কাটল তা আমি জানি। তুমিও জানো।
'আমার নিজের কাছে সবই আশ্চর্য মনে হয়।' হৈমন্তী আস্তে আস্তে জবাব দিত। তারপর চুপ করে দূরের আমলকি গাছের দিকে তাকিয়ে থাকত অনেকক্ষণ। শেষে বাতাস চলার সুরে বলত, 'এখন কোনোদিন শরীর একটু খারাপ হলে এত কষ্ট হয়, ভয় হয়।' বাকিটা আর বলতে পারত না। স্পষ্টই অনুমান করা যেত বাকি কথা এই : এখন যদি চলে যাই, যা হারাবো, তা অমূল্য।
সুধাময় আনন্দে অধীর হয়ে উঠত। কিছু বলত না।

কিন্তু এ কি হল ? যে-প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—হঠাৎ যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা তার ওপর আছড়ে পড়ল। ওকে নিভিয়ে না দিয়ে নিরস্ত হবে না। হৈমন্তী আবার জীবনমৃত্যুর সীমানায় গিয়ে পড়ল।
সুধাময়ও কাতর হয়ে উঠল। হৈমন্তী চলে যাবে। সে আর থাকবে না। এই স্যানেটোরিয়ামে নয়, এই জগতে নয় ? ওই ছোট শীর্ণ শান্ত স্নিগ্ধ দেহটি শূন্যে মিশে একাকার হয়ে যাবে।
চিন্তাটা দুঃসহ। সুধাময় ভাবে আর ভাবে। তার শরীর কত যেন ক্লান্ত মনে হয়, মন বিষণ্ণ ; ভীষণ এক বেদনা এবং শূন্যতার বোধ তাকে সারাদিনমান আর রাত্রিতে তাড়া করে বেড়ায়।
সুধাময় তখন নিজেকে প্রশ্ন করল—এ-রকম কেন হয়? কেন হবে? হৈমন্তী আমার কাছে শুধু তো দেহবন্ধ সত্য নয়—সে যে দেহবিহীন এক বিরাট অস্তিত্বও। ও আমার আলোর ভুবন, আমার আনন্দের জ্বলনকাঠি। যতক্ষণ তার দেহটুকু আছে ততক্ষণ কি আমার আনন্দ সত্য হয়ে আছে, যে-মুহূর্তে ওর দেহকে মৃত্যু চুরি করে নেবে—আমার আনন্দ অসত্য হয়ে দাঁড়াবে। ভালবাসা তো তা নয়, হৈমন্তীর নিশ্বাস গুণে ভালবাসার আয়ু যে নয়। তবে ?
তবে কেন এই অসহ্য দুঃখ, ভয়, বেদনা, হাহাকার! হৈমন্তী চলে যাবে—যেতে পারে—এই চিন্তায় আমি কেন শঙ্কিত, বেদনার্ত, শূন্য হয়ে যাচ্ছি।
'আমার আনন্দ শতখান হয়ে ভেঙে গেল। পরিমল, আমি বৃথাই বলেছিলাম, আর আমার সংশয় নেই— ! বিরাট সংশয় আমাকে কাঁটার মতো সর্বক্ষণ বিঁধছে।

রাজেশ্বরীর মধ্যে তার দেহের বাইরে আলোর ভুবন খুঁজেছিলাম, পায় নি, হৈমন্তীর মধ্যে তার মনের আলোময় অস্তিত্ব অনুভব করে সারবস্তু পেয়েছি ভেবেছিলাম। কে জানত—তার দেহের সঙ্গে এত গভীরভাবে সে-অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। আমার ভালবাসা অন্ধকারের মতন, প্রদীপের কাছে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আলোকিত। একে ভালবাসা বলি না। যে আনন্দ এত চঞ্চল, ভঙ্গুর—সে-আনন্দ মিথ্যে।' পরিমলের কাছে শেষ চিঠিতে লিখেছিল সুধাময়।

তারপর— ?

সুধাময় তারপর মিহিরপুর টি বি স্যানেটোরিয়াম ছেড়ে চলে গেল। কেন—কে জানে ? হয়ত এত সংশয়, এই দুঃসহ বেদনা তার সহ্য হয় নি। সে নতুন করে তার বিশ্বাসকে খুঁজতে বেরিয়েছে কিংবা তার সেই অদ্ভুত আনন্দকে।

সুধাময়ের গল্প এখানে শেষ। আমি, পরিমল, তার কথা আর কিছু জানি না। যদি আপনাদের কেউ এ-গল্প পড়েন এবং সুধাময়ের দেখা পান, তাঁকেও এখানে শেষ করতে হবে কাহিনী। কিন্তু কে জানে, হয়ত, আপনার এত কথা মনে থাকবে না, কিংবা থাকলেও সময় থাকবে না, এত কথা বলার। খুবই স্বাভাবিক অবশ্য। তবে, হ্যাঁ, যদি কোনোদিন সুধাময়ের সঙ্গে দেখা হয়, তাকে বলবেন, তার লেখক বন্ধু পরিমলের বড় ইচ্ছে সুধাময় যেন জানায় সে কি তার সমস্ত জীবনে সেই সুধাকে পেয়েছে যার জন্যে ওর এত আকুলতা, এত ঘাট ছেড়ে ঘাটে যাওয়া ? এত তন্ন তন্ন আঁতিপাতি করে খুঁজে, এক বন্দর ছেড়ে আর এক বন্দর—এমনি করে সে চলতে চলতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।



নিষাদ

"You begin by killing a cat and you end by killing a man."

ছেলেটা মরবে ; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ…কিংবা কাল…।

নাম ওর জলকু। বছর বারো বুঝি বয়েস। এখানকার দেহাতী ছেলেদের মতনই দেখতে। গাঢ় কালো রঙ। নরম সিমেণ্টে কালি-মেশান কালচে রঙের একটি ছাঁচ যেন। এখন কাঁচা, হাত দিলেই দাগ পড়ে যাবে—এমনই নরম কাদাটে কোমল ভাব সারা গায়। মুখটা গোল, ফোলা ফোলা গাল, চিবুকের ডৌলটুকু এখনও ফোটে নি, কারিগরের হাত পড়ে নি বোধহয়। নাকটি মোটা, বসা। পুরু মোটা মোটা ঠোঁট। জোড়া ঘন ভুরুর তলায় বড় বড় দুই চোখ। কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব। কালো শান্ত চোখের তারা আর সাদাটে জমিটা যেন জলে-জলে ভেসে উঠেছে। জলকুর কপাল আছে কি নেই বোঝা যায় না চট করে। মাথা ভর্তি একরাশ চুলে কপাল, ঘাড়, কানের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে থাকে।

ছেলেটা একেবারে জংলী। এখানে থেকে থেকে এদের মতনই হয়ে গেছে। গায়ে জামা দেয় না, পায়ে জুতো নেই। আদুল গায়ে নোংরা একটা ইজের পরে সারা-দিন ওই রেললাইনের কাছে।

ছেলেটা মরবে ; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ…কিংবা কাল।

এই এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার। আগে ছিল না।

কিছুদিন দেখতাম টিলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকত। চারপাশে তাকাত। শেষে রেললাইনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। কী যেন খোঁজবার চেষ্টা করত, দেখত। ঠিক জানি না কেন, হয়ত টিলার ওপর কিছু খুঁজে না পেয়ে, কিংবা হয়ত খুঁজে পেয়েই টিলার ও-পাশটায় নেমে যেতে লাগল। ও-পাশেই রেললাইন। লাইনের পর আবার টিলা। এখানটায় এইরকম। দু-পাশে, প্রায় বালিয়াড়ির মতন দুই টিলা, মাঝ দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে রেললাইন। পুব এবং পশ্চিমে বেশি দূর ছড়িয়ে পড়ে নি টিলার ঢল। শ' দেড়েক গজ বড় জোর। তারপর মাঠ আর মাঠ, অস্পষ্ট জঙ্গল। পুবে একটা ছোটখাটো নদীর পুল। পুলের এ-পাব থেকে রেল-লাইনটা ধনুকের মতন বেঁকে এসে টিলার কাছাকাছি সোজা হয়ে গেছে।

জলকু টিলা থেকে নেমে রেললাইনে চলে যেতে শুরু করেছিল আজকাল। আর নতুন যে-খেলা খেলতে শুরু করেছিল তা বাস্তবিক নতুন নয়, কিন্তু দিনে দিনে

কেমন এক ভয়ংকর খেলা হয়ে উঠেছিল।

ছেলেবেলায় কে না এই খেলা খেলেছে। রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে আমরাও লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়েছি। দেখেছি, টিপটা কি রকম; হাতের জোর কতটা, লাইনের গায়ে পাথরের চোট লেগে ফুলকি জ্বলে কিনা, শব্দটা কেমন হয়। আমাদের এ খেলা ছিল কদাচিতের, সামান্য সময়ের। কিন্তু জলকুর কাছে খেলাটা রোজকার হয়ে উঠল। আজকাল প্রতিদিন সে এই খেলা খেলছে, প্রতিদিনই। আর এই খেলায় তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ্দুরে, তাপে, লু-য়ে—জলকু পাথর ছুঁড়ছে, রেললাইনে তাক করে করে। আর প্রায় রোজই ওকে ধরে আনতে হয়। আমায়।

আমি ছাড়া জলকুকে ধরে আনার কেউ নেই। ওর বাবা পঙ্গু। ঘরে আছেন কি নেই বোঝা যায় না। এক এক সময় খেপে গিয়ে যখন চেঁচাতে শুরু করেন, গালি-গালাজ ছোটান—তখন বোঝা যায় আমার পাশে ও-বাড়ির কোনো ঘরে একজন পুরুষমানুষ আছেন। নয়ত জলকুদের বাড়িতে শোনার মতন গলা আর নেই। জলকুর মাকে আমি কমই দেখেছি। চেহারা মুখ কিছুই ভাল করে দেখতে পাই নি, ধারণাও করতে পারি না সেই অবয়ব। অত্যন্ত ঝাপসাভাবে যে-টুকু আকার তৈরি করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়—জলকুর মা রোগা, রুগ্ন, কালো, অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া গ্রাম্য। মুমূর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। রান্নাঘর আর উনুন, মসলা বাটা, ঘর ঝাঁট, কুয়োতলায় বসে বাসন মাজা—সংসারের এই শ'খানেক অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে জলকুর মা-র ভোর শুরু হয় এবং স্বামীর অসাড় দুর্গন্ধ শরীরে মালিশ মাখাতে মাখাতে মাঝরাতের বেহুঁশ ঘুমে ঢুলে পড়ে দিনটা তার ফুরিয়ে যায়।

জলকুর বাবা কী রোগে পঙ্গু হয়েছেন আমি জানি না। শুনেছি, বছর দুই ধরে ভদ্রলোকের এই অবস্থা। ডান পাশটা পড়ে গেছে একেবারে, শুকিয়ে চিমসে গেছে। অনাচারে কি? হতে পারে। অত্যাচারে কি? অসম্ভব নয়। কোনো সাংঘাতিক আঘাতের পরিণাম যদি হয়—হবেও বা। আমি জানি না। জলকুর বাবার সঙ্গে আমার দু' একবার যা সাক্ষাৎ তাতে আমরা দু'জনেই স্বল্পভাষী হয়েছি। ভদ্র-লোকের সেই দুর্লভ গুণ আছে, দুর্ভাগ্যের কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে চান না। আমার সহানুভূতি পাবার আশা উনি করেন নি, ইতিবৃত্তও শোনান নি পঙ্গু-তার। শুধুমাত্র বর্তমানের অবস্থাটা দু' এক কথায় বলেছিলেন।

সমবেদনা জানাবার ভদ্রতা আমার জানা ছিল না। আমি বেদনা পেয়েছিলাম নিশ্চয়। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারা, মুখ, বিছানা, ঘর, ঘরের আবহাওয়া আমায় এত বেশি অস্বস্তি দিচ্ছিল যে, আমি যতটুকু সম্ভব কম কথা বলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম।

কাজেই আমরা কথা বলেছি অল্প। নিছক কাজের কথা ছাড়া অন্য কথায় যাই নি। কাজের কথাও অবশ্য সামান্য—ঘরের ভাগ-বাঁটরা, ভাড়া, ভাড়ার তারিখ—এমনি খুঁটিনাটি।

জলকুদের একতলা ছোট টালিছাওয়া বাড়ির পশ্চিমটা আমার, ভাড়া পাওয়া। পুবটা তাদের। আমার এলাকায় একটি মাঝারি, অন্যটি ছোট ঘর; সামনে পিছনে সামান্য বারান্দা, খাপরা-ছাওয়া একফালি রান্নাঘর।

একই বাড়ির আধাআধি ভাগ-বাঁটরার মধ্যে দেওয়াল মাটি ছাদের সংযোগ ছাড়া বাকি যে-টুকু সংযোগ তা ছিল জলকুকে নিয়ে—এবং জলকুর পিসিকে যদি ধরা যায় তবে তাকে নিয়েও। তবে সে তো সামান্য, অতি সামান্য।

জলকুর পিসির পুরো নাম বোধহয় তরুলতা! তরু বলেই ডাকতে শুনতাম। ঢেঙা রোগাটে গড়ন। মুখের ছাঁদটি লম্বা ধরনের। গায়ের রঙ মাজা কালো। সাপের মতন লম্বা বেণীটি ঘাড় থেকে খসে পিঠের ওপর দুলত। মিলের শাড়ি, সস্তা কাপড়ের জামা। তরুর বয়েস কুড়ি ছাড়িয়েছিল অনেক দিন। বিয়ে হয় নি। একটি দু'টি বসন্তের না-মেলানো দাগের সঙ্গে হতাশা এবং কাতরতা মাখানো সেই মুখ কেমন যেন রিক্ত শূন্য অবোধ দেখাত।

আমার আর তরুর মধ্যে মেলামেশা গল্পগুজব ছিল না। দেখা হলে চোখাচোখি হত, জলকুর খোঁজ করতে এসে বড় জোর শুধোত, জলকুকে দেখেছেন নাকি? না আমি যখন রাত্রে গ্রামোফোন বাজাতাম—ওদের তরফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও শুনত, পরের দিন দেখা হলে বলত, ওই গানটা আজ আর একবার দেবেন? বড্ড ভাল গান।...কখনও কখনও ডাকে-আসা আমার বাংলা মাসিক পত্রিকা দুটো চেয়ে নিয়ে যেত, গল্প পড়তে।

গল্প করতে, গান শুনতে তরু এলে আমি বোধহয় অখুশী হতাম না।

পরে সে-কথা বুঝেছি। আর যখন কথাটা স্পষ্ট করে বুঝছি, তখন থেকে জলকু তার সর্বনেশে নতুন খেলা শুরু করল।

জলকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত উধাও। বাড়িতে নেই, সামনের আগাছাভরা বাগানটায় নেই, কুয়োতলায়, মাঠে—কোথাও না।...তরু বাইরে এসে খুঁজছে, ডাকছে, জলকু-জলকু। বাড়ির মধ্যে বসে সে-ডাক আমি স্পষ্টই শুনতে পাই। প্রথমটায় গরজ দেখাতে ইচ্ছে করে না; ভালোও লাগে না উঠতে।

ডাক যখন বাড়তে বাড়তে ঘুরেফিরে আমার বারান্দার কাছে এসে পেঁছয়, উঠতে হয় আমায়। আমি জানি জলকু কোথায় আছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছককাটা। জলকুর পিসি খুঁজবে, ডাকবে, আমি প্রথমে গা করব না, পরে সরু ব্যাকুল গলার ডাক অনুনয়ের মতন আমার বারান্দায় এসে

থামবে, আমি উঠব। বিরক্ত, অপ্রসন্ন। মাথার ওপর বৈশাখের খর রোদ, অসহ্য গরম, আগুনে হাওয়া, আস্তে আস্তে আমি হাঁটব। বাড়ির পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে টিলার কাছে এসে দাঁড়াব, উপরে উঠব, সতর্ক পায়ে, মুখে তপ্ত বাতাসের ঝাপটা লাগবে, কটকটে রোদের ঝাঁঝে তাকাতে পারব না ভাল করে, তবু টিলার ওপর উঠলেই দেখতে পাব, নীচে রেললাইনের স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে জলকু পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ছে। আদুল গা, ঢলঢলে ইজের, একরাশ চুলে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা এবং অব্যর্থ নিশানায় জলকু রেললাইনের লোহার ধারালো হিংস্র উজ্জ্বলতাকে বার বার আঘাত করছে। ধাতব, বেসুরো একটা আওয়াজ উঠছে, ঠং ঠং ঠং।

'জলকু। এই জলকু।' কাছে গিয়ে জোর এক ধমক দেবো। জলকুর একটা হাত জোরে চেপে ধরব। ডান হাত। জলকু প্রথমে হাত ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। শেষে চোখ তুলে তাকাবে। সে জানে আমায় দেখতে পাবে। মুখে কোথাও তার বিস্ময়ের এতটুকু ছায়া পড়বে না। আমি জানি, ঘোর-ভাঙা দুটি গভীর অবসন্ন লালচে চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাব না। তপ্ত, ঘর্মাক্ত, অথচ নরম পিচ্ছিল একটা হাত আমার মুঠোয় শক্তভাবে ধরা থাকবে।

'বাড়ি চলো।' গলাটা আমার রুক্ষ বিরক্ত কঠিন, 'তোমায় রোজ বলি এ-ভাবে একা লাইনে এসে দাঁড়িয়ো না—সব সময় গাড়ি আসছে যাচ্ছে—কোন্‌দিন কাটা পড়বে লাইনে।'

জলকু কথা বলে না। আরও ঘামে, মুখ মাথা আরও গোঁজ করে আমার হাতের টানে-টানে টিলার ওপর উঠতে থাকে।

মাথার ওপর আকাশ জ্বলছে, পাথর আর কাঁকরে-বালি ঝকঝক করছে, গরম হাওয়া ঝাপটা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে, দূরের পুলের কাছ থেকে রেললাইনের ধনুকের মতন বাঁকটা বিরাট এক শানানো তলোয়ারের মতন জ্বলছে।

'তুমি এ-ভাবে আর এসো না জলকু। কখনও না।' টিলার ওপরে উঠে এসে আমি বলি। হাতটা ছেড়ে দি ওর। কয়েক পা দূরেই আমাদের বাড়ির পাঁচিল।

জলকু কথা বলে না। আমি জানি, জলকু আমার নিষেধ শুনবে না। ও আবার আসবে। হয়ত আজই দুপুরে কোনোও ফাঁকে ছাড়া পেয়ে।

কি সর্বনেশে খেলায় পেয়েছে ওকে। ছেলেটা মরবে; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ…কিংবা কাল…।

সে-দিন একটা লোক জুটেছিল। আমার এলাকার বাগানটুকু নিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত খেটেছি। বাখারির ভাঙা বেড়াটা ভেঙেই ফেললাম একেবারে। আর দরকার নেই। কিছু আগাছা জন্মেছিল, রোদের তাতে পুড়ে পুড়ে খড় হচ্ছিল, সে-সব

পরিষ্কার করা হল। বেলফুলের কেয়ারি, জুঁই গাছের তলা, টিপ-হলুদের ছোট ঝোপের মাটি খুঁড়তে আর বারান্দার টবের ফুল-গাছ ক'টাকে পরিচর্যা করতে করতে বেলা অনেক হল। স্নান করতে যাব, এমন সময় জলকুর পিসির গলা, 'জলকু —জলকু।'

ডাকটা পাঁচিলের শেষ পর্যন্ত চলে গেল, ওপাশে কদমগাছের তলা দিয়ে বেড় খেয়ে পেয়ারা ঝোপ, বাতাবি লেবু, আমগাছের ছায়া ঘুরে আমার বারান্দার কাছে এসে থামল।

'পালিয়েছে ?' আমি বললাম, বিরক্ত গলায়।

'ক—খন ; আসুক আজ হারামজাদা—গায়ের ছাল তুলব। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেও নিস্তার নেই।' তরু রাগে গর গর করছিল।

'বেঁধে রাখাই উচিত। রোজ রোজ এ-ভাবে রেললাইনে পালিয়ে যায়। একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ—ওইটুকু তো ছেলে।'

'মরবে ; মরবে একদিন হতভাগা। মরুক, আমারও হাড় জুড়োয়।' তরু আজ অসম্ভব চটেছে। কথার ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল।

চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে আমি বললাম, 'আর কিছু না, এখান থেকে দেখাও যায় না, লোক নেই জন নেই, ফাঁকা রেললাইন—ভয় হয়।'

আমার অগোছালো কথা, তরুর তিক্তবিরক্ত ভাব, সব মিলেমিশে জলকুর একটি ভবিষ্যৎ পরিণতি যেন দু'জনের চোখেই লহমার জন্যে ভেসে এলো। অল্প একটু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। তারপর আমি নেমে গেলাম বারান্দা দিয়ে।

বৈশাখের বুঝি শেষ সপ্তাহ চলছে। অসহ্য গরম। মাথার ওপর চোখ তোলা যায় না। গলা তামার মতন প্রতপ্ত আকাশ বেয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। তেঁতুল কি কাঁঠালের ঝোপ-ঝাড়গুলো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। একটি কাক কি চড়ুইও ডাকছে না। টিলাটা যেন পুড়ছে, পাথরগুলো রোদ আর তাতকে দ্বিগুণ করে ছুঁড়ে দিচ্ছে চোখে, গায়ে।

আমার চোখ জ্বালা করছিল, নিশ্বাস অসহ্য গরম, কানের পাশ দিয়ে লু-য়ের হলকা বয়ে যাচ্ছে।

জলকু একটার পর একটা পাথর কুড়োচ্ছে রেললাইন থেকে আর ছুঁড়ছে, ছুঁড়ে মারছে রেললাইনে। ছেলেটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে আজ। কিসের এক অদম্য আক্রোশ তাকে জ্ঞানহারা করেছে। আদুল গা, ছোট একটু ইজের, উদোম পা, স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে ধারালো শক্ত পাথর তুলে নিচ্ছে মুঠোয় আর পলকের মধ্যে হাতটা অসম্ভব কঠিন, হিংস্র, উন্মত্ত ভঙ্গিতে ওপরে তুলতে না তুলতেই পাশ কাটিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারছে। ইস্পাতের মসৃণ চকচকে একটা সাপ যেন এই অর্থহীন ছেলেখেলার আঘাত সয়ে যাচ্ছে ; গ্রাহ্য নেই।

আমার হঠাৎ মনে হল আজ, জলকু যেন অন্য কিছুকে তার ওই অন্ধ উন্মত্ত আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত করে মারতে চাইছে। কিন্তু কাকে?

কাকে?

কোন্ অদ্ভুত কৌতূহলে জানি না—আমি চারপাশে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত জায়গাটা নির্জন, ছায়াহীন। ঘা খাওয়া লোহার বেসুরো ভাঙা ভারী শব্দ শুধু। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বয়ে আসা লু-য়ের ঝড় বইছে, থেকে থেকে। অতি দ্রুত বাতাস কেটে এগিয়ে যাওয়ার সেই সোঁ সোঁ গর্জন, এই আছে, এই নেই। পুলের কাছে রেললাইনের পুরো বাঁকটা চোখে পড়ে না। বাঁক যেখানে শেষ হয়ে সোজা হয়ে মিশে যাচ্ছে সে-টুকু চোখে পড়ে। ধারালো ফলার মতন দেখাচ্ছে অংশটা।

অতি কষ্টে একবার মাথার ওপর চোখ তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সমস্ত আকাশটাই যেন জ্বলন্ত সূর্য, আগুনের ঝলসানিতে গনগনে আঁচের মতন রঙ ধরেছে শূন্যে। টিলার পাথরে শরীরটা পুড়ছে, কাঁকরের স্তূপ ধকধক করে জ্বলছে, রেললাইনের পাথর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল, অসহ্য উজ্জ্বল। আমার গাল মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল ভীষণভাবে, গলার কাছে বুকের তলায় দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আর চোখে মুখে নাকে ঠিকরে এসে লাগছিল সেই জ্বলন্ত দুঃসহ তাপ। অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ, লোহা, স্লিপার সবই—, সমস্ত কিছু এক ভয়ংকর দহনের ঝলসানিতে জ্বলছে। অবোধ্য আকারহীন এবং নির্মম কোনো হিংস্রতা তার বিরাট করতল আস্তে আস্তে গুটিয়ে মুঠো করে নিচ্ছে।

আচমকা মনে হল, জলকু এই সর্বগ্রাসী বীভৎস অবয়বহীন হিংস্রতাকে তার অতি পরিমিত অর্থহীন সামর্থ্য দিয়ে আঘাত করছে, নিষ্ফল আক্রোশে।

আমার মাথার শিরায় রক্তের প্রবাহ হঠাৎ যেন জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ভীত এক অনুভূতি হল আমার। মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস হারালাম, চোখ অন্ধকারে ঠিকরে পড়ল, অসহ্য এক ব্যথা ঘাড়ের কাছে ছুরির ফলার মতন বিঁধে গেল।

'জলকু—এই জলকু।' জ্ঞান ফিরে পেয়ে জলকুর হাত চেপে ধরলাম।

টিলার ওপর দিয়ে যখন উঠে আসছি, জলকুর হাত আমার হাতে, মনে হল, নীচের ইস্পাতের দু'টি উজ্জ্বল হিংস্র অজগর যেন তার অফুরন্ত ওষ্ঠে হাসির আভা খেলিয়ে ঝকঝক করছে। বিদ্রূপে।

একটা গাড়ি আসছিল। পুলের কাছ থেকে ইঞ্জিনের সিটি বাজছে, বিরতিহীন কর্কশ তীক্ষ্ন ধ্বনি—বাতাস থেকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই তীক্ষ্নতা আমার কানে এসে লাগছিল।

আর একটু হলেই জলকু আজ লাইনে কাটা পড়ে মরত। যা বেহুঁশ বেঘোর পাগল হয়েছিল আজ।

ছেলেটাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি আজ বাঁচিয়েছি। আমি মনের তলায় তৃপ্তি এবং মমতার স্বাদ-মাখানো এক সুখ পাচ্ছিলাম।

'জলকু, আমি না এলে আজ তুমি একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করতে। আর কখনও এ-ভাবে এসো না। বুঝলে?'

জলকু তাকাল না, কথা বলল না, মাথাও নাড়ল না।···কেন জানি না, হঠাৎ ভীষণ একটা বিরক্তি এলো ছেলেটার ওপর। হাত ছেড়ে দিলাম।

ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ···কিম্বা কাল।

মাঝে জলকুর অসুখের মতন হল। একদিন বিকেলে জ্বর এল। দেখতে দেখতে হু হু করে জ্বর বাড়ল। পাঁচ পর্যন্ত উঠে থামল তখনকার মতন। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, চোখ চাইতে পারছে না। সারাটা মুখ ঝলসে যাচ্ছে। এখানে কাছাকাছি কোথাও ডাক্তার-বদ্যি নেই। আমার মনে হল, তাত-জ্বর। জলপটি দিতে বললাম তরুকে, সেই সঙ্গে আমার হঠাৎ-প্রয়োজনের হোমিওপ্যাথী বাক্স থেকে তখনকার মতন একটা ওষুধ।

পরের দিনও জ্বর থাকল। ডাক্তার এলো না বাড়িতে। জলকুর বাবা জলকুর মাকে গালাগালি দিচ্ছিল, শুনেছি। ডাক্তার না ডাকার জন্যে নয়, অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে বোধহয়। জলকুর মা যথারীতি উনুন আর বাসন আর কাপড়কাচা নিয়ে ব্যস্ত থাকল, তবুই যা বার দুই আমার কাছে এলো ওষুধ চাইতে এটা ওটা বলতে। রাত্রে যেন জলকুর মাকে কাঁদতে শুনেছিলাম। সম্ভবত বারান্দায় এসে অন্ধকারে বেচারী একটু আড়াল দিয়ে কাঁদছিল।

জলকুর জ্বর ছাড়ল পরের দিন ভোরে। একেবারে ছেড়ে গেল। গা ঠাণ্ডা।

তরু এসে খবর দিল আমায়। নিজের ওষুধের মহিমায় নিজেই মুগ্ধ এবং অভিভূত হচ্ছিলাম। গর্ব বোধ হচ্ছিল। খুশী মনে তৃপ্ত মুখে তরুর দিকে চেয়ে থাকলাম।

তরু আঁচলের আগা দিয়ে আঙুলে পাক দিচ্ছিল আর খুলছিল। হঠাৎ বলল, 'জ্বরের ঘোরে বার বারই জলকু তার মানিককে খুঁজেছে। বউদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে, জলকু তাই বুকের কাছে জাপটে ধরে···'

অসহ্য একটা রাগ মাথার মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল। তরুকে শেষ করতে না দিয়েই বিশ্রী ইতর গলায় ধমকে উঠলাম, 'তবে আর কি—তোমার বউদির কাছে যাও। ছেলের জ্বর তিনিই সারিয়েছেন।'

তরু চুপ। তার মুখে চোখে গলার স্বরে কি রকম এক অপরাধী ভাব ছিল, আমি

যা সহ্য করতে পারছিলাম না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তরু চলে গেল ধীরে ধীরে।

যাক। মনের ঝাঁঝ তখনও আমার পুরো মাত্রায় রয়েছে। প্রায় স্বগতোক্তির মতন বললাম, 'বউদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে—? তবে আর কি, বালিশ বুকে জড়িয়েই তোমাদের ছেলে ভাই-পো সারুক।' বিদ্রূপটা আমারই কানে মধু বর্ষণ করল।

জলকুর মানিক? সে তো, সে তো জলকুর সোহাগের একটা ছাগলছানা। মরেছে। পাপ চুকেছে। বড্ড জ্বালাতন করত। আমার বহু পরিশ্রমের ফল, টবের দু'টি ডালিয়াও একেবারে গোড়া পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। অকালের ফুল, বহু সাধ্য-সাধনা করে পেয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম সাত-সকালে সাইকেল ঠেলে, পাঁচ মাইলটাক পথ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। জ্যৈষ্ঠের রোদে আর ফেরা গেল না সকালে। ফিরলাম বিকেলে। তখনও মাথার ওপর রোদ ছিল।

খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে কুয়োতলায় স্নান করতে নামলাম। ঠান্ডা গা-জুড়োনো জল। সমস্ত শরীর থেকে তাপ ধুয়ে যাচ্ছে, মাথাটা ঠান্ডা হয়ে আসছে শীতলতায়, ঘর্মাক্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহের অতৃপ্তি ধুয়ে মুছে স্নিগ্ধতা জড়িয়ে ধরছে। আরাম অনুভব করতে পারছি। সাবানের ফেনায় গন্ধ উঠেছে খসের, মৃদু সুঘ্রাণ।

'জলকু—জলকু—।' তরুর গলা কানে গেল।

আমি স্নান করছি, কুয়োয় গা-মাথা জুড়োনো ঠান্ডা মিষ্টি জল, সাবানের ফেনায় চমৎকার গন্ধ, সামনে ছায়া নেমেছে, হালকা ম্লান একটু রোদ, শালিক বসেছে কুয়োতলার পাড়ে।

'জলকু—জলকু।' ডাকটা বাড়ির সামনে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেড়ালো। কদম-গাছের তলা দিয়ে করবী ঝোপের কাছে গিয়ে থামল। ঘুরে ফিরে বাতাবি লেবুর গাছের তলায় থমকে দাঁড়াল। আশপাশ ঘুরে কুয়াতলার কাছাকাছি কোথাও।

ছেলেটা আবার পালিয়েছে। স্নান শেষ হয়ে গেছে আমার। আমি জলকুর কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। এই সে-দিন তাতজ্বরে মরতে মরতে বেঁচেছে। এখনও ও অসুস্থ। দুর্বল, রুগ্ন। এই অবস্থায়। আবার পালিয়েছে! শয়তান ছেলে একটা।

ঘরে এসে কাপড়-চোপড় ছাড়লাম। কি খেয়াল হল, ধোপ ভেঙে একটা পাজামা পরলাম। প্রায় আধ-কৌটো পাউডার ছড়ালাম গায়। কে জানে কেন, অত্যন্ত আরাম লাগছিল, ভাল লাগছিল। নেটের গেঞ্জিটা গায়ে দিলাম। চুল আঁচড়াচ্ছি—আয়নায় মুখ দেখে দেখে, বারান্দার কাছে তরুর গলা শোনা গেল, ভাইপোকে ডাকছে। আসলে ভাইপোর নাম ধরে আমাকেই ডাকা, আমাকেই অনুনয় করা।

মুখ মুছে, চটিটা পায়ে গলিয়ে বাইরে এলাম।

'পালিয়েছে ?'

'হ্যাঁ, খানিকটা আগেও কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল।...আমি ভাবলাম...' তরু ব্যাকুল উদ্বিগ্ন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, 'বিকেল শেষ হয়ে গেল... রোগা ছেলে...।'

'দেখছি।' বারান্দা থেকে নামলাম। কদমগাছের তলায় আসতেই কেমন এক লালচে আভা দেখলাম পাঁচিলের মাথায় চুপ করে পড়ে আছে। যেন ফিসফিস করে আমায় কিছু বলতে এসেছে। পশ্চিমের আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকালাম। সূর্যাস্তের লগ্ন শুরু হয়েছে। আকাশটা সিঁদুরের রঙে ধুয়ে গেছে, সূর্যটা লাল, টকটকে...সূর্যটা ঘন লাল, টকটকে...

হঠাৎ কিসের আকুল-করা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের একটা দমকা এসে ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডে ঝাপটা দিল। ঝাপটা নয়, ছোবল। বুক থেকে পলকে সাপের কিলবিলকরা এক অনুভূতি মাথার স্নায়ুতে উঠে এলো। আমার হৃৎপিণ্ড, সম্ভবত জীবনের ধ্বনিটুকু, সময়মত বাজতে ভুলে গেছে। মাথা বুক হাত পা সব অসাড়। আমি সর্বপ্রকার অনুভূতি থেকে চ্যুত হলাম কয়েক মুহূর্তের মতন।

অল্পক্ষণ। হৃৎপিণ্ড এবার ভয়ংকর জোরে শব্দ করতে শুরু করেছে। বরফের বিরাট একটা দেওয়ালে কে যেন আমার পিঠ ঘাড় ঠেসে ধরেছে। ঝিমঝিম করছিল মাথা! দৃষ্টিটা টিলার ওপর থেকে আর নড়ছে না।

জলকু মারা গেছে, লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে আজ, অল্পক্ষণ আগেই। কানেব পরদায় ইঞ্জিনের তীব্র হুইসল, মালগাড়ি চলে যাবার শব্দটুকু ভেসে এলো। আমি যখন স্নান করছিলাম একটা মালগাড়ি চলে গেছে। চাকার বিশ্রী জঘন্য সেই শব্দটা এখন আমার কানের পরদায় শুনছিলাম। চাকা চলছে...চলছে; ইস্পাতের হিংস্রতা হাসছে। ছেলেটা মারা গেছে। কেন যেন আমার হঠাৎ আজ মনে হল। আকাশে টকটকে রক্তগোলা রঙ, সূর্যটা লাল, অসহ্য লাল আজ। ভয়ংকর উজ্জ্বল।

আর আমার পা বাড়াবার মতন সাহস হচ্ছিল না। কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে। সাড় নেই, আগ্রহ নেই, শুধুমাত্র এক ভয়ংকর আতঙ্কের পীড়ন আমায় পিছু দিকে টেনে নিচ্ছে।

বিহ্বলতার এই উগ্রতা আমি দমন করবার চেষ্টা করলাম। কার্যকারণের স্বাভাবিক যুক্তি তৈরি করবার আপ্রাণ পরিশ্রম করছিলাম। জলকু কাটা পড়েছে এ-কথা আমি কেন ভাবছি ? কেন ?...সূর্য এইরকমই লাল থাকে, মেঘ এমনই ঘন রক্ত সদৃশ রঙ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সূর্যাস্তবেলায়। হয়ত প্রত্যহই। আমি চোখ তুলে দেখি না বা দেখলেও তেমন করে দেখি না।

আমায় যেতে হবে। জলকুকে ধরে আনতে হবে। সে মারাত্মক খেলায় মেতে

আছে। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যে পা বাড়িয়েছে। জলকুর মা রুটি সেঁকছে জলকুর জন্যে। তরু কুয়াতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গামছা হাতে—অপেক্ষা করছে। জলকু ফিরে এলে হাত মুখ ধুইয়ে দেবে।

বুঝতে পারলাম আমি আস্তে আস্তে ভীত ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে হাঁটছি। টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশই। কাঁকরের স্তূপ, ছোট ছোট আগাছার ঝোপের ওপর থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গিয়ে ছায়া নেমেছে, মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। কোথা থেকে একটু হাওয়া বইতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

টিলায় ঠিক মতন পা দিতে পারছি না—পিছলে যাচ্ছে। আমার যেন একবিন্দু শক্তি নেই, হয় ঘুমে না হয় কতকাল অসুখে ভুগে আজ দুর্বল পায়ে পথ হাঁটতে নেমেছি।

বার বার বাধা। মন পিছু টানছে। জলকু সামনে টানছে। কে যেন কাছে ফিস-ফিস করে বলছে যেয়ো না—; পর মুহূর্তে চোখের ঝাপসায় জলকুর মা যেন রুটির থালা হাতে এগিয়ে আসছে, তরু ডাকছে···

জানি না কখন কেমন করে টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য সেই লহমায় কোন্ দূর দূরান্তে ডুব দিতে যাচ্ছে। যাবার আগে শেষ নিশ্বাসের মতন প্রাণের কোনও অদৃশ্য শক্তি থেকে সূর্যপিণ্ড তার শেষ আলোটুকু ঢেলে দিল। এই আলো অসহ্য গাঢ়, আশ্চর্যরকম লাল। আমি জীবনে কখনও এই রঙ দেখি নি, কখনও নয়। এত ঘন, জীবন্ত ভাষাময় হতে পারে রঙ আমি জানতাম না। এখন জানলাম। দেখলাম।

দেখলাম—টিলার তলায় অসাড় রেললাইন। এক ঝলক সেই আলো। হিংস্র ধারালো ইস্পাতের ওপর মুঠো-মাপের জায়গাটুকুতে আলোটা ছিল। আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাল তারপর উড়ে গেল।

ছায়ার মধ্যে তালগোল পাকানো কালো জামাপরা জলকুর একটু চিহ্ন। পাথরের গায়ে গায়ে আর সব নিশ্চিহ্ন। স—ব।

কত রাত জানি না। ঘর অন্ধকার। ছোট লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়েছি কখন। অল্প টিম-টিমে আলো—তাও সইতে পারছিলাম না। যতটুকুই হোক, আলো থাকলেই মনে হচ্ছিল, অন্য কিছু আছে এ-ঘরে। অপলক দু'টি চোখ মেলে আমায় দেখছে। ···বাতি নিবিয়ে ঘরভরা অন্ধকার সামনে নিয়ে বসে আছি। আমায় যেন কেউ না দেখে। নিজেকেও নিজে দেখতে চাই না।

কত রাত জানি না। চারিধারে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। অন্ধকার। পাশের বাড়িতে একটি মুমূর্ষু গলার প্রায় শব্দহীন কান্নাটা শেষবারের মতন শুনেছি অনেকক্ষণ। এখন হয়ত মানুষটির গলা বুজে গেছে। আর শব্দ বেরুচ্ছে না। জলকুর পিসি

হয়ত জলকুর বিছানা জাপটে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জলকুর বাবা—? জানি না।

আমি জেগে আছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার আমায় ভরে রেখেছে। মনে হচ্ছে এই লুকিয়ে থাকার খেলা আমি শুরু করেছি কতকাল আগে—আজ আর তার হিসেব পাওয়া অসম্ভব ; এই খেলা কতকাল খেলব তারও কোনো সীমা পাচ্ছি না। এই অন্ধকারের মতনই সব। আদি হারিয়ে গেছে ; অন্ত আছে বলে মনে হয় না।

এত অস্থির চঞ্চল কাতর বিহ্বল আগে কখনও হই নি। কেন ? আজই বা আমার কি হল ? জলকুর কাটা পড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায় ?

বুকের মধ্যে কী যে যন্ত্রণা আর কান্না ! কেমন এক মাথা-খোঁড়ার মতন হাহাকার। কিন্তু সব জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। পাথরের মতন। একটুও গলবে না, একটুও না।

অন্ধকার কখন একটু ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। বাইরে হয়ত মাঝরাতে চাঁদ উঠল। কোন্ তিথি আজ ?

বাইরে থেকে আমায় নিঃশব্দে কে যেন ডাকছে। আমি জানি কে। অনেকক্ষণ থেকেই ডাকছে। এ এক ভীষণ আকর্ষণ। প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু চাঁদ উঠছে বলে, আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে এসেছে। এমন কি হয় ! হয়ত।

কদমগাছেব পাতা সরসর করে কাঁপছে, বাতাবিলেবুর তলায় কাঠবেড়ালি ছুটছে· · জলকুর দড়ির দোলনা ছিঁড়ে গেছে কবে···তার মানিকের কাঁঠালপাতা জমে জমে রোদে শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠেছে। এখন বুঝি হাওয়া ছিল একটু, শুকনো কাঠালপাতা খস খস করে উড়ে গেল।

আমায় ধরে রাখতে পারল না ঘরের অন্ধকার। আমার বুক, মন, পা—প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন একবার শেষ চেষ্টা করে সেই অদ্ভুত যাদুকরী তীব্রতম আকর্ষণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ ওঠে নি—উঠবে। পা বাড়াতে গিয়ে ফুলের টবে পা আটকাল। হাত বাড়িয়ে পথ ঠাওর করতে গিয়ে মনে হল, এটা সেই ফুল-ছেঁড়া, ডাল-চিবোনো ডালিয়ার গাছ। জলকুর মানিকের একটা বিরাট অপরাধের স্মৃতি। দু' পা এগিয়ে বারান্দার নীচে মাঠে নামলাম। পাশের বাড়ি অসাড়। মনে হল শূন্য। হয় সবাই মরে গেছে, না হয় ছেড়ে চলে গেছে। পোড়ো বাড়ির ভ্যাপসা গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। শ্যাওলা জমে জমে কালো দেওয়ালের অত্যন্ত আবছা একটু আভাস।

তরু কি চলে গেছে ? তরু জানত আমি ফুল ভালবাসি, তরু জানত আমি গান ভালবাসি, তরু জানত আমি তাকেও ভালবাসতে শুরু করেছিলাম—সবই জানত তরু। তার অজানা ছিল না কিছু। সেই যে একদিন এক ঘন মেঘলায় আঁধার-

হয়ে-আসা দুপুরে তরু অসাড় পায়ে আমার ঘরে এসেছিল, আমি ছিলাম···সে ছিল, ঝোড়ো ধুলোর ভয়ে জানলা বন্ধ ছিল···পাশাপাশি বসে···ঘর ভরা মেঘলার ঘনতা···। জলকু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তরু চমকে উঠল, আমি চমকে উঠলাম। জলকু তার মানিককে খুঁজছে। ঝড় উঠছে কিনা তাই। মানিকের সেই দ্বিতীয় অপরাধ।

চাঁদ উঠল। আমি টিলার ওপর উঠেছি। চরাচর নিস্তব্ধ। বাতাস বইছে। তাল তাল এবড়ো খেবড়ো ছায়া ছড়ানো এ-দিক ও-দিক। কোথাও হাল্‌কা, কোথাও নরম। চাঁদের অতি মিহি ঝাপসা আলো আমাতে ছায়াহীন করেছে।

জোনাকি জ্বলে না এখানে, ঝিল্লিরব হয়ত আছে···আমার কোনো হুঁশ নেই, মতি-ভ্রম হয়েছে হয়ত···বা কোনো কুহকের ডাকে চলে এসেছি।

টিলার উপর উঠে এসে দাঁড়ালাম। নিচে রেললাইন। কত যেন নীচু। চাঁদের মিহি, জলের মতো সাদা একটু আলো, রেললাইনের সাড়া নেই, পাথরের কুচিগুলো চুপ।

হঠাৎ মনে হল, আমি যেন কিছু একটা ধরে রেখেছিলাম এতক্ষণ। তার ভার ছিল হাতে। আচমকা মনে হল, সে-ভার আর নেই। ফেলে দিয়েছি। ছুঁড়েই দিয়েছি। টিলার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে···পড়ল। শব্দ কি শুনলাম? না, না। শব্দ নয়। তারপর চাঁদ একটু উজ্জ্বল হল, মুহূর্তের জন্যে···। এক মুঠো করুণ বিষণ্ণ আলো দুলে দুলে রেললাইনের একটু জমিতে কাঁপল। যেমন কাঁপা জলে আলো কাঁপে। জলকুর রক্ত বুঝি ওখানেই ছিল। কিংবা···মানিকের রক্ত বুঝি পাশেই ছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল কবে। কবেই।

ক্ষীণ চাঁদ প্রকাণ্ড এক ভাসন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

কখন কদমতলার কাছে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি। জলকুদের ঘর থেকে পোড়ে বাড়ির গন্ধ ভেসে আসছে।

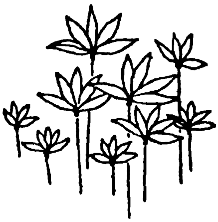
এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের মন ও সত্তাকে ভাঙলাম। দু'ভাগে। এক ভাগ আমি, অন্যটি জলকু। মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধহয় এইভাবে নিজেকে ভাঙে। জলকুর আদুল গা, কালো তুলতুলে চেহারাটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আস্তে আস্তে তার মুখ স্পষ্ট হল। বড় বড় চোখ, বসা নাক, ঝুল জমে কালো হয়ে থাকার মতন চুলের গুচ্ছগুলি কপালে কানে চোখে ঝুলে ঝুলে পড়ছে।

মনে হল, জলকু পাথর ছুঁড়ছে। পরিচ্ছন্ন অথচ হৃদয়হীন এক ষড়যন্ত্র এবং অনেক সবল কঠিন নির্মমতার বিরুদ্ধে সে বোকার মতন তার ছোট পলকা হাতে শুধু পাথরই ছুঁড়ছে ব্যর্থ আক্রোশে।

কত কথা বলার ছিল, বলা হল না। বলতে পারলাম না। শুধু বললুম, 'জলকু, কে জানত গ্রামোফোনের দম দেওয়া অতটুকু হ্যাণ্ডেল ছুঁড়ে মারলে তোমার মানিক মরে যাবে। …একটুতেই কত কি যে মরে যায়! আশ্চর্য।'

জলকু হয়ত কথা শুনতে পেল না। নিজের কথা নিজের কানেই ফিরে এসে লাগল। আমি শুনলাম। তারপর স্বপ্নের মতন দেখছিলাম, সারা দুপুর বিকেল সন্ধ্যে এবং প্রায় সারারাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা মানিককে আমি কেমন করে লুকিয়ে ছেঁড়া এক টুকরো চটে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি টিলার ওপর।…

ছেলেটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মরেছে। আজ…।



ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া

শীতের দিনে রবিবারের হাটে একটা লোক পাখি বেচতে আসত। ত্রিলোচন নন্দীকে দেড় টাকায় এক জোড়া রঙ করা চড়ুই বেচে বলেছিল রোদে জলে রাখবেন না, ঘন জঙ্গলের পাখি, ছায়ায় থাকতে ভালবাসে।

সাতদিনের মাথায় ঘন খয়েরী পালক, সবুজ পুচ্ছ এবং আলতা লালের ছিট প্রায় উঠে গেল। পাখি জোড়া নিজের মতন চড়ুই হয়ে আসছিল। জুবিলি স্কুলের অংকের মাস্টার নরেনের সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে ত্রিলোচন পাখির গল্পটা করে ফেলল একদিন। নরেন খুব হেসেছিল। ত্রিলোচন ঠকেছে এই আনন্দে সে অন্তঃপুর পর্যন্ত গলা পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, দেড় টাকায় পাখি কিনতে গেলে ওই-রকম হয়। পোষা জিনিসের জন্যে পয়সা খরচা করতে হয়, মশাই, পয়সা। জবাবে ত্রিলোচন শুধু বলেছিল, রঙটা পাকা নয়।

তারপর পাখি দুটো সাদামাঠা চড়ুই হয়ে গেল। ত্রিলোচনের বউ ফুল্লরা বাঁশের খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিল ও দুটো। অনেকদিন ডানা মেলতে পারে নি বলে চড়ুই দুটো এক দমকায় বেশী উড়তে পারল না, একটা ডালিমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসল, অন্যটা কুয়োপাড়ে ; গৌরগোপাল গয়ার পেঁড়া নিয়ে তখন সবেমাত্র বাড়িতে ঢুকেছে। ফাল্গুন মাসের পড়ন্ত বিকেল, উষ্ণ দিনান্ত, সামনে মাঠ, ধুলো রোদ ঘোলা করে তুলেছে, ফুল্লরা গৌর-গোপালকে দেখে হাসল। 'এস ঠাকুর পো…কোথায় গিয়েছিলে ?' ফুল্লরা একবার ডালিমগাছ আর একবার কুয়োপাড়ের দিকে অন্য-মনস্ক চোখে তাকাল, তারপর কত যেন অতিষ্ঠ, বিরক্ত, নাক, মুখ কুঁচকে ঠোঁট উলটে বলল, 'আপদ দুটোকে বিদায় করে দিলাম। চড়াই আবার পোষে নাকি কেউ।' রুমালে বাঁধা গয়ার পেঁড়া হাতে ঝুলিয়ে চায়ের দোকানের মস্ত ইয়ার গৌরগোপাল দাঁত বের করে হাসল, 'আমি হলে ময়ূর পুষতাম।' ফুল্লরা গালে টোল তুলে হাসল ; চোখ অলস, পিছু দিকে হেলিয়ে মাথা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে ডান হাতে এক রাশ চুল ঘাড়ে নিয়ে সামনে টেনে নিল। হাতের চারটে আঙুল চিরুনির মতন চুলে ডুবিয়ে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'পুষতে, তারপর মাংস খেতে।' ত্রিলোচনের সাইকেলের ঘণ্টি এ-সময় বেজে উঠল। দুপুরে রুগী দেখতে বেরিয়েছিল ত্রিলোচন এই ফিরল।

এইসব ঘটনার পব আস্তে আস্তে ত্রিলোচন নন্দীর নামে একটা ছড়া চালু হয়ে গেল। শহরের প্রায় সবাই শুনল কারও কারও মুখস্থ থাকল। এই ছড়া কে তৈরি করল কেউ সঠিক জানে না। কেউ বলত, হাটের পাখিঅলা ; কেউ বলত, জুবিলি

স্কুলের নরেনবাবু। কেউ বা গৌরগোপালের নাম দিত। সবই অনুমানে। কারণ, সেই পাখিঅলা আর হাটে আসত না, নরেন ত্রিলোচনের দাবা খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, গৌরগোপাল ও-বাড়ি যেত না আর।

ছড়াটার ঢঙ দেখে মনে হবে, এ কীর্তি কারও একার নয়, একাধিকের। তবে কোরা তাঁতের কাপড় চার-পাঁচ ধোপ ধোপার বাড়ি ঘুরে এলে যেমন খোল জমে, সুতো মাজা হয়, চেহারায় খোলে—ছড়াটা তেমনি মুখে মুখে ভাটি খেয়ে খুব মজেছিল। শুনলে শ্রবণসুখ তো বটেই, দর্শনতৃপ্তিও মিটত। ছড়া শুনেই ত্রিলোচন, ত্রিলোচনের বউ এবং তাদের সংসারের স্পষ্ট ছবি দেখা যেত, বিন্দুমাত্র কষ্ট হত না। কেউ কেউ বলল, ডিমের ওপর যেমন খোলা—তেমনি এই ছড়াটা ত্রিলোচনদের ওপরকার খোলা—ভাঙলে ভেতরটা টল টল করে ফুটে বেরুবে।

সেবার শহরে খুব বসন্ত লেগে গেল। ঘরে ঘরে। বাজার পাড়ার দিকে আতংকটা বেশী। কিছু মরল, ভুগল প্রায় সবাই। ত্রিলোচন নন্দীর সঙ্গে এই মড়কের দিনে আমার ভাব হল। জনকল্যাণ সমিতির হয়ে আমি টিকে দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। বাস কম্পানীর প্রহ্লাদবাবুর বাড়ি টিকে দিতে গিয়েছি, ত্রিলোচন নন্দীর সঙ্গে দেখা প্রহ্লাদবাবুর বড় মেয়েকে হোমিওপ্যাথিগুলি খাইয়ে ফিরছে ত্রিলোচন, বসন্তের গুটি বেরিয়ে মেয়েটা জ্বরের জ্বালায় অচেতন।

ত্রিলোচন নন্দী আমায় দেখে আপনজনের মতন হেসে বলল, 'আমার বাড়িতে একবার যেও ভাই।'

'টিকে নেবেন!'

'আমি নেব না, আমার বউ নেবে।'

'আপনিও নিয়ে নিলে পারেন।' ত্রিলোচনের হাতে ঝোলানো হোমিওপ্যাথি ওষুধের কালো ব্যাগটা অবজ্ঞার চোখে দেখতে দেখতে আমি বললাম।

আমার লাগবে না। ত্রিলোচন চোখের তলায় হাসি ফেলে নিশ্চিন্তে মাথা নাড়ল। সামান্য দাঁত দেখা যাচ্ছিল ওর।

ত্রিলোচন চলে গেলে আমি দুটো কথা তখনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে ছিলাম। ত্রিলোচনের বউ বোধহয় স্বামীর হোমিওপ্যাথিগুলি-ফুলি বিশ্বাস করে না; এমনও হতে পারে ত্রিলোচন রুগীর বাড়িতে দাঁড়িয়ে টিকে নিতে নারাজ। হয়ত বাড়িতে গেলে ত্রিলোচনই প্রথম টিকে নেবে হাত বাড়িয়ে, বলবে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করি ভাই, আমি টিকে নিলে লোকে আমার ওষুধে বিশ্বাস করবে কেন।

আমার ধারণা ভুল। ত্রিলোচন নন্দীর বাড়ি গিয়ে বুঝতে পারলাম, লোকটা তার পেশাকে বিশ্বাস করে। নিজের বিশ্বাস বউয়ের ওপর চাপাতে পারত, চাপায় নি।

'আপনি তো ওঁকে ওষুধ দিতে পারতেন।' আমি কৌতূহল দমন করতে পারি নি।

'না। ও একবারও টিকে নেয় নি।'

'সে কি ! 'প্রাইমারী ভ্যাক্সিনেশান…।'

'না ভাই । ওটা দেওয়া উচিত ।' ত্রিলোচন পরম বিশ্বাসে বলল ।

ঠিক জানি না কেন, আমার মনে হয়েছিল ত্রিলোচন বিশ্বাসী এবং যুক্তিবাদী। কোনো কোনো জিনিস সে বিশ্বাস করে, কোনো কোনো জিনিসে যুক্তি মানে। অধিকাংশ মানুষই এইরকম। কিন্তু এই বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে তাদের সবটুকু ডুবে নেই। বিশ্বাসও আধাখাপচা, যুক্তিও তাই। ত্রিলোচনের তা নয়। তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ, তার যুক্তির ক্ষেত্রে সে পূর্ণ অনুগত।

এত কিছু নিশ্চিতভাবে জানতে আমার সময় লেগেছিল। সময় এবং সুযোগ আমার জুটে গিয়েছিল। মড়কের দিনে যার সঙ্গে আমার পরিচয়, মড়ক থেমে গেল যখন তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। রাস্তা-ঘাটে এবং রুগীর বাড়িতে দেখা হতে হতে শেষ পরিচয়টা ঘটল আমার বিছানায়। আমিও বসন্তের হাত এড়াতে পারি নি, যখন সারা গায়ে জলভরা গুটিগুলো অসহ্য হয়ে উঠল, তখন জ্বরে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন কণ্ঠে মাকে বলেছিলাম ত্রিলোচন নন্দীকে ডেকে পাঠাতে।

ত্রিলোচন নন্দীর নামে যে-ছড়া আমি বহুমুখে বহুবার শুনেছি, মজা পেয়েছি, ভাল লেগেছে—সেই ছড়া সম্পর্কে আমার মনোভাব আগেই বদলে গিয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা যখন বন্ধুত্বের পর্যায়ে তখন ছড়াটার কথা মনে পড়লে আমার খারাপ লাগত, এই শহরের মানুষগুলোকে ধিক্কার দিতাম। আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কোনো এক ইতর তার আক্রোশ বশে এই ছড়া তৈরি করেছিল এবং আরও কয়েকজন ইতর মিলে তাকে জমকালো করেছে।

ছড়ার ত্রিলোচন আর এই ত্রিলোচনে কোনো মিল নেই। আমি যে ত্রিলোচনকে দেখলাম তার বয়স চল্লিশ। বেশ দীর্ঘ, অনুপাতে মেদহীন বলে শীর্ণ দেখায়। ওর মুখের ছাঁচ লম্বা, কপাল চওড়া, নাক সোজা এবং দৃঢ়, গালের হাড় পুরু, চিবুক সামান্য বাঁকানো। ত্রিলোচনের চোখ খুব শান্ত, স্থির, নীচের ঠোঁট একটু বেশীরকম পাতলা। মাথার চুল ছোট ছোট, কোঁকড়ানো। রঙ ঠিক কালো নয়, তামাটে। ত্রিলোচনকে দেখলে দু'পলক তাকাতে হত। তার চেহারা বেশভূষা আমাদের শহরের প্রান্তসীমাগুলো মনে করিয়ে দিত। তেমনি মেঠো, মুক্ত, রোদে জলে পোড় খাওয়া। মাঠ, ধুলো, গাছের শুকনো পাতা, অনুর্বর পতিত প্রকৃতির মতন ত্রিলোচনের চেহারায় যে নীরসতা ছিল তা অনুভব করা যেত। সাধারণ পরিপাট্যের অভাবে তাকে হয়ত একটু বুনো রুক্ষ বলে মনে হত।

ত্রিলোচনের বেশভূষার পরিবর্তন আমি কখনও দেখি নি। বাড়িতে খাটো ঝুলের মোটা কাপড়, গায়ে ফতুয়া, খালি পা। বাইরে বেরুবার সময় ধুতি মালকোচা মেরে পরে নিত, হাঁটুর একটু তলা পর্যন্ত সে ধুতির ঝুল, পায়ে কেডস্ জুতো, গায়ে সাদা মোটা পাঞ্জাবি, সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা তার হোমিওপ্যাথি ওষুধের

ব্যাগ। সাইকেলটার চেহারা ধোপার বাড়ির গাধার মতন হয়ে গিয়েছিল।

বয়সে ত্রিলোচন আমার চেয়ে বেশ বড়, অন্তত দশ বছর। আমার উচিত ছিল বয়সের এই ব্যবধান মেনে চলা, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ছড়া শুনে শুনে মানুষটাকে এমন মজার নজরে দেখেছিলাম যে, ওকে আপনি বলতে আমার অসুবিধে হত। পূর্বে হয়ত ত্রিলোচন বুঝতে পেরেছিল বলেই আমায় তার বন্ধুর মতন করে নিয়েছিল এবং সম্মানের সম্বোধনগুলো বাতিল করে দিতে বলেছিল।

ত্রিলোচনকে আমি দাদা বলতাম—ত্রিলোচনদা। তার বউ—ফুল্লরাকে বউদি বলতে মুখে বাধত। ফুল্লরা আমার সমবয়সী, সামান্য ছোটই হবে। ওকে কদাচিত বউদি বলেছি, নয়ত সম্বোধন বাদ দিয়ে কথা বলতাম।

আমার শোনা ছড়ায় ফুল্লরাকে ত্রিলোচনের পোষা পাখির মতন বর্ণনা করা হয়েছিল। যেন ত্রিলোচন দিনের পর দিন ছোলা জল খাইয়ে একটা হৃষ্টপুষ্ট পাখিকে ভোলাবার চেষ্টা করছে, ভোলাতে পারছে না, যে-মুহূর্তে পাখিটা ধরতে হাত বাড়ায়, তীক্ষ্ম চঞ্চুর আঘাত খেয়ে হাত সরিয়ে নেয়। ত্রিলোচনের শয়তানি এবং জ্বালা দুইই বেশ ফুটেছিল ছড়ায়, ফুল্লরার বেদনা অসহায়তা আর আত্মরক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টাও।

ফুল্লরাকে দেখে, অনেক দিন মেলামেশার পরও আমার মনে হল না, ফুল্লরা বাস্তবিক ত্রিলোচনের পোষা পাখি। ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা দূরত্ব আছে ঠিকই, সে দূরত্ব ওই রকম হাড়মাংসের নয়, অন্যরকম। কেমন তা আমার চোখে ধরা পড়ে নি।

ফুল্লরাকে সুন্দরী বলা যায় কিনা আমি জানি না, তবে তার শরীর সুশোভিত ছিল। তার গায়ের রঙ ফরসা, অনেকটা যেন পাকা বেলের মতো রং। গোলগাল, মাথায় খাটো। মালসার ছাঁচে মুখ, নাক ছোট, স্ফুরিত ডগা, গাল ফোলা ফোলা, আঠার মতো কেমন চকচক করত, ঠোঁট পুরু, সিক্ত, চোখ দুটি চওড়া, মনে হয় এই মুখের পক্ষে অতিরিক্ত। খুব উজ্জ্বল দৃষ্টি, হাসলে বাঁ গালে টোল ওঠে। দাঁত ধবধবে সাদা, শক্ত। চুলের ভারে মাথা যেন একটু হেলিয়ে রাখে ফুল্লরা, অফুরন্ত ঘন জানুছোঁয়া চুল। কণ্ঠের কাছ থেকে বুক যেন প্রসারিত হয়ে গেছে হঠাৎ, ভারী বুক, কোমল শিথিল, নিম্নাংশ স্ফীত। ফুল্লরার চেহারায় পীড়িত হওয়া হয়ত স্বাভাবিক। ফুল্লরাকে আমার বঞ্চিত অথবা ব্যথিত মনে হত না, বরং কখনও কখনও তাকে প্রগল্‌ভা, চতুর বলে মনে হত। ত্রিলোচন স্ত্রীর কী পছন্দ করত আর কী পছন্দ করত না আমি বুঝতে পারি নি।

ফুল্লরাকে আমি যে টিকে দিয়েছিলাম, কপালদোষে সেই সামান্য ছুরির আঁচড় এবং কয়েক বিন্দু তরল পদার্থ তাকে কিছুদিন ভুগিয়েছিল। ওকে এক রকম বিষাক্ত হয়ে যাওয়া বলে। পেকে ঘা হয়ে অনেকটা ছড়িয়ে গিয়েছিল। পরে শুকিয়ে

গেলে কালো দাগ হয়ে গিয়েছিল, একটু গর্ত গর্ত দেখাত।
মাঝে মাঝে ফুল্লরা তার ফরসা হাতের সেই দাগ আমায় দেখাত, কৃত্রিম কুপিত কণ্ঠে বলত, 'কী টিকেই দিয়েছিলে। আনাড়ি…।'
আমি জানতাম এ দোষ আমার নয়, আমি জানতাম না এ-দোষ কার। বলতাম, 'রক্ত অপরিষ্কার থাকলে এ-রকম হয়।'
ফুল্লরা চোখের পালক ঝাপটা মেরে বলত, 'আমার রক্ত তোমার চেয়ে পরিষ্কার।'
একদিন তারের খোঁচা লেগে ফুল্লরার আঙুল কেটে গিয়েছিল। ফুল্লরা তার রক্ত আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। আমি লক্ষ করে দেখেছিলাম, খুব ঘন এবং গাঢ় লাল। আমার মনে হয়েছিল, এই রক্ত স্বাভাবিক।
ত্রিলোচন আমায় কখনো কখনো ফুল্লরার চোখের দোষের কথা বলত। আমি বুঝতাম না, কি দোষ। ফুল্লরার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং তীব্র। মাঝে মাঝে তার চোখ গরুর গাড়ির চাকার মতন খুব পুরোনো এবং মেঠো দেখাত, কিন্তু তেমন দৃষ্টি খুবই অল্প দেখেছি। ত্রিলোচন বলত, রোগটা ঠিক মণির নয়, আরও ভেতরের।
আমার মনে হত ত্রিলোচন তার স্ত্রীর চোখের চিকিৎসা করেছে নিজের মতে। অবশ্য কোনোদিন সে-কথা ও আমায় খোলাখুলি বলে নি।

একদিন শেষ বর্ষায়, বিকেলের দিকে ত্রিলোচন আমার সঙ্গে মতিবাগানে কিছু ফুলগাছের চারা নিতে গিয়েছিল। বৃষ্টি এসে পড়ল পথে, আমরা তৌলির দোকানের খাপরার তলায় মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম, বৃষ্টি ধরল না। সামনের খোয়া ও পাথর-পেটা রাস্তাটা কাদা হয়ে গেল, নীচু মাঠে জল জমে গেল, দু পাশের আম জাম হরীতকী গাছগুলো ভিজে কাতর হয়ে বাতাসে কাঁপছিল। এক সময় বৃষ্টি সামান্য ধরল। আকাশ তখনও অপরিষ্কার, জলের মেঘ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাস ঠান্ডা, ঝিরঝিরে বৃষ্টির আঁশ উড়ছে। বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি আলো মরে গেছে। চারপাশ থেকে অজস্র ব্যাঙ ডাকছিল।
ত্রিলোচন বলল, 'আজ আর হল না, চল বাড়ি ফিরে যাই।
তৌলির দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা জলকাদা ভেঙে বাড়ি ফিরছি, আবার যেন বৃষ্টি তার ক্লান্তি কাটিয়ে ছুটে এলো। পুরু সাদা চিকের মতন জল আমাদের পথ দেখতে দিচ্ছিল না, মেঘ ডাকছিল ভয়ঙ্কর গলায়, গাছের মাথা বাতাসের দাপটে নুয়ে নুয়ে পড়ছিল।
ত্রিলোচন বৃষ্টির জল খেতে খেতে বলল, আমার বাড়িতে চল…তবু কাছে আছে।
ত্রিলোচনের বাড়িতে পেঁছে মনে হল, এই বৃষ্টির ঠিক-ঠিকানা নেই, হয়ত রাত পর্যন্ত টানা চলবে। ত্রিলোচন আমার কাপড় জামা ছেড়ে ফেলতে বলে ফুল্লরাকে

ডাকতে গেল।

জলে ভিজে আমার শীত করছিল। জামা কাপড় পায়ের সঙ্গে জাপটে কেমন বন্ধনের মতন লাগছিল, সারা গা মাথা পা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, কয়েকটা কাক কোথা থেকে আতঙ্কিত কর্কশ স্বরে চেঁচাচ্ছিল, গুরু মেঘের ধ্বনি সামনের মাঠ ছাড়িয়ে দূরান্তে ভেসে যাচ্ছে।

ফুল্লরা এলো। হাতে গামছা, কাপড়, ত্রিলোচনের গেঞ্জি, শুকনো একটা বিছানার চাদরও। বলল, 'ইস, কাক ভেজা ভিজেছ যে। নাও, নাও—ও ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি সব বদলে নাও।' ফুল্লরা ত্রিলোচন নন্দীর ভেতর দিকের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

বারান্দা লাগানো এই ঘরটা ছোট, ত্রিলোচনের বসার ঘর। তার রুগী দেখার জন্যে সামনে একটা কুঠরি মতন আছে। জামা কাপড় বদলাবার সময় ঘর অন্ধকার ছিল, শুকনো কাপড় পরে গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে, চাদর জড়াবার সময় জানলা খুলে দিলাম। বাইরে ধোয়া কালির মতন অন্ধকার। শূন্যতা যেন আর্দ্র হয়ে আছে। সামান্য দূরে কদম গাছটা অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জলে কেমন ঘন ছায়ার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফুল্লরা এলো। হাতে লণ্ঠন। এইমাত্র জ্বালিয়ে এনেছে। অন্য হাতে চিরুনি। বলল, 'বাতিটা জ্বালিয়ে আনলাম, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।......এই নাও চিরুনি। চিরুনি বাড়িয়ে দেবার সময় ফুল্লরা আমার মাথার চুল ঘেঁটে দেখে নিল। 'এই কি মাথা মোছা, জল রয়েছে এক গাদা, ভাল করে মুছে নাও।'

মাথা থেকে হাত সরিয়ে নেবার সময় ফুল্লরার আবরিত ত্বকের গন্ধ আমার নিশ্বাসে প্রবেশ করল। আমার খুব নিকটে ঘন হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। সাপুড়ের বাঁশীর মতন তার ফোলা বুকের ওপর আমার বিব্রত দৃষ্টিকে আমি স্থির হতে দিচ্ছিলাম না।

'মাথায় এত চুল রাখ কেন?' ফুল্লরা বলল, বলে জানলার গায়ে রাখা গামছাটা আমার হাতে এনে দিল।

কখনও কখনও মানুষের মাথার খুলি তাকে বাঁচাতে পারে না। আমার চুল ভেজা, মাথার খুলি ঠাণ্ডা, তবু রক্ত অনেক লঘু বলে অগ্নিকণিকায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল। 'দাও, আমি মুছিয়ে দি'—ফুল্লরা আমার মাথায় অর্ধসিক্ত গামছা ফেলে দিল।

আমি নিরুপায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। লজ্জা এবং অস্বস্তির প্রবাহ আমার শরীরে যথারীতি কিছু জড়তা সৃষ্টি করেছিল এবং মন কয়েকটি বিগত স্মৃতি দ্রুত নিপুণ হাতে তুলে নিচ্ছিল। যে কোনো কারণেই হোক ঘটনাগুলি আমার স্মৃতিবদ্ধ হয়ে আছে।

ফুল্লরার চঞ্চল হাত আমায় স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। এক সময় আমার মনে হল, শিরার মতো দুটি চক্ষু আমার অসহায়তা লক্ষ করছে, পর মুহূর্তে ধারণা হল ফুল্লরার

কম্পিত মেদস্তরে আমার দুর্লভ্য বস্তুগুলি কেউ দুহাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অবশেষে ফুল্লরা আমার সমস্ত সিক্ততা শুষ্ক করে একটু সরে দাঁড়াল। ওকে লক্ষ করার জন্যে ভীত নেত্রে মুখের দিকে তাকালাম এবং সবিস্ময়ে দেখলাম, ফুল্লরার হাতে গভীর দাগ। সেই টিকের দাগ! কিন্তু ক্ষতটি আর কালো নয়, কিঞ্চিৎ শ্বেত। যেন এই ক্ষত যে-কোনো মুহূর্তে আবার রক্তপাত করতে পারে।

'নাও এবার চুল আঁচড়ে নাও।' ফুল্লরা বলল।

ফুল্লরা চলে গেলে আমার মনে কামভাব জেগেছিল।

ভিজে জামা কাপড় সবই স্তূপীকৃতভাবে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ফুল্লরা। আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে কদমগাছের পাতায় ঘনীভূত অন্ধকারের বিশালতা অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম।

ত্রিলোচন এলো। বাতি উজ্জ্বল করল। বলল, 'আর বাদলা হাওয়া খেও না, তক্তপোশে এসে বস।'

'প্রচণ্ড বৃষ্টি হল আজ—'

'ভালোই হল। ক্ষেতে একটু জল দাঁড়াবে।'

জানলার কাছ থেকে সরে এলাম। এই ঘর বেশ ছোট। একটি জামকাঠের তক্তপোশ, ওপরে সতরঞ্চি পাতা। কোণের দিকে কালো রঙ করা একটা বেঁটে আলমারি, তালা ঝুলছে আঙটায়; দেওয়ালে বাঙলা তারিখের ক্যালেণ্ডার। একপাশে একটা টেবিল, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা, তার ওপর কিছু ছেঁড়া খোঁড়া বইপত্র, চিনেমাটির ভাঙা ফুলদানিতে ক'টা কাগজের ছেঁড়া ফুল।

ত্রিলোচন তক্তপোশের ওপর আরাম করে বসল। বলল 'বস। গরম চা আসছে, মুড়ি ভেজে গোলমরিচ আর আদার কুঁচি দিয়ে আনতে বলেছি। ব্যস্, শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

বসলাম! বাইরে বৃষ্টির মৃদু শব্দ। খুব দূরে কোনো দিকভ্রম পাখি করুণ কণ্ঠে ডাকছিল। মেঘের ডাকে মুখ চাপা পড়েছে, ঝিঁঝিঁর স্বর প্রখর হল।

ঘরের আলো অন্ধকার পেয়ে ক্রমশ তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে। এই আলো যেন আমার চোখে এই প্রথম অনুভূত হল স্পষ্ট করে।

'তুমি আজ এখানে থেকে যাও মুরারি।' ত্রিলোচন বলল।

'যা অবস্থা...' আমি বাইরের দিকে না তাকিয়েও আমার বাড়ির পথঘাটের অবস্থা কল্পনা করতে বললাম, 'যা অবস্থা তাতে শেষ পর্যন্ত তাই থাকতে হয় বোধ হয়।'

'বৃষ্টি হয়ত থেমে যাবে!' ত্রিলোচন যেন আকাশ কল্পনা করতে পারছে এমনভাবে বলল।

'বলা যায় না।...না ফিরলে আর কিছু না, মা ভাববে।' আমি যেন অপ্রয়োজনে

অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলাম।

'আমার বাড়ির সহদেব খানিক পরেই বাড়ি ফিরবে, তোমার বাড়িতে বলে দেবে।' ত্রিলোচন শান্ত গলায় বলল।

সহদেব ত্রিলোচনের ছোকরা চাকর। আমাদের বাড়ির দিকেই থাকে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ হেসে বললাম, 'আমি দাবা খেলা জানি না।'

ত্রিলোচন শুনল। তারপর হেসে উঠল। 'আমি জানি তুমি নরেন মাস্টার নও।'

দাবা খেলা প্রসঙ্গে নরেন মাস্টারের নাম উঠতে আমি কেমন বিব্রত বোধ করলাম। ত্রিলোচন কি আমার কথার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে! অন্তত দাবার উল্লেখ করার সময় আমার জ্ঞানত কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এমনি বলেছিলাম, আমার হয়ত ধারণা হয়ে থাকবে, এই বাদলার রাতে ত্রিলোচন সময় কাটাবার জন্যে আমায় দাবা খেলতে বলবে।

ত্রিলোচনের কথার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা আমি বুঝতে পারলাম না। তার মুখের দিকে তাকাতে আমার সংকোচ হচ্ছিল হঠাৎ। তবু কথাটা সরল করে নেবার জন্যে বললাম, 'নরেন মাস্টার দাবায় খুব পাকা বুঝি?'

'কাঁচা।'

'হারত রোজ?'

ত্রিলোচন প্রশান্তমুখে হাসল, 'তার হাত কাঁচা।'

অল্প চুপচাপ। মনে হল ফুল্লরা সহদেবকে কিছু বলছে উঠোনে দাঁড়িয়ে। তার গলার স্বর ঝিল্লিরবের ওপরে চিকন হয়ে ভাসছিল।

'আচ্ছা আমি তো তোমার হাত দেখি নি। আজ দেখব।' ত্রিলোচন বলল শান্ত স্বাভাবিক গলায়।

'হাত...'

আমি কিছু কিছু চর্চা করেছি। তুমি শোনো নি, আমি হাত দেখতে পারি?' ত্রিলোচন চোখের হাসি সমানভাবে জ্বালিয়ে রেখে আমার দিকে চেয়ে থাকল।

'শুনেছি।' আমি ঘাড় হেলালাম; 'লোকে বলে।' আমার ঠোঁটের গোড়ায় উপহাসের ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল বোধহয়।

ফুল্লরা ঘরে এলো। কাচের গ্লাস ভর্তি করে চা, কলাই করা বাটিতে ভাজা মুড়ি। এখন লক্ষ করলাম, ফুল্লরার মাথায়, মস্ত গোল খোঁপা। পুষ্ট বিনুনি চাকার মতন গোল করে, পাকে পাকে জড়িয়ে বেঁধেছে। শক্ত স্ফীত খোঁপাটা লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছিল। আমি ঠিক জানি না ত্রিলোচন আমায় লক্ষ করছিল কিনা, কিন্তু সহসা সেই খোঁপার দিকে তাকিয়ে আমার স্নায়ু পীড়িত হয়ে উঠছিল।

'মুরারি আজ থাকবে।' ত্রিলোচন বলল, তার কথা আমার কানে গেল, আমি

চায়ের গ্লাস নিতে হাত বাড়ালাম, অত্যন্ত তাত লাগছিল হাতে। 'আজ রাত্রে তুমি বরং বেশ করে খিচুড়ি রাঁধ।'

'মুসুর না মুগ?' ফুল্লরা স্বামীর দিকে তাকাল।'

'যা ভাল হয়।' ত্রিলোচন বলল, একটু চুপ করে থাকল। 'সহদেব চলে গেছে?'

'না। যাবে এবার।'

'ওকে বল, মুরারির বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাবে।'

ত্রিলোচনকে আমি দেখছিলাম। সংসারে তার আসক্তি কতটা আমি জানি না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি ত্রিলোচন হলে আজ ফুল্লরাকে কাছে বসিয়ে রাখতাম মুরারিকে নয়।

ফুল্লরা আমার চোখে চোখ রেখে তাকাল। বোধহয় কিছু বলবে ভেবেছিল, বলল না, মানুষ যেমন ভিড়ের মধ্যে চেনা লোক দেখলে একটু হাসে, তেমনি করে হাসল জোড়া ঠোঁটে।

ফুল্লরা চলে গেল। আমরা মুড়ি তুলছিলাম মুঠো করে, মুখে দিচ্ছিলাম, চর্বনের শব্দ হচ্ছিল, চা খাচ্ছিলাম এবং বাইরে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় অগোচর কীট পতঙ্গ সমস্বরে যে অদ্ভুত তান তুলেছিল আমরা সেই শব্দে কান ডুবিয়ে বসেছিলাম। ত্রিলোচনই এক সময়ে আমাদের নির্বাক সম্পর্কহীন উপস্থিতিকে আবার যুক্ত করল।

'মতি বাগানে আবার একদিন যাওয়া যাবে, কি বল—'

'যে দিন হোক, কাল পরশু…'

'কাল পরশু হবে না। আমার কিছু কাজকর্ম আছে।'

'রবিবার—?'

'হাটের দিন! না ভাই হাটের দিন আমার দেহাতী রুগীগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়িতে ভিড় করে।' ত্রিলোচন কেমন স্নেহের গলায় বলল।

হাটের কথায় আমার কেন যেন সেই পুরোনো ছড়া এবং পাখি-অলার কথা মনে পড়ছিল। হয়ত নবেন মাস্টারের কথা অল্প আগে উঠেছিল বলেই পাখিঅলার কথা স্বাভাবিকভাবে মনে এলো। ত্রিলোচনের নিশ্চয় তার কথা মনে আছে। প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল কথাটা একবার জিজ্ঞেস করি।

'তুমি হাটে যাও?' ত্রিলোচন শুধল।

'যাই, মাঝে মাঝে।'

'আমার আর যাওয়া হয় না। সহদেবই যায়।'

'হাটে আজকাল কিছু আসে না তেমন…হাট পড়ে যাচ্ছে।' আমি বলছিলাম, বলার মুখে গলার কাছ পর্যন্ত গরম বাতাসের দলা অনুভব করছিলাম এবং পাখিঅলার কথা আমার জিভে অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করছিল।

'শীতে আবার জমবে। এখন বর্ষা…'

'শীতে অনেক নতুন জিনিস আসে।' আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পাখিঅলার কথাটা যেন ত্রিলোচনকে ইশারা করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। শীতে পাখিঅলা এসেছিল। ত্রিলোচন বুঝল না। হয়ত কিছু প্রকাশ করল না।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। ত্রিলোচন উঠল। টেবিলের ছেঁড়া-খোঁড়া বই ঘেঁটে কি খুঁজছিল।

ফুল্লরা এখন বারান্দায়। তার ভারী পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। হয়ত বারান্দায় ঝোলানো তারে আমাদের ভেজা জামা কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। হয়ত বিকেলের কাপড় ছাড়ার সময় হল তার এতক্ষণে, নিজেরই কাচা কাপড় মেলে দিচ্ছে। কিংবা অন্য কোনো কাজে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে।

'এখানটায় বড় জঞ্জাল হয়ে রয়েছে।' ত্রিলোচন বলল। তারপর কালো হাড়ের হাতল লাগানো বড় মোটা একটা আতস কাঁচ নিয়ে আমার সামনে এসে বসল।

লণ্ঠন সামনের দিকে টেনে নিচ্ছিল ত্রিলোচন। হাঁটুর ওপর আতস কাঁচটা পড়েছিল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, ত্রিলোচনের আতস কাঁচ এক বৃহৎ ভয়ংকর চক্ষুর মতো পড়ে আছে।

মানুষ অকারণে কোনো কোনো সময় ভয় পায়। আমি ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করছিলাম এবং অস্বস্তিকে ভয় বলে ভ্রম করছিলাম।

'তুমি হাত দেখায় বিশ্বাস কর না?' ত্রিলোচন আমার কোলের কাছে লণ্ঠন ঠেলে দিয়ে একটু সামনের দিকে সরে এলো।

'না।...এ-সব গাঁজাখুরি।'

'সব জিনিসই কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যে।'

'হাতটা পুরোপুরি মিথ্যে।'

'না, মুরারি—' ত্রিলোচন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'হাত মিথ্যে নয়।'

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উপহাসের অট্টহাসি হেসে উঠতে। কিন্তু হাসতে পারলাম না। হাসতে পারায় মানসিক গ্লানি অনুভব করছিলাম। আমার মনে হল, এই আতস কাঁচের বৃহৎ চক্ষু আমার মধ্যে অদ্ভুত এক জটিল অনুভব জাগিয়ে তুলছে।

'ত্রিলোচনদা, তুমি সত্যি সত্যি এই সব বাজে জিনিস বিশ্বাস করো, না নেহাত শখ বলে চর্চা করেছ?'

'আমি হাত বিশ্বাস করি।' ত্রিলোচন শান্ত স্থির গলায় বলল।

'আমার মাথায় তোমার বিশ্বাস ফিশ্বাস ভাল ঢোকে না।' আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। 'তোমার কোথাও কোথাও গোঁড়া বিশ্বাস—কোথাও কোথাও জোর যুক্তি।'

ত্রিলোচন যেন কথাটা শোনে নি, বা শুনলেও জবাব দেবার প্রয়োজন অনুভব করল না। হাঁটুর ওপর থেকে আতস কাঁচ তুলে নিল, আমায় ডান হাত বাড়াতে ইশারা করল চোখে। তারপর আমার ডান হাত তার বাঁ হাতে টেনে নিয়ে মৃদু ভারী শান্ত

গলায় বলল, 'সংসারে তোমায় কিছু কিছু বিশ্বাস করতেই হবে।'
ওর গলায় প্রত্যয় এত দৃঢ় সংযত হয়ে ফুটে উঠল যে আমি বিশ্বাস শব্দটির গভীরতর অর্থ ধরতে পারছিলাম।

'তুমি নিশ্চয় ভগবান বিশ্বাস কর না?' ত্রিলোচন আমার হাতের তালুর ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছিল।

'না।'

'ভূতও বিশ্বাস কর না নিশ্চয়?'

'ছেলেবেলায় করতাম।' আমি হাসলাম।

ত্রিলোচন আতস কাঁচ উঠিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। 'ভগবানের বিশ্বাস আর ভূতে বিশ্বাস কি এক, মুরারি?'

'প্রায় এক'।

'প্রায় বললে কেন?'

কেন বলেছিলাম জানি না। মানুষের তাৎক্ষণিক অনুভূতি সব সময় কৈফিয়ত দেয় না। আমার মনে হয়েছিল, ভগবানে বিশ্বাস করি না করি সে বিশ্বাস ভূতের বিশ্বাসের মতন উপহাস্য নয়। আমরা কোনো কোনো জিনিসের মূল্য অজ্ঞাতে দিয়ে থাকি। হয়ত ভগবানকে আমার ভূতের চেয়ে উন্নত বস্তু বলে মনে হয়েছিল।

কিছুটা বিব্রত বোধ করছিলাম। তবু আমার লঘু এবং হাস্য ভাব আমি গুটিয়ে নিতে রাজী হলাম না। 'ওটা সম্মান করে বললাম, ভগবানের সম্মান।'

ত্রিলোচন আর কোনো কথা বলল না। আমার হাতের তালুর ওপর তার আতস কাঁচ রাখল। লণ্ঠনের আলো আমাদের হাতে সরাসরি এসে পড়ছে, আলোটা অনুজ্জ্বল, ঘোলাটে। কেরাসিনের অতি সামান্য গন্ধও যেন পাচ্ছিলাম। ত্রিলোচন পিঠ নুইয়ে আতস কাঁচ আমার করতলে স্থিরভাবে ধরে রেখেছে। আমি নীচু চোখে তাকালাম। আমার কয়েকটি ভগ্ন রেখা স্পষ্ট এবং বৃহৎ হয়ে আমার চোখে ধরা পড়ল। আশ্চর্য, আমি আমার হাত কোনো দিন লক্ষ করি নি বলে মনে হল। অদ্ভুত এবং অর্থহীন কতক বেয়াড়া বিশ্রী রেখা আমায় যেন তাদের স্থূলতা এবং কদর্যতা দেখাতে লাগল। এবং কয়েক মুহূর্ত পরে আমার মনে হল, আমার দেহের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতন এই রেখাগুলি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা অথবা উৎসাহ নেই।

'তোমার হাত মন্দ না—' ত্রিলোচন বলল, আমি ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, পুনরায় চোখ নীচু করে আতস কাঁচের দিকে তাকালাম। এবং সহসা আমার কেমন ভয় হল। ত্রিলোচনের আতস কাঁচ ভয়ঙ্কর চক্ষু হয়ে আমার করতলের কতকগুলি দুর্বোধ্য ভাঙা বিচ্ছিন্ন রুগ্ন রেখাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। আমার ভাল লাগছিল না। ঘৃণা হচ্ছিল। ওই রেখার জাল যেন অকস্মাৎ আমার হৃদয়কে শঙ্কিত, আর্ত করে তুলছিল।

ত্রিলোচনের হাত থেকে টান মেরে আমি আমার হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমার ব্যবহারে বিস্মিত হবার মতন উপাদান ত্রিলোচন নিশ্চয় খুঁজে পেল। কিন্তু আমি তার চোখের দিকে তাকাবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ অনুভব করছিলাম না। অপ্রসন্নতা, বিরক্তি এবং তস্করের ভয় আমায় গ্রাস করছিল।

ত্রিলোচন নন্দী স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ ?'

'না।'

'তবে! এ-সব তোমার ভাল লাগছে না! আচ্ছা, তবে থাক্...' ত্রিলোচন তার হাতের আতস কাঁচ একবার মুহূর্তের জন্যে নিজের চোখের ওপর আড়াল করে ধরল। আমার মনে হল—তার একটি চোখ ভৌতিক হয়ে গেছে। আমি কখনও এমন চোখ দেখি নি, বিশাল, বীভৎস। পরক্ষণেই কাঁচটা পাশে রেখে দিল ত্রিলোচন, শতরঞ্জির ওপর। হাসল সামান্য। বলল, 'তুমি তোমার হাতে ধরা আছ। আমায় বিশ্বাস করো না করো কথাটা সত্যি।'

বাইরে বৃষ্টির শব্দ ছিল না। দূরান্তে কোনো বিশাল মেঘ বিদ্যুতের শিখা ছুঁড়ে দিয়ে গেল সামনে, অনুমানে মনে হল কদমগাছের মাথার ওপর দিয়ে ঘন তমসায় একটি আলোর ছটা ওই অসাড় মৃত জগতে আমায় আকর্ষণ করল।

ত্রিলোচন নীরব।

আমি শিহরিত, কম্পিত।

ফুল্লরার পায়ের শব্দ ঘরের দরজায় এসে থেমেছে।

'লোকে বলে তুমি নাকি হাটের পাখিঅলার কাছ থেকে পাখি কিনেছিলে এক জোড়া ?' ত্রিলোচনকে আমি অযথা অকারণে হঠাৎ এই প্রশ্ন করে বসলাম।

'কিনেছিলাম।' ত্রিলোচন মাথা নোয়াল আস্তে করে।

'রঙ করা চড়ুই ?'

'...রঙটা পাকা ছিল না।'

'লোকটা তোমায় ঠকিয়েছিল।'

'না—না, না।' ত্রিলোচন আস্তে আস্তে ওষ্ঠের কোলে সামান্য হাসি ফেলল, পাখি-ওলা রঙ পাকা করতে পারে নি, পারলে তার জিত হত।

'আর তোমার হার হত।'

'অবশ্য।...কিন্তু কি জানো মুরারি, পাখিঅলা নয়।' ত্রিলোচন ডান হাতের আঙুল মুড়ে নিজের নোখ দেখল দু মুহূর্তে। 'ফুল্লরা জানে আমি পশু পাখি মোটামুটি চিনি।'

পশু শব্দটা আমার কাছে এই মুহূর্তে অপমানকর লাগল। ত্রিলোচনের চোখের দিকে তাকালাম। বোঝা গেল না, ত্রিলোচনের মনে কি আছে কি নেই।

সেদিন গভীর রাত থেকে আবার বৃষ্টি নেমেছিল। আমি জানতাম, এই বর্ষণ একটি

অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ তৈরি করে আমায় প্রলুব্ধ করছে। আমি আমার ঘরের মৃদু আলোটুকু এই মুহূর্তে নিবিয়ে দিতে পারি।
অন্ধকার অনায়াসে বিস্তৃত প্রসারিত তমসায় একাকার হয়ে যাবে। ত্রিলোচনের ভগবান পাখির গায়ে পাকা রঙ দেবার আগে আমাদের ইন্দ্রিয়ে কাঁচা মালমশলা ঢেলেছে। আমার ইন্দ্রিয় তার রসনা লালায়িত করেএই সংসারে পাখিঅলা সাজতে চাইছিল।
সারা রাত বাইরে অন্ধকার অপেক্ষা করে থাকল, আমার ঘরে মৃদু আলো প্রতি মুহূর্তে আমার উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করছিল। কখনও কখনও নিজেকে আমি স্টার্ট দেওয়া মটরগাড়ির সঙ্গে তুলনা করে দেখছিলাম—যেন কেউ তার গাড়িরএঞ্জিন চালু করে কোথাও চলে গেছে এবং এক স্থানে স্থির থেকে গাড়িটা তার অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রগুলোকে খাটিয়ে মারছে, চাপা গর্জনে কাঁপছে অবিরত।
এবং শেষরাতে ত্রিলোচন নন্দীর আতস কাঁচএই সংসারের কোনও অদৃশ্য পুরুষের বিশাল তীব্র চক্ষু হয়ে আমায় দেখতে লাগল। এই চক্ষু যেন ত্রিকাল দর্শক। আমি ভীত ঘর্মাক্ত তৃষিত হয়ে সেই চক্ষুকে বলেছিলাম, 'তোমায় আমি বিশ্বাস করি।'
ভোরের ক্লান্ত বিশৃংখল ঘুমে আমি মড়কের স্বপ্ন দেখেছিলাম। ভয়ংকর মড়ক। ত্রিলোচন নন্দী সেই পথে তার কিছু পরম বিশ্বাস, কিছু সরল মুক্তি নিয়ে পথ হাঁটছে। তার হাতে আমার আয়ুকে আমি সমর্পণ করে দিলাম। এই বীভৎস মড়কে না হলে বাঁচার উপায় ছিল না।
এবং রৌদ্র ঘরে এলে আমি ঘুম থেকে উঠে জানলার বাইরে কদমগাছ দেখলাম। ত্রিলোচন গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। ত্রিলোচনকে দেখে আমার হাতের কথা মনে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি আমার করতললক্ষ করলাম। ত্রিলোচন নন্দীর কথা এই মুহূর্তে আমায় স্বীকার করতে হল, আমার হাতে আমি ধরা আছি।

গগনের অসুখ

'এই নে, ছবিটা দেখ। আলোর জন্যে মুখগুলো ফরসা ফরসা হয়ে গেছে বেশী। মেজদিকে দেখতে পাচ্ছিস? জানলার দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুলদানির পাশে আমাদের লতু, কেমন বড়সড় হয়ে গেছে দেখেছিস! শাড়ি পরে খোঁপা বেঁধে ফুল গুঁজে একটা লেডী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতুনবউ মুখ আর-একটু তুলে রাখলে তুই পুরোপুরি দেখতে পেতিস। ভালোই দেখতে বুঝলি, গায়ের রঙটঙ চলনসই, কিন্তু বড্ড কচি মুখখানা, সুন্দর। নয়নটাকে দেখ, রাস্কেলটা বিয়ের মালা গলায় দুলিয়ে ফিলমের হিরোর মতন পোজ দিয়েছে। ওটা যে কী ফাজিল হয়েছে, একেবারে ডেঁপো হয়ে গেছে। অ, তুই জানিস, বিয়ের পর নয়ন আর-একটা লিফট পেয়েছে; ওদের ফ্যাক্টরি নিউ স্কীমে অনেকটা এক্সটেনসান করেছে। নয়ন গ্লাসগো যাবার একটা চান্স পাবে বোধহয়। যাই বলিস, নতুনবউ খুব ভাগ্যমন্ত। তোর বাবা তো আদর করে বউকে দু বেলা দুধের সর খাইয়ে দিচ্ছে। আমি তার কাণ্ড দেখে অবাক। জামাইবাবু আমার দিদির বেলায় একটা স্নো ক্রীমের শিশিও কোনোদিন হাতে করে কিনে আনে নি। চান্স পেয়ে তোর বাবাকে এবার খুব শুনিয়ে দিয়েছি। আজকাল ওই ওলড ম্যান হাসে, কি বলে জানিস? বলে, দেখ হে ছোটশালা—তোমার মেজদি এমনিতেই ননী ছিল, তাকে আরও দুধ সর খাওয়ালে স্নো ক্রীম মাখালে জিনিসটি গলে যেত।...শুনলি তোর বাপের কথা।...যাই বলিস গগন, অনেক দিন পরে তোদের সংসারে বেশ একটা হাসি-খুশী দেখলাম। সবাই আনন্দ পেয়েছে। আমার এত ভাল লেগেছে রে, বিয়ে থা চুকে গেলে আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।...ও হো, ভাল কথা; নয়ন বলেছে তোর কাছে চিঠি লিখেছে দুটো, জবাব পায় নি—'

গগন ফটোর দিকে তাকিয়ে নয়নকে আবার দেখল। ফুলশয্যার দিন নয়নদের শোবার ঘরে পরিবারের যাদের যাদের পাওয়া গেছে সবাইকে এক সঙ্গে জড়ো করে ফটো তুলে রেখেছে ছোটমামা। গগন আত্মীয়-স্বজনদের সকলকেই চিনতে পারছে। লতু বেশ বড় হয়ে গেছে। নয়ন মোটা হয়েছে আগের চেয়ে। নয়নের বউ—কি যেন নাম নতুন বউটির!

'নয়নের বউয়ের কি নাম, ছোটমামা?' গগন জিজ্ঞেস করল।

'সবিতা।' ছোটমামা গগনের বিছানায় আরও একটু ঝুঁকে যেন ঢিলে ঢালা হয়ে বসল। 'বি-এ পর্যন্ত পড়েছে রে, গগন। কোয়েট এনাফ ফর আওয়ার ফ্যামিলি, কি বলিস!'

গগনের জানলার ওপাশে, বাইরে, বাগানে নতুন সার ঢেলেছে। সারের গন্ধ আসছিল। কিছু মাছিও জমেছে সারের গোড়ায়। মাঝে মাঝে নীল মাছি ঢুকছিল ঘরে। গগন যখন আবার ছবিতে নয়নের বউকে দেখছে তখন একটা মাছি তার মুখের পাশ দিয়ে উড়ে গেল।

ছবিটা চোখের কাছ থেকে সরিয়ে গগন দু মুহূর্ত সামনে তাকিয়ে থাকল, দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালে তার আলনা। জামা ঝুলছে, পাজামা রাখা আছে।

'ছোটমামা—'

'বল।'

'আমায় কবে নিয়ে যাচ্ছ?'

'তোকে—!…এবার তোকে নিয়ে যাব।' ছোটমামা যেন সামান্য ভেবে নিচ্ছে। চোখে ভাবনা, কপালে হিসেবের দাগ; ছোটমামা বলল, 'তোকে পরের বার নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। আর মাস দু'তিন। এবারের শীতটা এখানে কাটিয়ে নে, এত ভাল ক্লাইমেট।'

গগন জানলার দিকে তাকিয়ে, পায়ের দিকের জানলা। জানলার বাইরে সরু টানা বারান্দা, মাথায় টালির চাল, গড়ানো। ঘর থেকে বাইরে তাকালে বারান্দার গড়ানো চালা দৃষ্টিকে ভূমির দিকে নত করে রাখে। দূরে একটা কুঞ্জ। গগন কুঞ্জ দেখছিল। একটি বড় ঝাউকে মাঝে রেখে চারপাশে পাঁচ ছটি ছোট ছোট পাতাবাহার, জাফরিকাটা বেড়া ধরে লতানো গাছ আলপনা বুনে রেখেছে, কিছু মরশুমি ফুল। এখান থেকে ছবিটা স্পষ্ট নয়, তবু মোটামুটি স্নিগ্ধ।

'গগন।' ছোটমামা পায়ের কাছে নামানো বেতের টুকরি থেকে বড় বড় দুটো কমলা লেবু বার করল। এবং ইতস্ততঃ তাকিয়ে মিটশেফের মাথায় কলাই করা জাগে জল দেখতে পেয়ে উঠল। মাথার দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে ছোটমামা লেবু দুটো ধুয়ে নিচ্ছিল।

এখন দুপুর। সূর্য হেলে পড়েছে। অগ্রহায়ণের রোদে পাকা হরীতকীর রঙ ধরেছে। পাখিরা দানা খুঁটে নিয়ে আলস্য উপভোগ করছে ও-পাশটায়, এদিকে পাখি নেই, ফাঁকা।

'নে গগন, লেবু খা—' ছোটমামা টুকরির ওপর থেকে বাসি খবরের কাগজটা বিছানার পায়ের দিকে রেখে লেবুর খোসা ছাড়াতে বসল।

'মেজদি তোর জন্যে যে জিনিসগুলো দিয়েছে, সেগুলো ওই কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে আছে। কি কি যেন বলে দিল…ফুলহাতা সোয়েটার, গরম মোজা, পাজামা, গেঞ্জি…' গগনের হাতে লেবুর কোয়া দিতে দিতে ছোটমামা একটু থেমে আবার বলল, 'ও হো গগন, নয়নের বিয়েতে তুই একটা ধুতি পেয়েছিল, নয়নই কিনেছিল। ধুতিটাও আছে ব্যাগে।'

'ধুতি আমি কি করব !'

'পরিস মাঝে মাঝে।'

'এখানে কোথায় ধুতি পরব !' গগন লেবুর রসে স্বাদ পাচ্ছিল না। মিষ্টি নয়, টকও নয় ; বিস্বাদ। জলো।

'এই টুকরির মধ্যে তোর জন্যে ফলটল আছে সামান্য। তলায় বিস্কুটের টিন মাখন সব আছে।'

মাথার জানলা দিয়ে মাছি ঢুকে বিছানায় এসে বসছিল। গগন হাত নেড়ে মাছি তাড়াল। 'মা কেমন আছে, ছোটমামা ?'

'শরীরের কথা বলছিস? ভালই। তবে বাড়িতে বিয়ে থা গেল—কাজেকর্মে অনিয়মে একটু গোলমাল তো হবেই।'

'বাবা ?'

'জামাইবাবু ভালই আছে ! ডান চোখের ছানিটা এখনও কাটানোর মতন হয় নি, ওটা কাটাবার জন্যে বড় ব্যস্ত।'

মাছিটা উড়ে জানলার কাছে গিয়ে বসল। গগন দেখল একবার। নতুন সারের গন্ধ এলো বাতাসে।

'দেখ গগন, এই বিয়েটা দরকার ছিল।' ছোটমামা একটা লেবু শেষ করে ফেলল। দ্বিতীয়টায় হাত দিতেই গগন হাত নেড়ে বারণ করল, আর নয়।

'খা না। দুটো তো মাত্র লেবু।'

'না, এখন আর ভাল লাগছে না।' মাথা নাড়ল গগন, 'তুমি কি বলছিলে, ছোট-মামা ?'

'আমি !···ও হ্যাঁ, বলছিলাম এই বিয়েটা দরকার ছিল।' ছোটমামা কাগজ সমেত লেবুর ছিবড়েগুলো তুলে ঘরের কোণে চুন ভরতি গামলাটার ওপর রেখে দিল। 'তোদের বাড়িটা কেমন একটা মেলাংকলিতে ভুগছিল। মেজদি একেবারে ভেঙে পড়েছিল প্রথম দিকে, সেটা সামলে নিল বটে, তবে মায়ের মন তো রে, যতই সংসার নিয়ে পড়ে থাকুক, মনে মনে সর্বক্ষণ একটা দুশ্চিন্তা। হাসি সুখ দেখতাম না। জামাইবাবু অবশ্য খুব রিজার্ভড, তবু বুঝতে পারতাম মনে মনে বড় দুর্ভাবনায় থাকেন। গোটা বাড়িটাই কেমন চুপচাপ থাকত, রান্নাবান্না খাওয়া স্কুল অফিস কাছারি সবই চলছে—তবু মরার মতন যেন।···নয়নের বিয়েতে এই মনমরা ভাবটা কাটল। অনেকটাই কাটল।' ছোটমামা গগনের হাত টেনে নিয়ে আদর করে নিজের করতলে চেপে রাখল। বলল, 'গোটা একটা সংসার যদি বিছানায় পড়ে থাকে গগন, অসুখ আরও পেয়ে বসে। আমি জানি, তোকে বাদ দিয়ে তোদের বাড়ির কারুর কিছু ভাল লাগে না, লাগবে না। তবু, ওরা সবাই তোর বিছানার চারপাশে বসে থাকলেই কি সব সমস্যা মিটে যাবে !'

গগন মামার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল আস্তে করে। নয়ন তাকে বিয়ের আগে চিঠি লিখেছিল, বিয়ের পরও দুটো লিখেছে। নয়ন তার ছোট। ছোট হলেও পিঠোপিঠি, দেড় বছরের তফাৎ। দাদা বলে না, নাম ধরে ডাকে।

(গগন, আমি বিয়ে করছি রে। আমাদের ফ্যাক্টরির এক ভদ্রলোকের মেয়ে। তুই তাকে দেখেছিস। পালিত লেনে আমরা যখন থাকতুম তখন সেই পাড়াতে তারাও থাকত। তখন ছোট ছিল ; এখন পাঁচ পাঁচ হাইট। গগন, আমি কেন বিয়ে করছি তোকে পরে বলব, তুই যখন ফিরে আসবি তখন।)

'আমি সে-দিনও মেজদিকে বলছিলাম—' ছোটমামা গগনের বিছানার ওপর পা তুলে উঠে বসল, 'বুঝলি গগন, আমি মেজদিকে বললাম, তোমাদের সংসার দেখে এখন মনে হচ্ছে মেজদি, বেয়াড়া বাদলাটা টুটেছে। দেখো বাবা, রোদটা যেন থাকে।'

গগন নয়নের কথা ভাবছিল। নয়নের চিঠি তার চোখের ওপর—নয়নের গলায় কথা বলছে।

(গগন, আজ আমার বিয়ে। বিকেলে বর বেশে যাত্রা করব। বাড়িতে শাঁখ বাজছে, তত্ত্ব গিয়েছে গায়ে হলুদের। মা ঠাকুর ঘরে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে, বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না, হয়ত নীচেতে। লতু একটু আগে এসে আমায় বলছিল, ছোড়দা, মা বলছিল, বড়দার ছবিটা পরিষ্কার করে একটা মালা পরিয়ে রাখতে।... গগন, আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি তোর আগে আগে কখনও কোথাও যেতে চাই নি, যাই নি। এই ব্যাপারটায় এগিয়ে গেলাম। কেন, তা তোকে পরে বলব, তুই ফিরে এলে।)

'দেখ গগন, আমি একটা কথা বুঝি—' ছোটমামা বলল, 'শোক দুঃখ দুশ্চিন্তা এ-সব তো আছেই। সংসারে জন্মাবে আর বগল বাজিয়ে দিন কাটিয়ে দেবে এ বাপু হয় না। রাজারও দুঃখ আছে। শোক দুঃখ আছে বলে সবাই মিলে গলা জড়াজড়ি করে বসে মরার মতন কাঁদব। এতে কোনো লাভ হয় না, অ্যাটমসফেয়ারটাই যা বিশ্রী হয়ে ওঠে। নয়নের বিয়ের সময় আমি মেজদিকে বুঝিয়েছিলাম, গগন তো ভাল হয়ে উঠছে, ফিরেও আসবে, অযথা, তোমাদের নয়নের বিয়ে নিয়ে অত কিন্তু, কিন্তুকরার কি আছে। সংসারের দিকেও তো তোমায় তাকাতে হবে।' ছোটমামা হাতের ঘড়িটা খুলে দম দিয়ে নিল।

নয়নের বিয়ের পরের চিঠিটা যেন বাতাসে উড়ে গগনের চোখের সামনে এসে পড়েছে দেখতে পেল। খুব পাতলা নীলচে কাগজে লেখা চিঠি। বউয়ের লেখার কাগজ থেকে নিয়েছে নিশ্চয় নয়ন।

(গগন, বিয়ের ঝামেলা চুকে গেছে। তুই কিরে, একটা চিঠিও তো দিবি ! আমার কথা না হয় বাদ দে, কিন্তু সবিতাকে একটা আশীর্বাদ করবি তো চিঠিতে। তোর

কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই, গগন।...তুই ফিরে আয়, তোকে আমি অনেক কিছু বলব। গগন, সবিতা তোকে চেনে। বলছিল, একবার সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে তুই পড়ে গিয়েছিলি। সত্যি না কি রে!)

'গগন—?' ছোটমামা গায়ে ঠেলা দিল গগনের আলতো করে।

'উঁ।'

'তুই কোনো কথা বলছিস না।'

'বলছি।' গগন ছোটমামার দিকে তাকাল। ছোটমামার মুখ গোল, রঙ ফরসা। মার মুখের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। কপাল আর চোখ নাক অবিকল মার মতনই। তবে ছোটমামার চোখ খুব দপদপে, কেমন যেন চাঞ্চল্য দৃষ্টিতে; মার চোখ শান্ত, মার চোখে ক্লান্তি। গগন মাকে দেখছে এমন চোখ করে কয়েক পলক ছোটমামাকে দেখে নিল।

'গগন—' ছোটমামা ডাকল।

'বলো।' গগন চোখে চোখে আর তাকাতে পারল না ছোটমামার, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তোর এখন শরীর কেমন?'

'ভাল।'

'কোনো, কষ্ট হয়?'

'না।' গগন বলল। বলে ভাবল, তার কষ্ট হয় না বললে ছোটমামা খুশী হবে। পরে আবার ভাবল, শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেছে ছোটমামা, শরীরে তার কোনো কষ্ট হয় কি না! হয় না।

ফটোটা বিছানা থেকে উঠিয়ে গগন আবার দেখতে লাগল। ঘরটা তার বড় চেনা। ওই ঘরে তারা দুজনে থাকত—গগন আর নয়ন। জানলার দিক করে তাদের বিছানা ছিল, পশ্চিম দেওয়ালের দিকে টেবিল, আলমারি ছিল একটা দরজার দিকে; নয়ন টেনিস খেলা শিখছিল, তার র‍্যাকেটটা কাপড় পরিয়ে টিকিতে বেঁধে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখত।

'ছোটমামা, লতুটা সত্যিই বেশ বড় হয়ে গেছে।' গগন অন্যমনস্ক গলায় বলল।

'বড় কি রে, বললাম না তোকে একটা লেডী হয়ে গেছে।'

'ওর কত বয়স হল?'

'কত—! দাঁড়া বলছি—' ছোটমামা হিসেব করে নিচ্ছিল, 'লতু হয়েছে মা মারা যাবার আগের বছর। তার মানে লতু এখন পনের।'

'আমি যখন আসি তখন লতু ফ্রক পরত—' গগন কেমন হেসে বলল, 'ওর একবার চুলে জট পড়েছিল, আমি কাঁচি দিয়ে অনেক চুল কেটে দিয়েছিলাম। তারপর যা অবস্থা হল ছোটমামা, লতু আর বিনুনি বাঁধতে পারে না।' গগন আপন মনেই

হাসল, লতুর মুখ দেখতে লাগল ছবিতে, মস্ত একটা খোঁপা বেঁধেছে বোধহয়।

'দেখ গগন—' গগন আর অন্যমনস্ক নেই দেখে ছোটমামা আবার কথা শুরু করার উদ্যম পেল। 'আমি ঠিক করেছি, এবার একবার মেজদিকে নিয়ে হরিদ্বার বেড়িয়ে আসব। জামাইবাবুর এখন আর কোনো অসুবিধে নেই, নয়নের বউ রইল।'

'নয়ন কবে গ্লাসগো যাবে, ছোটমামা ?'

'এখনও কিছু ঠিক নেই। একটা কথা চলছে।...তবে নাইন্টি পার্সেণ্ট চান্স রয়েছে। আরে, গরু দুধ দিতে না পারলে কি মানুষ তাকে গোয়ালে রেখে খাওয়ায় ! নয়নটা যে খুব কাজের ছেলে, ফ্যাক্টরিতে ওর খুব সুনাম।'

'এখন কত মাইনে পাচ্ছে ?' গগন শুধলো।

'ছশো পাচ্ছিল। নতুন লিফট পেয়ে আরও বেড়েছে কিছু।' ছোটমামা বলল। বলে কি ভাবল। হঠাৎ যেন কোনো কথা মনে পড়ে গেছে, মজার কথা, ছোটমামা হাসি মুখ করে বলল, 'নয়নের একটা কীর্তি শুনবি !...বেটা যেদিন লিফট পাবার খবর পেল সেদিন বাড়ি আসার সময় একটা শাড়ি কিনে এনেছে। এনে নতুনবউয়ের হাতে দিয়েছে, কোনো কথা বলে নি।...রাত্রে খাবার সময়, তুই ভেবে দেখ গগন, জামাইবাবু এক পাশে বসে খাচ্ছে, লতু রয়েছে, নয়ন নিজে, মেজদি বসে, নতুনবউ খেতে দিচ্ছে—নয়ন খেতে খেতে লিফট পাবার খবরটা দিল। দিয়ে মেজদিকে বলল, তোমার জন্যে একটা শাড়ি এনেছি মা, পাও নি ? মেজদি অবাক। শাড়ি, কই না—কিছু তো দেখে নি মেজদি। নয়নটা সঙ্গে সঙ্গে তার বউয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওর হাতেই দিয়েছি, ও তোমায় দেয় নি তবে, নিজে মেরে দিয়েছে। বউ বেচারী তো লজ্জায় অপ্রস্তুত...' ছোটমামা হা হা করে হাসতে লাগল। যেন রগড়টা এইমাত্র করা হয়েছে, নয়ন সামনে বসে আছে।

গগনও একটু হাসল। শব্দ করে নয়। তার মনে হল নয়ন বউকে এমনি করেই জ্বালাচ্ছে বোধহয়। নয়ন ওই রকমই। লতুকে, যখন লতু বেশ ছোট, নয়ন বলত, হ্যাঁরে লতু, তোদের সেলাইদিদিমণিটা শালকরের দোকানে রিপুর কাজ করে কেন রে ? লতু বুঝতে পারত না প্রথমে, পরে ভীষণ চটে যেত, চেঁচাত, রাগের দমকে কেঁদেই ফেলত। নয়ন তবু ছোট বোনের পিছনে লাগত।

'লতু আমার কথা কিছু বলে না, ছোটমামা ?' গগন বলল। ছোটমামার দিকে না তাকিয়ে, ছবিটা দেখতে দেখতে।

'বলে না রে কিরে, প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।' ছোটমামা পকেট হাতড়ে লবঙ্গর কৌটো বের করল, একটা দুটো তুলে নিল, 'এই যে এখান থেকে ফিরে যাব, তারপর লতুর কত কি প্রশ্ন।...বুঝলি গগন, লতুর খুব জানতে ইচ্ছে করে তুই কোথায়

আছিস।'

'ও জানে না?'

'জানে, তবে ঠিক বুঝতে পারে না।'

গগন কেমন অন্যমনস্ক হল। এ রকম অন্যমনস্ক মানুষ খুব ঘনঘোর বাদলার দিনে হয়, কিংবা কোনো নদী বা বনের ধারে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যে বেলা। গগন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল সে কোথায় আছে, তার চারপাশে কি কি আছে!

দুপুরের রোদ দেখে মনে হচ্ছে, যে বিরাট চৌবাচ্চায় সারা সকাল দুপুর ভরে রোদ জমা হয়েছিল যেন তার জল বেরোবার মুখটা খুলে গেছে হঠাৎ—আর কল কল করে রোদ বেরিয়ে চৌবাচ্চা খালি হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে রোদ ফিকে হয়ে আসছিল। গগন কাতর হল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে ছোটমামা লতুকে কি কি বলে গগনের জানতে ইচ্ছে হল।

ছোটমামা মাথার দিকের জানলা দিয়ে বাইরে ক দণ্ড তাকিয়ে থাকল। বাতাস এলোমেলো হয়ে বয়ে যাচ্ছে, নতুন সারের গন্ধ আসছে ঘরে। বার কয়েক নাক টানল ছোটমামা। 'কিসের গন্ধ রে, গগন?'

'সারের। বাগানে নতুন সার দিয়েছে।'

'তোদের এখানে বিনি সারেই যা ভেজিটেবলস্ হয়…'

'আমায় তুমি কবে নিয়ে যাবে ঠিক করে বলো, ছোটমামা?' গগন কাতর ক্ষুব্ধ চোখে ছোটমামার দিকে তাকাল।

'বললাম যে, এই শীতটা শেষ হলেই।'

'তুমি যখনই আস এই গরম এই বরষা এই শীত কর। এবারেও ঠিক তেমনি বলছ।'

'আরে না। না—না—না।' ছোটমামা প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল। 'আমি ইচ্ছে করলে তোকে এখনও নিয়ে যেতে পারি। নিয়ে যাচ্ছি না কেন জানিস? এই শীতটা এখানে কাটিয়ে দিলে তোর হেলথ্ আরও ইমপ্রুভ করবে।…দেখ গগন, ভাল জিনিস একটু বেশী হলেই ভাল। লাভ বই ক্ষতি নেই তাতে।'

গগন বিছানা থেকে উঠল। জল খেল। ছোটমামার আনা ব্যাগটা তুলল, নামিয়ে রাখল আবার। উবু হয়ে বসে ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করতে লাগল। মার চিঠি ছিল ব্যাগের মধ্যে।

সোয়েটারটা নতুন। উলের গন্ধ শুঁকল গগন। পাজামা গেঞ্জি সব নতুন। কোরা গন্ধ। সমস্ত নতুনের মধ্যে মার চিঠিটাই যা পুরোনো। গগন মার চিঠি হাতে করে উঠে দাঁড়াল। 'মার চিঠি, ছোটমামা।'

'মেজদির চিঠি!…আমায় কিছু বলে দেয় নি। ভুলে গেছে বোধহয়।'

গগন খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ করা দুটো চিঠি পেল। মা আর লতুর।

মার চিঠি পড়তে পড়তে গগনের মন বিষণ্ণ হল। মার মনে বড় অশান্তি। গগনের জন্যে মার দুর্ভাবনা এক তিলও কমে নি, আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি রয়েছে। বাবার কথাও লিখেছে মা। বাবা আজকাল প্রায়ই গগনের নাম করে বলে, ও বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি নতুন বাড়ির কিছু করব না।

(শীতটা খুব সাবধানে থাকিস, বাবা। ফুলহাতা নতুন সোয়েটারটা ঢিলে করে করেছি, সারাক্ষণ পরে থাকবি। নয়নের বউ তাড়াতাড়ি করে মোজা বুনেছে, যদি পায়ে ছোট লাগে ফেলে দিস না, দুচার দিন পরলেই ঠিক হয়ে যাবে। তোর বাবা আর নয়ন আগামী মাসে যেতে পারে তোর কাছে। যা যা দরকার চিঠিতে লিখিস পাঠিয়ে দেবো।)

বাইরে পাখি এসেছে। কাকলি শোনা যাচ্ছিল। শিরীষগাছের ডালে বসে পাখিরা যেন খেলা করতে নামার আগে দু দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল।

'গগন!' ছোটমামা ডাকল।

'উঁ—' গগন চিঠি পড়তে পড়তে সাড়া দিল।

'তোর গলার কাছে ওটা কিসের দাগ রে?'

গগন জবাব দিল না। লতুর চিঠি পড়তে পড়তে মুখে তার হাসির ছোঁয়া লাগছিল। লতুটা একেবারে সেই রকম আছে, পাগলী। এক কথা লিখতে লিখতে অন্য কথা লেখে। লতু কখনও কথা পুরো করে বলতে পারত না, অর্ধেকটা বলে বাকিটা বলার গরজ পেত না। নয়ন হেসে বলত, দেখ লতু তোর সবই যখন আদ্ধেক তখন আমরা তোর বিয়ের সময় শুধু একবার তোর বরটাকে দেখিয়ে দেব, ব্যাস; তারপর আর তোর কোনো কিছুর দরকার নেই।

গগন হেসে ফেলল। চিঠি শেষ করে নয়নের সেই কথা ভাবতে লাগল। লতু তার বরের কথা শুনে নয়নের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আঁচড়াত নয়নকে।

বাইরে বাগানে পাখিরা দু দলে ভাগ হয়ে যেন খেলা শুরু করে দিয়েছে। গগন সুখ অনুভব করল, গগন দুঃখ অনুভব করল।

'তোর গলায় ওটা কিসের দাগ রে, গগন?' ছোটমামা আবার বলল।

গগন অন্যমনস্ক। বাইরে রোদের চৌবাচ্চা ফুরিয়ে এলো। এখন তরল করে রোদ পড়ছে, রঙ নেই। বাগানে দুটো মালি কাজ করছে। সার পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। ঝারিতে করে জল দিচ্ছে বুড়ো মালি। বিকেল হয়ে এসেছে বলে দু একজন করে লোক দেখা যাচ্ছিল।

ছোটমামা এবার যেন অবাক হয়েই বলল, 'এই গগন? কি হল রে তোর?'

গগন ছোটমামার দিকে তাকাল।

'কথা বলছিস না কেন?' ছোটমামা বলল।

'বলছি—'

'কোথায় বলছিস। আমি চেঁচিয়ে যাচ্ছি, তুই চুপ করে আছিস।...এদিকে তো সময় হয়ে এলো, এবার আমি উঠব।'

'তুমি আজ ফিরবে ?'

'সন্ধ্যের ট্রেন ধরব।'

'এখনও দেরি আছে।'

'কোথায় আর দেরী। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসছে দেখছিস না।...আমায় একবার তোদের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে।

বিকেল বাস্তবিকই পড়ে আসছিল। গগন দেখছিল, যাবার আগে যেন দিনের আলো তার শুকোতে দেওয়া টুকরো জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। শিরীষ গাছের তলা থেকে আলো চলে গেছে, ছায়াগুলো কালচে হয়ে এসেছে, পাখিরা পালাচ্ছে একে একে, জল দেওয়া ঝারি নিয়ে বুড়ো মালি চলে যাচ্ছে।

'এবারে তুমি আমায় সত্যিই নিয়ে যাবে, ছোটমামা ?' গগন বলল।

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। তোকে আমি বলছি তো এই শীতের পরই নিয়ে যাব।'

'নয়ন গ্লাসগো যাবার আগে আমি বাড়ি যেতে পারলে খুব ভাল হয় ছোটমামা।'

'নয়ন মার্চের আগে যাচ্ছে না।'

'নয়ন আর বাবা নাকি আগামী মাসে আসছে এখানে? মা লিখেছে।' গগন জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল।

'ইচ্ছে আছে ওদের। তবে এতটা আসা জামাইবাবুর পক্ষে কষ্টের। আসতে পারলে ভালই।' ছোটমামা হাই তুলল।

বিছানার ওপর লেবুটা পড়ে আছে। বিকেলের জলখাবার নিয়ে চাকর এল, মিট-শেফের ভেতর থেকে কাচের ডিশ বার করে দুটো মিষ্টি রাখল, এক গ্লাস দুধ। রেখে চলে গেল। গগন দেখল। কিছু বলল না।

'তোর গলার দাগটা কিসের রে গগন ?' ছোটমামা আবার বলল।

গগন গলায় হাত দিল। দাগ ঢেকে নেবার মতন করে হাত রাখল গলায়। কি জানি। কালশিরে বোধহয়।'

'আঙুলের দাগের মতন দেখাচ্ছে।

চুপচাপ। গগন ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ছোটমামা যেন অবেলায় ঘুম পাওয়ায় বার বার হাই তুলছিল। সমস্ত ক্লান্তি এতক্ষণে ছোটমামাকে অবশ করে ফেলেছে। ছোটমামার চোখ ছোট হয়ে আসছিল, গগনকে যেন আর ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না।

গগন বিকেলকে পুরোপুরি ফুরিয়ে যেতে দেখল। আলোর রেখা আশেপাশে কোথাও নেই। নিমের ডাল তার দৃষ্টিকে আড়াল করে ফেলেছে, সেই আড়ালের ওপাশ থেকে একটি মেয়েলী গলা শুনতে পেল গগন। 'আসব—তাড়াতাড়ি আসব

আবার ।'

পাশের ঘরে একবার ললিতবাবুর বউ এসেছিল । চলে যাবার সময় ললিতবাবুর কি মনে পড়ায় বউকে ডাকছিল । ডেক কি বলছিল । ললিতবাবুর বউ নিম গাছের আড়ালে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'আসব—তাড়াতাড়ি আসব আবার' ।

ললিতবাবু চলে গেছে । অপারেশন থিয়েটার থেকেই চলে গেছে । গগন এখনও মাঝে মাঝে ললিতবাবুর বউয়ের গলা শোনে । 'আসব—তাড়াতাড়ি আসব আবার ।'

গগন দেখল ছোটমামা উঠে দাঁড়িয়েছে । ছোটমামার যাবার সময় হয়ে গেছে ।

'ছোটমামা, এই শীতের পর কিন্তু আর নয়'—গগন বলল ।

'পাগল নাকি । আবার কি ! অনেক দিন হয়ে গেল । এবার বাড়ির ছেলে বাড়ি যাবি ।'

'জানুআরিতে কিন্তু ।'

'বেশ, জানুআরিতেই ।'

'মাকে বলো আমি ভাল আছি । বাবাকেও বলো ।'

'নয়নকে তাহলে চিঠি দিস তুই ।'

'দেবো ।···জানো ছোটমামা, নয়নের বউ আমায় চেনে ।'

'তোকে ?'

'আমায় দেখেছে আর কি । পালিত লেনে যখন থাকতাম আমরা, তখন ।'

'আ-চ্ছা ।' ছোটমামা মাথা নাড়ল । নয়ন-বেটা বুঝি তখন থেকেই বউ পছন্দ করে রেখেছিল ।' ছোটমামা হাসতে লাগল ।

হাসি থামল একসময় । যেতে যেতে ছোটমামা ললিতবাবুর বউয়ের মতনই বলল, 'আসব আবার—তাড়াতাড়ি আসব ।' তারপর অন্ধকার । এই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল ।

অন্ধকারে গগন চোখের পাতা খুলল । বাইরে অন্ধকার নেমেছে । কাঁঠাল গাছের মাথার মতন বেশ ঘন বুনন্ত অন্ধকার । বাতাস আসছিল, অগ্রহায়ণের ঠাণ্ডা বাতাস । মিহি কুয়াশার মতন ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে অদূরে । গগনের শীত করছিল । কাছাকাছি একটা দেবালয় আছে, ঘণ্টা বাজছিল । গগন আকাশে কয়েকটি তারা দেখতে দেখতে দেবালয়ের ঘণ্টা শুনল । প্রতিটি ঘণ্টা এমন করে বাজে যেন পায়ে পায়ে শব্দটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে । গগন ভাবল, তার মনে হল, সে বোধহয় প্রত্যহ দূর থেকে দূরান্তে সরে যাচ্ছে ।

চাকরটা এসেছে । হাতে লণ্ঠন । গগনের ঘরে পায়ের দিকে ছোট টেবিল-বাতি, কেরোসিন নাড়তে নাড়তে বাতিটা জেবলে দিল চাকরটা । বাতি জবলল, ছোট্ট ফোঁটার মতন হলুদ বাতি । চাকরটা চলে গেল । আসার সময় সে গলায় একটা ভজনের গুনগুন নিয়ে এসেছিল, যাবার সময় ঘরে সেই ভজনের সুর ফেলে গেল ।

বিছানার ওপর উঠে বসল গগন। বাইরে নতুন সার দেওয়া বাগান। বাতাসে গন্ধ আসছে। শীত আসছে। অন্ধকারও এ-ঘরে গগনকে রোজকার মতন দেখতে এসেছে। দেখার সময় হয়ে গেলে, এরাই তাকে দেখতে আসে। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মতন—ওই শীত, বাতাস, ওই অন্ধকার এবং বিষণ্ণতা তার ঘরে বিছানার পাশে এসে বসে।

বাইরে থেকে আরও একজন এ-সময় তাকে দেখতে আসে, ছোট ডাক্তারবাবু। তাঁর সাইকেলের ঘণ্টি বাজলেই গগন তৈরি হয়ে থাকে। আজ এখনও তিনি আসেন নি। আসবেন।

গগন কপালে বুকে হাত দিল। তার জ্বর এসেছে। জ্বরটাও গগনকে বিকেলের ঝোঁকে রোজ দেখতে আসে। দেখতে এসে পাশে বসে থাকে। মাঝ রাতে গগনের ঘুমের মধ্যে চলে যায়।

চোখ জ্বালা করছিল গগনের। জিব বিস্বাদ লাগছিল। মাথা ধরেছে। জানলার বাইরে হাত বাড়াতে ইচ্ছে করল গগনের, ব্যথা ব্যথা লাগছিল সর্বাঙ্গ, শীত করছিল বলে গগন আর হাত বাড়াল না।

বাইরে হাত বাড়ান গেল না বলেই গগন ভেতরে হাত রাখল। কম্বলের তলায় জামার ওপর হাত রেখে বুকের তাপ ও কষ্ট অনুভব করতে লাগল। মাটিতে যেমন গাছ, মাটির তলায় যেমন শেকড়, গগনের মনে হল, তার বুকের তলায় সেই রকম কষ্টের বহু পদার্থ মিশ্রিত হয়ে আছে, এই বোধ একটা বৃক্ষের মতন অজস্র অদৃশ্য শিকড় দিয়ে সেই কষ্টকে শুষে বর্ধিত হচ্ছে। কেন? গগন বুঝতে পারল না, কেন হৃদয়ে এত কষ্ট থাকে, এত অভাব? বেদনা কেন অধিক, সুখ কম? পৃথিবীতে জলভাগ বেশীর মতন্ পর্যাপ্ত দুঃখ এবং অপর্যাপ্ত সুখ ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন!

গগন তার এই চিন্তাকে বেশ শিথিল এবং জ্বরে আচ্ছন্ন বলে মনে করা সত্ত্বেও ভাবতে লাগল, তার দুঃখকে সে কেমন করে সহনীয় করতে পারে। তার মনে হল, প্রত্যহ গগন এই চিন্তা করছে। প্রত্যহ। সে বড় শূন্য, তার গগনে সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা নক্ষত্রদল নেই।

ছোট ডাক্তারবাবুর সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। গগন বুঝতে পারল, এবার ছোট ডাক্তার-বাবু ঘরে ঘরে একবার ঘুরে যাবেন। বড় ভাল লোক, বড় সুন্দর মানুষ, কখনও নিরাশ করেন না। বলেন, বাঃ—চমৎকার, আজ তো বেশ ভালই দেখছি। খুব তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভ করছ তুমি।

গগন বিছানায় শুয়ে পড়ল। কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিল। সাইকেলের ঘণ্টি শুনতে পেল আবার। শুনে গগন নয়নের বউয়ের কথা মনে করতে পারল। নয়নের বউ গগনকে পালিত লেনে সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে পড়ে যেতে দেখেছে।

লজ্জা পেয়ে গগন যেন নয়নের বউকে দেখাচ্ছে এমনভাবে কল্পনায় সাইকেলের পিঠে লাফ মেরে চেপে বসল। তারপর প্যাডেল ঘুরোতে লাগল।

না। গগন পারল না। গগন বালিশের মাথার পাশে হাত বাড়াতে গিয়ে তার রুমাল স্পর্শ করতে পারল। রুমালের পাশে কবেকার একটা পুরোনো মাসিক পত্রিকা। গগন পত্রিকাটা কতবার জানলার বাইরে ফেলে দিতে চেয়েছে, পারে নি। ওর মধ্যে নয়নরা আছে, নয়ন, নয়নের বউ, বাবা, মা, লতু, ছোটমামা। শুধু গগন নেই।

গগন এ-ঘরে আছে। এখানেই থাকবে গগন। শীত আসবে, শীত যাবে ; আবার শীত আসবে। গগন জানে তার ছোটমামা নেই, তার ছোটমামা তাকে শীতের পর নিয়ে যেতে আসবে না।

গগন চোখ বুজতে বুজতে নয়নদের কথা ভাবল। নয়নরা থাকলে, গগন পরম দুঃখীর মতন ভাবল, তার গগন এত শূন্য হত না।



জননী

আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল। সবার বড় ছিল বড়দা, মা-র উনিশ বছর বয়সের ফল। প্রথম বলে বড়দা মা-র সেই বয়সের রূপ যতটা পেরেছিল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে জগতে এসেছিল। শুনেছি, ঠাকুরমা বলত, অত রঙ অমন চোখ নিয়ে যদি এলি, তবে দাদু, মেয়ে হয়ে এলি না কেন?

ঠাকুরমার ক্ষোভ বছর দুয়েক পরে মা মিটিয়ে দিল। এবার এলো বড়দি। বড়দা পুরুষমানুষ বলে ওপর-ওপর থেকে মা-র রূপ চুরি করেছিল, বড়দি মেয়ে বলে আমাদের মা-র অন্তর থেকে সব যেন শুষে নিয়ে ঠাকুরমার কোলে এসে পড়ল।

নয়নের মণির মতন করে ঠাকুরমাবুড়ি বড়দিকে তিনটি বছর আগলে রেখে, লালন-পালন করে, ঝুলন পূর্ণিমাতে মারা গেল। বুড়ি মারা যাবার সময় আমাদের তিন বছরের বড়দিকে মরণের ঘোরে রাধাকৃষ্ণর গল্প শোনাচ্ছিল। শোনাতে শোনাতেই স্বর থেমে গেল।

আমরা এ-সব গল্প মা-বাবার কাছে শুনেছি। বাবাই বেশী বলত। বাবারই অতীত-মোহ অতিরিক্ত ছিল।

বড়দির পর আমাদের মেজদা। মেজদা বাবার মতন। অবিকল বাবার মুখের আদল তার। সেই রকম লম্বা লম্বা হাত। গায়ের রঙ একটু তামাটে।

ছোট আর আমি মাত্র দেড় বছরের এদিক ওদিকে জন্মেছি। ছোটকে আমি দিদি বলি নি কোনোকালে, আজও বলি না। ছোট আমাকে ছেলেবেলায় 'কড়ে' বলত, মানে কনিষ্ঠ; তার খেপানো ডাক থেকেই আমার ডাক-নাম কড়ি হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগছিল। বড়দির প্রথম ছেলেটা হল নাক-ভাঙা, বিকলাঙ্গ। মরে গেল। পরে আরও একটা পেটে এসেই নষ্ট হয়ে গেল। স্বামীর রক্তে কোন্ রোগের পোকা বংশবৃদ্ধি করেছে, ততদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছে বড়দি। নিজেও ভুগছিল। একদিন স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বড়দি চলে এলো, আর স্বামী-গৃহে যায় নি।

বড়দির পর দ্বিতীয় শোক, মেজদার অন্ধ হওয়া। মেজদা দানাপুর যাচ্ছিল কাজে। ট্রেনে বড় ভিড়। যাত্রীরা ঢোকার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। মেজদা পান কেনার জন্য জানলা খুলে পানঅলাকে ডাকছিল। এক দঙ্গল বেহারীকে আসতে দেখে

গোলমালের ভয়ে কাচের জানালা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারা প্রথমে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করল, পরে জানলার কাছে এসে ক্ষিপ্তভাবে কী বলছিল। কামরার লোক মেজদাকে জানলা খুলতে বারণ করল। তখন খুব আচমকা বাইরে থেকে একটা লোক তার টিনের সুটকেশ জানালায় ছুঁড়ে মারল। কাঁচ ভেঙে তার ধারালো ফলা মেজদার চোখে মুখে ঢুকে গেল, রক্তে সর্বাঙ্গ লাল হল।...হাসপাতালে একটানা ছ'মাস কাটিয়ে বেচারা মেজদা ফিরে এলো বাড়িতে, তার দু'চোখ সেই নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে ভিড়েই মিশে থাকল।

আমাদের তৃতীয় শোক, বাবার মৃত্যু। বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল। মা-র কাছে বাবা স্নান করছিল। অল্প অল্প জ্বর ছিল গায়ে। মা ঈষদুষ্ণ জলে বাবার গা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছিল; বাবা মা-র কোলের ওপর হঠাৎ শুয়ে পড়ে কী বলতে গেল, পারল না; মৃত্যু এসে বাবার মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা থামিয়ে দিয়েছিল। বাবা তৈরী ছিল, চলে গেল।

বাবার মৃত্যুর বছর দুই পরে আমাদের চতুর্থ শোকও এলো। ছোট বড় জেদী। চিরকালই সে যখন যা ঝোঁক ধরেছে, করতে গেছে। আমি তাকে কত বলেছি, ওভাবে জেদ ধরে কাজ করতে যাস না। তুই সব পারবি এমন কোনো কথা নেই।...আমার কথা ছোট গ্রাহ্য করত না। তার ধারণা ছিল, সে চেষ্টা করলে সব পারে। ছোট এ-সব বুঝত না। বুঝতে চাইত না। অকারণে সে মেতে থাকত। তার কাজের অন্ত ছিল না, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের বালাই ছিল না। সকালে মিশনারীদের অনাথ-আলয়ে গৃহিণীপনা করত, দুপুরে বড়দির সঙ্গে শখের চাকরি করতে যেত স্কুলে, বিকেল আর সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাজারের সেই ঝুপসি ঘরটায় লণ্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির কাজ করত।... একদিন ছোট বুঝতে পারল, তার বয়সে যতখানি জীবনীশক্তি স্বাভাবিক, তার অনেক বেশী সে অত্যন্ত হঠকারির মতন ব্যয় করেছে। এখন তার জীবনের কলসি প্রায় ফাঁকা! ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বলে দিল, আর ওঠা-চলা নয়, বেশী কথা বলাও না। বিছানায় শুয়ে থাকা। ইনজেকশান ওষুধ, ভাল ভাল খাওয়া আর চুপ করে পড়ে থাকা। ছোট বলল, তা হলে আমি মরে যাব। জবাবে ডাক্তারবাবু বলল, দেখা যাক...।

সেই থেকে ছোট বিছানায়। বছর পুরো হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

আমাদের সংসারে পঞ্চম শোক এসেছে সদ্য। মা মারা যাবার পর। এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মার মাথার চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়ানো সরের মতো কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ নিয়ে মা

বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।

তখনও সকালে হিম পড়ে। আমাদের দোতলার বড় বারান্দা শিশিরে ভিজে রয়েছে। সূর্য ওঠে নি, রঙ ধরেছে সবে। মার বিছানার চারপাশে আমরা পাঁচজনে দাঁড়িয়ে, মা চলে গেল।

বড়দা আগেই বলেছিল, আমরা বারোয়ারী শ্মশানে মাকে নিয়ে যাব না, আমাদের বাড়ির বাগানে দাহ করব, পরে সেখানে একটা বেদী করে রাখব।

বিঘে খানেকের ওপর জমি নিয়ে আমাদের দোতলা বাড়ি। পাঁচ বিঘের বাগান। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

উত্তরের দিকে, যেখানে করবীর ঝোপ, স্থলপদ্মর রাশিকৃত গাছ, ঘাসের জঙ্গল—সেই দিকটা মাকে দাহ করার জন্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করে কদমগাছটাকে মাথার কাছে রেখে মা-র চিতা তৈরী হল, পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা দাঁড়িয়ে থাকল—আমাদের বাবার মতন দেখাচ্ছিল তাকে। তারপর মা-র দাহ হল।

যখন আগুন তার অকলুষ শিখা বিস্তার করে মার শরীর আগলে রেখেছিল, তখন আমি আমাদের পাঁচজনকে দেখছিলাম। বড়দা খানিক রোদ খানিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চিতার দিকে তাকিয়েছিল, মাঝে মাঝে কী বলছিল ; বড়দি কদমতলায় মাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল ; মেজদা বড়দির পাশে আসন পা করে বসে, দু'হাত বুকের কাছে—তার অন্ধ চোখ চিতার দিকে ; কাঠচাঁপার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছোট ফোলা-ফোলা মুখ করে বসে ; আমি ছোটর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

ছোট এক সময় বলল, 'এখন কি জল খেতে আছে রে, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

আমি কিছু জানতুম না। বললাম, 'এখন না। আর খানিকটা পরে খাস।'

এখন চৈত্র মাস। চৈত্রের শুরু সবে। মার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। যে জায়গায় আমরা আমাদের মাকে দাহ করেছিলাম, সেই জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশটা যেন নিকোনো। শ্রাদ্ধর পর-পরই আমরা ওখানে সুন্দর করে বেদী করেছি। কাশীর সাদা পাথর দিয়ে বেদীটা মোড়া। এখনও যেন কাঁচা গন্ধ লেগে আছে ওর গায়ে। হাত রাখলে মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে ; নরম মসৃণ স্পর্শ।

মাসান্তে আমরা এই বেদীতে বসেছিলাম। বেদীর মাথার দিকে ছোট কুলঙ্গির মতন, বড়দি সেখানে প্রদীপ এবং ধূপ জেবলে দিয়েছিল। বাতাসে ঝাপটা লাগছিল না বলে দীপের শিখাটি জবলছিল, অগুরুচন্দনের ধূপ পুড়ে খুব ফিকে একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। আর চৈত্রের পূর্ণিমা বলে চাঁদের আলোয় সাদা বেদীটা ধবধব করছিল।

আমরা পাঁচজনে বেদীর ওপর বসে।

বড়দা বলল 'আমরা যতদিন বেঁচে আছি, মাসের এই দিনটিতে সবাই একসঙ্গে এখানে এসে বসব।' বলে একটু থামল বড়দা, বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আবার, 'এই পরিবারের নিয়ম হল। কি বলিস, অনু।'

অনু বড়দির ডাক নাম। পুরো করে অনুপমা। ছোটর নাম নিরুপমা, বড়দির সঙ্গে মিল করে রাখা। বড়দি মাথা নেড়ে বড়দার কথায় সায় দিল; বলল, 'বাবার বেদীটাও যদি আমরা করে রাখতাম!' বড়দির গলায় আক্ষেপের সুর।

বড়দির আক্ষেপ খুবই সঙ্গত। কিন্তু তখন তো আমাদের মাথায় এ-বুদ্ধি আসে নি। মাও কিছু বলে নি।

বড়দা কয়েক দণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর নিশ্বাস ফেলল মুখ নামিয়ে। বলল, 'খুবই ভাল হতো। তবে মা রাজী হত কিনা কে জানে!'

'রাজী হত না!' বড়দি বেশ অবাক হয়েছিল যেন, 'কেন? মা কেন রাজী হত না?'

'হত না হয়তো।' বড়দা সন্দেহের গলায় বলল। 'সবাই এসব পছন্দ করে না। সংস্কার। আমরা বোধহয় অনেক কিছু পুরোপুরি অগোচরে রাখতে চাই।'

মেজদা হঠাৎ কথা বলল। আমরা তাকালাম। তার অন্ধ চোখ একদিকে স্থির রেখে মেজদা বলল, 'শ্মশানে পুড়িয়ে আসার সময় আমরা কি ভাবি জান, দিদি?'

'কি?'

'অনেকের মধ্যে দিয়ে এলাম। যেন সঙ্গীসাথীর মধ্যে।'

'মরার পর আবার সঙ্গীসাথী কী?' ছোট বলল।

'কিছু না। মানুষ তবু ভাবে।' মেজদা উদাস গলায় বলল। 'তুই জানিস না ছোট, কত মানুষ মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থাকে তীর্থ-যাত্রা কল্পনা করে নেয়।'

আমরা সকলে মেজদার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। মেজদার গলার স্বর গোল ও নিটোল। বাঁশের আড়-বাঁশির মতন মোটা। এই স্বর শুনলে অনুভব করা যায়, মেজদার গলার সবটুকু অন্তর থেকে এসেছে। মেজদার কথাবার্তাও অন্যরকম। আমরা মনে মনে অহরহ কথা বলি, মুখে নয়। মনের সেই শব্দহীন বাক্যস্রোত যদি শব্দময় হয়ে ওঠে এই রকম শোনাবে হয়ত, মেজদার কথার মতন।

বড়দি বলল, 'তুই স্বর্গের কথা বলছিস, দীনু!'

মেজদার নাম দীনেন্দ্র, ছোট করে দীনু। বড়দির কথায় মেজদা আলগা করে মাথা নাড়ল। বলল, 'না দিদি; স্বর্গ তো শেষ কল্পনা। আমি এই মর্ত্যের পর স্বর্গের আগে যে-পথ তার কথা বলছি।'

'সেটা আবার কী?' ছোট বলল অবাক হয়ে, 'মাঝপথের কথাও মানুষ ভাবে?'

'ভাবে। যত ভাল করে ভেবে নিতে পারা যায় ততই ভাল রে, ছোট।...আমি রাঁচির দিকে মুণ্ডা না মুণ্ডরীদের গ্রামে এক বাড়িতে ছবি দেখেছিলাম একটা।'

'ওদের কথা বাদ দাও।' ছোট বলল।

'বাদ কেন, শোন না।' মেজদা যেন অন্ধ চোখে জ্যোৎস্না মেখে সামান্য মুখ ফেরাল। বলল, 'মাটির বাড়ি, বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম ; কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ঘটি রাখা।...ওই ছবির মানে বলে দিল ফরেস্টবাবু। ও-বাড়ির ছেলে মারা গেছে, তাই ওই ছবি।'

'আ-হা—' বড়দি দুঃখ পেল।

মেজদা বলল, 'মানেটা তুমি, শোন দিদি। বড় অদ্ভুত লাগে। ভাবতো ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছে মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছেলেটিকে একা একা অনেক দূর যেতে হবে। তাই তাকে বসিয়ে দিয়েছে ঘোড়ায়, হাতে দিয়েছে লাঠি, পুঁটলিতে বোধহয় চিঁড়ে গুড়, আর মাথায় তেষ্টা মেটাবার জল।'

স্নেহ মমতা, ইহলোকের মায়া ও দুঃখ, পরলোকের দুর্ভাবনা—সব যেন এই ছবিতে মহৎ ও সুন্দর হয়ে কল্পিত ছিল। আমি অভিভূত হলাম। জ্যোৎস্নার ধারার মতন আমার কল্পনা সেই ছবির গায়ে আলো বর্ষণ করছিল।

অনেকক্ষণ বুঝি কেউ কোনো কথা বলল না আর। চৈত্রের চঞ্চল বাতাস বাগানের তৃণ এনে আমাদের গায়ে মাথায় ফেলে দিচ্ছিল। বেদীতে আমাদের পাঁচজনের ছায়া ; পরস্পরকে স্পর্শ কবে যেন ছায়ার একটি আশ্চর্য রকম জাফরি তৈরী হয়েছে। চাঁদটা সমুদ্রের জলের মতনই নীল অনেকটা। পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না। মা-র বেদীর মাথার কাছে সেই বৃন্দাবনেব কদম্বগাছ। মার পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা।

কদম্বগাছটার বয়স আমার সমান। বৃন্দাবন থেকে এনেছিল বাবা। এখনও বর্ষায় ফুল ফোটে।

বড়দি প্রথমে নিশ্বাস ফেলল। বড়দার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার গাটা একটু দেখ তো, দাদা।'

'কেন রে, কি হল ?' বড়দা উদ্বেগের গলায় বলল।

'আমায় যদি কেউ মা-র হাতে কিছু দিতে বলে, কি দেবো রে !' বড়দি আমাদেব প্রত্যেকের মুখে একে একে তাকাল, তারপর কেমন করে যেন মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। কী দেবো মা-র হাতে কে জানে !'

কথাটা আমাদের কানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন ঘুরে দাঁড়াল। আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সহসা অনুভব করলাম বিহ্বল হয়েছি।

'মা-র হাতে কী দেব—' এই প্রশ্ন আচমকা বড়দি আমাদের সামনে যবনিকার মতন নিক্ষেপ করল। আমরা অসংবিত ও বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। তারপর ক্রমশ বড়দিব কথার পরিপূর্ণ মর্ম আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে পারলাম।

সমূলে সচকিত হবার মতন আমরা শিহরিত ও কম্পিত হয়ে দেখলাম, এই প্রশ্ন যেন আমাদের সমস্ত বোধ অধিকার করেছে। আমরা কী দেবো, কী দিতে পারি

মাকে ?···মনে হল, এই অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা,আমাদের সম্মিলিত বোধ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছি। যেন কোনো ভয়ঙ্কর পর্বতচূড়ায় এনে কেউ আমাদের পরস্পরের দেহের সঙ্গে বাঁধা দাঁড় কেটে দিয়েছে, আমরা সবাই চূড়ার অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।

স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে আমরা বসে থাকলাম। চাঁদের আলো কদমগাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে। কবরীঝোপে বাতাস যেন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে যাচ্ছিল, শব্দ হচ্ছিল পাতার। আমরা আমাদের ছায়ার নকশা থেকে চোখ তুলে কখন যে শূন্যে দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানি না।

বড়দাই প্রথমে কথা বলল। মা-র কোলে বড়দাই প্রথম এসেছিল, বড়দাকে দিয়েই মা-র মাতৃত্ব শুরু, হয়তো তাই বড়দা এই নীরবতা এবং অপেক্ষা প্রথমে ভাঙল, যেমন করে মা-র সন্তান-কামনার অপেক্ষা ভেঙেছিল।

'অনু কিন্তু কথাটা মন্দ বলে নি।' বড়দা ধীরে সুস্থে নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, 'আমরা কেউ মৃত্যুর পরটর বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভাল লাগছে, আমাদের মা দীনুর গল্পের মতন দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবে। আমরা মা-র জন্যে কে কী দিতে পারি ?'

আমরা প্রকৃত পক্ষে ওই একই চিন্তা করছিলাম। মা-র সেই দীর্ঘ অন্তহীন পথ-যাত্রায় আমরা মাকে কী সম্পদ দিতে পারি ?

বড়দা দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল, কদমছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কী যে দেবো, আমিও ভেবে পাচ্ছি না।' বড়দার গলার স্বর বিষণ্ণ উদাস। বড়দিকে দেখল বড়দা, কাঠচাঁপার বুড়ো গাছটাকে অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ করল। 'মা-র অনেক দুঃখ ছিল, অনেক। আমি সব দুঃখের কথা জানি না। একটা দুঃখ জানি, আমায় নিয়ে।'

আমার মনে হল, বড়দা ঠিক আমার মতন করেই ভাবছে। এ-সংসারে মা কী পায় নি, কী অভাব তার ছিল, কী পেলে মা-র সে অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা-র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধহয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারি নি।

'সে রকম দুঃখ তো আমার জন্যেও মা-র ছিল।' ছোট বলল বড়দাকে লক্ষ করে।

'আমাদের সবায়ের জন্যই ছিল।' বড়দা জবাব দিল।

'তাহলে কি আমরা মা-র হাতে সেই দুঃখগুলো আর দিতে চাই না ?' ছোট অসহায়ের মতন শুধালো।

'তা ছাড়া আমরা আর কী দিতে পারি!···' বড়দা ছোটর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাল কলা জল আমাদের মা-র দরকার নেই। মাকে যদি আমরা সেই মনের জিনিসগুলো দিতে পারি, এখানে যা পারি নি—মা-র কাজে লাগবে।' 'কাজ' শব্দটা বড়দা টেনে

বড় করে উচ্চারণ করল।

আমি মনে মনে বড়দার কথায় সায় দিলাম। মাকে আমরা অন্য কিছু দিতে পারি না।

'তুই তো জানিস অনু—' বড়দা বড়দিকে লক্ষ করে কথা শুরু করল, 'আমি বিয়ে করি নি বলে মা-র মনে বড় দুঃখ ছিল। অভিমানও। মা-র কী সাধ ছিল আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না।...আমার জন্যে মা মেয়ে পছন্দ করে রেখে-ছিল, বাবা সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবে বলে ঠিক করেছিল, আমি অমত করায় আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নি।'

'তুমি অমত করলে কেন?' আমি বড়দার ওপর যেন অপ্রসন্ন হয়ে বললাম।

'কেন করলাম—!' বড়দা আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। পলক ফেলল না। তারপর অতিশয় স্নিগ্ধ হয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অবনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির ভাব ছিল।'

'তা হলে সন্দেহ?' ছোট যেন বিরক্ত হল।

'না রে সন্দেহ নয়। মেয়েটিকে অবনী ভালবাসত।' বড়দা শান্ত গলায় বলল, 'মাকে আমি বলেছিলাম। মা বলেছিল, কিন্তু কনক যে অপরূপ সুন্দরী। এ মেয়ে এলে আমার বংশধররা কত সুন্দর হবে ভেবে দেখ।' কয়েক দন্ড থেমে বড়দা যেন মা-র সঙ্গে তার সেই কথোপকথন স্মরণ করল, তারপর বলল, আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা আরও বেশী ভালবাসি।' অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'মা এই কথাটা কেন যে বুঝল না!' বড়দা আক্ষেপের গলায় বলল, মনে হচ্ছিল তার কোনো পুরনো প্রদাহ সে আজ অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে আবার অনুভব করছে। অনেকটা সময় চুপ করে থেকে বড়দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মৃদু গলায় টেনে টেনে বলল, 'আমি মাকে আমার সেই ভালবাসার মন দিতে পারি।'

বড়দা নীরব হলে সাদা বেদীটার গায়ে চাঁদের আলো ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মলিন হল সামান্য।

আমরা নির্বাক বসে থাকলাম। চৈত্রের বাতাস করবীঝোপের তলা থেকে ধুলোর গুঁড়ো এনে মাখিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙা যাচ্ছে, টাঙাঅলার পায়ে-টেপা ঘণ্টি বাজছিল। কদমগাছের ছায়া একটু যেন হেলে গেছে।

'তা হলে আমিও বলি—' বড়দি বলল। বড়দার পর বড়দিরই বলার কথা। আগে বড়দি দিশেহারা হয়ে বলেছিল, সে কি দেবে জানে না; এখন বড়দার কথার পর বড়দি মন স্থির করতে পেরেছে।

বড়দি কি দেয় শোনার জন্যে আমরা সকলে মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। জ্যোৎস্না আবার স্পষ্ট হয়েছে। চন্দ্রাকিরণে বড়দিকে রেশমের মতন নরম মসৃণ

দেখাচ্ছিল। হাঁটু ভেঙে একপাশে হেলে বসেছিল বড়দি, তার হাতে সরু দুগাছা করে সোনার চুড়ি। সাদা হাতে মিনের কাজের মতন চুড়ি দুটো চকচক করছিল। অল্প সময় ইতস্তত করে বড়দি বলল, 'আমি অমন করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি বলে মা কোনোদিন খুশি হয় নি। তুই তো জানিস দাদা, মা তোকে কতবার সেই লোকটার কাছে যেতে বলেছে। কেন বল্ তো? বলত যাতে তুই তাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে পারিস।' সোজা হয়ে বসে নিল বড়দি, বাঁ-হাত গলার কাছে নিয়ে গিয়ে তার মটর-হারে আঙুল রাখল। 'বাবাকেও মা বুঝিয়েছিল, আমি ওখান থেকে চলে এসে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। বরং চেপে বসে থাকলে তাদের জামাইকে শুধরে নিতে পারতাম।...মা আমায় বলত, এই তেজ দেখিয়ে তুমি তোমার ক্ষতি করলে। সারা জীবন পুড়বে।'

'তুমি তো আজও মাঝে মাঝে কাঁদ, বড়দি।' ছোট আচমকা বলল।

বড়দি ছোটর দিকে তাকাল। ভাবল যেন। বলল, 'কাঁদি—' আস্তে মাথা নাড়ল বড়দি, 'কাঁদি, মা কেন আমায় আবার বিয়ে করতে বলল না।'

'তোমার কি আবার বিয়ে করার সাধ ছিল?' আমি অবাক হয়ে বড়দিকে দেখছিলাম।

'হ্যাঁ, মা-বাবা যদি বলত, আমি আবার বিয়ে করতাম।...চামড়ার ব্যবসাদার সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু তো পাই নি।'

'তোমার আবার বিয়ে করা খুব সহজ ছিল না, বড়দি।' ছোট বলল।

'না হয় কঠিনই ছিল। তাতে কি!...বড়দি যেন দ্বিধাবোধ করে থামল, তারপর বলল, 'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।...মা-র সাহস হল না।...একদিন আমি মাকে বলেছিলাম, রোগ, নোংরামি, কষ্ট সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই; আপত্তি, সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে। মা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল, বলেছিল—এ বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কিছু করতে আমি দেবো না।...মা মর্যাদা চাইত, আমি সাহস চাইতাম।' বড়দি সামান্য থামল, তার সমস্ত শরীর রেশম দিয়ে মোড়া সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল, ভাঙা হাঁটু, মাটির ওপর ভর-করা হাত: নিশ্বাস ফেলে বড়দি বলল, 'মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারি নি। মা যেন সেই সাহস পায়।'

কথা শেষ করে বড়দি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আমরা স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাস এসে কদমের কয়েকটি শুকনো পাতা ফেলে গেল, চাঁদের আলোয় একটা কাঠবেড়ালি কাঠচাঁপার ডাল বেয়ে এগিয়ে এসে আবার ছুটে পালাল।

বেদীর কুলঙ্গীর মধ্যে প্রদীপটা অকম্পিত জ্বলছে। ধূপধুনো ফুরিয়ে গেছে আমরা আর গন্ধ পাচ্ছিলাম না।

এবার মেজদার পালা। আমরা মেজদার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মেজদা কিছু বলছিল না।

ছোট মেজদার গায়ে হাত দিল। 'মেজদা—তুমি ?'

মেজদা মাথা নাড়ল। 'এখনও কিছু ভেবে পাই নি। তোরা বল্। তুই বল্, ছোট।'

ছোটর স্বভাবই আলাদা। তার অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবনা নেই। ছোট একবার প্রদীপের দিকে তাকাল, এবার আকাশের দিকে। খুক খুক করে কাশল কবার ; তারপর বলল 'এত অল্প বয়সে আমার এমন একটা বিশ্রী অসুখ করল বলে মা বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছিল। ভাবত, আমি আর বাঁচব না। আমিও প্রথম প্রথম সেই রকম ভেবেছি। মা বলত, তুই নিজে ইচ্ছে করে এই অসুখ বাধালি। কী বোকার মতন কথা বলত, বড়দি। অসুখ কি কেউ ইচ্ছে করে বাধায়—! না অসুখে সুখ আছে—!' এক দমকে কথা বলছিল ছোট, বলতে বলতে থামল। মনে হল, সে কোনো কিছু না ভেবেই কথা শুরু করেছিল, তারপর খেই হারিয়ে ফেলেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমরা চুপ করে থাকলাম। ছোট একটু যেন অপ্রস্তুত হল। মাথার বেণী বুকের কাছে টেনে আঙুলে জড়িয়ে দুচার বার দোলাল। ছোটর গায়ে হালকা রঙের একটা শাড়ি, গায়ে অর্ধেকহাত জামা। ছোটর কপাল ছোট ; দু পাশের চুল তার প্রায় সবটুকু কপালই ঢেকে ফেলেছে। নাকটি লম্বা ; চোখ দুটি খুব কালো, ছোটর হঠাৎ থেমে যাওয়া, হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করা এবং এই আপাতত চাঞ্চল্য থেকে মনে হল ছোট যেন খেই খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে।

আরও একটু সময় নিল ছোট। সে তার কথা খুঁজে পেল। বলল, 'অসুখ কেউ ইচ্ছে করে বাধায় না, অসুখে সুখ নেই—তাও ঠিক। তবু আমি এই অসুখে পড়ে একটা সুখ পাচ্ছিলাম।···তুমি তো জান বড়দি, অসুখের সময় আমার বন্ধুটন্ধুরা খোঁজ-খবর নিতে আসত। বেশী আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত, এ অসুখ কিছুই না।··· মা কেন জানি এটা পছন্দ করত না, একেবারেই নয়।' ছোট তার দীর্ঘ বেণী কাঁধের ডান পাশে রাখল, আকাশের দিকে তাকাল আবার, তাকিয়ে থাকল, বলল, 'একদিন মা আমার সামনে সুশান্তকে বলল, তুমি তো ডাক্তার নও ; কেন অযথা ও-সব কথা বল। ওকে বকিয়ো না, বিরক্ত করো না।'···সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না। আমি মাকে বলেছিলাম, অকারণে তুমি ওকে অপদস্থ করলে। মা বলেছিল, 'ওরা আমার অনেক করেছে, তোমায় মাতিয়ে এই অসুখ দিয়েছে। তা দিক, আর আমার সুখ দরকার নেই।' ছোট আকাশ থেকে চোখ নামাল, তার গলা পাতলা, কাঁপছিল চোখ যেন একটু চিকচিক করছে। ও বলল, 'মা আমার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখে নি। মা জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার

দিয়ে সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক ; ভরসা পাওয়ার কত শক্তি…' ছোট আমার দিকে তাকাল, 'আমি মাকে আর কিছু দিতে পারি না, মন ছাড়া, আশা ছাড়া, ভরসা ছাড়া। মা যেন তার মনে ভরসা পায়।'

ছোট নীরব হল। মার বেদীতে কদম-ছায়া উঠে এসেছে। বড়দার পাশ দিয়ে ছায়াটা বড়দির কোলে গিয়ে বসেছে। বাতাবিলেবুর গাছটা অনেক দূরে। তার মাথার ওপর দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে রেললাইনের বাতি চোখে পড়েছিল আমার। দশরথ ধোপার কুঠিতে ওরা গান গাইছে। গত সপ্তাহে দশরথের ছেলের বিয়ে হয়েছে, আজও থেকে থেকে সেই আনন্দের লহরী তোলে তারা।

খুব যেন ক্লান্ত হয়ে ছোট তার মাথা আমার কাঁধে রাখল। বলল, 'কড়ি, এবার তোর পালা—'

বড়দা, বড়দি আমার দিকে তাকাল। মেজদা তার অন্ধ চোখ অনুমানে আমার দিকে ফিরিয়ে রাখল। সহসা অনুভব করলাম, ওরা আমার হৃদয়ে লুকানো মার ছবি দেখার জন্যে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। আমার ভয় করছিল। কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো কোনো সাক্ষীর বোধহয় জবানবন্দী দেবার সময় এই রকম ভয় হয়।

এই মুহূর্তে সকলই স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাসও শান্ত হয়ে আছে। দুধেরফেনার মতন জ্যোৎস্নায় আমার চারটি উৎকর্ণ আত্মীয় নিষ্পলকে আমায় দেখছে। বড়দার দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলার আয়োজন করছিলাম। বড়দার পাশ দিয়ে বেদীর কুলঙ্গীতে প্রদীপ চোখে পড়ছিল। শিখাটি স্থির। মার চোখের মতন শিখাটি যেন আমায় লক্ষ করছিল।

'ভেবে পাচ্ছি না—' আমি বললাম। আমার মন স্থির নয়, নিঃসংশয় নয়। দ্বিধায় গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে আমি বললাম, 'কখনও মনে হচ্ছে অনেক কিছু যেন দেবার আছে, আবার মনে হচ্ছে কিছু নেই। আমি সব চেয়ে ছোট বলেই মা আমায় তার শেষ গচ্ছিত ধনের মতন করে সরিয়ে রেখেছিল। মানুষ যেমন করে সিন্দুকে অবশিষ্ট অলংকার তুলে রাখে অনেকটা সেইরকম। ব্যবহার করত না, দেখত না।'

কথা বলার সময় ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছি। গলা কাঁপছিল তখনও, তবু আমার স্বর স্পষ্ট হয়ে এসেছে অনেকটা। 'তোমরা মাকে যত পেয়েছ, যেমন করে পেয়েছ, আমি তা পাই নি। আমার মা আমাদের সংসারকে তেমন করে বুঝতে দেয় নি। ভাবত, আমার এ-সবে দরকার নেই।…কিন্তু আমি মাকে দেখেছি।…একবার মার সঙ্গে আমায় কাশী যেতে হয়েছিল। তোর মনে আছে ছোট, বাবা মারা যাবার পর মা একবার আমায় নিয়ে কাশী গিয়েছিল পনেরো বিশ দিনের জন্যে। তোরা ভেবেছিলি মার মন ভাল নয়, বাবার অভাবে মন বড় কাতর—তাই মা কটা দিন তীর্থের জায়গায় মন জুড়িয়ে আসতে গেছে। হয়ত খানিকটা সেই উদ্দেশ্যেই মা গিয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়।…' আমার গলা স্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল, আমি আর ভীত হচ্ছিলাম না ; আমার মনের সামনে সব স্থির হয়ে গিয়েছিল, যা খোঁজার আমি যেন তা পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রদীপশিখাটি শেষ বারের মতন দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেজদাকে দেখছিলাম। 'কাশীতে বাবার এক বন্ধু থাকত। আমি কখনও তার নাম শুনি নি—'

'শচীন-জ্যেঠামশাই।' বড়দা বলল অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ। তুমি তা হলে জান?'

'জানি বই কি। শচীজ্যেঠাকে আমি কতবার দেখেছি। তুইও দেখেছিস, অনু।'

'দেখেছি।' বড়দি মাথা নাড়ল।

'বাবার সঙ্গে ব্যবসা করত। তারপর কি হয়, আলাদা হয়ে গেল। পরে আর আমি শচীজ্যেঠার কথা শুনি নি।'

'নানা জায়গায় ঘুরে শেষে তিনি কাশীতে গিয়েই শেষ জীবন কাটাচ্ছিলেন।' আমি বললাম। বলার সময় শচীন-জ্যেঠামশাইয়ের কাশীর সংসার আমার চোখে ভাসছিল, স্পষ্ট অনাবৃত। 'বাঙালীটোলার অন্ধকার গলিতে নরকের মতন ছোট ছোট খুপরি ঘরে ওঁরা থাকেন ; উনি স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে—একটি পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন্ বাড়িতে যেন রান্নাবান্নার কাজ করে দেয়। ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে।...কাশীর সেই অন্ধকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় একটি অসহায় পরিবার গলা পর্যন্ত ডুবে। মা গিয়েছিল সেখানে বাবার পুরানো কোন্ ব্যবসায় শচীন-জ্যাঠা কবে কাগজপত্রে বাবার অংশীদার ছিল সেটা নাকচ করিয়ে আনতে। উনি সে-কথা মনেও রাখেন নি, মনে রাখার কথাও নয়। তবু মা আইনের ফাঁক রাখতে রাজী নয়। কে জানে কবে এই গর্ত খুঁড়ে সাপ বেরুবে না। একশো টাকার দু'খানা মাত্র নোট মা শচীন-জ্যেঠার হাতে দিয়ে সেই পুরানো অংশীদারী বাতিল করিয়ে নিল।...আমি মাকে বলেছিলাম, তুমি তো অনেক আগেই এটা ওঁদের ছেড়ে দিতে পারতে মা। বাবাও তো কাঠের ব্যবসাটা আর করত না।...জবাবে মা বলেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, বিষয়-আশয়ের কিছু বোঝ না। ওই ব্যবসা অন্যের তদারকিতে দেওয়া আছে, বছরে হাজার দুয়েক টাকা বাড়িতে আসে। টাকাটা আমি অকারণে খোয়াব! অত স্বার্থ-ত্যাগ আমি শিখি নি।' 'আমার গলার শিরা যেন কেউ আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে টানছিল, সেই যন্ত্রণায় আমি কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলাম না ; আমার সামনে শচীন-জ্যেঠার পিচুঁটিভরা চোখ দুটি ভাসছিল। কী দুর্গতি তাঁর! মা স্বার্থত্যাগ জানত না।' আমি চাপা গলায় বললাম, 'মা দীন ছিল, আর মন কৃপণ ছিল।...আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব। আর কিছু না।'

আমি নীরব হলে বৃন্দাবনের কদমগাছ তার ছায়া আরও দীর্ঘ করল। বড়দির

বুকে সেই ছায়া দেখলাম। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে। দশরথ ধোপা-দের বস্তিতে গানের সুর থেমে গেছে। একটি রাত্রিগামী ট্রেন সাঁকোর ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে হুইসল্ দিচ্ছে পথের জন্যে। ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এখানে ভেসে আসছিল।
মেজদা কিছু বলে নি। এবার বলবে। মেজদার পালা ফুরোলে আমাদের পাঁচটি আঙুলই গুটিয়ে যাবে।
আমরা কেউ কোনো কথা না বলে মেজদার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
মেজদা কিছু বলছিল না। মেজদা শূন্যপানে মুখ তুলে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অধীর উৎকণ্ঠিত সেই অপেক্ষা দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।
'দীনু—' বড়দা মেজদাকে ডাকল।
মেজদা স্থির, শান্ত। যেন আকাশের দিকে তার অন্ধ চোখ মেলে সে হৃদয় দিয়ে মাকে দেখছে।
'দীনু—' এবার বড়দি হাত বাড়িয়ে মেজদার গা স্পর্শ করল।
মেজদা তবু পাথরের মতন বসে। তার নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যাচ্ছিল না।
ছোট ডাকল, 'মেজদা।'
হাত দিয়ে মেজদাকে স্পর্শ করে বললাম, 'মেজদা, এবার তোমার পালা।'
মেজদা সামান্য নড়ল। আকাশের দিকেই তার মুখটি তোলা, অমল জ্যোৎস্না তার সমস্ত মুখ লেপে রেখেছে, তার দুই অন্ধ নয়ন নিবিড় করে সেই আলো মাখছিল।
মেজদা তার সাদামাটা মেঠো সুরেলা গলায় বলল, 'সৎকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে! তোমরা মার সৎকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই।' কয়েকদণ্ড থামল মেজদা, তারপর বলল, 'আমাকে যেন একটা নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম।…এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'
মেজদা আর কিছু বলল না। কাশীর সাদা পাথরে বাঁধানো মার বেদীর ওপর আমরা পাঁচটি সন্তান বসে থাকলাম। শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মা-র সৎকার যেন এইমাত্র সমাধা হল।
সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মা-র নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।

অপেক্ষা

অগোচরে সন্ধ্যা নামল। ধূসর অন্ধকার অবশিষ্ট আলোর রেখাগুলি মুছে দিলে শূন্যের কোথাও আর স্বচ্ছতা থাকল না। শিরীষগাছের মাথা ডিঙ্গিয়ে শেষ কয়েকটি পাখি গঙ্গার দিকে চলে গেছে। এই সময় চৈত্রমাসের অস্থির হাওয়া এলো মাঠে; কয়েক দণ্ড পর ওই বাতাস দূরান্তে চলে গেলে আকাশ বড় নিরিবিলি দেখাল।

শিবতোষ উদাস চোখে ফাঁকা আকাশ, ময়লা মেঘের তলায় আঁধারে ঘন হয়ে আসা দেখছিল। এখন কিছু আর চোখে পড়ে না; মনে হয়, দৃষ্টির ওপারে চলে গেছে সব। মাঠের গাছগুলি অন্ধকারে মিশে গাঢ় ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে; কাছাকাছি কয়েকটি মানুষ ছিল, তাদের দেখা যাচ্ছে না; কলাফুলের ঝাড় ছিল সামনে—এখন সেই গাছটিও ঠাহর করা যায় না।

ভুবন দত্তর কথা আবার মনে এলো। কোনো কোনো সময় এই রকম হয়, যতবার বই খোলো সেই একই পাতা; কি করে যেন একটু ফাঁক জমে গছে ওখানে, ঘুরে ফিরে পাতাটা দেখা দেবে। ভুবন গতকাল রাত্রে মারা গেছে। কোনো মারাত্মক ব্যাধি নয়, দুর্ঘটনাও না। ভুবনের সাধারণ জ্বর হয়েছিল। বউ নিয়ে দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়েছিল মাসের প্রথম দিকে, ফিরে এসেছিল মাঝামাঝি; এসে বসেছিল, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। কলকাতায় ফিরে কেমন করে যেন আবার একদিন জ্বরটা বেড়ে গেল। হু হু করে জ্বর উঠল। কমল একটু। তারপর কাল রাত্রে আর সে নিশ্বাস নিতে পারল না। বউকে নাকি বলেছিল, পাখাটা ফুল করে দাও; আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঝড়ের মতন পাখা ঘুরছে মাথার ওপর, গলির মোড়ে রাত থমথম করছে, মুখের সামনে বউ; ডাক্তার এলো, এসে দেখল ভুবন মারা গেছে। আ-হা!

শিবতোষ অনুভব করছিল, দুপুর থেকে সে কতবার বড় বড় নিশ্বাস ফেলেছে তবু তার বুক ভার। যেন একটু একটু করে বাতাস তার বুকে ক্রমশই জমে যাচ্ছে, দীর্ঘনিশ্বাসগুলি তার বুক থেকে সবটুকু বাতাস তুলতে পারছে না।

কোল থেকে চশমা তুলে নিয়ে পরল শিবতোষ; মুখ হাঁ করে যতটা পারল বাতাস উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করল।

ভুবন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিল। বছর বত্রিশের ছেলে। মাত্র সে-দিন বিয়ে করেছে। বছর দুই? নাকি তিন? অফিসেরই একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে

করেছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে জোড়ে অফিসে আসত, ছুটির পর একসঙ্গে বেরুত ট্রাম-বাস ধরতে।

বিশু মিত্তির বড় রগুড়ে লোক। একদিন বর্ষায় ভুবন আর ভুবনের বউ দু'জনে দুটো আলাদা ছাতায় মাথা ঢেকে অফিসে ঢুকছে দেখে বিশু চেঁচিয়ে বলল, 'কি রে ভুবন, বউমার সঙ্গে ঝগড়া নাকি ? ভুবন সস্ত্রীক থমকে দাঁড়াল ; বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিশু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোদের তো ভাই এক ছাতা মাথায় দিয়ে আসার কথা।'

এখনও যেন সেই বর্ষার দিনের হাসির হল্লো শুনতে পাচ্ছে শিবতোষ ; ভুবনের হাস্যময় মুখ এবং প্রসন্ন দৃষ্টি, ভুবনের বউ গৌরীর সলজ্জ মুখ এবং ঈষৎ অ-প্রস্তুত ভাব—শিবতোষ এই অন্ধকারেও যেন দেখতে পেল।

ঘাসের ওপর থেকে এবার পা গুটিয়ে নিল ও। অনেক দূরে কোনো একজন ট্রানজিস্টার সেট খুলেছে। হাতে ঘড়ি আছে, এত অন্ধকারে কাঁটা দেখা যাবে না জেনে শিবতোষ ঘড়ি দেখল না। বাড়ি ফেরার সময় উতরে যাচ্ছে। তার ওঠা উচিত। রাত হয়ে গেলে কমলা বড় ভাবে।

উঠে দাঁড়াল শিবতোষ। রুমাল বের করে মুখ মুছে নিল আলতো করে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর অবসন্ন পায়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। ট্রাম-গুমটি এতক্ষণে নিশ্চয় কিছুটা ফাঁকা হয়ে এসেছে, যথেষ্ট অন্ধকারে রাস্তার বাতিগুলোও পুরোপুরি ফুটে উঠেছে।

এ সংসারে কখন কি আসবে কেউ জানে না। ভুবন কত আশা করে ভালবেসেছিল, কত দীর্ঘকাল ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকবে বলে ভেবেছিল। গৌরী কত নির্ভর করে এই ভালবাসার কাছে নিজেকে দিয়েছিল। কিন্তু কী হল ?

বিশু আজ ক্ষেপে গিয়ে বলেছে, 'শালার ভগবান। থানা থেকে লোকজন নিয়ে যেন কুকুর ধরতে আসে।'

তা সত্যি, কখন যে কী আসছে কেউ জানে না।

বাড়ি ফিরতে প্রায় আটটা বেজে গেল। গলির গলিতে বাড়ি। পথের বাতি আজ জ্বলে, কাল নেবে ; আবার কর্পোরেশনের বাতি-জ্বালানো লোকটা যতদিন নতুন বালব্ না আনছে ততদিন এদিকটা অন্ধকার, তিরিশ চল্লিশ গজ জায়গা ঘুটঘুট করবে। শিবতোষ বাড়ি ফিরে দোতলায় ওঠবার সময় শুনতে পেল, নীচে বৈঠকখানা-ঘরে বাবুল আর টুলু চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছে। ওদের মাস্টারমশাই এসেছেন যে সেটা বোঝা যায়, নয়তো পড়া ছেড়ে দুই ভাইবোনে দাপাদাপি করত।

দোতলার সিঁড়িতে পা দিয়ে চোখ পড়ল, কলতলার মুখোমুখি রান্নাঘরে চৌকাঠের কাছে কমলা দাঁড়িয়ে আছে ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বামুনকে কিছু বলছিল। শিবতোষের পায়ের শব্দে কমলা মুখ ফিরিয়েছে।

নিজের ঘরে এসে শিবতোষ কাপড় জামা ছাড়ল। মেঝেতে এক পাশে সেলাই-কল নামানো রয়েছে ; কিছু ছিট-কাপড়, কাঁচি, একটা বালতিব্যাগ সেলাই-কলের আশে-পাশে ছড়ানো। কমলা সেলাই নিয়ে বসেছিল, উঠে গেছে। হাতে সময় পেলে বসে মাঝে মাঝে ; কিন্তু বড় অসতর্কভাবে সমস্ত ফেলে যায়। একদিন মিনু হাত পা কাটবে। শিবতোষ কাঁচি সরিয়ে রেখে সেলাই-কলের ডালাটা কলের মুখে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছিল, কমলা এলো।

'ঠিক, যা ভেবেছি—' কমলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো কলের কাছে, 'থাক, ঢাকনা দিও না, আমার কাজ আছে।'

'মিনু কোথায় ?' শিবতোষ ডালা রেখে দিল।

'বলো না আর, ওই এক মেয়েতে আমি জ্বলে গেলাম। এক অক্ষর পড়বে না। সারা দুপুর চাল্লি, সন্ধ্যেবেলা শাঁক বাজতে না বাজতে ঢুলবে।' কমলা সতরঞ্জির আসন টেনে নিয়ে কলের সামনে বসে পড়ল।

শিবতোষ গায়ের জামা ছাড়তে আলনার কাছে সরে গেল।

'দিয়েছি দুটো চড়। খানিক কাঁদল, তারপর জেদ ধরে বসে থাকল। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছি নীচে। খাক, খেয়ে ঘুমোক।' কমলা বলল।

শিবতোষ অনুমান করতে পারল, মিনু একটু পরেই উঠে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়বে। রাগ হলে মিনু বাবার সান্নিধ্যই বেশী পছন্দ করে।

'আজ এত দেরী করলে ?' কমলা সেলাই-কলের মুখের ওপর ঝুঁকে বুঝি সুতো পরিয়ে নিচ্ছিল।

'দেরী হয়ে গেল, মাঠে গিয়ে বসেছিলাম।' শিবতোষ কলঘরে যাবার জন্যে কাচা ধুতি, গেঞ্জি আলনা থেকে তুলে নিচ্ছিল। 'মনটা খারাপ হয়ে গেছে—'

স্বামীর গলার স্বর এবং দীর্ঘনিশ্বাস শুনে কমলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'মন খারাপ ! হঠাৎ ! কী হল ?'

'কাল রাত্তিরে ভুবন মারা গেছে।'

'কে ?'

'ভুবন। আমাদের অফিসের ভুবন। সেই যে যার কথা বলি তোমায়—'

'সে কি !' মুহূর্তে যেন কমলা বিমূঢ়তা কাটিয়ে ভুবনকে চিনতে পারল। স্পষ্ট চিনতে পারল। শিবতোষের কাছে কত খুঁটি-নাটি শুনেছে ভদ্রলোকের বিষয়ে। একবার এ-বাড়িতে এসেছিল। 'কি করে মারা গেল ? হঠাৎ ?'

'হঠাৎই। বলছে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া। কি জানি !' শিবতোষ উদাসীন ভারী গলায় বলল। 'মানুষের কখন কি হয়, কখন ডাক আসে কে জানে ?··· বেচারী !'

কমলা সেলাই-কলের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল।

তারপর আরও রাত হল। ন'টা বেজে গেল কখন। সদর থেকে হাওয়া এসে এই গলিতে তার সাড়া দিচ্ছিল যেন। ঘরের সামনে গলির দিকে মুখ করে ফালি বারান্দা, এলোমেলো হাওয়ায় অন্ধকারে কমলার সেমিজ দুলছিল, টুনুর ফ্রক মাটিতে, টবের অপরাজিতা লতার ডালপালা বারান্দার রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক'হাত এগিয়েছে, বেতের একটা চেয়ার, তিন চাকার সাইকেল সব যথাযথ রয়েছে। নীচে বাবুলরা বসেছে, কমলা ছেলেমেয়েকে খাওয়াচ্ছে; মিনু শিবতোষের বিছানায় বালিশ জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে অকাতরে। আজ কোনো কিছুতেই মন বসছে না বলে শিবতোষ বই অথবা কাগজপত্র পড়ে সময় কাটাতে পারে নি। চেষ্টা করেছিল, ফল হয় নি। সামান্য আগে পাশের বাড়িতে রেডিও খুলে দেওয়ায় তার কানে একটা গান ভেসে আসছিল, ইচ্ছে হয়েছিল ঘরের রেডিয়োটা খুলে দেয়; শেষ পর্যন্ত দেয় নি।

কখনও ঘরে কখনও বাইরে এসে বিছানায় শুয়ে, বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে এ-কাজ সে-কাজে মন বসাতে গিয়ে সুস্থির হতে না পারায় শিবতোষ তৃতীয়বার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকার খুব হালকা করে আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ অতি অল্পই দেখা যাচ্ছে, তারা চোখে পড়ল। সামনের বাড়ির বেখাপ্পা চিলেকোঠা দৃষ্টি আটকে রেখেছে, নয়ত দূরান্তে চোখ পড়ত। কমলার সেমিজ উড়ে মুখে এসে লাগল। গলির পথ দিয়ে একটি বউ চলে যাচ্ছে।

গৌরীকে একটা চিঠি লেখার কথা হঠাৎ মনে হল শিবতোষের। যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এ-সময় যাবার মতন সাহস হচ্ছিল না। ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে নিজেকে আরও দুর্বল মনে হয় শিবতোষের। কথা বলতে পাবে না, তার বুক কাঁপে। আপাতত একটা চিঠি লিখে ঠিক এই অবস্থার মুখ থেকে সরে থাকা যাক। তারপর কয়েকদিন পরে শ্রাদ্ধের সময় শিবতোষ যেতে পারবে।

চিঠি লেখার কথা মনে আসায় শিবতোষ ঘরে এলো। পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে টেবিল। টুকটাক জিনিস সাজানো আছে। টেবল-ল্যাম্প, মাটির ফুলদানি, দোয়াতদান, তারিখ-বদলানো ক্যালেন্ডার, দু-একটা বই, বাসী মাসিকপত্র। সামান্য কাগজ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ একটা চিঠির কথা মনে পড়ল শিবতোষের। একটুক্ষণ থমকে গেল যেন। ভাবল। হ্যাঁ, চিঠিটা থাকা উচিত। এই টেবিল অথবা বইয়ের ফাঁকে কোথাও চিঠিটা থাকার কথা।

শিবতোষ চিঠি খুঁজল। টেবিল দেখল, বইপত্র হাতড়াল, ড্রয়ার ওলট-পালট করল। কি আশ্চর্য, কোথায় রাখল চিঠিটা? গেল কোথায়? কমলা দরকারী জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বড়। ঘর গুছোনোর রোগ তার, সারাক্ষণ সময় পেলেই এখানের জিনিস ওখানে করছে; অথচ কমলা অসাবধান এবং ভুলো-মন।

চিঠি খুঁজে না পাওয়ায় শিবতোষ ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক সময়

দেরাজের টানার মধ্যে কাগজপত্র রেখে দেয় কমলা। শিবতোষ আলনার কাছে গিয়ে দেরাজ টানল। ইনসিওরেন্সের রসিদ, কর্পোরেশনের ট্যাক্সের তাগিদ, টুলুর কোষ্ঠি, দু-দশটা পুরোনো চিঠি, বাড়ির ছাদ মেরামতির বিল—ইত্যাদি কয়েকটা জিনিস দেখা গেল, সেই চিঠিটা নেই।

'কমলা—' দোতলার ভেতর-বারান্দায় এসে ডাকল শিবতোষ। 'একবার ওপরে উঠে এস।'

শিবতোষ বেশ চঞ্চল এবং বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরে এসে উদ্বিগ্নের মতন সে আরও একবার টেবিল হাতড়াল। না, চিঠিটা নেই। কমলা চিঠিপত্রর ব্যাপারে একেবারে 'কেয়ারলেস'। মনে মনে কেমন বিতৃষ্ণা অনুভব করল শিবতোষ স্ত্রীর ওপর। রাগ হচ্ছিল।

কমলা আসছে না। শিবতোষের খেয়াল হল, অনেক সময় বিছানার পায়ের দিকের তোশকের তলায় এটা সেটা কাগজপত্র রেখে দেয় কমলা। কথাটা মনে পড়ায় বিছানার পায়ের দিকের তোশক তুলে ফেলল শিবতোষ। ফ্রকের ডিজাইনের রঙীন ছবি, ছুঁচের কাজের ছেঁড়া বই, বাংলা খবরের কাগজের কয়েকটা কাটা-ছেঁড়া পাতা, বিয়ের নেমন্তন্নর দুটো চিঠি এবং দুটো স্যারিডনের বড়ি পাওয়া গেল।

'বিছানা হাতড়ে কি খুঁজছ?' কমলা ঘরে এসেছে। ঘরে এসে দেখল, স্বামী বিছানাটা লণ্ডভণ্ড করে এক বিশ্রী অবস্থা করেছে। কমলার এটা একেবারেই পছন্দ হয় না। পুরুষমানুষ বিছানা হাতড়াবে কেন! আবার সব পরিপাটি করতে হবে কমলাকেই। এ-সংসারে দিনরাত শুধু পরিশ্রম করো।

'একটা চিঠি রেখেছিলাম টেবিলের ওপর, কোথায় ফেললে?' শিবতোষ বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল।

'চিঠি! কার চিঠি? কিসের চিঠি?' কমলা বিছানার পায়ের দিকে এসে অগোছালো বিছানার তোশক চাদর আবার গুছোতে লাগল নীচু হয়ে।

কার চিঠি, কিসের চিঠি মনে করতে গিয়ে শিবতোষ কেমন থমকে গেল। কখনও কখনও এ-রকম হয়, খুব চেনা পরিচিত শব্দের প্রথম অক্ষরটি দেখেই পুরো শব্দটি মনে মনে ধরে নেওয়ার মতন আমরা অপরিচিত শব্দটিকে ভুল করে পরিচিত শব্দ বলেই ধরে নিই, পরে কেউ প্রশ্ন করলে হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে যায়, শব্দটি কি সত্যিই তেমন ছিল! বস্তুত মনোযোগ দিয়ে না দেখার ফলে যে সন্দেহ, সেই সন্দেহ পরে দেখা দিয়ে আমাদের কেমন বিব্রত করে। শিবতোষ প্রায় সেইরকম বিব্রত ও বিমূঢ় হল। সে মনে করতে পারল না চিঠিটা কার।

'সব ব্যাপারে তোমার ঠিকুজি দিতে হবে—' শিবতোষ অত্যন্ত অপ্রসন্ন গলায় বলল, মুখচোখে প্রখর বিরক্তি। 'কে যে তোমায় আমার কাগজপত্রে হাত দিতে বলে। কেয়ারলেস…! রাখলাম চিঠিটা, বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল!'

'কী মুশকিল !' কমলা স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল, 'প্রায় দিনই তো চিঠি আসে বাড়িতে, কার চিঠি কেমন চিঠি বলবে, তবে না বুঝব।'

'তোমার মুণ্ডু বুঝবে ! আমি যা পছন্দ করি না সেই কাজটাই তোমার করা চাই। হাজারবার বলেছি, টেবিলে আমার যা থাকে থাক্‌, তোমরা ঘেঁটো না। কেন ঘাঁটো ?'

'চেঁচিয়ো না।' কমলা যেন ধমক দিল স্বামীকে। 'আস্তে কথা বল। অত তিরিক্ষে মেজাজ করে কথা বলার কী হয়েছে !…কার চিঠি কবে এসেছে বলতে পারছ না ?…দিদির চিঠি ?'

'না। দিদি-ফিদির চিঠি নয়। দিদির চিঠি তুমি পড়গে যাও।'

'তোমারই দিদি, আমার নয়।'

'হোক আমার দিদি।…আশ্চর্য, কাল আমি রাখলাম চিঠিটা—আজ হাওয়া হয়ে গেল।' শিবতোষ যেন এই রহস্যের মর্ম বুঝতে না পেরে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে।

'কাল কোনো চিঠি আসে নি তোমার। মুক্তির একটা পোস্টকার্ড এসেছিল।' কমলা বলল।

'তোমার বোনের চিঠি নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।'

'তা হলে অন্য কোনো চিঠি আসে নি।'

'এসেছিল।'

'আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম তো ! এসেছিল যদি, তবে কি উড়ে গেল। কার চিঠি তাও বলবে না, কেমন চিঠি তাও বলবে না, শুধু চেঁচাবে।' কমলা অধৈর্য, তিতিবিরক্ত। 'খাম, না, ইনল্যান্ড লেটার ?'

'আমার মাথা। বুঝলে, আমার এই মাথা—' রাগে বিরক্তিতে বদমেজাজে যেন জ্বলে-পুড়ে শিবতোষ অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে নিজের মাথা দেখাল। তারপর বলল, 'হাতির পিঠে হাওদায় বসে সংসার করছ। কোনো দিকে চোখ নেই, গ্রাহ্যও নেই। কাজের মধ্যে অকাজ। তুমি আর কখনও আমার কাগজপত্র চিঠিতে হাত দেবে না।'

কমলারও রাগ চড়ে গিয়েছিল মাথায়। মানুষে যদি অকারণে মাথা গরম করে যা খুশি বলে যায় তবে কতটা আর সহ্য করে অন্যে। কমলা চেরা গলায় বলল, 'কথা বলো না আর, কি আমায় হাওদার উপর বসিয়ে রেখেছ ! এক গুচ্চের ছেলে-মেয়ে নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মরছি তার ওপর তোমার ফিরিক্কি সামলানো। পারব না। নিজের জিনিস নিজে রাখবে, নিজে নেবে ; খবরদার কমলা কমলা করবে না।' বলতে বলতে কমলা রাগে অসহিষ্ণু হয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

শিবতোষ দাঁড়িয়ে থাকল। কমলার পায়ের শব্দ সিঁড়ি থেকে নীচে নেমে নেমে মিলিয়ে গেল। বাবুল আর টুলুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। ঘরে বিছানায় মিনু

ঘুমোচ্ছে। এই সংসারের চেহারাটা হঠাৎ রেল-কামরার চেহারার মতন দেখাল, কয়েক পলক, তারপর আবার সব ঠিক হয়ে এলো। ঘরে একশো পাওয়ারের বাতিটা যথেষ্ট আলো ছড়িয়ে জ্বলছে, টেবিল আলমারি দেরাজ আলনা—সব সেইরকম, ঘরের মাঝদরজা দিয়ে পাশের ঘর দেখা যাচ্ছে। ও-ঘর এখন অন্ধকার।

শিবতোষ চিঠিটার কথা ভাবল। কাল কি আসে নি তবে? গত পরশু এসেছিল? হতে পারে, শিবতোষের ভুল হচ্ছে। পোষ্টকার্ড বা ইনল্যান্ড নয়, খাম বলেই মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়িতে চিঠিটায় একবার আধখাপচা চোখ বুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। খুবই অন্যমনস্ক ছিল শিবতোষ তখন। ফলে তেমন কিছুই মনে পড়ছে না চিঠিটার। কে লিখেছে তাও না। নামটা কি দেখেছিল শিবতোষ? দেখেছিল, তবে তেমন খেয়াল করে নয়।

সামান্য মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেই এই বিশ্রী অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হত না। শিবতোষ সবই মনে রাখতে পারত। পরে পড়ে দেখব ভেবে এবং আগের থেকেই যেন কেমন এক অদ্ভুত পূর্বজ্ঞান নিয়ে চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে মোটেই দেখে নি শিবতোষ। ভুল হয়েছে, খুব খারাপ ভুল।

চিঠিটা কে লিখেছে কবে এসেছে, কি লেখা ছিল মনে করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল শিবতোষ। এবং বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

বারান্দায় এলোমেলো বাতাস এসেছে, কমলার সেমিজ দুলছে, বাবুলের ছেঁড়া জামা গেঁজা আছে রেলিঙে; অন্ধকারে এ-সব দেখা যায়, চেনা যায়। চিঠিটার কথাই যেন মনে পড়ছে না।

দুই

অনেক সময় অফিসের ঠিকানাতেও চিঠি আসে শিবতোষের। পুরোনো বন্ধুদের অনেকে, যারা এক সময়ে তার সহকর্মী ছিল, এখন কলকাতায় নেই কিংবা অন্য অফিসে চলে গেছে তারা অফিসের ঠিকানাতেই চিঠি দেয়। মনে রাখার পক্ষে সহজ ঠিকানা অফিসেরই। তা ছাড়া, এমনিতেও অনেক সময় অফিসের ঠিকানাতেই চিঠি পায় শিবতোষ। বিয়ের নেমন্তন্ন, শ্রাদ্ধ, লটারীর টিকিট, রিডার্স ডাইজেস্ট—এ-সব বেশীর ভাগই অফিসের ঠিকানায় আসে। আশুবাবু তাকে রিডার্স ডাইজেস্ট গিফট্ করেছেন বলে ওটা অফিসেই আসছে। মোহিত বরাবর অফিসেই চিঠি লেখে। ওইরকম আরও।

শিবতোষ ভেবেছিল, তা হলে সম্ভবত চিঠিটা অফিসেই এসেছে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় পড়তে পারে নি ভাল করে, রেখে দিয়েছিল পরে দেখবে বলে, তারপর ভুলে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, বাড়িতেই এসেছিল অফিস যাবার বেলায়, তাড়াতাড়িতে তেমন নজর করে দেখে নি, পকেটে পুরে অফিসে চলে গিয়েছিল,

অফিসেই ফেলে এসেছে।

চিঠির চিন্তা এবং সেটা হারানোর অস্বস্তি শিবতোষ থেকে থেকেই অনুভব করছিল। তার স্বভাবে বেশ খানিকটা অন্যমনস্কতা আছে, অনেক সময় মন দিয়ে নজর করে বড় বড় জিনিসও দেখে না ; দোকানে জিনিস কিনে ফেরত পয়সা গুনে নেয় না, ভুল করে ট্রামে দু'বার টিকিট কিনেছে কতবার, অনেক সময় আবার পকেটে টাকা-পয়সা না নিয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়েছে। তার অন্যমনস্কতা এবং অবহেলা তাকে ছেলেবেলা থেকেই নানাভাবে ভুগিয়েছে। এই বিশ্রী স্বভাবদোষের ফলে কখনও সে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারে নি ; আই-এ পরীক্ষায় আর একটু হলেই ফেল করে যেত, বি-এ পড়ার সময় ভয়ে ইতিহাস পড়ে নি, ভুলে যাবার ভয়ে। এই দোষে সবচেয়ে বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে তার দু'বার ; বাবা যখন মারা গেলেন আর সুরমা যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল। বাবার বুকের যন্ত্রণা প্রথম যখন উঠল তখন সে তেমন গা করে নি। গা করার পরেও একটা ভুল করল। মানসিক উদ্বেগে এত জ্ঞানহারা হয়েছিল যে, বাথগেটে ওষুধ কিনতে গিয়ে প্রেস-ক্রিপশন হারাল ; বাড়ি ফিরে এসে ডাক্তারবাবুকে আবার খোঁজ করে ধরে প্রেস-ক্রিপশন লিখিয়ে ওষুধ আনতে এত দেরি হয়ে গেল যে সে-ওষুধ বাবার কাজে লাগল না। বরাবরই একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে শিবতোষের। মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না। তবু বাবার মৃত্যুর কোথাও যেন তার দায়িত্বহীনতার কাঁটা ফুটে থাকল।

সুরমার বেলায়ও শিবতোষ বড় বেশী রকম অন্যমনস্কতা দেখিয়েছিল। সব মানুষ জীবনে ঘরসংসার করে, ছেলেমেয়ের বাবা-মা হয় কিন্তু ক'জন মানুষ ভালবাসা পায় জীবনে। বিয়ে, ঘরসংসার, ছেলেপুলে—এ-সমস্তই হয়ত ভাল ; কিন্তু এর দশ আনাই আমাদের অভ্যাসবশে রক্তে এসে যায়। এক ধরনের 'কর্নাডশানড রিফেলক্স'। ভালবাসা এ-রকম নয়, অন্তত শিবতোষ আজও তা মনে করে না। বিয়ে করেছি, আমার স্ত্রী—অতএব ভালবাসি। ভালবাসা এখানে বাধ্য মনোগত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু শুধু ভালবাসা তা নয়। সুরমা যখন তাকে ভালবেসেছিল তখন ভালবাসার মধ্যে বাধ্যবাধক অবস্থা সাংসারিকভাবে হয় নি। তার ভাল লেগেছিল বলে ভাল-বেসেছিল। শিবতোষ যখন সুরমাকে ভালবেসেছিল তখন বিয়ের আওতায় বউ করে তাকে পায় নি ; সুরমার নম্রতা, স্নিগ্ধ স্বভাব, অমলিন হৃদয় ও আন্তরিকতাই তাকে মুগ্ধ করেছিল। অথচ শিবতোষ নিজের আলস্য ও অন্যমনস্কতার জন্যে এই ভালবাসাও হারাল। সুরমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে সুরমার বাবা মেয়ের বিয়ে সেরে ফেলতে চান। সুরমা চাইছে শিবতোষ একটা কিছু করুক বাড়িতে বলুক, অন্তত যেমনই হোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিক আপাতত। কিন্তু শিবতোষ সমস্ত ব্যাপারটাই তাচ্ছিল্য করে যাচ্ছিল। হবে,

হচ্ছে করে দিন কাটাচ্ছিল। বাঙালী বাড়িতে কুমারী মেয়ে থাকলে বাপ-মা বিশ পঁচিশবার দেখিয়ে থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না। মেয়ের বাড়ি থেকে সব সময় সোনার কার্তিক জামাই চায়, সরকারী বড় চাকুরে খোঁজে। সংসারে চাইলেই কি পাওয়া যায়! একদিন সুরমার বাবা কিছুই পাবেন না, শিবতোষকেই মেয়ে দেবেন। চাকরি শিবতোষ পাবেই; আপাতত সে তেমন চেষ্টা করছে না।...গা না করার ফল কিন্তু ফলে গেল। তমলুকের এক মুনসেফের সঙ্গে সুরমার বিয়ে পাকা হয়ে গেল। শিবতোষের ততদিনে ঘুম ভেঙেছে। নিজের ঐশ্বর্য অন্যে নিয়ে চলে গেলে যেমন হা-হা করে ওঠে মানুষ, শিবতোষ সেই রকম চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। আশীর্বাদী মেয়েকে সে তুলে আনার সাহস রাখে না; মেয়েও কেলেংকারী করার মতন কিছু করবে না। সুরমা মুনসেফের গিন্নী হয়ে তমলুক চলে গেল।

যৌবনের এই দুটি ভুলই শিবতোষকে অনেক অনুশোচনা করিয়েছে। মৃত্যু এবং প্রেম—দুটি জিনিসের কোনোটিকেই সে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে নি; তারা শিবতোষকে যেন সুযোগ দিয়েছিল, তারপর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে দেখিয়েছে, শিবতোষ কত অযোগ্য। হয়ত এরা দুটি জিনিসই এইরকম—সুযোগ দেয়, ধরা দেয় না।

চিঠিটা না-পাবার অস্বস্তিতে মন এ-রকম ভরে থাকল যে, শিবতোষ শান্তি পেল না। একই অক্ষরের ওপর ক্রমাগত কালি বুলিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত সেই অক্ষর যেমন কিম্ভুত এবং যথার্থ অবয়ব হারিয়ে অন্য কিছু হয়ে যায়, সেইরকম ওই চিঠির চিন্তা ক্রমাগত মনে পুষে রাখতে রাখতে এত অসংখ্য কথা ভাবল, বিচিত্র চিন্তা করল শিবতোষ যে, ঘটনাটা বৃহৎ ও অদ্ভুত এক আকার নিল। রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না। অশান্তি তাকে জড়িয়ে থাকল।

অফিস এসে শিবতোষ তার টেবিলের সর্বত্র খুঁজল; কাগজপত্র ফাইল হাতড়াল; ব্যক্তিগত যাবতীয় যা কিছু আতিপাঁতি করে দেখল; চিঠি পেল না। বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, একটা চিঠি আমি ফেলে গিয়েছিলুম ভুলে; টেবিলের নীচে পড়ে যায় নি তো? তুই কাগজ-ফেলা ঝুড়িতে ফেলে দিস নি তো?' বেয়ারা মাথা নাড়ল। তার মনে নেই। মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকলে জমাদারে ফেলে দিয়েছে ঝাঁট দিয়ে; কাগজের ঝুড়িতে বাবু যদি নিজে ফেলে দিয়ে থাকেন তবে এতদিনে পুরোনো কাগজঅলাদের বস্তা থেকে কোথায় চলে গেছে।

শিবতোষ বেয়ারার ওপর রাগ করল, ধমকাল, তার ডিপার্টমেন্ট থেকে হটিয়ে দেবে বলে শাসালো; কিন্ত অনুভব করতে পারল—চিঠিটা পাবার শেষ আশাটুকুও হারিয়ে গেল।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল শিবতোষের। বড় ফাঁকা লাগছিল। সংসারে কারও ওপর

নির্ভর করা যায় না। কেউ তোমার প্রয়োজন অপ্রয়োজন দেখে না। আশ্চর্য, যেহেতু শিবতোষ তেমন খেয়াল করে নি, ভুলো-মন হয়েছিল, সেহেতু তার চিঠিটা হারিয়ে গেল, কেউ দেখল না!

অফিস ছুটির বেলায় ওরা ক'জনে ভুবনের বাড়ি যাচ্ছিল, গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে। বিশু মিত্তির বলল, 'কি শিবু, যাবে নাকি! চল, একবার যাব। গৌরীর দরকার-টরকার থাকতে পারে।'

তিন

কোনো কোনো সময় এ-রকম হয়, ভুলে যাওয়া স্বপ্ন হঠাৎ ঝাপসা ভাবে মনে পড়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে শিবতোষ শুনল, কমলার ভাই প্রকাশ এসেছিল; আগামী বুধবার একুশ তারিখে বোনেরা গৌহাটি চলে যাচ্ছে। কমলার ভাই-বোন-ভগিনীপতিরা কে কোথায় যাচ্ছে শিবতোষের জেনে রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু ওই কথায় শিবতোষের চিঠির কথা মনে পড়ে গেল। কী আশ্চর্য, তার খেয়ালই হয় নি, চিঠিতে একটি তারিখ ছিল। সতেরো? না সতেরো, নয়—ষোলো। হ্যাঁ, ষোলোই ছিল তারিখটা। মানে শুক্রবার। শিবতোষ ঘরের ক্যালেণ্ডার ভাল করে দেখে নিয়ে মনে মনে হিসেব করল। পরশু দিনই দেখা করার কথা। কিন্তু চিঠি লেখার সময় মানুষটি নিশ্চয় ভাল করে হিসেব করে নি দিন-বারের। লিখেছে, ষোলো তারিখে দেখা করব, অথচ বার লিখতে লিখেছে আগামী বৃহস্পতিবার। মানে, পনেরো ষোলো দু দিনই তার আসবার সম্ভাবনা আছে।

পত্রলেখকের ওপর যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করা সত্ত্বেও শিবতোষ আজ এই মুহূর্তে কিছুটা হালকা হল। মনে হয়েছিল, চিঠিটা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে, কিছু আর মনে পড়বে না। দেখা গেল, চিঠিটা যদিও হারিয়ে গেছে, তবু দরকারী ব্যাপারটা মনে পড়ে গেছে শিবতোষের। আজ বুধবার—চৌদ্দই; আগামী ষোলো তারিখে তার দেখা করার কথা। কিন্তু ওই একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছে, বৃহস্পতি-বার নাগাদ দেখা করবে। তার মানে—হয় তারিখ ভুল করেছে, না-হয় পনেরোই তারিখটা বসাতে ভুলে গেছে।

শিবতোষ যতটা বিরক্ত হয়েছিল প্রথমে, ক্রমে সেই বিরক্ত কেটে গেল। অনেকটা যেন মার্জনা করে নিল পত্রলেখককে। হয়ত এই ভুল বা গোলমেলে ব্যাপারটা তার নজরে পড়ে নি, তাড়াতাড়িতে চিঠি লিখেছে। শিবতোষের মতনই অনেকটা স্বভাব, কাজের সময় অন্যমনস্ক থাকে! মনে মনে শিবতোষ সকৌতুক প্রসন্নতা অনুভব করল। অবশ্য শিবতোষের পক্ষে দুটি দিনই সমান। ছুটির পর সাধারণত সে সরাসরি বাড়ি ফেরে না; মাঠের দিকে চলে যায়, বেড়ায় খানিকটা, ঘাসে বসে থাকে, অর্থাৎ এক দেড় ঘণ্টা সময় তার একা একা মাঠের দিকে কাটে। কাজেই

লোকটি বৃহস্পতিবারই দেখা করতে আসুক কি শুক্রবারই আসুক ; শিবতোষের পক্ষে সমান কথা।

মনের অস্বস্তি এবং ভার অনেকখানি বুঝি কেটে গেল শিবতোষের। হারানো চিঠির জন্যে এখন তার তেমন ক্ষোভ হচ্ছিল না। বরং তার পক্ষে চিঠির প্রয়োজনীয় বিষয়টি মনে পড়া একটি কৃতিত্বের মতন মনে হচ্ছিল। ও, মানে—যে-মানুষটি চিঠি লিখেছে সে যে শিবতোষের সঙ্গে অফিসে দেখা করবে না, অফিস ছুটির পর বাইরে দেখা করবে বলেছে—শিবতোষের তাও মনে পড়ে গিয়েছিল। বলতে কি, এর পর হারানো চিঠির জন্যে ক্ষোভ করা অর্থহীন। দেখা হবেই যখন, তখন মানুষটি কে, কি তার ঠিকানা, তার প্রয়োজন কি—এবং নামধাম জানতে অসুবিধে কোথায় !

যত দূর মনে হয়, মানুষটি বাইরের লোক। অপরিচিত বইকি। পরিচিত হলে বাড়ি আসত। অন্তত তার নামটা শিবতোষ ভুলে যেত না।

মোটামুটি মন হালকা এবং নিরুদ্বেগ করে শিবতোষ কমলাকে ডাকল। সামান্য পরে কমলা ঘরে এলে শিবতোষ বলল, 'তুমি কি কাল হেনাদের আসতে বলেছ?'

'না, কাল নয় ; রবিবার বলেছি।'

শিবতোষ নিশ্চিন্ত বোধ করল। আগামী কাল হেনারা এলে তাকে অসুবিধেয় পড়তে হত।

অফিসের বেলা ফুরোলো যখন, তখন আকাশতলায় রোদ ছিল। চৈত্রের বিকেল ওইরকম, যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও সহজে যায় না ; উঁচু-উঁচু বাড়ির মাথাগুলোয় আরও সামান্য সময় বসে থাকবে, যেন গা নেই যাবার, তারপর এক সময় বাধ্য হয়ে চলে যাবে। শিবতোষ স্বভাবতই ট্রাম-বাস ও হন্যে-হাওয়া ভিড়ের গা বাঁচিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি একটা পথ নিল। ওই পথে ছায়া এবং অবসন্ন দিনের মালিন্য ছিল। খানিকটা হেঁটে এসে তার পরিচিত ও পছন্দসই চায়ের দোকানে ঢুকল। মুখচোখে জল দিয়েছিল অফিসেই, দোকানে বসে ধীরে-সুস্থে চা খেল এক কাপ, এক টুকরো কেক ; তারপর সিগারেট ধরিয়ে পথে নামল।

গ্রীষ্মের দিন যে সমাগত বোঝা যায় ; রাস্তা এবং আশেপাশের বাড়ি যথেষ্ট তাপ ছড়াচ্ছে। এখনও বাতাস বয় নি দমকা। না, আর রোদ নেই, আকাশের নীচে পাতলা পরদার মতন আলো রয়েছে এখনও। লাটবাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিবতোষ কিছু গাছ দেখল, ফুলবাগান চোখে পড়ল দূরে। এই জায়গাটা যেন কলকাতা নয় ; শিবতোষ যখনই এ-পথ দিয়ে যায়, তার এই কৌতুককর কথাটা মনে হয়। লাটবাড়ির গাছগাছালি বড় স্নিগ্ধ, এবং এখনই কেমন সন্ধ্যার নির্জনতা সৃষ্টি করেছে।

মাঠে এসে পৌঁছতে যতটুকু সময় লাগল ততক্ষণে বিকেল শেষ হয়েছে। গোধূলির সাজসজ্জা চলছে আকাশে। নিজের অভ্যস্ত জায়গার কাছাকাছি একটি স্থান বেছে নিয়ে শিবতোষ বসল। আজ যেন এপাশে ভিড় একটু বেশী। দুটি বৃদ্ধ পায়চারি করছে, একটি কলেজী ছেলে আকাশমুখো হয়ে সটান শুয়ে আছে, তার পাশে বসে সমবয়সী এক বন্ধু সিগারেট টানছে। খেলার মাঠ থেকে হল্লার একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। শিবতোষ বুঝতে পারল না, আজ কিসের খেলা? হকি নাকি অন্য কিছু!

ঘড়িতে ছ'টা বেজে গেছে। হু হু করে এবার চৈত্রের অন্তিম আলোটুকু মুছে আসছে। ট্রাম-বাস, গাড়ি-ঘোড়ার মিশ্রিত একটি গুঞ্জন বাতাসে ভেসে আছে সর্বক্ষণ; সামান্য দূরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নীচু গলায় কথা বলতে বলতে এসে বসল, সেই এক-চোখ কানা চিনেবাদামঅলাটা এসে গেছে; পায়ে স্যেডসের জুতো, হাফ-প্যান্ট-পরা অ্যাংলো মেয়ে দুটি মাঠে ছুটছে।

আজ গঙ্গায় ঘন ঘন ভোঁ দিচ্ছে জাহাজ। মস্ত একটা মেঘ এসে গেছে পশ্চিম থেকে। ঝড় আসবে নাকি? বোঝা যায় না। এক দঙ্গল মাড়োয়ারী বউ-ঝি বাচ্চাকাচ্চা এসে পড়েছে মাঠে। ঘাসের রঙ ক্রমশই সীসের মতন হয়ে আসছিল।

সন্ধ্যা নামল দ্রুতই যেন। অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ থেকে সেই মেঘ সরল না, শূন্য ছায়ায় ছায়ায় ভরে গেল। শিবতোষের কাছাকাছি কেউ কেউ এসে বসল, কেউ বা উঠে গেল, পাখিরা আর ডাকল না, গানের সুর ভাসল কোথাও, কোথাও বা অট্টহাসি উঠল। নিবিড় আঁধার যখন আর কোনো কিছুকে চিনিয়ে দেয় না, তখন শিবতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল!

আজ সে এলো না। বৃহস্পতিবারের কথাটা অকারণেই লিখেছিল। আগামীকাল ষোলোই তারিখে তবে আসবে। সারাটা বিকেল শিবতোষ মিছিমিছি অপেক্ষা করল, অনর্থক।

কিঞ্চিৎ বিরক্তি অবশ্য বোধ করল শিবতোষ। এই অপেক্ষা বড় বিরক্তিকর। 'অপেক্ষা মানে প্রত্যাশা; এই যে শিবতোষ আশায় থাকল অর্থাৎ কেউ এলো না, এর ফলে শিবতোষের প্রত্যাশা মিটল না। মানুষকে অনর্থক উৎকণ্ঠিত রাখা, ভরসা দিয়ে বসিয়ে রাখা অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার কাজ।'

ট্রামের সিটে বসে এক সময় বিরক্তির বদলে শিবতোষ অকস্মাৎ নিজের এক গাফিলতি অনুভব করতে পারল। অনুভব করে লজ্জা পেল সামান্য। সে বড় বোকা, মানে—আজ বোকামির পরিচয় দিয়েছে। দুটি লোক আজ মাঠে তার কাছাকাছি এসে বসেছিল। একজন একটু প্রবীণ, অন্যজন যুবক। তারা অনেকক্ষণ বসেছিল কাছাকাছি। এ ছাড়া একবার, যখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি বয়স্কা মেয়ে তার প্রায় মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই সরে গিয়েছিল। এমন হতে পারে,

এদের মধ্যেই কেউ সেই পত্রলেখক। শিবতোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দেখা করতে এসেও তারা তবে কেন দেখা করল না ? বোধহয় শিবতোষকে ভাল চিনতে পারে নি। চিনতে না পারায় এগিয়ে এসে আলাপ করতে সংকোচ অনুভব করেছে।
খুবই আশ্চর্যের কথা, পত্রলেখক শিবতোষকে ভাল করে না চিনেও সাক্ষাৎ করার কথা লিখেছে। যে-মানুষ জানে, শিবতোষ অফিস ছুটির পর মাঠে বেড়াতে আসে, সে কি শিবতোষকে ভাল করে না চিনেই দেখা করার কথা লিখেছে। বোধহয় নয়। শিবতোষের কাছে মানুষটি অপরিচিত। কিন্তু শিবতোষ তার কাছে অপরিচিত হতে পারে না।
কে জানে, হয়ত সেও শিবতোষকে চেনে না। লোকমুখে শিবতোষের কথা শুনেছে, জেনেছে শিবতোষ মাঠে এসে বসে, ভেবেছে শিবতোষকে খুঁজে নেবে।
যদিও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না শিবতোষের যে, লোকটি তাকে বিন্দুমাত্র না চিনেই অফিস অথবা বাড়ির বাইরে মাঠে ঘাটে দেখা করার কথা লিখতে পারে, তবু শিবতোষ ভাবল, তার কাছাকাছি যারা এসে বসেছিল, যারা তাকে মাঝে মাঝে দেখছিল, লক্ষ করছিল—তাদের সঙ্গে শিবতোষের আলাপ করা উচিত ছিল। আলাপ করলেই এক সময় শিবতোষ নিজের পরিচয় দিতে পারত, এবং সেই মানুষটি শিবতোষের সঙ্গে দেখা করতে এলে দেখা হয়ে যেত।
মানুষ যেমন দাবাখেলার ছক সামনে পেতে নানা রকমের চাল ভাবে, এটা-ওটা-সেটা ভেবে ভেবেও কুল না পেয়ে প্রথম-ভাবা চালটি চেলে দিতে বাধ্য হয়, শিবতোষও সেইরকম গোড়ার কথাটিই স্থিরভাবে ভেবে নিল। আগামীকাল ষোলো তারিখ, শুক্রবার ; চিঠিতে ষোলো তারিখের কথা আছে। কালই সে আসবে। অবশ্য এমন হতে পারে, শিবতোষকে সে ভালমতন চেনে না ; তার ভুল হতে পারে, কাজেই আগামীকাল তার কাছাকাছি যারা এসে বসবে, তাকে লক্ষ করবে, তার কাছে দেশলাই চাইবে বা সময় জানতে চাইবে, শিবতোষ এ-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করবে সামান্য। তাতে ক্ষতি নেই, বরং লাভ।
পরের দিন যথারীতি শিবতোষ মাঠে এলো। আজ সে আসবে। অপেক্ষা করল শিবতোষ। কাছাকাছি যারা এসে বসেছিল, যারা তার সামনে দিয়ে বার কয় আসা-যাওয়া করেছিল, যারা সিগারেট ধরাতে দেশলাই চেয়েছিল, সময় জানতে চেয়েছিল —তাদের সঙ্গে টুকটাক আলাপ করার চেষ্টাও করল শিবতোষ। অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল, মাঠ ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল, রাত্রি নামল, শিবতোষ অপেক্ষা—অপেক্ষা—অপেক্ষা করে, যথেষ্ট রাত সঙ্গে নিয়ে মাঠ ছেড়ে ফিরে চলল। না, সে এলো না। সে আশা দিয়ে, আসতে বলে, শিবতোষকে উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত করেও শেষ পর্যন্ত এলো না। শিবতোষ কেমন শূন্য, ভার এবং হতাশ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

চার

কোনো দাঁত সদ্য পড়ে গেলে সেই জায়গাটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে, বার বার জিবের ডগা এসে সদ্য বিয়োগব্যথার মতন অভাবটি মনে করিয়ে দেয়, তারপর ক্রমে ক্রমে সরে আসে। চিঠির ঘটনাটাও শিবতোষের সয়ে আসছিল। কয়েকদিন পরে সে মনে করতে শুরু করেছিল, ওই চিঠি বাস্তবিকই তাকে অকারণে বড় বেশী উদ্বিগ্ন করেছে, উতলা করেছে এবং অশান্তি দিয়েছে। অতি বেশীরকম গুরুত্ব না দিলে, ওই এক চিঠি-চিঠি করে সারাক্ষণ না ভাবলে এ-রকম হত না। চিঠিটা জরুরী কিংবা প্রয়োজনীয় হলে পত্রলেখক নিশ্চয় যথাসময়ে আসত, দেখা করত; সে আসে নি, আসার গা করে নি। বোঝাই যাচ্ছে, ও-পক্ষ থেকে কোনো গরজ ছিল না, নেই।

সেদিন মন ভাল না থাকায় এবং কমলার সঙ্গে অকারণে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে চিঠির ব্যাপারটা সে ফেনিয়ে তুলেছিল। বোধহয়, ওই যে কার চিঠি, কিসের চিঠি, কবে এসেছে—এ-সব বৃত্তান্ত কিছু বলতে না পারায় নিজের দোষ কাটাতে সে যথেষ্ট বেশী জেদ ধরেছিল। জেদের পরিণাম যা হয়।

মন যখন আর তেমন অস্থির নয়, ওই এক চিন্তা ক্রমাগত তাকে পীড়িত করছে না, তখন, সেই প্রায়-সয়ে আসা ফাঁকা দাঁতের কাঁচা মাড়িতে একটা ধারালো কিছু হঠাৎ ফুটে গেল যেন। কাঁটার মতন।

'দেখা হল?' সন্ধ্যে উতরে বাড়ি ফিরতেই কমলা জিজ্ঞেস করল।

'দেখা!' অবাক হল শিবতোষ। 'কার সঙ্গে?'

'ওমা, এই তো গেল; তুমি তার পর-পরই বাড়ি ঢুকছ।' কমলাও যেন বুঝতে পারছিল না কিছুই।

'কে গেল? কার কথা বলছ তুমি?' শিবতোষ স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকল।

'আমি কি ছাই চিনি তাকে! কে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'আমার সঙ্গে!' শিবতোষ অকস্মাৎ তার মনে আবার সেই চিঠির কাঁটা-ফুটে-যাওয়া অনুভব করল। 'কখন এসেছিল?'

'এই তো তুমি এলে আর ও গেল।...আমি ভাবলাম তোমার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেছে।'

'না, না; আমার সঙ্গে কারও দেখা হয় নি। তুমি দেখেছ তাকে?'

'না, আমি কলঘরে তখন। দেখছ না—' কমলাকে তার সদ্য গা-ধোওয়া অবস্থাটা দেখাল।

'তা হলে কে দেখল? কার সঙ্গে কথা হল?'

'টুলু। টুলুকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।' কমলা ভিজে শাড়ি-জামা মেলে দিতে

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

নীচে থেকে টুলু এলো। বাবার ডাক শুনে মাস্টারমশাইয়ের হাতে অঙ্কের বইটা গছিয়ে দিয়ে এক ছুটে ওপরে চলে এসেছে।

'কে এসেছিল রে?' শিবতোষ মেয়েকে শুধলো।

'একটা লোক।'

'চিনিস না? দেখিস নি তাকে?'

'না' টুলু মাথা নাড়ল। 'অত্তো লম্বা—' বলে টুলু তার হাত যতখানি সম্ভব তুলে আগন্তুকের দীর্ঘতা বোঝাবার চেষ্টা করল।

'কি নাম বলল?'

'নাম বলে নি।'

'কোথা থেকে এসেছে, কি দরকার…কিছু বলে নি?'

টুলু বড় বড় চোখ করে বাবাকে দেখছিল। সেই লোকটা কড়া নাড়ছিল বলে পড়ার ঘর থেকে ছুটে টুলু সদরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা খালি জিজ্ঞেস করল, বাবা আছেন বাড়িতে? টুলু মাথা নেড়ে না বলে দিল। তারপর আর কিচ্ছু বলে নি লোকটা, চলে গেল। টুলুর তেষ্টা পেয়েছিল জল খেতে রান্নাঘরে যাচ্ছে, মার সঙ্গে দেখা; মা গা ধুয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। মা জিজ্ঞেস করল, কে এসেছিল রে? টুলু বলল, বাবাকে খুঁজতে এসেছিল একটা লোক।

কমলা বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এসেছিল। বলল, 'আবার হয়ত আসবে ঘুরে।' শিবতোষ কেন যেন পুনরায় সেই অস্বস্তি অনুভব করছিল। কে এলো? অপরিচিত কেউ? শুধু টুলুর অপরিচিত, নাকি তারও?

'আবার আসবে বলে গেছে?' শিবতোষ মেয়েকে শুধলো।

'কি জানি!' টুলু নাক ঠোঁট কুঁচকে বলল; ঠিক যেমন করে পড়ার বইয়ের না-জানা পড়ার জবাব দেয়।

কমলা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। 'তুই যা।' মেয়েকে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিল কমলা। শিবতোষ চিন্তিত ও অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। কে এসেছিল বোঝার উপায় নেই। গলিতে তার চেনা অচেনা কত লোকই পাশ দিয়ে চলে গেছে; ওর মধ্যে কে শিব-তোষের খোঁজে এসেছিল কী করে বোঝা যাবে! তা ছাড়া, সে গলির মধ্যে ব্যানাজী ব্রাদার্স-এ ঢুকেছিল একবার, ব্লেড্ এবং টুথপেস্ট কিনতে; হতে পারে সে-সময় লোকটি গলি দিয়ে চলে গেছে, শিবতোষকে দেখতে পায় নি। এমনও সম্ভব, যে এসেছিল সে শিবতোষকে চেনে না, শিবতোষও তাকে চেনে না; ওরা একে অন্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়েও কেউ কাউকে চিনতে না পেরে পাশ কাটিয়ে হেঁটে গেছে। কিন্তু…কিন্তু…এইটুকু সময়ের মধ্যে লোকটি চলে গেল!

'এ যে কী হতচ্ছাড়া এক বাড়ি হয়েছে আমি বুঝতে পারি না।' শিবতোষ রাগ

করে বলল, 'বাড়িতে লোক এলে তাকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করতে পার না কেউ ?'
আয়নায় মুখ দেখে কমলা সামান্য পাউডার মেখে নিচ্ছিল, স্বামীর কথায় বিরক্ত হল ; বলল, 'তোমার মেয়েকে বল। আমায় শোনাচ্ছ কি !'
'যেমন মেয়ে তেমনি তুমি ।'
'আমি— ! আমি কি কলঘর থেকে তোমার লোক দেখতে ছুটবো !' কমলা রেগে গিয়েছিল। 'যা মুখে আসে বলো না, একটু ভেবে-চিন্তে কথা বল ।'
'ভেবেচিন্তেই বলেছি। মানুষ ছোটদের সব সময় শিক্ষা দেয়। তোমার ছেলে-মেয়েকে এমন শিক্ষা দিয়েছ যে, লোক এলে দুটো কথা জিজ্ঞেস করতে পর্যন্ত শেখে নি। ওআর্থলেস—!' রাগে ধিক্কারে শিবতোষ যেন আর কথা খুঁজে পেল না, চুপ করে গেল।
কমলা স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এমন অবুঝ মানুষ সংসারে আর হয় না। কোনোদিন ভাল করে কিছু বুঝবে না। বলল, 'দেখ, অত শিক্ষা-শিক্ষা করো না। তোমার শিক্ষা যদি ভাল তবে ছেলেমেয়েকে দয়া করে দিলেই পার শিক্ষাটা, কে তোমায় মাথায় দিব্যি দিয়ে বারণ করেছে !'
'তাই দিতে হবে।' শিবতোষ আলনা থেকে ধোয়া, কুঁচোনো কাপড় উঠিয়ে নিল।
'হ্যাঁ, দিয়ো। ছেলেমেয়ে তোমারও, আমি তাদের বয়ে আনি নি—'
শিবতোষ আর কথা বলল না ; বলার সাহস পেল না ; ইচ্ছেও হল না। মুখহাত ধুয়ে চলে গেল। যেতে যেতে শুনল, কমলা গজগজ করে বলছে, 'সাত বছরের কচি মেয়ে, সে বুড়ো লোকের মতো বুদ্ধি খেলিয়ে হাজার কথা জিজ্ঞেস করবে অচেনা মানুষকে, কী আমার কথা ! কে এসেছিল, কে এসেছিল করে পাগল হয়ে গেলেন ! যার আসার, দরকার থাকলে সে আবার আসবে নিজের গরজে, অত হাঁস-ফাঁস করার কি আছে !'
যে এসেছিল সে কিন্তু আর এলো না। শিবতোষ দুর্ভাবনায় থাকল, শতরকম অনুমান করল, কিন্তু সে এলো না। চিঠির চিন্তাটা আবার তাকে আচ্ছন্ন করে কেমন ঘোরের মধ্যে রেখেছে। বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে বললেও হয়। শিবতোষের কেমন সন্দেহ হয়ে উঠেছিল, এই লোকই সেই মানুষ, যে তাকে চিঠি লিখেছিল ; মাঠে দেখা করতে পারে নি বলে বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে দেখা করতে এসেছিল। অদ্ভুত লোক ; এলো, চলে গেল—কিছু বলে গেল না, আবার ফিরে এলো না। অশান্তি, বড় অশান্তির মধ্যে থাকল শিবতোষ এবং ক্রমাগতই বিশ্রী এক অস্বস্তি তাকে পীড়িত করতে লাগল। কেন লোকটা এ-রকম করছে, তার কী দরকার, আসব বলে আসে না, অসময়ে এসে ফিরে যায়—কেন, কেন, কেন ? শিবতোষ খুঁটিয়ে কত ভাবল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না, অনুমান করতেও পারল না।
শিবতোষ অসুস্থ উদাস এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল।

পাঁচ

বিকেল ফুরিয়ে আসার আগে আগেই আকাশে মেঘ জমেছিল। ঘন কালো সেই মেঘখণ্ড দেখে বোঝা যায় নি, তার পিছনে এক পাল ঝড়ো মেঘ হা-হা করে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে তারা এসে গেল, আকাশ আড়াল হল, ঘুটঘুটে অন্ধকার মতন হয়ে এলো, তারপর কালবৈশাখীর ঝড় নামল। এই বুঝি এ-বছরের প্রথম কালবৈশাখী। দাপট দেখে মনে হচ্ছিল, সারা বছর পরে রীতিমত সাড়া দিয়ে আসছে। ঝড়ের শেষে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির তলায় তলায় ঝড়ের ঝাপটা থেকে গেল।

আজ রবিবার। সকালে, একটু বেলায় শিবতোষকে যেতে হয়েছিল ভুবনের বাড়ি। শ্রাদ্ধকর্ম ছিল আজ। অফিসের সবাই ছিল; দোতলার ঘরে ভুবনের একটি ছবি বাঁধানো, কিছু ফুল। ধূপ পুড়ছিল। কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এসেছিল ভুবন এবং গৌরীর। কিন্তু কাজকর্ম যা করার অফিসের বিশু মিত্তির, প্রফুল্লবাবু, রাখাল —এরাই করছিল। কীর্তনের ব্যবস্থা ওরা করে নি। ভুবন একেবারে এ-কালের ছেলে ছিল, এ-সব সে পছন্দ করত না, ভালবাসত না। শর্মামশাই কয়েকটি ভগবৎ গান গেয়েছিলেন ওই ঘরে বসে, পুরোনো বাংলা গান।

গৌরীর সঙ্গে দেখা হতে শিবতোষ চোখ নামিয়ে নিল। নিজেকে ভীষণ অপরাধীর মতন লাগছিল। গৌরীর পরনে শ্বেতবস্ত্র, সমস্ত মুখটি সাদা পাথরের মতন। সিঁথিটি যে কী ভীষণ খাঁ খাঁ করছিল, যেন গৌরীর সমস্ত জীবন শূন্য হয়ে গেছে। শিবতোষ চোখ নামিয়ে নিয়ে আর উঠোতে পারছিল না। দু একটি কথা বলল গৌরী; শিবতোষ কোনো রকমে হুঁ হাঁ করল, সে কথা বলতে পারছিল না; দুটো সান্ত্বনার কথাও তার মুখে এলো না।

শ্রাদ্ধ থেকে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। মন যেন একটি দূর কোনো রিক্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমস্ত কিছু অর্থহীন অকারণ লাগছিল, বিধাতার নিষ্ঠুরতায় তার চোখের তলায় কোথায় যেন জ্বালা আর ঘৃণা অনুভব করছিল।

এমন অবস্থায় দুপুর কাটল, বিকেল গেল। তারপর ঝড় উঠল কালবৈশাখীর, বৃষ্টি নামল। অন্য দিনের তুলনায় আজ দ্রুত সন্ধ্যা নেমেছিল এবং বৃষ্টি ঝড়ে রাত ঘন ও বিষন্ন হয়ে এসেছিল।

শিবতোষ ঘরে শুয়ে ছিল। ছেলেমেয়েরা বড় হল্লা করছিল বলে নীচে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কমলাও নীচে রান্নাঘরে। বিছানায় অলসভাবে শুয়ে শিবতোষ মন অন্যমনস্ক করার জন্য প্রথমে রবিবারের কাগজটা তন্নতন্ন করে দেখেছে, পড়তে চেষ্টা করেছে, সামান্য কয়েকটা লাইন পড়ে ছেড়ে দিয়েছে; তারপর বিজ্ঞা-

পন দেখেছে ; সেটাও ভাল লাগে নি। কাগজটা ফেলে কমলার আনানো বাংলা উপন্যাস নিয়ে মন ভুলোতে গেছে, পারে নি। রিডার্স ডাইজেস্ট ? তাও না। একবার রেডিয়ো খুলেছিল, পল্লীমঙ্গল চলছে, বন্ধ করে দিয়েছে। চা খেয়েছে দুবার, পাঁচ-সাতটা সিগারেট পুড়িয়েছে, তবু এই বিষণ্ণতা তার বিন্দুমাত্র কাটল না। এখন বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে শিবতোষ। পাশের ঘর অন্ধকার। এই ঘরেও জোর বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছে, হালকা বাতিটা জ্বলছে। বাইরে বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে, ঝড়ের ঝাপটা আসছে মাঝে মাঝে।

শুয়ে শুয়ে শিবতোষ ছেঁড়া বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কত কথা ভাবছিল। কখনও ব্যক্তিগত কথা, কখনও এই বৃহৎ সংসারের কথা। জীবনের যে-সব উদাস চিন্তা মানুষকে নিঃসঙ্গ ও অতি দীন অনুভব করায়, এক সময় শিবনাথ তার চিন্তাও করছিল। সে ভুবনের কথা ভাবছিল, গৌরীর কথা ভাবছিল; নিজের কথা, বাবার কথা, সুরমার কথাও। এবং সে অফিসের কারও কারও কথা, যারা নেই, মৃত তাদের ও আজকের শ্রাদ্ধের কথাও ভাবছিল। শর্মামশাই যে গানগুলি গাইছিলেন, তার একটি গানের দুটি কলি ভাঙা ভাঙা ভাবে শিবতোষের মনে পড়ছিল : 'আঁখি তৃষিত অতি আঁখিরঞ্জন, আঁখি ভরিয়া মোরে দাও হে দেখা… !' সমস্ত চিন্তা একটি অন্যকে নিজের জগতে টেনে এনে এক জটিল অস্পষ্ট নীহারিকা-লোক যেন তৈরি করে রেখেছিল। শিবতোষ মৃদু অনুজ্জ্বল আলোয় এবং নিরিবিলি নিঃশব্দে ঘরে বিছানায় শুয়ে আধবোজা চোখে এই বিবিধ চিন্তায় যখন আত্মবিস্মৃত, বাইরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে ঝিরঝির করে, তখন হঠাৎ শুনতে পেল শব্দটা।

নীচে কে যেন কড়া নাড়ছে। খুব জোরে কেউ কড়া নেড়ে দিল। দু মুহূর্ত অপেক্ষার পরই শিবতোষ অনুমান করল, তাকে কেউ খুঁজতে এসেছে। আর পরক্ষণেই তার মনে হল, নীচে থেকে ওরা কেউ আগন্তুককে দরজা খুলে দেয় নি। হয়ত শব্দটা তাদের কানে যায় নি।

আচমকা এক ধরনের ভীত উত্তেজনা এবং বিহ্বলতার বশে শিবতোষ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। গলির দিককার বারান্দায় এলো দ্রুত পায়ে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, বাতাস বেশ উদ্দাম। গলির নীচের বাতিটা আজ খারাপ হয়ে আছে। অন্ধকার গায়ে মাখানো। কিছু দেখতে পেল না শিবতোষ। 'কে?' শিবতোষ ঝুঁকে পড়ল, চোখ যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ন করে দেখবার চেষ্টা করল। 'কে ? নীচে কে ?' বাতাসের ওপর গলা তুলে চিৎকার করার মতন করে ডাকল শিবতোষ। কেউ সাড়া দিল না।

পা সামান্য কাঁপছিল, বুকের মধ্যেও কাঁপছে, নিশ্বাসপ্রশ্বাস কিছুটা দ্রুত। শিবতোষ নীচে নেমে এলো। বাবুল আর টুলু পড়ার ঘরে বসে খাতা পাকিয়ে গোল করে মুখে ধরেছে, ধরে ঘোড়ার ডাক গাধার ডাক মুরগির ডাক-এর খেলা

খেলছে।

ওরা জানে না, কে কড়া নেড়েছে, ওরা শোনে নি। বাবুল বলল, 'কুকুর—একটা কালো রঙের কুকুর আছে না গলিতে বড়মতন, সে মাঝে মাঝে দরজায় এসে গা ঘষে।'

কমলা রান্নাঘরে, মিনু মার কাছে। ওরা কেউ বাইরে এলো না। বাবুল আর টুলু আবার শান্ত ও শিষ্ট হয়ে গিয়ে বইয়ের পাতা খুলল। শিবতোষ অবসন্নের মতন, যেন তার শেষ প্রত্যাশাও ব্যর্থ হয়ে গেছে, নিতান্ত হৃতসর্বস্ব চেহারা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো।

অলৌকিক কাহিনী অশরীরী মানুষের মতন ওই মানুষটি আসে যায়। ওর আসা অনুভব করা যায়, দেখা যায় না, বলা যায় না। মনের ভুল দিয়ে সে আসে কি? হয়ত আসে না।

শিবতোষ বুঝতে পারল না, আবার কবে সে আসবে? সে কে? সে কেমন?

অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল শিবতোষের। সে এক দুঃস্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের মধ্যে সে শিলাবৃষ্টিতে যথেষ্ট ভিজেছে এবং আহত হয়ে গেছে। খুবই আশ্চর্যের কথা, একটি মনোরম মন্দির ছিল সামনে তবু শিবতোষ শিলাবৃষ্টিতে সেই মন্দিরের দিকে যেতে পারে নি।

ঘুম ভেঙে গেলে দুঃস্বপ্নের অস্বস্তি এবং স্বেদ অনুভব করল শিবতোষ। গলার তলায় যথেষ্ট ঘাম হয়েছে। হাত ভিজে গেল। তবু, এখন অনেকটা স্বস্তি অনুভব করতে পারছিল। ঘর নিকষ-কালো; এক কণা আলো নেই কোথাও, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে? না।

শিবতোষ সোজা হয়ে শুল। মনে হল, পাশে কমলা শুয়ে আছে। ও-ঘরে বড় বিছানা পাতা থাকে, তিনটি ছেলেমেয়ে ঘুমোয়। কমলা মিনুর পাশে শুয়ে পড়ে কোনোদিন, কোনোদিন বা উঠে স্বামীর পাশে চলে আসে। মিনুও মাঝে মাঝে বাবার কাছে শুয়ে থাকে। আজ কমলা শুয়ে আছে। কমলা যে পাশে আছে, তাকে স্পর্শ না করেও বোঝা যায়। কেননা, কমলা ঘুমিয়ে পড়লেই প্রায় মিনুর মতনই তার একটা হাত স্বামীর বুকের কাছে মুঠো হয়ে থাকে। কী অদ্ভুত, এত বয়স হয়ে এলো, পঁয়ত্রিশ প্রায়, তবু ঘুমিয়ে পড়লে এখনও সে শিবতোষের বুকের কাছে গেঞ্জিটা মুঠো করে ধরে রাখে। এই অভ্যেস ছাড়ানো গেল না কমলার। বললে লজ্জা পায়, তারপর হেসে জবাব দেয়, 'বেশ করি; থাকবই তো ধরে। কি জানি বাবা, যদি পালিয়ে যাও!'

পালিয়ে যাবে শিবতোষ! কোথায়?

অন্ধকারে বড় দুঃখীর মতন দুদণ্ড নিশ্বাস নিল শিবতোষ। মনে হল, ঘরের

পাখাটা তেমন করে ঘুরছে না। এই পাখটা অনেক দিনের, বাবার আমলের। বিলাতী পাখা ; আজও কাজ দিচ্ছে। বাবার কথায় নিজের কথাও মনে এলো শিবতোষের। বিশ বছরের পাখা। তার বয়স যখন পঁচিশ-টচিশ, তখন বাবা কিনেছেন। হ্যাঁ, পাখা কেনার বছরেই শিবতোষ দেখতে পেল, মা মারা যাচ্ছে। বাবা মারা গেছে শিবতোষ যখন একত্রিশ বছরের, বত্রিশ বছর বয়সে শিবতোষ বিয়ে করেছিল, আজ তার বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে অনেকটা পিছু ফেলে আসা গেল। এবার—এবার একদিন···

কমলার হাতের মুঠো সরিয়ে দিতে গিয়েও শিবতোষ কেমন দুর্বল সহানুভূতি-ভরে, কোমল করে ও প্রেমভরে সেই মুঠো ধরে থাকল। কমলা বলে, তাকে পালিয়ে যেতে দেবে না।

আমার বুকের কাছের এক মুঠো গেঞ্জি ধরে তুমি আমায় আটকে রাখবে, কমলা! শিবতোষ কতকালের নিশ্বাস যেন বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকল, তারপর মনে মনে বলল, আমি ভুবনের মতন এই মুহূর্তে চলে যেতে পারি। তুমি মুঠো খুলবে যখন, তখন দেখবে আমি নেই।

শিবতোষ কেমন যেন এক ধরনের জলরাশির তলায় চাপা পড়ে গেল, তার চেতনার ওপর দিয়ে অদ্ভুত এক স্রোত বয়ে যেতে লাগল, নিঃস্বতার স্রোত। মনে হল, অখণ্ড কোনো শূন্যতার মধ্যে সে ভেসে যাচ্ছে। তার চতুষ্পার্শ্বে সে কোনো অবলম্বন বা আশ্রয় পাচ্ছে না। সে বড় একাকী।

শিবতোষ ভাববার চেষ্টা করল, সে কোথায় ছিল? কেন, এই সংসারে! মনে মনে জবাব দিল শিবতোষ। আজন্ম এই সংসারে সে আছে। কমলা, বাবুল, মিনু, টুলু, অফিস বাড়ি গলি মনিহারী দোকান···এ-সবের মধ্যে সে ছিল, সে রয়েছে।

কিছুটা সান্ত্বনা পেতে যাচ্ছিল শিবতোষ, হঠাৎ নিজেকে সতর্ক করে দিয়ে ধিক্কার দিল। না, সে এ-সবের মধ্যে নেই। তার থাকাটা ছায়ার মতন ; হ্যাঁ—এই থাকা ছায়ার অস্তিত্ব সদৃশ ; মিথ্যা নয় অথচ মিথ্যাই, আমি, আমি, আমি। তুমি কে শিবতোষ? তুমি এই সংসারে একান্ত অন্যের ছায়া। তুমি অন্য বস্তুর গুণে একটি মিথ্যা আকার পেয়েছ, যেমন কিনা আলো এবং বস্তু বিনা ছায়া হয় না। অতএব তুমি নির্গুণ এবং আলো ও বস্তুটিই প্রকৃত গুণ।

ভাল লাগল না। চিন্তাটা ভাল লাগল না শিবতোষের, মনঃপূত হল না। এই সংসারে সে আছে। কমলা, বাবুল, মিনু, টুলু—এদের মধ্যে সে আছে, সে এদের সঙ্গে বন্ধন ও একাত্মতা অনুভব করে। এদের সঙ্গে তার প্রতিটি দিনের গ্রন্থি, সুখ-দুঃখ, প্রেম, বেদনা, স্নেহ ও আশার বন্ধন। যদি আমি মিথ্যা হতাম, তবে এই বন্ধন সত্য হয় কী করে?

শিবতোষ যেন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পেরেছে ভেবে এবার কিছুটা স্বস্তি

পাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাকে স্বস্তি দিল না, বলল : ওরা যদি তোমার সর্বস্ব তবে তোমার এই অভাব, এই উদাস ভাব, অন্যমনস্কতা কেন ? কেন তুমি এমনি-ভাবে মাঝ-রাতে জেগে ওঠ ?

কেন শিবতোষ জেগে ওঠে সে কি জানে ? কেন সে কি জানে, কেন সে কোনো কোনোদিন প্রবল শিলাবৃষ্টিতে ভিজে এবং আহত হয়েও একটি আশ্রয় খুঁজে পায় না ? এই সুখ পাওয়াও কি তবে অভ্যস্ত অবস্থাব বাধ্যবাধকতা, কুকুরের জিবে জল আসার মতন তারও ইন্দ্রিয়ে সুখের জল আসছে।

এইসব এলোমেলো অগোছালো চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ শিবতোষের সেই চিঠির কথা মনে পড়ে গেল। চিঠিটা যেন উড়ে এসে এসে তার চোখের সামনে খুলে পড়ল। শিবতোষ একদৃষ্টে বুঝি চিঠিটার প্রেরককে খুঁজছিল।

অবিশ্বাস্য ভাবেই এখন শিবতোষের দুটি কথা মনে পড়ে গেল। চিঠির শেষে লেখা ছিল কথা দুটি। শিবতোষ স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছে সেই ছত্রটা : 'আমি আসব। আমার অপেক্ষা করো।'

শিবতোষ অনুভব করতে পারল, কোনোদিন সে আসবে, অতি অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু সে কেমন, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, শিবতোষ বুঝতে পারল না। শুধু শিবতোষ আজ এই মধ্যনিশীথে পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে সেই অবধারিতকে অনুভব করতে পারছে।



সোপান

প্রথম টাঙ্গায় বাবা, মা। পরেরটায় দিদি পুষ্প। শেষের গাড়িটায় আমরা দু'জন—হেমদা আর আমি। টাঙ্গায় ওঠার সময় হেমদাকে আমরা গাড়িতে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলাম একবার; পুষ্প রগড় করে বলেছিল, 'যান না, জোড় বেঁধে বসুন গে যান, এখানে কেন!' পালটা রসিকতা করে হেমদা বলল, 'দেখো ভাই, প্রত্যাশার জন্যে মানুষ সামনের দিকে চায়, আমি ও-গাড়িতে বসলে আমায় যে পিছু দিকে চাইতে হবে।' বলে হেমদা পুষ্পর চোখে চোখ রেখে হাসল। পুষ্প কথাটার মানে বুঝতে মুহূর্ত সময় নিল, তারপর হেমদার হাতে চিমটি কেটে দিল জোরে, বলল—'আ—হা!'

আমাদের টাঙ্গা তিনটে প্রায় ঘণ্টা খানেক হলো ছুটছে। বাবা-মা'র গাড়িটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে ভাল গাড়িটায় ওঁদের বসানো হয়েছে। ভাল গদি না হলে বাবা-মা'র কষ্ট হত। প্রথমত ওঁদের বয়স হয়েছে; দ্বিতীয়ত, বাবা আজ সাত-আট বছর নিজের অস্টিন গাড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত নন। আজকের এই হুজুগে আমরা ওঁদের জোর করে টেনে এনেছি।

দিদি আর পুষ্পর গাড়িটা মন্দের ভাল। ঝাঁকুনি দিদির সয় না। ভারী শরীরে টাল সামলাতে কষ্ট হয়, কখনো কখনো আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে। দিদিদের গাড়িটাকে তাই ধীরেসুস্থে চালাতে বলে দেওয়া হয়েছিল। ওরা আমাদের খানিকটা আগে আগে যাচ্ছে।

শেষের গাড়িটা একেবারে লঝ্ঝড়। যেমন গাড়ি, তেমনি ঘোড়া। নড়বড়ে শরীরে শব্দ করতে করতে, আমাদের দু'জনকে কখনো ডাইনে টলিয়ে দিয়ে, কখনো বাঁয়ে হুমড়ি খাইয়ে গাড়িটা চলেছে। হেমদা মাঝে মাঝে বলছে, 'অন্তু, নার্ভাস হয়ো না; মহাপ্রস্থানের পথের এটা প্রাইমারি প্রিপারেশান।'

আমরা পঞ্চপাণ্ডব নই, মহাপ্রস্থানেও যাচ্ছি না। আমরা মজুমদার ফ্যামিলি। সুরেশ্বর মজুমদার, তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র এবং জামাতা—এই মিলিয়ে আমরা ছ'জনে একটি গোটা পরিবার আপাতত চলেছি একটি স্তম্ভ দেখতে; প্রাচীনকালের স্তম্ভ।

শীতের রোদ খুব ঘন এবং হলুদ হয়ে এসেছে; যেন সকাল থেকে নীল অনন্ত আকাশে মাঘের রোদ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, ফুটে ফুটে এখন তা ঘন ও ঠান্ডা হয়ে পুরু একটা সর পড়ে গেছে রোদের। দুপুর শেষ হতে চলল। পাহাড়ী বনপথের মেঠো রাস্তা ধরে আমাদের টাঙ্গা তিনটে ছুটছে; ঘোড়ার গলায়-বাঁধা

ঘণ্টির মালা ঝুনঝুন শব্দে বাজছে সর্বক্ষণ ; মনে হবে আমরা যেন কোনো প্রাচীনকালের তীর্থযাত্রী।

এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, তা যেন পাহাড়তলীর মতন। নির্জন, নিস্তব্ধ। চোখ মেলে দেখেছি, কোথাও ঢালু জমি নদীর চরের মতন আদিগন্ত ছড়ানো, ছোট বড় পাথরের বিক্ষিপ্ত স্তূপ, ঝোপঝাড় ; কখনো চোখ পড়েছে অরণ্যের হরিৎ-শ্যাম পটচিত্র, আকাশ-মাটির মাঝখানে দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কখনো উত্তরে—দূরান্তে পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছি, রৌদ্রকিরণ এবং মেঘপুঞ্জের জন্য তার মাথায় ধোঁয়ার জটা। কদাচিৎ একটি গ্রাম, কাঠুরিয়ার বয়েলগাড়ি এবং ছোলার ক্ষেত চোখে পড়ছিল।

হেমদা বলল, 'অন্তু, আমরা বেরাস্তায় চলে আসি নি তো ? কোথায় সেই কেপ অফ্ গুড হোপ ! চোখে পড়ছে তোমার ?'

হেমদা যেদিন থেকে এই স্তম্ভটার কথা শুনেছে সেদিন থেকেই ওটাকে 'কেপ অফ্ গুড হোপ' বলে আসছে। আমি অনেকবার বলেছি, 'তুমি কেপ পাচ্ছ কোথায়, হেমদা ! ত্রিপাঠীবাবুর কথামতন ওটা টাওয়ার অফ্ গুড হোপ বলতে পার।' দিদি বলেছে, 'সোজাসুজি মিনার বলো না, বাপু ! যা বুঝছি তাতে ওটা মনুমেণ্ট কি মিনার-টিনার হবে।' দিদির কথায় পুষ্প আর হেসে বাঁচে নি, বলেছে, 'শুনেছ ওটা কোন আদ্যিকালের সৃষ্টি, লোকে তখন মিনার-টিনার বুঝত না। তার চেয়ে এরা যা বলে তাই বলো।'

এরা যা বলত তাতে আমরা কৌতুক বোধ করতাম। এরা বলত 'মনদির'। সরল, দেহাতী মানুষগুলোর কাছে ইটের ঢিবি মাত্রেই মন্দির। ত্রিপাঠীবাবু অবশ্য বলেছিলেন, অনেকে একে 'নভস্তি' বলে। কথাটা আমরা বুঝি নি প্রথমে, পরে বুঝলাম : কোনো কালে কেউ সংস্কৃত ভাষায় বুঝি বলেছিল নভে অস্তি, তাই থেকে নভস্তি। অর্থাৎ মিনার চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে, শূন্যে ভাসছে। ত্রিপাঠীবাবু আমাদের নভস্তির গল্পটা শুনিয়েছিলেন। তার কাছে। পুষ্প শুনেছিল মতিয়ার কাছে।

মতিয়া এ বাড়ির চাকর, এখানকারই লোক। আমরা আজ পক্ষকাল এখানে। সপরিবারে বেড়াতে এসেছি। ব্যবসাসূত্রে বাবার পরিচিত কেউ তাঁকে এই স্বাস্থ্যকর নির্জন জায়গাটির কথা বলেছিলেন। বাড়িও তিনি যোগাড় করে দিয়েছেন। এসে পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে ভোগ করতে হয় নি। বাবা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, মা সংসার দেখছিলেন, আর আমরা চারজনে হেমদা, দিদি, পুষ্প আর আমি—এখানের প্রচণ্ড শীতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে, নদী ও ঝরনা দেখে, হাটমাঠ করে, খেয়ে ঘুমিয়ে, তাস খেলে দিন কাটাচ্ছিলাম। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন এই মনোরম, নির্জন ও নির্বান্ধব জায়গাটি ভাল লাগলেও ক্রমশই

আমরা উত্তেজনাহীন হয়ে উঠছিলাম। হেমদা না থাকলে হয়ত এত নির্জনতা সহ্য করা যেত না।

এমন সময় একদিন মতিয়ার কাছে এক গল্প শুনে পুষ্প বলল, 'এখান থেকে খানিকটা দূরে এক মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মাথায় চড়লে একেবারে স্বর্গ।... চলো, একদিন স্বর্গ বেড়িয়ে আসি।'

হেমদা বলল, 'স্বর্গের জন্যে বাইরে ছুটব কেন ভাই, আমার হাতের কাছে ডবল স্বর্গ রয়েছে।'

পুষ্প ছুটে এসে হেমদার মাথার চুল ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল; বলল, 'ইস্—মানুষের একটা হয় না, আপনার আবার ডবল।'

হাসি-তামাশার মধ্যে পুষ্প আমাদের কাছে মতিয়ার কাছে শোনা গল্পটা বলল। শুনে আমরা হেসে বাঁচি না। কোন্ এক রাজা নাকি রামজীর বড় ভক্ত ছিল, বহু-কাল সুখে শান্তিতে রাজত্ব ও প্রজাপালন করে শেষে বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করল। রামভক্ত সেই ধার্মিক রাজা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, সাধনভজন করে, তার সঙ্গে না আছে পাত্রমিত্র না সৈন্যসামন্ত। ঘুরতে ঘুরতে রাজা একদিন এলো মহাদেও পর্বতমালার কাছে; চেয়ে দেখলে বিরাট পর্বত, আকাশ ছাড়ানো মাথা; ভাবল এই পাহাড় বেয়ে সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতন এবার স্বর্গে চলে যাবে। পাহাড় চড়া শুরু হলো তার। রাজা বড় ভুল করে-ছিল, পাহাড়ে চড়ার আগে পুজো দেয় নি পর্বতের, তাই পর্বত তাকে নিল না, ফেলে দিল। রাজার পা গেল ভেঙে, হাত ঠুঁটো হল। তখন সেই অক্ষম রাজা রামজীকে ডেকে বলল: 'আমি চিরকাল তোমার পুজো করে এসেছি, আর কারও পুজো করব না; তুমি আমায় স্বর্গে ওঠার পথ যদি করে দাও তবে যাব, নয়ত পড়ে থাকব এইখানে।' রামজী তখন ওই মন্দির করে দিলেন—ভক্তের জন্যে; বললেন: 'তোমার ভাঙা হাত-পা নিয়েই তুমি ধীরে-সুস্থে ওই সিঁড়ি ধরে উঠে আসবে। তোমার জন্যে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু মন্দির বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মন্দিরে ঢুকলে আর ফিরতে পারবে না।' রাজা তখন রামজীর পুজো করে ওই মন্দিরে ঢুকল, তারপর আর মন্দিরের বাইরে আসে নি।

হেমদা হেসে বলল, 'রামচন্দ্রের অপার মহিমা। সাগর বাঁধতে পারেন, আর রাবণের ওপর টেক্কা মেরে স্বর্গের সিঁড়ি করতে পারবেন না!...যাই বলো, এইসব সরল মানুষের ইমাজিনেশান বড় সাদামাটা, কিন্তু সুন্দর।'

আমরা একদিন ত্রিপাঠীবাবুকে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: রামজী-টামজী না ভাইয়া, কোই হিন্দু রাজা ওটা বানিয়েছিল। দুসরা এক কিস্‌সা আছে, শুনুন।

ত্রিপাঠীবাবুর গল্পে ইতিহাসের একটু গন্ধ ছিল, যদিও তা কাহিনী। এক হিন্দু

রাজার তৈরী ওই নভস্‌্তি ; কি তাঁর নাম, কিবা তাঁর পরিচয়, আজ আর জানা যায় না। কিংবদন্তী বলে, তিনি ছিলেন সাহজাহান বাদশার সমসাময়িক। রাজা আবার স্বয়ং একজন দক্ষ স্থপতি। একবার তিনি তাঁর অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী যুবতী মহিষীকে সঙ্গে করে মহাদেব পর্বতমালায় পুজো দিতে এসেছিলেন। ফেরার পথে রাজারানী বনাঞ্চলে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অপরাহ্ন বেলা, অদূরে তাঁর সৈন্যসামন্তরা ক্লান্তি বিনোদন করছে, বসন্তকাল, বনভূমি নব পত্রপল্লবে সজ্জিত, রাজার এই স্থানটি নয়নে ধরে গেল। রানীও বিমোহিত। রাজা রানীকে বললেন, তোমার সৌন্দর্যের স্মৃতিতে এখানে একটা কিছু গড়ে দিতে চাই, বলো কি ইমারত গড়ব ? রানী বললেন, আমার দুটো শর্ত আছে, যদি শর্ত রাখেন, তবে প্রার্থনা জানাই। রাজা হেসে বললেন, রাখব শর্ত। তখন রানী দুই শর্ত দিলেন। রাজাকে স্বহস্তে একটি মিনার তৈরী করে দিতে হবে ; আর দ্বিতীয় শর্ত—যতদিন না রানী সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, তিনি তৃপ্ত, ততদিন রাজাকে মিনারের উচ্চতা বাড়িয়ে যেতে হবে।...রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন, রানীর ইচ্ছা মতনই কাজ হবে।...তারপর ওই নভস্‌্তির কাজ শুরু হলো, রাজা নিজে নকশা বানালেন মিনারের, তদারকি করতে লাগলেন কাজের আর মিনারের মাথা তুলতে লাগল। মিনারের একটি করে তল শেষ হয়, রাজা নিয়ে আসেন রানীকে, দু'জনে উঠে এসে দাঁড়ান শেষ চত্বরে। রাজা শুধোন, তুমি তৃপ্ত ? রানী বললেন—না ; তিনি তৃপ্ত নন। আবার মিনারের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়, রানী ফিরে যান রাজপুরীতে। এমনি করে সাত বছরে সাতটি চবুতর বা তলা তৈরী হল। রানী আসেন, শীর্ষে উঠে দেখেন চারপাশ, তারপর তিনি মাথা নেড়ে বলেন, তিনি এখনো তৃপ্ত নন। আস্তে আস্তে বছর যায়, রাজা বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়েন, রানীও বিগতযৌবনা। অবশেষে রাজা শেষ তল তৈরী করে রানীকে ডেকে পাঠালেন। তারপর দুজনে মিনারের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর ফিরে আসেন নি। বা রাজা তাঁকে ফিরতে দেন নি।

'আর রাজা ?' আমি ত্রিপাঠীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ত্রিপাঠীবাবু বলেছিলেন, 'ভাইয়াজী, রাজাভি নেহি লোওট আয়া। মালুম মনোরথ পূরণ হো গ্যয়া, সুখ মিলা, শান্তি মিলা।'

কাহিনী শুনিয়ে ত্রিপাঠীবাবু বলেছিলেন, আমরা যখন বেড়াতেই এসেছি, তখন একবার ঘুরে যাই না কেন নভস্‌্তি। গল্পকথায় কত কি থাকে, তাতে কি যায় আসে ! 'আগর যাইয়েগা তো বহুৎ আনন্দ মিলে গা, আসমান উঁচা ওহি নভস্‌্তি ; অন্দর ভি ভারী মনোরম।'

হেমদা জিজ্ঞেস করল, 'লোকে বেড়াতে যায় না ? মিনারে চড়ে না ?'

ত্রিপাঠীবাবু বললেন, 'কেউ কেউ যায় বটে। এখানকার কথা ক'জন আর জানবে বলুন ! তবে যারাও মিনারে চড়তে যায় তারাও সামান্য উঠে ফিরে আসে, ভয়

পায়, ঠকে যায়।'

ত্রিপাঠীবাবুর গল্প শোনা হয়ে গেলে আমরা অন্য কোথাও কিছু দেখতে যাবার মতন না পেয়ে ওই নভস্যূতি দেখতে যাওয়া স্থির করলাম।

হেমদা বলল, 'কত আর উঁচু হবে—, গল্পের গরু গাছে ওঠে। আর যদি একটু উঁচুই হয়—ক্ষতি কি—ঘষড়ে-টষড়ে উঠে যাব, তারপর না হয় বিছানায় শুয়ে পায়ে তেল মালিশ চালাব। চলো পুষ্প, মনস্কামনা পূর্ণ করে আসি। টপে চড়লে তো আর তোমায় আমায় ফিরতে হবে না।' হেমদা হাসতে লাগল।

দিদি হেসে বলল, 'আমায় বাপু তা বলে ঠেলে ফেলে দিও না।' হাসিশেষে দিদির মুখে একটু-বা লুকানো বিষাদ নামল।

আমরা আজ ছ'জনে—সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর পরিবারবর্গ—মাঘের দুপুরে টাঙায় চড়ে সেই মিনার দেখতে যাচ্ছি। বাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না যাবার, মা-ও নিমরাজী ছিল। আমরা একরকম জোর করেই তাঁদের দলে টেনেছি। এই ভ্রমণ অন্তত তাঁদের খারাপ লাগার কথা নয়।

হেমদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'অন্তু, ওই যে—ওই, নর্থের দিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ!'

উত্তরের দিকে তাকিয়ে আমি একটি ধূসর মিনার দেখতে পেলাম।

দুই

আমবা মিনারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। টাঙা তিনটে চড়াইয়ের নীচে। এতক্ষণে সূর্য হেলে পড়েছে; পশ্চিমের দিকে সামান্য একটি চালা। ওই চালার সামনে একটি গ্রাম্য কূপ। অল্প তফাতে বুঝি একটি গ্রাম আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রাম। চালাবাড়িতে কেউ ছিল না, ঘরের মধ্যে একটি ধুলোভরা খাতা, কয়েকটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি পড়ে আছে। টাঙ্গাঅলারা বলেছিল, আপনারা যান, আমরা দারোয়ানকে ডেকে আনছি।

মিনারের চারপাশে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাবা বললেন, 'পুরনো টাওয়ার তবে খুব পুবনো নয়। শ' দুই-আড়াই হতে পারে।'

মা বলল, 'জায়গাটি বড় নিরিবিলি। মন জুড়োয়।'

পুষ্প মাথা তুলে হাঁ করে মিনারের চূড়া দেখছিল, বলল, 'দাদা দেখ, মনে হচ্ছে মিনারের মাথাটা হেলে পড়ছে, এক্ষুণি হুড়মুড় করে আমাদেব ঘাড়ে পড়বে।'

হেমদা বলল, 'ইলিউসান অফ ভিসান।'

সুবিশাল মিনার, তলার দিকটা জরাজীর্ণ দেখায়, ফাটলে-ফোকরে গুল্ম ও লতা-পাতা, চাপড়া ঘাস। মাথা তুলে মিনারের উচ্চতা দেখে আমার মনে হল না, স্থানটি

অনধিগম্য। শীতের আকাশ আরো নীল, আরো স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, একটি হালকা মেঘখণ্ড চূড়ার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। হুহু বাতাস বইছে। বনানীর গন্ধ সেই বাতাসে।

লোকটা এলো ; এখানকার তদারকি করে ; প্রায়-বুড়ো। বোঝা গেল, পিছনের গ্রামটিতে থাকে, কদাচিৎ কোনো ভ্রমণকারী এসে পড়লে তার চালাঘরের খাতাটি দেখায়, মোমবাতি বেচে। আমরা মোমবাতি নিলাম না, হেমদা টর্চ এনেছিল সঙ্গে করে। মিনারে ঢোকবার সদর দরজাটির তালা সে খুলে দিল। বিশাল দরজা, বিরাট তালা।

হেমদা পরিহাস করে বলল, 'ভেতরে ভয়ের কিছু নেই তো ? সাপখোপ ?'

মাথা নাড়ল বুড়ো, বলল, 'অত উঁচুতে সাপ-খোপ যাবে কি করে ! সাপ নেই, ভালুলু নেই। মিনারের নীচুর দিকে পাখির বাসা, পাখি দু'চারটে থাকতে পারে, পতঙ্গ দু' পাঁচটা।'

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হেমদা হাসিমুখে আবার শুধলো, 'ওপরে উঠতে কতক্ষণ লাগবে জী ?'

বুড়ো হেমদাকে দেখল কয়েক পলক, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে মিনার দেখাল, নাকি আকাশ, বলল, 'রামজীকে মালুম।'

বাবা দরজা দিয়ে প্রথমে ভেতরে গেলেন, তারপর মা ; দিদি গেল, পুষ্প গেল ; হেমদা আমায় ঠেলা দিল, আমি হেমদাকে আগে এগুতে দিয়ে পরে একবার বাইরের দৃশ্যাবলী এবং সেই বৃদ্ধের মুখ চকিতে দেখে নিয়ে মিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।

বাইরের অফুরন্ত আলো এবং রোদ থেকে বন্ধগৃহে আসায় সহসা মনে হল সমস্ত আলো দপ করে নিবে গেছে। অন্ধকার যেন অভেদ্য। সামান্য সময় আমরা নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি যথাসাধ্য চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক করে যখন এই অন্ধকার সইয়ে নিচ্ছি তখন আমার মনে হল, আমার এবং হেমদার, হেমদা এবং দিদির, বাবা মা পুষ্প—আমাদের সকলের মধ্যে কেমন একটি ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে, আমরা প্রত্যেকেই পৃথক। অদ্ভুত কোনো অন্ধকার যেন আমাদের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে।

বাবা সামান্য কাশলেন, তারপর পা বাড়ালেন ; তাঁর হাতে ছড়ি ছিল, ছড়ির শব্দে বুঝলাম, তাঁর চোখে এই আকস্মিক অন্ধকার সয়ে গেছে, তিনি এগুতে শুরু করেছেন।

মা, দিদি, পুষ্প একে একে এগিয়ে যেতে লাগল। আমার চোখে অন্ধকার সয়ে গেল ; বাবা, মা, হেমদা—সকলকেই দেখতে পেলাম। যে অন্ধকার অভেদ্য মনে হয়েছিল, সে অন্ধকার যে কিছু না, নিতান্ত দৃষ্টিবিভ্রম, এখন তা অনুভব করে

খুব সহজেই পা বাড়ালাম।

বাবা, মা, দিদি, পুষ্প—সকলেই কথা বলছিল। আমরা সামান্য এগিয়ে যেতেই আলো পেলাম, নীচের বৃহৎ গোল চত্বরটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হল।

হেমদা বলল, 'অন্তু, কীভাবে ভিত তুলেছে, দেখেছ! কত বড় সারকামফারেন্স! মনে হচ্ছে যেন বিরাট একটা গোল পুকুর কেটে বেঁধেছে।'

বাবা সামান্য কাশছিলেন, দিদিও গলা পরিষ্কার করছিল। নীচের বাতাস বড় ভারী, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কত কালের বাতাস যেন এখানে চুপ করে বসে বসে নিজেকে ক্রমশ একরকম প্রাচীন গন্ধ দিয়েছে, যে-গন্ধ আলোয় ও বাতাসে পরিশুদ্ধ নয়।

বাবা আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন, পাশে মা, মা'র প্রায় গা ঘেঁষে দিদি। আমার পেছনে।

দিদি বলল, 'বাবা তোমার কষ্ট হচ্ছে!'

'হয়েছিল একটু, এখন সয়ে আসছে।'

'দেখতে পাচ্ছ? টর্চ দিতে বলব?'

'এখন পাচ্ছি। ওপর থেকে আলো আসছে।'

ওপর থেকে আলো আসছিল। আমরা প্রথম সোপানের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

'জামাইবাবু—' পুষ্প ডাকল।

'বলো,' হেমদা জবাব দিল।

'সিঁড়ি গুনবেন নাকি?'

'ওঠার সময় নয়।'

'কেন!'

'ওপরে ওঠার সময় কখনো শেষ দেখতে নেই, উদ্যম নষ্ট হয়,' হেমদা হালকা গলায় বলল। সিঁড়িও গুনতে নেই ঠিক ওই কারণে।'

বাবা সোপানে পা দিয়েছেন, মা বলল, পারবে তো?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে পারব না?' বাবা কেমন গলায় যেন বললেন।

মা বোধ হয় একটু লজ্জা পেল। 'অভ্যেস তো নেই। আস্তে ওঠো।'

'আমি ঠিক উঠব। তুমি সামলে এস।' বাবা যেন অনেকটা আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজের আরোহণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন। তারপর সামান্য বুঝি পরিহাস করে দিদিকে বললেন, 'রেণু, তোমার মা'র একটা হাত ধরো।'

দিদি বোধহয় মা'র হাত ধরতেই যাচ্ছিল, মা বলল, 'ছাড়, এত চওড়া সিঁড়ি, সবাই উঠছে আর আমি পারব না!'

বাবা মা দিদি সোপানে উঠছে, আমরা পিছু পিছু। আশ্চর্য, প্রথমে যখন ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন এই কূপসদৃশ বদ্ধ ইমারতের কোনো দিশে পাই নি। এখন

আমাদের সামান্যই অসুবিধে হচ্ছে। সোপানের ধাপগুলি মিনারের গা বেয়ে বুঝি চক্রাকারে ওপরে উঠে গেছে। ক্রমশই অনুভব করছিলাম, কয়েকটি চক্রাকার সিঁড়ির আবর্তের পর একটি করে তল ; অনুমান করতে পারছিলাম, প্রতি তলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার পথ ও অলিন্দ আছে, কেননা আমরা বাইরে থেকে প্রাচীর দেওয়া অলিন্দ দেখেছি। গবাক্ষ, ঘুলঘুলি ও অলিন্দ-পথে আলো আসছিল।

'হেমদা—' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে খানিকটা উঠে গেলে আলো-বাতাসের কমতি হবে না।'

'হওয়া উচিত না,' হেমদা বলল। 'দেখে তো মনে হয় উলটোউলটি জানলা মাথা-বরাবরই আছে।'

আমাদের গলার স্বর সামান্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। হয়ত এই শূন্য এবং বিশাল ইমারতের মধ্যে ঢোকার পর আমরা ক্রমশই নিজেদের অজ্ঞাতে আমাদের গলার স্বর উচ্চ করছিলাম। বন্ধ এবং জনশূন্য বড় ঘরে যেমন শব্দ সামান্য প্রতি-ধ্বনিত হয়, আমাদের কথাগুলিও আপাতত সেই রকম প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছিল।

পুষ্প বলল, 'আমি সেই রাজার কথা ভাবছি, বেচারা রাজ্যের পাথর গাঁথতে গাঁথতে বুড়ো হয়ে গেল!'

'রাজপ্রাসাদে বসে থাকলেও বুড়ো হতো', হেমদা জবাব দিল।

'হলেও বা, কিন্তু এই পাথর গেঁথে সময় নষ্ট কেন!'

'আমাদের কাছে পাথর, যে করেছিল তার চোখে হয়তো পাথর ছিল না।'

হেমদার কথায় খুব আচমকা আমার কেমন যেন এক বুদ্ধিভ্রম হল। মনে হল, আমরা বাস্তবিক একটি প্রাচীন জরাগ্রস্ত স্তূপ অতিক্রম করছি না। রানীর কথা আমার মনে পড়ল : আশ্চর্য সেই রাজমহিষী! রাজার সঙ্গে তিনি কি শুধু কথার খেলা খেলেছিলেন? কি অভিপ্রায় ছিল তাঁর? কেন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি? মনে মনে আমি সেই উপকথার একটি ছবি তৈরী করে নেবার চেষ্টা করছিলাম।

বাবার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁর গলার স্বর গম্ভীর শোনাচ্ছিল। বাবা মাকে বলছিলেন, 'ছেলেবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম। আমাদের ওখানে একটা চাঁদমারি ছিল, বড় টিলার মতন, আমরা নীচের মাঠ থেকে ছুটে এসে এক দমে সেই চাঁদমারি উঠতাম। যে আগে উঠত সেদিনকার মতন চাঁদমারিটা তার দখলে যেত। চাঁদমারি ছিল আমাদের কেল্লা আর কি!' বাবা হাসলেন।

মা'র মাথার কাপড় পড়ে গিয়েছিল, কাপড়টা তুলতে তুলতে মা হাসির গলায় বলল, 'তুমি ক'দিন কেল্লা পেতে?'

'প্রায়ই পেতাম। আমার খুব দম ছিল।' বলে বাবা থামলেন ; তারপর আমাদের সকলের সামনে রহস্য করে মাকে বললেন, 'আমার দমটা বড় বুকের, তুমি তে

জানোই।'

দিদি বাবার একটু বেশীরকম প্রিয়। বাবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে দিদির বাধে না। বাবার কথা শুনে দিদি হেসে বলল, 'তুমি এমন করে বলছ-না বাবা, যেন এখনো আমরা সবাই মিলে ছুটলে তুমি সবার আগে ওপরে উঠে যাবে!'

বাবা এবার জোরে জোরে হাসলেন। তাঁর হাসি যখন প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, তখন তিনি হঠাৎ নিজের কানে সেই শব্দ শুনতে শুনতে থেমে গেলেন। তারপর ডান দিকে ফিরে চওড়া মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'এস তবে, দেখ—। এ-পর্যন্ত আমি পেঁৗছেছি, তোমাদের আগে আগেই।'

সিঁড়ি ঘুরে আমরা একে একে মিনারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাঁধানো চত্বর, বুক সমান পাঁচিল তোলা। শীতের মধ্যাহ্ন ফুরিয়ে এলো। রোদ অনেকটা যেন দোপাটি ফুলের রঙ নিয়েছে, তার তাত মরে এসেছে। এতটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে চারপাশ স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন ছবির মতন দেখাচ্ছিল। দূরে আমাদের সেই তিনটে টাঙা, ঘোড়াগুলো মাঠে চরছে, প্রান্তর এবং তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে রোদ আলস্যভরে শুয়ে আছে, শীতের বাতাস বইছিল; দূরে পাহাড়, একটি মেঘ আপন মনে ভেসে চলেছে। কয়েকটি বুনো বক শূন্যে বিচরণ করছিল।

হেমদা ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে তিনটে। পুষ্পর কাঁধে জলের বোতল। আমার হাতে চায়ের গোল ফ্লাস্ক। হেমদার ঘাড়ে মস্ত একটা থলি ঝুলছে, তার মধ্যে পুরনো খবরের কাগজ, টর্চ, কমলালেবু, বিস্কুট, আরও কত টুকটাক।

পুষ্প জল খেল কয়েক ঢোঁক। দিদির হাতে মা'র পানের কৌটো, মা পান খেলেন। হেমদা আমাদের কমলালেবু দিল। লেবুর খোসা ছাড়িয়ে আমরা নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

দিদি বলল, 'আরো খানিকটা ওপরে উঠে চা খাব।'

আমরা ঊর্ধ্বমুখে মিনারের চূড়া দেখলাম। মাথার ওপরকার তলাগুলি ঠিক বোঝা যায় না, বাইরের বাঁধানো গোল অলিন্দে আড়াল পড়ে যায়। দিদি বললে, আরো চার; পুষ্প বলল, পাঁচ; আমার মনে হল আরো বেশী।

বিশ্রাম শেষ হলে বাবা বললেন, 'নাও, চলো। শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।'

আমার মনে হল বাবার পক্ষে এই সিঁড়ি ওঠার পরিশ্রম হয়তো বেশী হচ্ছে। শরীর খারাপ হতে পারে। বললাম, 'তুমি আরো উঠবে?'

বাবা আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এক এক সময় আমি অত্যন্ত প্রখর এক সংকল্প অনুভব করি। মনে হল, বাবা সেই রকম দৃষ্টিতে আমায় দেখলেন। তারপর বললেন, 'চলো, দেখি।'

আমরা আবার মিনার অভ্যন্তরে একে একে প্রবেশ করলাম।

আলো এবং ছায়ার মধ্য দিয়ে সোপান অতিক্রম করে আরো খানিকটা উঠে এলাম। ধুলো মাটি, পাখির গায়ের বাসি গন্ধ, জীর্ণতার ঘ্রাণ প্রায় আর ছিল না। সিঁড়িগুলি এখনো চওড়া, তবে মনে হল ক্রমশই তার দৈর্ঘ্য কমে আসছে। বাবা সামান্য দেরী করে করে পা ফেলছিলেন। মা একবার দিদির হাত ধরে ফেলেছিলেন, ভেবেছিলেন সিঁড়িতে হোঁচট লেগেছে, আসলে মা'র পায়ে শাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্য ক্রমশই হেলে যাচ্ছে বলে রোদের কেমন গোল ও চৌকোনো কিরণ মিনারের ঘুলঘুলি ও ঝরোকা পথে সোজাসুজি দেওয়ালে গিয়ে পড়ছিল। আর আমাদের কণ্ঠস্বর এখন প্রতিধ্বনিত হতে হতে নীচে এবং ওপরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পুষ্প খেলাচ্ছলে কয়েকবার অ—আ করে ডেকেছে, এবং তার ডাক অধঃ এবং ঊর্ধ্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বাবা এক সময় বললেন, 'তোমাদের উচিত ছিল আরো একটু বেলাবেলি আসা।'

দিদি বলল, 'আর কত বেলাবেলি আসব। দুপুরেই তো এসেছি।'

'আলো পড়ে গেলে অসুবিধে হবে।'

'আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে।'

'তোমরা শেষ পর্যন্ত উঠবে ঠিক করেছ ?'

'হ্যাঁ, নয়তো আসা কেন !'

'পারবে তো ?'

দিদি কিছু বলার আগেই হেমদা বলল, 'এমন কিছু উঁচু নয়, না পারার কিছু নেই।'

বাবা সামান্য চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'ওপরের দিকের সিঁড়ি কেমন তা তো জান না !'

হেমদা কোনো জবাব দিল না। যেন বাবার এই সন্দেহ সম্পর্কে কিছু বলা নিরর্থক ; আমরা বুঝতে পারছিলাম, বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি আর বেশী উঠবেন না, ওঠা সম্ভব নয়। আরো সামান্য কিছুটা উঠতে পারলে বাবা বিশ্রামের স্থান পাবেন ভেবে আমরা কোনো উদ্বেগ বোধ করলাম না। তাঁকে বিব্রত বা ব্যস্ত না করার জন্যে আমরাও ধীর পায়ে সোপান উঠছিলাম। সকলেই নীরব তখন, আমাদের পায়ের শব্দ, বাবার ছড়ির শব্দ, স্থূল একটি আলোর বৃত্ত বাবার মাথার ওপর, বাবা সামান্য পরে সেই আলোর বাইরে চলে গেলেন, দিদি একবার ঘাড় ফিরিয়ে মাকে যেন দেখল।

এই স্তব্ধতা আমাকে কাতর করছিল। কেন জানি না যেসব কথাগুলি এতক্ষণ আমাদের ছ' জনের মধ্যে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল, যেন সেই হাত আমরা ছাড়িয়ে নিয়েছি কিংবা শিথিল করেছি—এই রকম মনে হওয়ায় আমি অধৈর্য হয়ে কথা বললাম।

'হেমদা, তোমার গরম লাগছে ?'
'সামান্য।'
'কোটটা খুলে ফেললে হয়।'
'চলো, ওপরে গিয়ে দেখব।'
পুষ্প ডাকল, 'জামাইবাবু—'
'বলো।'
'সেই রানী এই সিঁড়ি কেমন করে উঠত ?'
'তুমি যেমন করে উঠছ।'
'আমার তো হাঁটু ব্যথা করতে শুরু করে দিয়েছে।'
'তবে আর কি, থেকে যাও।'
'ইস রে, এত সহজে! চলুন না, শেষ পর্যন্ত কে থাকে কে যায় দেখব।'
'তাই ভাল—' হেমদা গলার স্বর খুব নীচু করে বলল, 'তুমি আগে আগে থাকলে আমি প্রেরণা পাব।'
পুষ্প যেন বলার কথা পেল না কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'আর আমি কি পাব ?'
ওরা কেউ এবার হাসল না।
এ-সোপান শেষ হল। বাবা প্রশস্ত স্থানটি দিয়ে বাইরে এলেন। মা, দিদি, হেমদা, পুষ্প এবং আমিও। অনেকক্ষণ পরে আবার মুক্ত আলো-বাতাসে চোখ মেলে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বাবা হাঁপাচ্ছিলেন, মা'র কপালে ঘামের বিন্দু। দিদি মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছিল। বাইরে এখনো রোদ, মোলায়েম এবং নিষ্প্রভ সেই আভায় চতুর্দিক ঈষৎ আর্দ্র দেখাচ্ছে যেন ; মাঠে আমাদের অলস ঘোড়াগুলি দাঁড়িয়ে, টাঙাঅলারা কুয়ায় জল তুলছিল, অতি দূরে একটি বয়েল-গাড়ি কাঠ-বোঝাই হয়ে চলেছে। শীতের হাওয়া খর হয়েছে।
হেমদা কাঁধের ঝোলা থেকে পুরনো কাগজ বের করে পুষ্পর হাতে দিল। পুষ্প কাগজ বিছিয়ে দিল নীচে। বাবা বসলেন, মা বসলেন ; দিদি এবং পুষ্পও। আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। জল খাওয়া শেষ হলে চায়ের কাপ বেরুল। বাবা শুধুই চা খেলেন, মা চা এবং পান। আমরা কিছু খাবার ও চা খেলাম।
বাবাকে পরিশ্রান্ত দেখালেও বিরক্ত দেখাচ্ছিল না। তিনি যেন নিরুদ্বেগে এই বিশ্রাম উপভোগ করছেন। তাঁর মুখে একটি অবসাদ-মোচনের আলস্য ভাব। মিনে করা সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে মৃদু মৃদু ধোঁয়া টানছিলেন, কখনো আকাশ দেখছিলেন, কখনো মাকে, কখনো আমাদের।
আকাশে একটি মনোহর অলক্ত মেঘ ভেসে এসেছে, বিহঙ্গহীন শূন্যের কোথাও বুঝি অপরাহ্ণের মায়া জমেছিল। আমরা একে একে পুনর্যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে

উঠলাম।
দিদি বলল, 'বাবা, তুমি তাহলে এখানে বসছ!'
'হ্যাঁ, আমি আর পারব না। দিস ইজ মাই লিমিট্।'
পুষ্প হেসে বলল, 'তুমি কিন্তু খুব একটা উঁচুতে ওঠো নি, বাবা। ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়েছে বলে এতটা লাগছে।'
বাবা পুষ্পর দিকে তাকালেন, তাকিয়ে থাকলেন স্থির চোখে, ওঁর দৃষ্টি সহসা আহত, ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট মানুষের মতন দেখাল। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি অনেক ঘুরে উঠেছি। আরো ওঠার সাধ্য আমার নেই, সাধও নেই।'
বাবার গলার স্বর সম্পূর্ণ অন্য রকম শোনাচ্ছিল, আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, বাবার চোখের তলায় অভিমানের সামান্য কালি পড়ল যেন। তিনি মা'র দিকে আস্তে করে মুখ ফেরালেন, মুখ ফিরিয়ে টেনে টেনে অন্যমনস্কভাবে পুষ্পকে বললেন, '...তোমার মা জানেন আমি কতটা ঘুরে কোথায় উঠছি।...তা সে যাই হোক, আমি এতেই সন্তুষ্ট।'
আমরা, বাবার পুত্র কন্যা ও জামাতা, সকলেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বাবা আমাদের কাউকেই দেখছিলেন না, তিনি মা'র মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলেন।

তিন

আমরা চারজনে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে সোপানে উঠছিলাম আবার। বাবা নীচে থেকে গেছেন, মা-ও আর আসতে পারেন নি। বাবা ও মা'র কাছ থেকে চলে আসার পর আমরা আগের মতন হালকা ও স্বাভাবিক মন ফিরে পাচ্ছিলাম না। কেউই কারুর কাছে প্রকাশ করছিলাম না যে, আমরা কোথায় যেন একটি অন্যমনস্কতা নিয়ে আপাতত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছি, অথচ বুঝতে পারছিলাম, আমরা বাবা এবং মা'র কথা ভাবছি।
বাবার বিষয়ে দিদির দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী। দিদি বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, 'আমার জ্ঞান হওয়া থেকে এখন পর্যন্ত আমি বাবাকে দেখছি। আমি জানি, বাবার সবটাই নিজের করা।'
আমরা কোনো সাড়া দিলাম না। দিদি কি বলতে চাইছে, আমরা জানি। আমি আমার ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবাকে যা দেখছি, দিদির আরো প্রায় সাত আট বছর বেশী দেখার কথা। হয়তো দিদি বলতে চাইছে, বাবার সেই প্রায়-নিঃসম্বল অসহায় দরিদ্র অবস্থাটিও দিদি দেখেছে। আমিও আমার জ্ঞান উন্মেষের বয়সে বাবার রাজকীয় রূপ দেখি নি। সংসারে বাবা অনেক পড়েছেন, অনেকবার মার খেয়েছেন, হয়তো পা রেখেছেন কোথাও, পরমুহূর্তে দেখেছেন অবলম্বন সরে গেছে। এ-

সব আমরা কিছু জানি, কিছু বা শুনেছি। শোক, তাপ, সন্তাপের পর তবে তাঁর সাফল্য।

দিদি আবার বলল, 'যে-মানুষ এক সময় টিনের ছাউনির তলায় একটা ভাঙা মেশিন আর একজন মাত্র লোক গিয়ে সারা দিনে পাঁচটা টাকার বেশী রোজগার করতে পারে নি, আজ তার লক্ষ টাকার কারখানা, নিজের বাড়ি-গাড়ি। এতটা করা মুখের কথা নয়।'

পুষ্প কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, 'অত বলার কি আছে! বাবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছেন জীবনে তা পেয়েছেনও, এ আমরা জানি।'

পুষ্পর কথায় দিদি যেন অপমান বোধ করল, আহত হল, বলল, 'হ্যাঁ, আমরাও সেটা না পাচ্ছি এমন নয়। বাবা চেষ্টা করে পেয়েছিলেন, আমরা সবাই বসে বসে পাচ্ছি।...আর আমরা পেয়েছি বলেই তার দাম দেবার কথা ভাবছি না।'

দিদি এবং পুষ্পর কথা-কাটাকাটি হেমদা আর বাড়তে দিল না। বলল, 'সকলেই এক রকম জিনিস চায় না। যার যা আশা। তোমাদের বাবা তো বলেই দিলেন, তিনি আর কিছু চান না, ওই পর্যন্ত তাঁর লিমিট।' বলে হেমদা হেসে বলল, 'রেণু ঠিকই বলেছে, তোমাদের উনি এ পর্যন্ত এনে দিয়েছেন, সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তোমাদের আর ভাবতে হবে না।...এখন যা ভাবার তাই ভাব, এখনো অনেকটা উঠতে হবে—দম নষ্ট করো না।'

পুষ্প আর কিছু বলল না, দিদিও চুপ করে গেল।

আমি আমার পায়ের তলার সিঁড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়, এখন আবার মনে হল। পা শক্ত করে এক সিঁড়ি থেকে অন্য সিঁড়িতে উঠে যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সকলকে শুনিয়ে বললাম, 'বাবা আমাদের অনেকগুলো শক্ত সিঁড়ি তুলে দিয়েছেন ; নাও এখন চলো।'

হেমদা হাসল, 'বেশ বলেছ অন্তু, মার্ভেলাস। ...কিন্তু একটা জিনিস তুমি দেখলে না।'

'কি জিনিস ?'

'মা কেমন বাবার পাশটিতে থেকে গেলেন।'

'মা কোনোকালেই বাবার বেশী যেতে চান না। বাবাকে ছেড়েও যেতে চান না।' আমি সরল গলায় বললাম।

হেমদা হাসল, তার হাসি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে কেঁপে যেন অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে নীচে তলিয়ে শেষে ডুবে গেল।

আমরা চারজনে আরো দুটি তল উঠে এলাম। দিদি হাঁপিয়ে পড়েছিল। দিদির চেহারা একটু ভারী। মাথায় কিছু লম্বা বলে দিদিকে ওই ভারী চেহারায় বেমানান দেখাত না। অনেক সময় দিদিকে লোকে অবাঙালী বলে ভুল করেছে। দিদির

মুখেও তেমন তলাতলে ভাব ছিল না, একটু বোধহয় রুক্ষ ও শক্ত দেখাত। দিদি পুষ্পর কাছ থেকে জল চেয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। পুষ্পও মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। আমরা যে যথেষ্ট উঁচে উঠে এসেছি তা বোঝা যাচ্ছিল। নীচের যাবতীয় বস্তু ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল ; আমরা দূরান্তের গ্রামটি এবং বৃক্ষলতা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, সব যেন একই পটে আঁকা। উচ্চতার জন্য এখানে বাতাস অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ, শীত করে উঠল, আমরা মা-বাবাকে দেখলাম, নিতান্ত শিশুর মতন দেখাচ্ছিল, পুষ্প ডাক দিয়ে ওঁদের ডাকল, হাত নাড়ল, বাবা-মা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

মাঘের এই অপরাহ্ন বেলা ক্রমশই বিষণ্ণ হয়ে এসেছে, অদ্ভুত নিঃশব্দতা চতুর্দিকে, সেই অলক্ত মেঘটি কোন্ দূরান্তে চলে গেছে। একটি পাখির দল বনপ্রান্তর থেকে উড়ে উড়ে আসছিল। নীল আকাশতলায় মিনারের মাথাটি যেন মহিমার মুকুট পবে দাঁড়িয়ে আছে।

হেমদা বলল, 'নাও, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, বিকেল হয়ে আসছে, আলো থাকতেই স্বর্গে উঠতে হবে।'

আমরা প্রস্তুত, দিদিই মাটিতে বসে। দিদির চোখ দুটিতে অবসাদ ; মুখে ক্লান্তি ফুটে আছে। হাতের রুমালে দিদি কপাল মুছল। শীতের এই প্রচণ্ড বাতাসে তার কপালে ঘাম থাকার কথা নয়, হয়তো যে গ্লানিটুকু তার কপালে জমে আছে, অভ্যাস-বশে সে সেটুকু মোছার চেষ্টা করল। দিদি অনেকদিন হল এইভাবে তার কপাল মোছার চেষ্টা করছে, আমি জানি।

দিদির জন্যে আমার মায়া হল, দুঃখ হল। বললাম, কি দিদি ওঠো।'

ওঠার কথায় দিদি তেমন উৎসাহ পেল না আর তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেমদা শুধলো, 'পারবে কি ?'

দিদি ক্লান্তস্বরে বলল, 'দেখি। এই মাঝপথে একলা বসে থাকব কি করে।' দিদির বিষণ্ণ চোখ দুটি আমায় অপরাহ্নের ছায়ার কথা মনে পড়াল।

আমবা চারজনে আবার সেই বন্ধ এবং ধূসরালোকে মিনারের মধ্যে এলাম। সোপান-গুলি এখন বেশ ছোট এবং খাড়া হয়ে উঠেছে। হেমদা আগে ; পুষ্প, দিদি পর পর ; সবার শেষে আমি। আমরা সকলেই কম-বেশী পরিশ্রান্ত থাকায় আগের মতন দ্রুত সিঁড়ি উঠতে পারছিলাম না ; এই সিঁড়ির ধাপগুলিও আরোহণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দিদির কথাও ভাবছিলাম, তাকে ধীবে সুস্থে উঠতে দেওয়াই ভাল। কনকনে ঠাণ্ডার একটি ভাব জমছিল এতক্ষণে।

হেমদা বলল, 'অন্তু, মহাপ্রস্থানে যাবার সময় কার কি দোষে পতন হয়েছিল জানো তা ?'

'জানি বলে মনে হচ্ছে।'

'আমার মনে নেই, ভুলে গেছি।'

হেমদা কথাটা কেন বলল জানি না। আমার দিদির কথা মনে পড়ল। হেমদা কি দিদিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলতে চাইল! এবার কি দিদির পতন হবে!

পুষ্প অকস্মাৎ কেমন ভীতরবে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা চমকে গেলাম। পুষ্পর আতঙ্কিত স্বর আরো ভয়ানক হয়ে ফাঁপা ফাঁপা সুবিশাল এই মিনারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। হেমদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছু ফিরে পুষ্পকে ধরে ফেলল।

'কি হলো?' হেমদা উদ্বিগ্ন গলায় শুধলো।

পুষ্প কোনো কথা বলতে পারল না সামান্য সময়, তারপর ভীতস্বরে বলল, 'কি একটা আমার মুখের পাশ দিয়ে ছুঁয়ে গেল।'

'দূর…কি ছুঁয়ে যাবে আবার!'

'আমি বলছি গেছে, আমার গলার পাশ দিয়ে চলে গেল। হাতের মতন!'

'বাদুড় হয়তো।' আমি বললাম।

হেমদা ঝোলা থেকে টর্চ বের করে আলো ফেলল। 'কই! কিছু নেই তো!'

'অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে…' পুষ্প বলল।

'যাক, নাও চলো।'

আরো খানিকটা উঠে আসতেই আমরা আচমকা একটি ঘরের মধ্যে পেঁছে গেলাম। মনে হলো, সিঁড়ির বাঁকে একটি ছোট ঘর, তার দু'দিকের উন্মুক্ত পথ। তৃতীয় পথে আমরা এসেছি। আমরা ডানদিকের পথে এলাম, সামনে নিকষ কালো অন্ধকার, বাঁদিকের পথে গেলাম—অটুট আঁধার, যেন অন্ধকারের প্রাচীর গাঁথা আছে। হেমদা টর্চ জ্বালাল। আলোয় অল্পে অল্পে বোঝা গেল: উভয় পাশেই ক্ষুদ্রাকার ঘর, ঘরগুলির দু-পাশেই দু'টি দরজার মতন পথ। ডানদিকের ঘর ধরে এগিয়ে যেতে আবার একটি সমান আকারের এই রকম পথ-অলা ঘর চোখে পড়ল। আমরা আর বাইরের আলো পাচ্ছিলাম না।

হেমদা বলল, 'অন্তু, আমার মনে হচ্ছে, একটা বড় গোল-ঘরকে যেন চার-পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ঘরে দুটো করে দরজা করা হয়েছে।'

'কেন?'

দিদি যেন কি বলতে যাচ্ছিল, পুষ্প হঠাৎ বলল, 'আমার কেমন লাগছে! আমরা যেন পাতালে নেমে গিয়েছি। কী অন্ধকার!…আমার ভয় করছে। জামাইবাবু, বাইরে চলুন।'

হেমদা কোনো জবাব দিল না, কি যেন ভাবছিল চুপ করে দাঁড়িয়ে। শেষে বললে, 'আমার বিশ্বাস এই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে কোনো একটা পথ চূড়ায় উঠে গেছে। হয়তো সামান্য আর একটু পথ বাকি আছে আমাদের।'

'কিন্তু হঠাৎ এখানে এ-রকম বেয়াড়া ঘর করবার কারণ কি?' আমি শুধলাম।
'কে জানে! হয়তো ওপরের কনস্ট্রাকশনের জন্যে।...আসলে অন্তু, এগুলো ঠিক ঘর নয়, পথও নয়; খিলান—খিলান বড় বেশী, তাই ধাঁধার মতন দেখাচ্ছে।'
দিদি বলল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাইরে চলো।'
'তাহলে—' হেমদা হাসল, 'এই পর্যন্ত; এত কাছাকাছি এসেও ফিরে যেতে হবে।'
আমার ফেরার ইচ্ছা ছিল না। যদি এমনই হয়, প্রায় আমরা চূড়ার কাছে পেঁছে গেছি—তবে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমার বারবার আফসোস থাকবে। আমি বললাম, 'হেমদা, দিদিরা বাইরে অপেক্ষা করুক, চলো আমরা যাই।'
হেমদা বলল, তাই ভাল।...তার আগে তো বাইরে যাই...'
আমরা বাইরে আসার জন্যে একটি একটি করে দরজা পেরোলাম, কিংবা সেই বিসদৃশ খিলানগুলি অতিক্রম করছিলাম। হেমদার হাতে টর্চ। আমরা চারজনে গায়ে গায়ে পিছু পিছু চলেছি। চলেছি, চলেছি—অথচ কী আশ্চর্য, বাইরের আলো পাচ্ছি না, পথ পাচ্ছি না। ক্রমশই দিদি ভীত হচ্ছিল. পুষ্প অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আমারও কেমন উদ্বেগ জমছিল ক্রমশ।
দিদি বিড়বিড় করে বলল, 'ছি ছি, কী ভুল করেছি! এখানে কেন এসেছি!'
পুষ্প কাতর হয়ে বলল, 'জামাইবাবু, বাইরে চলুন—আর পারছি না।'
আমরা বাইরের পথ পাচ্ছিলাম না। প্রতিবার ভাবছি, ওই খিলানের আড়াল পেরোলে বাইরের আলো আমাদের পথ দেখিয়ে ডেকে নেবে; প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, আমরা আমাদের পথটুকু পেয়ে যাব অথচ আমরা এই রহস্যময় গোল ঘরটির কয়েকটি অংশের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যত সময় বয়ে যাচ্ছিল আমরা পথ হারানো পথিকের মতন, গুহা মধ্যে নিক্ষিপ্ত পশুর মতো ততই অধৈর্য ও হতাশ হয়ে কেমন অদ্ভুত এক শঙ্কা অনুভব করছিলাম। দিদি চিৎকার করে কি যেন বলল, তারপর নিজের সেই অদ্ভুত চিৎকারের বিচিত্র প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হবার আগেই পাশের দরজার দিকে ছুটে গেল। দিদি ওখানে আলোর আভাস দেখে ভেবেছিল, বাইরের পথ পেয়েছে। ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার পিছু পিছু ছুটে গেলাম। বাইরের আলো দেখা দিল, অতি সামান্য; আমরা দিদির জন্যে—আলোর জন্যে মরিয়া হয়ে আলোর দিকে এগিয়ে যাবার সময় সহসা পরস্পরের কথা ভুলে গেলাম। আমরা প্রত্যেকেই পাগলের মতন আলোয় আসতে গিয়ে হুড়োহুড়ি এবং ছুটোছুটি করে কোথায় এসে পেঁছিলাম জানি না—অথচ আমি আমার পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে সঙ্গীচ্যুত ও একাকী হয়ে গেছি অনুভব করে পাথরের মতো নিষ্প্রাণ নিজীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।
আমার ভীত হৃৎপিণ্ড অতি দ্রুত হয়ে উঠছিল, ধক ধক শব্দটা আমার কানে বাজ-

ছিল, যেন হৃৎপিণ্ডটি বুকের মধ্যে থেকে লাফিয়ে আমার কানের কাছে চলে এসেছে। সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেই অবর্ণনীয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আমি হেমদাকে ডাকলাম।

আমার ডাকের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে আসার আগেই পুষ্পর ডাক শুনতে পেলাম, 'অন্তুদা—'

হেমদা ডাকল, দিদি ডাকল। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ডাকছি। গলার স্বর মাত্র আমাদের সম্বল। আমরা কেউ আর পরস্পরের পাশে নেই। আমরা সকলেই আতঙ্কিত ও আর্ত। আমরা পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলাম।

হেমদা চেঁচিয়ে বলছিল যে, অন্ধকারে আমরা যেন পথের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, হেমদা আলো হাতে একে একে আমাদের কাছে আসবার চেষ্টা করছে।

প্রায়-মৃত, বেহুঁশ মানুষের মতন আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। অজ্ঞাত বীভৎস একটি দানবের মতন যেন নিঃশব্দে মৃত্যু আমার কাছে এগিয়ে আসছিল।

দিদি পাগলের মতন কাঁদছে, পুষ্প ডেকে ডেকে গলা দিয়ে বুঝি রক্ত বের করে ফেলল, হেমদা সাহস দিচ্ছে; বার বার বলছে, সে আসছে, সে আসছে। অথচ হেমদা আসছিল না।

হয়তো মানুষের কোনো আদি অনুভূতি তাকে শেষ সময়ে পশুর মতন বেপরোয়া করে তোলে; আমি সেই পাশব ও অদম্য আত্মরক্ষার প্রেরণায় মসীকৃষ্ণ অন্ধকার ও অজ্ঞাত পথ অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ালাম। পা টেনে টেনে দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটছি, হাঁটছি; দিদি বমি করছে যেন, পুষ্প বাচ্চা মেয়ের মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনো মনে হয়, তারা আমার কাছে চলে এসেছে, হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারব; কখনো মনে হচ্ছিল ওরা অন্য কোথাও চলে গেছে, আমি এখানে একা। সম্ভবত আমারই মতন দিদি এবং পুষ্প মরিয়া হয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছিল, হেমদা সেই অদ্ভুত গোলাকধাঁধার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে যথাসাধ্য করছিল। ক্রমশই আমাদের গলার স্বর বসে এলো, আমরা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে নীরব হয়ে নিস্তব্ধতা বিরাজ করলে এই স্থানটি যেন তার পরিত্যক্ত মহিমা ফিরে পেল।

কতক্ষণ পরে জানি না, সহসা আলো দেখতে পেয়ে আমি হেমদাকে ডাকলাম। হেমদা আমায় ডাকল। পুষ্প সাড়া দিল, দিদির কথা ভেসে এলো। আমরা কে যে কোথা থেকে বেরিয়ে ছুটে আলোর সামনে আসছিলাম জানি না, পাগলের মতন ছুটে আসতে গিয়ে পুষ্প হেমদার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঠক্ করে শব্দ হলো; হেমদার হাতের টর্চ মাটিতে পড়ে গেছে। আবার অন্ধকার। হেমদার মুখ থেকে আর্ত শব্দ হলো : যাঃ—!

মাটিতে বসে হাতড়ে হাতড়ে হেমদা টর্চ কুড়িয়ে ঝাঁকাল, হাতের তালুতে ঠুকল, নাড়ল-চাড়ল, তারপর আতঙ্কের স্বরে বলল, 'বালব্ ভেঙে গেছে।'

টর্চের আলোটুকুতে আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছিল; আমি অনুভব করলাম —আমার এই হাত পা মাথা মুখ দৃষ্টি এমনকি আমার হৃৎপিণ্ডও—আমার যা আছে—কিছু না, কিছুই নয়, ওই বাইরের আলোটুকুই আমার জীবন। সেই আলো নিবে গেলে আমি মৃত্যুভয়ে শিহরিত হলাম।

তারপর কি ঘটছিল আমি সুস্থ চেতনায় কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। কখনো হারিয়ে যাচ্ছিলাম, কখনো আমার পাশে কাউকে অনুভব করছিলাম। পুনরায় সেই নিষ্ফল চেষ্টা, ব্যর্থ উদ্যম, বারংবার পরস্পরকে আহ্বান। অন্ধকারের মধ্যে আমি একটি নাগরদোলায় চড়ে আছি যেন, নাগরদোলাটি ঘুরছে, কখনো আমায় ওপরে তুলছে, কখনো আবার নীচে ফেলে দিচ্ছে। অবশেষে আমার মনে হলো, আমি যেন একটি ঘুরন্ত খোপ-কাটা জালি ঘরের মধ্যে একটি খোপে বন্দী, সমস্ত কক্ষটি—প্রতিটি খোপ ঘুরছে ক্রমাগত এবং আমি পাশের খোপে যেতে গিয়েও পারছি না, কখনো দিদি আমার কাছে এসে পড়ছে, তাকে হাত ধরে টেনে নেবার আগেই সে চলে যাচ্ছে; কখনো হেমদা, কখনো পুষ্পকে আমি ছুঁতে গিয়েও ছুঁতে পারছি না।

এক সময় হেমদা আর দিদিকে আমার কাছাকাছি কোথাও অনুভব করলাম। দিদি প্রলাপের মতন কথা বলছে।—'আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করে আমার দিকে আসছো না; আমি তোমার হাত ধরতে পেয়ে যদি বেঁচে যাই, তাই তুমি হাত গুটিয়ে আছ।'

'আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না, রেণু।'

'ও তো পুরনো কথা।…তুমি কি খোঁজ, কাকে খোঁজ, আমি জানি।'

'তুমিও তো খুঁজছিলে।'

'পাই নি। আমার কপাল।'

'তবে আর কি! যার যা কপাল…'

দিদির গলা আর উঠল না, হয়তো সে মুখ বুজে কাঁদছিল।

দিদিকে এ-সময় আমি কিছু বলতে চাইছিলাম। তাকে খোঁজার জন্যে হাতড়ে কোথায় এলাম জানি না। 'দিদি—'

দিদির সাড়া নেই। কয়েকবার ডাকলাম, 'দিদি—দিদি।' দিদি সেখানে ছিল না। সে কোথায় থেকে গেল জানি না।

দীর্ঘসময় পরে আমি আবার দু'টি মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমার হাত ধরার চেষ্টা কর—চেষ্টা কর।'

'যাব কোথায়?' পুষ্পর গলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

'কোথাও যাব', হেমদা বলল।

'কোথায় আর যেতে পারছি !'

'পারব।...আমরা বেরোবার পথ খুঁজছি, একবার যদি পাই...'

'আমি আর স্বর্গে যেতে চাই না।'

'পুষ্প, তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ; অত ভয় কেন !...আরএকটু কাছে এস, আমি তোমায় কোথাও নিয়ে যাব, কোথাও...'

আমি হেমদাকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলাম না, আমার গলা বন্ধ হয়ে এলো।

চার

রাত্রে ঘুমের মধ্যে পথ হাঁটলে যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির কোনো অনুভব থাকে না, আমারও কোনো চেতনা ছিল না, আমি অচেতনায় হাঁটতে হাঁটতেহাতড়াতে হাতড়াতে, পা ফেলে ফেলে কোথায় এসে পৌঁছিলাম জানি না, অকস্মাৎ আমার চোখে শেষ অপরাহ্নের আলো লাগল। বিশ্বাস হল না, আমি আলোয় এসেছি; মনে হল, এ আমার মতিভ্রম। চোখ পরিষ্কার করে তাকালাম, আলো নিবল না। আমি আমার গা হাত পা লক্ষ্য করলাম, পোশাক নজর করে দেখলাম। অবশেষে আমি বাইরে আসতে পেরেছি। সহসা জীবনের বাসনাগুলি আমায় আন্দোলিত করল, সাহস এলো, স্বস্তি ফিরে পেলাম। চারপাশের ঘেরা ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে গোধূলির ম্রিয়মাণ আলো, ছায়াময় দুরান্ত বনানীর একটি অংশ যেন আমার চোখে পড়ল। সন্ধ্যাসমাগমে শীতের বাতাস অসহ্য হয়ে উঠছে।

কিছু সময় আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার কোনো অতিন্দ্রিয় অনুভূতি আমায় বলছিল, আমার মাথার ওপরে মিনারের শেষ চূড়া, চূড়ার মাথায় গোধূলির স্বর্ণচ্ছটা এখনো মুছে যায় নি। ওখানে কায়ক্লেশে ওঠার এখনো সময় আছে। আরো কয়েকটি দণ্ড।

কোনো এক দুর্বোধ আবেগ এবং আশঙ্কা আমায় অস্থির করে তুলছিল। এ সুযোগ কে হারায়! অনেক কষ্টের পর, অনেক ভ্রম এবং বহু অনিশ্চিত সোপান পেরিয়ে আমি এখানে এসেছি নিতান্ত সৌভাগ্যবশে। এখান থেকে ফিরে যাওয়া মূর্খতা।

বাবার কথা আমার মনে পড়ল, তিনি এক জায়গায় উঠে এসে বসে আছেন। মা'র মুখ আমার চোখের সামনে ভাসল, মা বাবার পাশে পাশেই আছেন, যেন জীবনে মা সঙ্গদান ভিন্ন অন্য কিছুর আশা করেন নি। দিদি অনেক আগে থেকেই ক্লান্ত, তবু সে মাঝপথে থাকতে ভয় পেয়ে হেমদার কাছাকাছি উঠে আসতে চেয়েছিল, পারে নি। দিদি তার কপাল মুছতে পারল না। প্রথম যৌবনের গ্লানি তার কপালে লেগে আছে। দিদি মর্যাদার মোহে এবং আত্মরক্ষার্থে যেখান পর্যন্ত এসেছিল, সেখানে এসে থেমে গেছে, হেমদা তাকে খুঁজে পায় না। পুষ্প স্বর্গ চায় না, সে

কি চায় জানে না, সে নিজের শঙ্কিত বাসনার অবসান চায় হয়তো, হয়তো সে চতুর প্রতিদ্বন্দ্বীর মতন চরম জয় চায়। আমি জানি না সে কি চায়। হেমদা অতি গোপনে তার জীবনের কোনো নিষ্ফল বাসনা পূর্ণ করতে চায় বুঝি, সে শুধু পথ খুঁজছে।

নিজেকে নিঃসঙ্গতম মানুষ অনুভব করার পর যে বেদনা হওয়া সম্ভব, আমি এখন সেই বেদনা অনুভব করছিলাম। আমি সকলকে পরিত্যাগ করেছি, সকলের সহযাত্রী হয়ে যাত্রা শুরু করে অবশেষে একাকী এখানে এসেছি। আমি চেষ্টা করব শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যেতে!

খুব সন্তর্পণে আমি গোধূলির আলোটুকুতে একটি পথের আশায় চতুর্দিক লক্ষ্য করতে লাগলাম। সুউচ্চ প্রাচীর এবং সামান্য মাত্র ঘুলঘুলির জন্যে কিছু দৃষ্টি-গোচব হয় না। অনুমানে আমি পথ হাতড়াচ্ছিলাম।

সেই রাজ্যত্যাগী বৃদ্ধ রাজার কাহিনী আমার মনে পড়ল, যিনি খঞ্জ এবং অক্ষম হয়েও চেষ্টা করেছিলেন স্বর্গারোহণ করার। তিনি কি পেরেছিলেন শীর্ষে পৌঁছতে? আমার ত্রিপাঠীবাবুর কাহিনীও মনে পড়ল। সেই রানী প্রকৃতই কী চেয়েছিলেন! কোনো অসামান্য তৃপ্তি? কতটা উচ্চতায় এসে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন? নাকি রাজা দেখেছিলেন, রানীকে তৃপ্ত করা অসাধ্য, তাই সাধ্যমত চেষ্টার পর রানীকে আর ফিরতে দেন নি?

গোধূলির আলো ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছিল। আমার বুক অবসিত আলোর দিকে তাকিয়ে, ক্রমশই দ্রুত ও ভয়ানক হয়ে উঠছিল। আর সামান্য পরে আলো মুছে যাবে, আমি শীর্ষদেশে উঠতে পারব না।

কে যেন আমায় বলছিল: তাড়াতাড়ি করো, সময় ফুরিয়ে এলো। আশ্চর্য এক আবেগ আমায় উত্তেজিত ও আকুল করছিল। আমি পাগলেব মতন সামান্য মাত্র পথ খুঁজ-ছিলাম, কোনো রকমে যেখান দিয়ে চলে যেতে পারব। আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আর কয়েকটি সোপান শেষেই শীর্ষ চূড়া। সেখানে পৌঁছতে পারলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হবে। যে গোধূলিটুকু এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সেই শেষ আলোয় আমি জ্ঞানে-অজ্ঞানে, বেদনায় ব্যাকুলতায়, দুঃখে হতাশায় ও আঘাতে যা খুঁজেছি হয়তো তা দেখতে পাব।

অব্যক্ত কোনো যন্ত্রণায় এবং ভয়-তাড়িত ব্যাকুলতায় বার বার উন্মত্তের মতন, ভিক্ষুকের মতন, শিশুর মিনতির মতন, যুবকের প্রেমকামনার মতন এবং বৃদ্ধের ভগবত প্রার্থনার মতন আমার পথটুকু আমি খুঁজে ফিরলাম।

হয়তো আমি কোনো প্রচণ্ড আক্রোশে এবং বিক্ষত যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, সহসা গোধূলির অন্তিম আলোটুকু আমার চোখে মরে গেল। অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না, আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

নদীর চরায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উলটো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গরুর গাড়ির উপর বসে, গাড়িটা অর্জুনগাছের ছায়ায় দাঁড় করানো, গরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়েছিল। শিবানীর মুখাগ্নি শেষ করে ভুবন খানিকক্ষণ চিতার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, রোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখে নি, তারপর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মুখ আড়াল করে সে বসে ছিল, কদাচিৎ মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে বুলিয়ে শবদাহের তদারকি করছিল। পুরুতমশাই আর ছোটকিলাল অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধু ধু করছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসার মতন ভাব হয়েছে। বালিভরা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জলের ধারাটি শিবানীর চিতার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলতলায় বসে শিবানীর সৎকার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বলল, 'শেষ হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।' বলে সে শিবানীর চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে ছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আকাশমুখো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আর-একবার ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু' হাতে মুখ আড়াল করা। অনেকক্ষণ সে ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক : শিবানী ওর স্ত্রী। তবু আমার মনে হলো, ভুবনের এতটা শোকাভিভূত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোর করে তার শোকের মাত্রার

গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবার কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন ? সে কি আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে চায় ? কিংবা আমাদের তিনজনকেই ?

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, 'শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপর কি জন্যে যেন রেগে ছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যের কথায় দুঃখ করছিল...'

আমার কথায় অনাদি মুখ ফিরিয়ে দূরে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমরা বোধহয় না এলেই ভাল করতাম।'

আমরা চুপচাপ অনাদির কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনো পাখি চিকির-চিক করে ডাকতে ডাকতে চোখের পলকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

কমলেন্দু সব জেনেশুনে বুঝে হঠাৎ বলল, 'কেন ? আমরা না এলে কি ভাল হত ?'

অনাদি ধীরস্থির প্রকৃতির, আস্তে আস্তে নীচু গলায় সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, 'ভুবন হয়তো অস্বস্তি বোধ করছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদের বাদ দিয়েই তার স্ত্রীকে ভাবতে চেয়েছিল।'

'ভাবুক ; কে তাকে বারণ করেছে—' খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসের গলায় আমি বললাম।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'আমরা ওর চোখের সামনে বসে থাকলে ভুবনের পক্ষে আমাদের বাদ দিয়ে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।'

কমলেন্দু শুয়ে শুয়ে বলল, 'বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে শিবানীর মারা যাবার খবর পাঠানো কেন ! না পাঠালেই পারত।'

'কিংবা বলে দিলেই পারত আমরা যেন না আসি,' আমি বললাম।

'খবর না দিলে খারাপ দেখাত, বোধহয় ভদ্রতা করে...'

'আমরাও ভদ্রতা রক্ষা করছি। শিবানী আমাদের বন্ধুর স্ত্রী, তার সৎকারে না আসাই কি ভাল দেখাত !' কমলেন্দু বলল।

'বন্ধুর স্ত্রী শুধু কেন, শিবানী আমাদের...কি বলব...বান্ধবী, যাই বলো...সেও তো আমাদের কিছু একটা ছিল। সে মারা গেছে, আমরা শ্মশানে আসব না ?' আমি বললাম।

অনাদি আর কথা বাড়াল না। পকেট হাতড়ে আবার সিগারেট বের করল ! আমাদের দিল। নিত্যানন্দ চিতার কাছে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হলো। সে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তার সহচর দুটি ছেলে তার কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। চিতার ওপর কয়েকটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেন আতসবাজির মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল।

একটি ছেলে কয়েকটি কাঠের টুকরো ফেলল চিতায়।

ভুবন চিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উদাসভাবে নদী আকাশ আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। ভুবন মুখ ফিরিয়ে নিল; নিয়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর এই ভঙ্গি আমার ভাল লাগছিল না। মনে হলো, আমাদের যেন সে আর দেখতে পারছে না; বা দেখেও দেখতে চাইছে না—উপেক্ষা করছে।

বাড়াবাড়ি দেখলে আমার রাগ হয়, ভুবনের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমার কেমন রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। আতিশয্য কেন? আমরা কি জানি না শিবানীর সঙ্গে ভুবনের সম্পর্ক কি ছিল? তবে? তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা কিছু জানি না, যেন শিবানী তার সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তার বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে!

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনের বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালবাসা পেতে! শিবানী তোমায় ভালবাসে নি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হয়েছিলে বলে যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না। বরং শিবানীর ভালবাসা বলতে যা, তা আমি পেয়েছিলাম।

ফাল্গুনের দমকা বাতাস এলো দক্ষিণ থেকে নদীর তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাস নাচতে নাচতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভুবন আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আড়াল করে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনের এত আতিশয্য আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আর কমলেন্দুকে বললাম, 'আমরা একটু আড়ালে গিয়ে বসি না হয়—' বলে উপহাসের গলায় মন্তব্য করলাম, 'ভুবনবাবুর আমাদের হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।'

কমলেন্দু শিমুলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে! সে বলল, 'তাতে যদি ভুবন শান্তি পায় আমার আপত্তি নেই।...আমার বরং শিবানীর চিতার কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগছে।'

'তাই বুঝি শুয়ে আছ, আকাশ দেখছ?'

কমলেন্দু কথার জবাব দিল না।

অনাদি এবার বলল, 'আমারও কেমন অস্বস্তি লাগছে। একটু আড়ালে দূরে গিয়ে বসাই ভাল। তাছাড়া এবার এদিকে রোদ ঘুরে গেছে, বসে থাকা যাবে না।'

আমরা আরো অল্পক্ষণ বসে থেকে শিমুলতলা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তারপর তিন বন্ধু শিবানীর চিতা এবং ভুবনের দৃষ্টি থেকে সরে অন্য দিকে চলে যেতে লাগলাম।

খানিকটা দূরে এসে আমরা বসলাম। এখানে ঘন ঝোপঝাড় আর ছায়া, মাথার ওপর নিমগাছ, সামনে কুলঝোপের ওপর দিয়ে নদী দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু কানে যাচ্ছে না। নদীর বালি ছাড়া অন্য কিছু চোখেও পড়ছে না। এখানে যে যার মতন আরাম করে বসলাম, বসে নিশ্চিন্ত হলাম।

কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে ছোটোখাটো দু-চারটি কথার বিনিময় হলো ; শিবানী এভাবে, আচমকা একটা অসুখে মারা যাওয়ায় আমরা দুঃখিত। শেষে আমরা একে একে কেমন নীরব হয়ে গেলাম। নদীর দিকে অপরাহ্নের স্তিমিত ভাব নামছিল। আমরা তিনজনেই কখনো নদী, কখনো শূন্যতা, কখনো গাছপালা, কখনো পায়ের তলায় ঘাস-মাটি দেখছিলাম। এবং পরিপূর্ণ নীরব হয়ে গিয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ কমলেন্দু কেমন করে যেন নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘনিশ্বাস নয়, তার চেয়েও যেন গভীরতাপূর্ণ কিছু ; তার নিশ্বাসের শব্দে আমরা ওর দিকে সচকিত হয়ে তাকালাম।

কমলেন্দু সুপুরুষ। তার মুখ এখনো দু' মুহূর্ত তাকিয়ে দেখার মতন। লম্বা ধরনের কাটাকাটা মুখ, রঙ ফরসা, নাক এবং চোখ বেশ তীক্ষ্ন। তার ফরসা সুন্দর মুখে আমরা কোথায় যেন এক বেদনা দেখতে পেলাম।

অনাদি বলল, 'কি হলো ?'

কমলেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আমাদের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'না, কিছু নয়।...কই, দেখি একটা সিগারেট...'

পকেট থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওকে দিলাম। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ও আমাদের দু'জনকে দুটো সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া গলায় নিল। তারপর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ দিকটায় পালিয়ে এসে ভালই হয়েছে। সামহাউ, আমার শিবানীর চিতার সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।...হতে পারে, তখন আমি বোকা ছিলুম, বয়স কম ছিল ; তবু এ কথা তো ঠিক, শিবানী আমাকে ভালবেসেছিল।...আমার চেয়ে বেশী সে আর কাউকে কখনো ভালবাসে নি।'

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু পরস্পরের কথা জানতাম এবং ভুবন, আমাদের চতুর্থ বন্ধুও সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর মেলামেশা ভালবাসার কথা আমার অজানা নয় ; কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবীটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হলো না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে সরাসরি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, 'আমার তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।'

ধীরস্থির শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত

হলো। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল, 'এ-সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার সঙ্গে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দুজনে কেউই বাচ্চা ছিলাম না। সিরিআসলি যদি কাউকে সে ভালবেসে থাকে, আমি সে দাবী সবচেয়ে বেশী করতে পারি।'

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু, আমরা কেউই খুশী হলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয় নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবী করছি সে দাবী ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদের সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হলো। আমাদের তিন-জনেরই বয়েস হয়েছে, চল্লিশের এপারে চলে এসেছি। আমাদের তিনজনেরই স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আজ শিবানীর সঙ্গে আমাদের প্রেম নিয়ে অকারণ গল্প করার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করার কোনো অর্থ ছিল না। তবু, আমরা তিনজনেই এমন এক দাবী জানাচ্ছিলাম যেন সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমাদের কোনো বিশেষ সুখ ও অহংকার প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদির দিকে এবং আমার দিকে বার বার তাকাল, তারপর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে শিবানীর ওপর-ওপর মেলামেশা তোমরা দেখেছ ; আমি তোমাদের সে-সব গল্পও বলতাম ; চিঠিপত্রও দেখিয়েছি ; কিন্তু ভেতরে আমাদের কি হয়েছিল তোমরা কি করে জানবে ?'

'ভেতরে ভেতরে যা হয়েছে তাও তো পরে তুই বলেছিস,' আমি বললাম না।

'না আমি সব বলি নি। কিছু না-বলা আছে, সামথিং সিকরেট...'

'সে-রকম গোপনীয়তা আমারও আছে, কমল।' অনাদি বলল।

আমারও গোপনীয়তা ছিল। আমরা তিন বাল্যবন্ধু পরস্পরের কাছে জীবনের কোনো কিছুই বড় একটা অগোচর রাখতাম না। শিবানীর বেলায়ও কিছু রাখি নি রাখতে চাই নি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ এ-কথা উঠত না। শিবানীর সঙ্গে মেলামেশার সময়ও আমরা কেউ কারুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হই নি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীর সঙ্গে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা করেছিল, করে শিবানীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবনবেলার ; আমার সঙ্গে শিবানীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদের বাল্য-কালের বান্ধবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হয়েছে তা পরস্পরকে আমরা জানিয়েছি। স্বভাবতই কোনো ইতর ঈর্ষা আমাদের থাকার কথা নয়, তবু যদি কোনো ঈর্ষা থেকে থাকে বা হয়ে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নয়তো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এতকাল যা হয় নি তা হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিরোধ আমাদের

মধ্যে হয় নি ; সে জীবিত থাকতে যা হলো না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে আর নেই—তখন তা হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

আমার কি রকম যেন মনে হলো। কমলেন্দুর দিকে তাকালাম, তারপর অনাদির দিকে। আমার মনে হলো, ওরা নিজেদের গোপনীয়তাকে তাদের প্রতি শিবানীর চরম ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইরকম মনে করছিলাম। যদিও আমার আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বস্তি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, 'একটা কথা বলব ?'

ওরা আমাকে দেখল।

'আমাদের সব কথাই সকলের জানা।' ধীরে ধীরে আমি বললাম, 'আমরা কিছুই লুকোচুরি রাখি নি ; তবু আমাদের তিনজনেরই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভাল নয় ?'

কমলেন্দু অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখের চশমাটা ঠিক করে নিল। আমার মনে হলো ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলেন্দু বলল, 'বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভাল।'

অনাদি বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীর চিতা এখন জ্বলছে, আমরা শ্মশানে। এই সময় সে-সব কথা বলা কি ভাল দেখাবে !'

'খারাপই বা কি !' আমি বললাম, 'আমার বরং মনে হচ্ছে বলে ফেললেই স্বস্তি পাব।'

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্মত।

কমলেন্দুর দিকে আমি তাকালাম। সেই বলুক প্রথমে। শিবানীর জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

'সব কথা বলার কোনো দরকার নেই কমল, আমরা জানি। আমরা যা জানি না তুমি শুধু সেইটুকুই বলো।'

কমলেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'তাই বলব।'

কমলেন্দু বলল : 'তোমাদের নিশ্চয় মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুয়েকের জন্যে মোতিহারিতে ছোটকাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম যখন, তখন বর্ষার শুরু, আমাদের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। বাবা পাটনায় মেসোমশাইকে আমার কলেজে ঢোকার সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট কি হয়েছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পড়তে যাবার আনন্দে তখন খুব মশগুল হয়ে আছি, বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা আদরের ঘটা চলছে। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন গলায়-গলায়। মোতিহারিতে সে আমায় চিঠি লিখত। তার মা-বাবার কথা তোমরা জান, পয়সাকড়ি থাকার জন্যে, আর তার বাবা মনোজকাকা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুরে আসার পর আরো একটু সাহেবী

হয়ে গিয়েছিলেন। শিবানীকে শাড়ি ধরাতে ওঁরা দেরী করেছিলেন। আমি যখন মোতিহারিতে তখন শিবানী শাড়ি ধরেছে। চিঠিতে আমায় লিখেছিল। ফিরে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাড়ি পরে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হয়ে গেছে—বেশ বড়।··কই, আর একটা সিগারেট দাও তো···।'

অনাদি কমলেন্দুকে সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য, তারপর বলল :

'একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের মতন কালো।···দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যে। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে। একটা জানলা, যেটা দিয়ে ছাট আসছিল না জলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদের বাড়ি। শিবানীর মা—লতিকা-কাকিমার শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘর। আমার ঘর থেকে শিবানীর ঘর দেখা যায়···কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছচ্ছিল না।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশারা করে বলছিলাম শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে আসতে। শিবানী আমায় বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইরকম করতে করতে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে এলো। পেয়ারাগাছের ডালের পাশ দিয়ে শিবানীর ঘরের অনেকটাই চোখে পড়ে আমার। সে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে জানলায় বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূর থেকে রঙটা বুঝতে পারি নি।···সন্ধ্যের মুখে সব যখন অন্ধকার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দরজায় দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টির মধ্যে এ বাড়ি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময় মা তার হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজে গিয়েছিল; হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজেছে। লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। জলের ছাট আসছিল। আমি আলনায় ঝুলানো আমার একটা জামা এনে ওর ভিজে হাত মাথা ঘাড় মুছিয়ে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল অনেকটা ভিজে গিয়েছিল বলে শিবানী তার লম্বা বিনুনি খুলে ফেলছিল। ওকে আমি আমার পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ভিজে পা দুটি মুছিয়ে দিতে গেলাম, ইয়ার্কি করেই। ও পা দুলোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথার চুল খুলে ঘাড়ে পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমরা লণ্ঠনের আলোয় বসে গল্প করতে লাগলাম।

শিবানীর গানের মাস্টার ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভাল গাইত তা তোমরাও জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমার এখনো মনে আছে, আমি অনেকবার সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আর নয়। ঝড়বৃষ্টি, বাইরের দুর্যোগ আর অন্ধকারের মধ্যে আমার ঘরে বসে মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় সে গাইল : 'উতল ধারা বাদল ঝরে…।' ওই গানেরই একটা জায়গায় ছিল, 'ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে…।' বার বার শিবানী ওই চরণ দুটি গাইছিল, আর আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু করে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পারছিলাম।…গান শেষ হলে আমরা গল্প করতে লাগলাম। এ-গল্প সে-গল্প। শেষে আমরা ছেলেমানুষের মতন হাতের রেখা, কপালের রেখা, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবানী বলল, তার বুকে নীল শিরার একটা ক্রুশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবতী। বলে আমি হাসছিলাম। এরকম যে হয় না, হতে পারে না, তা আমি জানতাম। আমার হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পারল আমি তাকে অবিশ্বাস করছি। সে বলল, 'হাসছ কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?' আমি মাথা নাড়লাম, 'তুমি কি যীশু ?'…শিবানীর অভিমানে লাগল। বলল, 'আহা, যীশু না হলে বুঝি কিছু থাকতে পারে না ?' আমি তাকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বললাম, 'যার কোথাও পাপ নেই তার থাকতে পারে…। মানুষের নয়। যীশুর মতন তুমি মরতে পারবে ?'…শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ যে সে তার বুকের জামার ওপরের বোতাম খুলে—জামা অনেকটা সরিয়ে আমায় বলল 'আলো এনে দেখ।' …আমি দেখলাম। কি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই। …বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকে শিরা ছিল, নীলচে রঙের। সেটা ক্রুশ কি না আমি দেখি নি। আমি অন্য জিনিস দেখছিলাম।…আজ আমাব স্বীকার করতে দোষ নেই, সেই বয়সে শিবানীর সেই ইনোসেন্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।'

কমলেন্দু নীরব হলো। তাকে খুব অন্যমনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল। নদীর চরের ওপারে রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে, কোথাও একটা কাক ডাকছিল, গাছের পাতায় বাতাসের সরসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা নিঃঝুম ভাব।

আমরা তিন বন্ধুই নিশ্বাস ফেললাম। কমলেন্দু রুমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'শিশির, তোমার যা বলার…'

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীর জীবনে আমি দ্বিতীয় প্রেমিক, তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠতার কথা

কমলেন্দুদের অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছ থেকে যা আমি গোপন রেখেছিলাম, এবার তা বলার জন্যে আমি তৈরী হলাম। কুলঝোপের মাথা ডিঙিয়ে অপরাহ্নের রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, 'আমি খুব সংক্ষেপে সারতে চাই।'

'শুনি…' কমলেন্দু বলল।

'বলছি…। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকার দরকার নেই। তবে তোমাদের জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল, এটা তার শেষের দিকের ঘটনা—' আমি ধীরে ধীরে বললাম। 'শিবানীর বাবা তখন মারা গেছেন, লতিকা কাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আমার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করে পাওয়ার হাউসের চার্জে রয়েছি। শিবানীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখন এমন অবস্থায় যে, তোমরাও ভাবতে, আমি তাকে বিয়ে করব। লতিকা কাকিমাও ভাবতেন। শিবানীরও তাতে সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যেবেলা ওদের বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে হত না, সোজা ড্রয়িং-রুমের পরদা সরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে শিবানীর শোয়ার ঘরে চলে যেতে পারতাম। গল্পগুজব, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া সেরে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন রাত হয়ে গেছে। শিবানী আমায় ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। আর প্রায় রোজই ফেরার সময়, ফটকের করবীঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমায় চুমু খেত।… শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তা আমার কখনো মনে হয় নি। তার গায়ের রঙ, চোখমুখের ছাঁদ আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার শরীর আমার ভীষণ পছন্দ ছিল, তাদের বাড়ির আবহাওয়ায় যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ ভাব, খোলামেলা আচরণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধরনের রুচি, পরিচ্ছন্নতা, বেশবাসের সৌন্দর্য…এ-সবের জন্যে, আর শিবানীর তখনকার শরীরের জন্যে তাকে আমার ভাল লাগত। শিবানীর সেই যৌবন বয়সে তোমরা জানো, মনে হত তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে।…একদিন, সেটা শীতকাল, লতিকা কাকিমা তাঁদের মহিলা সমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকর আর ঝি ছিল। ঝি-টার ঠান্ডা লেগে অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীর শোবার ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম। জানুআরি মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরের জানলা-টানলা সবই বন্ধ ছিল।…সাধারণ একটা কথা নিয়ে আমরা দু'জনেই হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তার একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমরের কাছে বিছানায় অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংয়ের দিকে, মাথার ওপর হাত থাকার জন্যে তার বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বেঁকে—কিংবা বলা

ভাল—ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানার ওপর সুজনিটা ছিল কালচে-লাল, তাতে গোলাপের মতন নকশা ; শিবানীর পরনের শাড়িটা ছিল সিল্কের, তার রঙ ছিল সাদাটে। ওর ভাঙা শরীরের বা আছড়ে পড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেল। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তার গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন করে ফিসফিস গলায় গরম নিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে তার মাকে কথাটা বলব।...আমি তখন যে-কোনো রকম ধাপ্পা দিতে রাজী। বললাম, কালই বলব, কাল পরশুর মধ্যে। শিবানী যেন অন্ধকারের মধ্যে সুখে আনন্দে উত্তাপে সর্বাঙ্গে গলে যেতে শুরু করল।...সে কতবার করে বলল, সে আমায় ভালবাসে। আমি কতবার করে বললাম, আমি তাকে ভালবাসি।... তারপর ঘরের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর ময়লা রঙ, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনের বড় বড় দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম।...তারপর থেকেই আমি পালিয়েছি...'

আমি থেমে গেলাম। আমার গলার কাছে একটা সীসের ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন করে বলব !

নদীর ওপারে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীর চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করেছে। সমস্ত জায়গাটা অপরাহ্নের বিষণ্ণতায় ক্রমশই মলিন হয়ে আসছে।

আমাদের তিন বন্ধুর নিশ্বাস পড়ল।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। এবার অনাদির পালা। শিবানীর জীবনে তৃতীয় প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকালাম আমরা।

অনাদি প্রায় আধখানা সিগারেট শেষ করল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করল :

'শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যখন হয়েছে তখন আমরা কেউই বাচ্চা নেই। আমার বয়স তেত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল, শিবানী প্রায় তিরিশ। লতিকা মাসিমা তখন আর ঠিক বেঁচে থাকার মতন অবস্থায় নেই সেই আরথারাইটিসের অসুখে পঙ্গু, শয্যাশায়ী। আমি ব্যাংকে অ্যাকাউণ্টেণ্ট হয়েছি নতুন...তোমরা ভাই জানো, মহেশ্বরী যখন কনট্রাকটারী ব্যবসায় নামল তখন আমি তার পেছনে ছিলাম, তার সঙ্গে আমার ভেতরে ভেতরে কথা ছিল, তার লাভের একটা পার্সেণ্টেজ আমায় দেবে, আমি ব্যাংকে তার সবরকম সুবিধে করে দেবো। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীর কাছ থেকে বেমক্কা দু' চারশো পেতাম। ব্যাংকে আমি তার সুবিধে-টুবিধের মাত্রাও বাড়াতে লাগলাম। মামা ম্যানেজার যদিও নিজের মামা নয়। মামাকে আমি নানা-ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতাম। কিন্তু মহেশ্বরী শেষে আমায় ডুবিয়ে দিল। বিশ্রী

এক অবস্থায় পড়লাম। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার পক্ষে কোথাও আর আইনের ফাঁক থাকল না। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন মেলামেশা। সত্যি কথা বলতে কি আমার তখন এমন কাউকে দরকার, যে আমায় অর্থ সাহায্য করতে পারে। অন্তত একটা জামিন থাকলেও আমার পক্ষে একটু সুবিধে হয়। শিবানীদের নিজের বাড়িঘর, জমি, লতিকা মাসিমার—আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলংকার ছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শিবানীদের শরণাপন্ন হবার কথা ভাবছিলাম। লতিকা মাসিমা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তিই শিবানীর হবে। তাছাড়া, লতিকা মাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীর সঙ্গে আমার তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারেন। বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীর সঙ্গে যে-ধরনের সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমরা যেন স্বামী-স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ করি নি—মানে সেভাবে নয়, আমার তাতে আগ্রহ ছিল না। অথচ আমি শিবানীদের বাড়িতে সারাদিনও থেকেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি, বিছানায় শুয়েছি, লতিকা মাসিমার জন্যে ডাক্তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছি, শিবানীর ও তাদের সংসারের তদারকি করেছি।...আমার ওপর লতিকা মাসিমার সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায় কি ভাবত জানি না, পরে সে আমার ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস করতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গণ্ডগোল বেধে গেছে, মামার জোরে তখনো জেলে যাই নি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শরীর খারাপের অজুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমার বাড়ি বলতে এক মা, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদের বাড়িতে পড়ে আছি। দুশ্চিন্তায় খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখ-মুখ শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিকেল থেকে লতিকা মাসির খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। ডাক্তার ডেকে আনলাম, ওষুধ পত্র চলতে লাগল নতুন করে।...সেদিন সন্ধ্যের পর লতিকা মাসির অবস্থা যখন একটু ভাল হলো, আমি বাইরে—শিবানীদের বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, অন্ধকারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু' চারটে কথার পর সে বলল, আমি আর কতদিন এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব ?...আমি তখন জামিন এবং টাকার কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকা মাসির কাছে সে সব বলবে।...আমরা দু'জনেই তখন একটা শিউলি-গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক দিন পরে হঠাৎ আমার নাকে শিউলি ফুলের গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কান্না কুকুরের মতন। শিবানী আমায় সান্ত্বনা দিল। পরে বলল, এই ঘরবাড়ি টাকা—এ-সব মা আমার ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছে। যার কাছে আমার আশ্রয় জুটবে, এ-সবই তার। তুমি তো এ-সবই তোমার নিজের ভাবতে পার।'...আমি

সে-রাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।...লতিকা মাসিমা আমার তরফে জামিন দাঁড়ালেন, কিছু টাকাও আমায় তিনি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরী মামলায় এমন এক অবস্থায় পড়ল যে তাকে সরিয়ে রাখা টাকা বের করে দিতে হলো। আমার গণ্ড-গোলটাও মিটে গেল। লতিকা মাসি অবশ্য আরো মাস কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতের জন্যে আমার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিল ; সে-ভার আমি নিই নি, তাকে আশ্রয়ও দিই নি। শিবানীকে ঠিক বিয়ে করার মতন মেয়ে আমার কোনোদিনই মনে হয় নি।...'

অনাদি চুপ করল।

আমরা চুপচাপ। নিঃসাড় যেন। একটা সাদা ধবধবে বক নদীর ওপর দিয়ে গোধূ-লির আলোর সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, 'লতিকা কাকিমার টাকাটা তুমি ফেরত দাও নি ?'

'পরে মাসিমা মারা যাবার পর, শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি।'

আর কোনো কথা হলো না। আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন প্রেমিক-পুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কারো দিকে তাকালাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। আমাদের চারপাশে সেই সীসের মতন ছায়া ক্রমশই জমতে লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুরোলো। এবার আমরা। নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভরে এনে কমলেন্দু শিবানীর ভিজে চিতায় জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভরে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তার নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়ের রাশিতে জল ঢাললাম। তারপর অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আর পিছু ফিরে তাকাব না।

·

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গরুর গাড়িটা চলছে, চাকার করুণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে হলো যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পারছে না। আমরা তাকে গরুর গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোর করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় চাঁদ উঠে গেল। শুক্লপক্ষ, আজ বুঝি ত্রয়োদশী।

নদী পিছনে, দু' পাশের জঙ্গল গুটোনো পাখার মতন দু' পাশে নেমে গেছে,

সামনে উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা। জ্যোৎস্না ধরেছে বনে, ঝিল্লিরব ঘন হয়ে এলো, ফাল্গুনের বাতাস বইছে, গরুর গাড়ির চিকন করুণ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আর আমাদের পায়ের শব্দ। মাথার ওপর চাঁদ।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায়, 'শিবানীর চিতায় জল ঢালার সময় কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী। ভাই, আমি আজ তার কাছে, তার চিতায় জল দেবার সময়, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।'

অনাদি যে কাঁদছিল আমরা খেয়াল করি নি। সে ছেলেমানুষের মতন মুখে কান্না ও লালা জড়িয়ে বলল, 'আমিও…'

চাঁদের আলোয় আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিন প্রেমিক চলেছি। আমাদের সামনে ভুবন। পিছনে শ্মশান, শিবানীর ধুয়ে যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভুবনের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, আমরা তিনজনে—তিন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা, কৌমার্য, নির্ভরতা তো হরণ করে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তারপরও আর কি অবশিষ্ট ছিল শিবানীর, যা ভুবন পেয়েছে! কি পেয়েছে ভুবন যার জন্যে তার এত ব্যথা?

চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চার পাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক আলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।

